উমাচরণ-গ্রন্থাবলী—৩

যোগবলে রোগ-আরোগ্য

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

যোগবলে রোগ-আরোগ্য

[চতুস্ত্রিংশৎ সংস্করণ]

(বিশেষভাবে পরিমার্জিত)

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

Umachal Series—3

YOGABALE ROG-AROGYA

SRIMAT SWAMI SHIVANANDA SARASWATI

Published by : Srimat Swami Satyabratananda Saraswati

Umachal Prakashani

Umachal Yogashram
Kamakhya, Guwahati-10
Assam
Phone – 2540635

Shivananda Yogashram
471, Netaji Colony
Kolkata-700 090
Phone – 2531-1117

1st Ed.– 1949 ; 34th Ed. – Maghi Purnima, 2015

E-mail : shivanandayogashram@rediffmail.com
Face Book ID : www.facebook.com/shivananda yogashram

Price : Rs. 170.00

যোগবলে রোগ-আরোগ্য

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক—**শ্রীমৎ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সরস্বতী**
অধ্যক্ষ, শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘ

উমাচল প্রকাশনী

উমাচল যোগাশ্রম
কামাখ্যা, গুয়াহাটী—১০, অসম
ফোন নং—২৫৪০৬৩৫

শিবানন্দ যোগাশ্রম
৪৭১, নেতাজী কলোনী, কলকাতা-৯০
ফোন নং—২৫৩১-১১১৭

১ম সংস্করণ ঃ ১৩৫৫ ; ৩৪তম সংস্করণ ঃ রাসপূর্ণিমা, ১৪২১

মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা

মুদ্রক ঃ নবপ্রেস প্রা. লি.
৬৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ISBN—81-85859-02-7

শ্ৰীমৎ স্বামী শিৱানন্দ সৰস্বতী
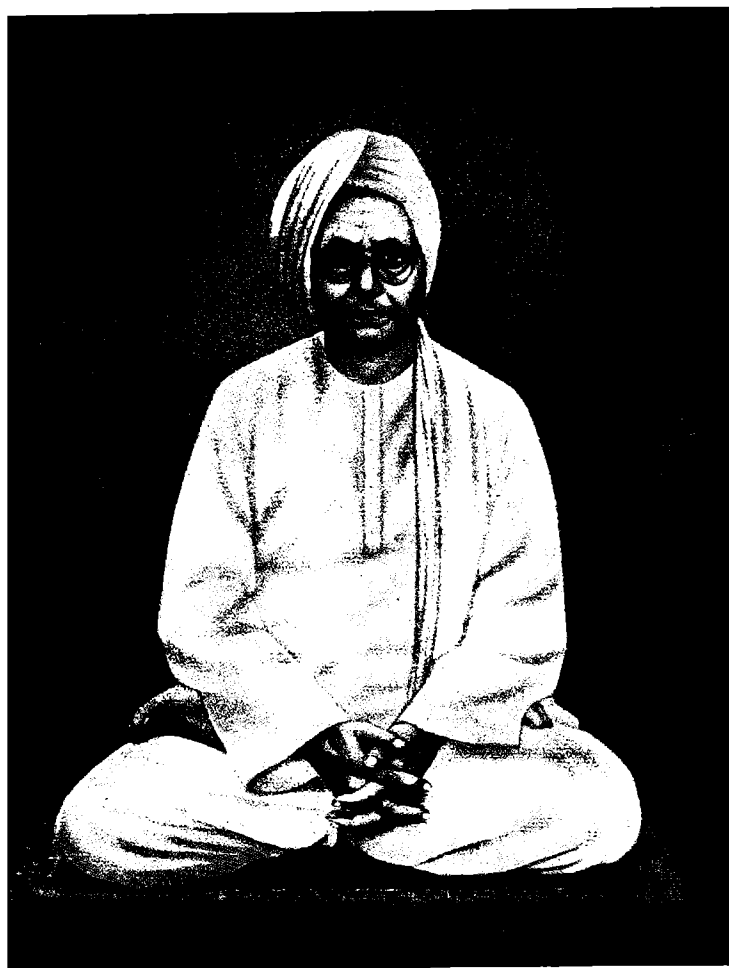
উৎসর্গ

সর্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

বিশ্বে সবে সুখী হোক্
হোক্ নিরাময়—
দৃষ্টি যেথা পড়ে
হেরে মঙ্গলনিচয়।
দুঃখ কেহ নাহি পাক্
ধরণীর বুকে—
বীত-রোগ বিশ্ববাসী
থাকে যেন সুখে।

আমাদের যৌগিক গবেষণা

বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজকাল অসাধ্য সাধন করিয়াছে। মানুষ ঊর্ধ্ব আকাশে উড়িতেছে; অচিন্ত্যনীয় বেগে মহাকাশ ঘুরিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে; সমুদ্রের অতল তলে মানুষ অবাধে বিচরণ করিতেছে; চন্দ্রলোকে, শুক্রে ও মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনা মানুষ রূপায়িত করিতেছে। কিন্তু এই মানুষই আবার জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর অধীন হইয়া অসহায় জীবনযাপন করিতেছে—ইহা মানুষের পক্ষে অগৌরবেরও। মানুষকে এই অগৌরবের হাত হইতে, এই জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যায় কিনা, মৃত্যুকে মানুষের ইচ্ছাধীন করা যায় কিনা—এই ভাবনায় আমাদের মনও ব্যাকুল হইয়াছিল। ঔষধের সাহায্যে মানুষকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যায় না—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বদাই আমরা পাইতেছি। একমাত্র ভারতীয় যোগবিদ্যার সাহায্যে হয়ত মানুষ এই ব্যাধি, জরা ও অকালমৃত্যু জয় করিতে পারিবে—এই ধারণা লইয়া আমরা যোগবিদ্যার গবেষণা আরম্ভ করি।

যোগশাস্ত্রে যেসব কঠিন ধৌতি, বস্তি ও কুম্ভক-প্রাণায়ামাদি আছে উহার অনুশীলন সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইজন্য সর্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী করিয়া নূতন যৌগিক ক্রিয়াদি উদ্ভাবনের আকাঙ্খা আমাদের মনে জাগে।

ভারতের সুদূর পূর্ব সীমান্তে আসামের নিভৃত আশ্রমে বসিয়া আমরা আমাদের এই যোগবিদ্যার গবেষণা বহু বৎসর পূর্বে আরম্ভ করি। আমাদের এই গবেষণার ফলেই মহোপকারী সহজ যৌগিক ক্রিয়া উদ্ভাবনে আমরা সক্ষম হইয়াছি। যোগের কঠিন ধৌতি-বস্তিক্রিয়াকে আমরা

সহজসাধ্য ধৌতি-বস্তিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করিয়াছি। কঠিন ও বিপদ্জনক কুম্ভক প্রাণায়ামের পরিবর্তে সাধারণের পক্ষে মহোপকারী সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম প্রচলন করিয়াছি। আমাদের আবিষ্কৃত সহজ অগ্নিসারক্রিয়া আমাশয় ও পেটের অসুখ অতি দ্রুত আরোগ্য করে ; এই সহজ অগ্নিসারক্রিয়াটি বিপজ্জনক কলেরা রোগেরও অব্যর্থ প্রতিষেধক। আমাদের প্রচলিত ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়ামাদি সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ অনায়াসে তাড়াতাড়ি ভালো করে। এই প্রাণায়াম অভ্যাস থাকিলে জ্বররোগ কখনো দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই সহজ প্রাণায়ামাদি টাইফয়েড, নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেরও অব্যর্থ প্রতিষেধক।

রক্তচাপবৃদ্ধিরোগ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগও আমাদের যৌগিকপন্থায় অল্পায়াসে ভালো হয়। করোনারী থ্রম্বসিস্ এবং ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্যেও আমাদের এই সহজ যৌগিক প্রক্রিয়ার সুফল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

এখন আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে করিতেছি—**জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধের সহজতম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।** সকলের পক্ষেই ইহা করায়ত্ত করা সম্ভব। সর্বসাধারণ যদি এই সহজ যৌগিকপন্থা গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমুদয় মানুষই ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জয় করিয়া ইচ্ছামৃত্যুকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। মানুষের অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি হয় পথ্যের ত্রুটির জন্য ; সুতরাং পথ্যব্যবস্থা নির্ভুল হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এইজন্য যোগবিদ্যা অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বিষয় লইয়াও আমাদের গবেষণা করিতে হইয়াছে। খাদ্য বিষয়ে আমাদের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা আমরা আমাদের 'খাদ্যনীতি' নামক বাংলা গ্রন্থে এবং 'Arrange Right Diet For Human beings' নামক ইংরেজি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমাদের এই খাদ্যনীতির পুস্তক দুইখানি বর্তমান যুগের খাদ্যবিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে এমন সুযুক্তির

সহিত লিখিত যে উহা পড়িলে পথ্য সম্বন্ধে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকিবে না। আমাদের আশা আছে, খাদ্যনীতি সম্পর্কে আমাদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত একদিন সমস্ত পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি পাইবে। জনসাধারণকে আমরা **'খাদ্যনীতি'** গ্রন্থ দুইখানিও ক্রয় করার অনুরোধ জানাইতেছি। এই অল্প মূল্যের খাদ্যনীতি পুস্তক দুইখানি আমাদের **'যোগবলে রোগ-আরোগ্য'** গ্রন্থখানির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ।

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
রাসপূর্ণিমা—১৩৬৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মানব আবির্ভাবের আদিম যুগ হইতেই রোগাক্রমণ প্রতিরোধের ভাবনা মানব মনে উদিত হইয়াছে। এই ভাবনাই ঔষধ আবিষ্কারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ত্রিবিধ ঔষধ মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে—উদ্ভিজ্জ, ধাতুজ ও প্রাণিজ। ঔষধ আবিষ্কার করিয়াও উহার ফলাফল সম্বন্ধে মানুষ নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। দেহতত্ত্বজ্ঞান, দেহযন্ত্রের সমুদয় কার্যকারিতার জ্ঞান মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ; কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই চিকিৎসককে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্যই আমাদের দেশে একটা বিদ্রূপাত্মক প্রবাদ আছে—"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।" অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগে এক শত রোগীর প্রাণনাশের পর ঔষধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 'বিদ্যা' বা কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, এইজন্যই ইহাদের নাম বৈদ্য। ঔষধপ্রয়োগে সহস্র রোগীর প্রাণনাশের পর যাহারা ঔষধ সম্বন্ধে অধিকতর 'চেতনা' বা জ্ঞান লাভ করেন, তাহারাই চিকিৎসক নামে খ্যাত হন।

যাহারা অসুখ হইলেই ঔষধ ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, রোগ তাহাদের সঙ্গ ছাড়ে না। এক অসুখ ভাল হওয়ার কিছুদিন পরই আবার তাহারা অন্য অসুখে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। এইভাবে বারবার অসুখে ভুগিয়া তাহারা অকালমৃত্যু বরণ করে। ঔষধের এই সুদূরপ্রসারী কুফল লক্ষ্য করিয়া একদল বিচক্ষণ লোক উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন, ঔষধের উপর ইহারা বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন। পশু-পক্ষী প্রভৃতির রোগারোগ্য প্রণালী ইহারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। গৃহপালিত কুকুরটি মাঝে মাঝে এক-একদিন উপবাস দেয়, তাহার অতিপ্রিয় খাদ্যও সে স্পর্শ করে না। রৌদ্রের মাঝে গিয়া কুকুরটি নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে। একবেলা বা একদিন

এইরূপ রৌদ্রস্নান করিয়া ও উপবাস দিয়া কুকুরটি সতেজ হইয়া উঠে। আবার সে পূর্ববৎ আহার গ্রহণ করে এবং ছুটাছুটি করিয়া স্ফূর্তিতে দিন কাটায়। ঘরের বিড়ালটিও মাঝে মাঝে এইরূপ এক-আধদিন কিছুতেই খাদ্য স্পর্শ করে না, কতকগুলি দূর্বা ঘাস চিবাইয়া কয়েকবার বমি করে ; তাহার পর আরও কিছুক্ষণ লঙ্ঘন দিয়া যথারীতি খাদ্য গ্রহণ করে। গৃহপালিত গরুটি জ্বরাক্রান্ত হইলে কিছুতেই ঘাস খায় না ; জলাশয়ের পাশে গিয়া নির্জীবভাবে পড়িয়া থাকে এবং প্রায়ই প্রতিঘণ্টা অন্তর জলাশয়ের নিকটে গিয়া প্রচুর জলপান করে। এইভাবে একদিন বা দুইদিন জলপান সহকারে উপবাস দিয়া গাভীটি আবার সুস্থ-সবল হইয়া উঠে।

পশু-পক্ষীর এই রোগারোগ্য পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াই ঔষধ-বিতৃষ্ণ ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কারের প্রেরণা লাভ করেন। ইহার ফলে অতিপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই আতপচিকিৎসা, জল-চিকিৎসা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। এই প্রাকৃতিক চিকিৎসার জয়গান বৈদিক সাহিত্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। ঔষধ-চিকিৎসা এবং এই প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রণালী অতি প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন যুগের ঋষিদের অহিংসা, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ যেমন বুদ্ধিজীবীদের কৌলীন্যবোধের দরুণ, ক্ষাত্রশক্তির দাম্ভিকতা ও ক্ষমতালোভের দরুণ এবং বৈশ্যশক্তির ধনলুব্ধতার দরুণ আজ পর্যন্ত জগতে বাস্তবমূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারে নাই—মনোজগতের খানিকটা স্থান মাত্র অধিকার করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া আছে, চিকিৎসা জগতেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। **ঔষধ আবিষ্কারকদের বিজ্ঞাপন ও বাগাড়ম্বরের দাপটে প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে হরিজনদের মতোই অস্পৃশ্য হইয়া অতি সঙ্কুচিত হইয়া পথ চলিতে হইতেছে।** কোনো বিষয় লইয়া গভীরভাবে ভাবনা করিবার অভ্যাস জনসাধারণের নাই, গতানুগতিক পথে চলিতেই তাহারা ভালোবাসে। বাগাড়ম্বর ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই জনসাধারণকে সহজেই প্রতারিত করা যায়। এইজন্যই প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতি, বর্তমান যুগে অজ্ঞাত ও অখ্যাত

হইয়া আছে। মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ এইগুলি অনুসরণ করেন না।

আমাদের দেশের **"যৌগিক চিকিৎসা পদ্ধতি" প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিরই পূর্ণাঙ্গরূপ**। ঔষধে রোগ আরোগ্য করে, কিন্তু আবার ঐ উদরস্থ ঔষধবিষেই নূতন রোগ সৃষ্টি হয়, ভাবী স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হয়। প্রাকৃতিক চিকিৎসার অঙ্গস্বরূপ পরিমিত উপবাস, জলধৌতি, কাদামাটির প্রলেপ, আতপস্নান প্রভৃতি অবলম্বনেও রোগ আরোগ্য হয় ; কিন্তু ঔষধের মতো পরিণামে উহা দেহের পক্ষে অনিষ্টকর হয় না; ভাবী স্বাস্থ্যলাভেরও প্রতিবন্ধকতা করে না। সুতরাং ঔষধ চিকিৎসার চেয়ে প্রাকৃতিক চিকিৎসা মানুষের দেহের পক্ষে অধিকতর কল্যাণজনক—যদিও ইহার অভ্যাসাদি একটু বিরক্তিজনক এবং সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এই প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিরও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ইহাও সাময়িকভাবে রোগ দূর করে, কিন্তু ভাবী রোগাক্রমণ প্রতিরোধে খুব বেশি সহায়তা প্রদান করিতে পারে না; দেহের দুর্বল যন্ত্রগুলিকে স্থায়ী সবলতা প্রদান করিতে পারে না। অথচ **যৌগিক চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য এই—উহা যেমন রোগ আরোগ্য করিতেও পারে, তেমনি ভাবী রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাহার অসাধারণ**। যৌগিক আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসে স্নায়ু, পেশী, ধমনী, গ্রন্থি, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি দেহপরিচালক যন্ত্রগুলি এমন সবলতর হয়, এমন প্রাণবান্ হইয়া উঠে যে কোনো রোগবিষ বা কোনো রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায় না। **এইজন্যই যৌগিক চিকিৎসা সমগ্র চিকিৎসা প্রণালীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি।**

যোগীরা দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সুগভীর ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই সর্বজনহিতকর যোগবিদ্যা আবিষ্কার তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্তমান যুগে গ্রন্থিতত্ত্ব ও গ্রন্থির অন্তর্মুখী রসের ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান এই গ্রন্থিতত্ত্ব

সম্বন্ধে অল্পজ্ঞ ছিল; অথচ যোগীরা বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই এই গ্রন্থিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া এই গ্রন্থিগুলিকে সবল-সুস্থ রাখিবার উপযোগী সহজ যৌগিক ক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। **আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিদের আবিষ্কৃত এই যোগবিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই অমূল্য সম্পদ স্বরূপ।**

রোগ আরোগ্য করার চেয়ে রোগ সৃষ্টি হইতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করাই চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষকে এই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র যৌগিক ক্রিয়ারই আছে। **৫ বৎসরের শিশু হইতে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল বয়সের সকল নর-নারীর উপযোগী সহজ সহজ যৌগিক ক্রিয়া আছে। আহারে-বিহারে সংযত থাকিয়া, সুষম পথ্য বা আদর্শ পথ্য গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝে কিছু সময় যৌগিক আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান করিলে আমরণ দেহকে নীরোগ রাখা যায়, আমরণ যৌবনকে অটুট রাখা যায়। এইরূপ মহোপকারী যোগপদ্ধতি স্বাধীন ভারতের ঘরে ঘরে, স্বাস্থ্যহীন ভারতবাসীর গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক—এই উদ্দেশ্যেই আমরা পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম।**

এই পুস্তক প্রণয়নের মূলে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে। বহু রুগ্ন ছেলে-মেয়ের উপর আমরা, যোগবিদ্যার ফলাফল পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছি। স্বাস্থ্যরক্ষায় যোগবিদ্যার ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও দেশের সেবায় লাগুক, স্বাস্থ্যহীন ভারতের গৃহে গৃহে স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী ছেলে-মেয়ের আবির্ভাব হউক, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু সর্বদেশের মানবসমাজ হইতে নির্বাসিত হউক—এই শুভেচ্ছার বশবর্তী হইয়াই আমরা এই যোগবলে রোগ-আরোগ্য গ্রন্থখানি রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই পুস্তকের যৌগিক চিকিৎসাপ্রণালী এবং পথ্যবিধি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক রোগীই রোগমুক্ত হইতে পারিবে—ইহাতে কোনো সংশয় নাই।

রোগীদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয় এইরূপ কোনো কঠিন যোগক্রিয়া আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করি নাই। রোগারোগ্যের জন্য কোন

কঠিন যোগক্রিয়া অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না, রোগীদের অনুষ্ঠান উপযোগী অতি সহজ সহজ অল্প কয়েকটি যোগক্রিয়া দ্বারাই সর্বব্যাধি আরোগ্য করা যায়।

যোগাসনের নামে অনেকেই ভয় পায়। অনেকের এই সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে। কিন্তু আমাদের এই গ্রন্থে যে সব যোগক্রিয়াদি আছে, তাহা ঠিকমত অনুষ্ঠিত না হইলেও কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং নির্ভয়ে ইহা অনুষ্ঠান করিয়া অটুট স্বাস্থ্যগঠনে যত্নশীল হইবে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তকের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে, সুতরাং চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বনের পূর্বে প্রত্যেক রোগীকেই আমরা পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠের অনুরোধ জানাইতেছি।

আমরা সকলেই জানি, যোগশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, উহা অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা আত্মদর্শন শাস্ত্র ; এইজন্যই রোগের কারণ বর্ণনা এবং রোগে নিয়ম-পথ্যবিধির উল্লেখ যোগগ্রন্থের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। রোগের কারণাদি বর্ণনা করিতে হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রের সহায়তা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। আয়ুর্বেদশাস্ত্র যোগশাস্ত্রেরই সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা (উভয়েই বেদমাতার সন্তান)। এইজন্য রোগের কারণাদি বিশ্লেষণে আমরা আয়ুর্বেদকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছি। আয়ুর্বেদ-বিবরণ যেখানে অতি সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট সেখানে আমরা আধুনিক যুগে প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সহায়তা লইয়াছি। সুতরাং শুধু যোগশাস্ত্র প্রণেতাদের কাছে নয়, বর্তমান যুগে প্রচলিত আয়ুর্বেদ, এলোপ্যাথিক, প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রভৃতি সর্ববিধ চিকিৎসাশাস্ত্রের কাছেই আমরা এই পুস্তকের জন্য আংশিকভাবে ঋণী। এই সব চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রণেতা আচার্যদের কাছেও কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরা ঋণ স্বীকার করিতেছি।

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
শিবানন্দ মঠ
উমাচল যোগাশ্রম
কামাখ্যা, গুয়াহাটী-১০ (অসম)

দীপান্বিতা
১৩৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দীর্ঘায়ুর সংখ্যা অতি নগণ্য। সিন্দুরশোভিত শুভ্র সীমন্তিনী নারীর দর্শন বাঙ্গালী সমাজে দুর্লভ, অধিকাংশ বাঙ্গালী পুরুষকেই অকালমৃত্যু বরণ করিতে হয়। সাধারণের অকালমৃত্যুর ক্ষতি কোনোরকমে পূরণ হয়, কিন্তু জাতির মাঝে যাঁহারা মহামনীষী, যাঁহাদের শক্তি ও কর্ম্মদক্ষতার উপর জাতির উন্নতি, জাতির কল্যাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে তাঁহাদের অকালমৃত্যু জাতির পক্ষে মহাবেদনাদায়ক, মহাদুর্ভাগ্যের বিষয়। বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে আমরা এখানে যাহা বলিতেছি, বাংলার প্রতিবেশী অসম ও উড়িষ্যাবাসীদের প্রতিও উহা সমভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের এই যুগেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীযুক্ত কেশব সেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশবরেণ্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতির অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাদের অকালমৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালী জাতিরই ক্ষতি সাধিত হয় নাই, সমগ্র ভারতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এইরূপ অকালমৃত্যুর নিশ্চয়ই কারণ আছে এবং সেই কারণ দূর করাও অসম্ভব নয়। এইরূপ অকালমৃত্যু জয় করিয়া আমরণ নীরোগ দেহ লাভের পন্থা, শতায়ুলাভের পন্থাই এই পুস্তকে এবং আমাদের যোগ সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তকগুলিতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আমরা পুনরায় জোরের সহিত বলিতেছি ঋষিদের আবিষ্কৃত এই সহজসাধ্য যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও নিয়ম-পথ্যাদি পালন করিলে

সর্বব্যাধিমুক্ত দেহ লাভ করা যায়, জরা ও অকালমৃত্যু জয় করা যায়, উদার ও উন্নত মনের অধিকারী হওয়া যায়।

ঔষধ এবং চিকিৎসক বর্জন করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যলাভের এই অমোঘ উপায় অবলম্বনের জন্য আমরা আমাদের দেশবাসীকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
গুরুপূর্ণিমা-১৩৬০

বর্তমান সংস্করণের বক্তব্য

দিনের পর দিন পুস্তক প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা এই অমূল্য গ্রন্থখানির বিশেষভাবে পরিমার্জিত বর্তমান সংস্করণের মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিলাম।

শিবানন্দ মঠ, কামাখ্যা,
গুয়াহাটী—১০, অসম।

প্রকাশক

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

পরম পূজ্যপাদ সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের গুরুপূর্ণিমা তিথিতে বরিশালে (অধুনা বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা তরঙ্গিনী দেবীর অতি আদরের প্রথম সন্তান। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা সদ্‌গুরু পরমহংস ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হয়ে জ্ঞান ও যোগ পথের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। হিমালয় ও কামাখ্যায় দীর্ঘ তপস্যায় পরম জ্ঞান লাভ করার পর জনহিতার্থে ১৯২৯ সালে কামাখ্যায় উমাচল যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উহা **শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘ** নামে দেশ-বিদেশে পরিচিত। সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে তিনি প্রায় অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ যোগবিদ্যার বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করেন। তাঁর এই বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ভারতে তথা বহির্ভারতে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী দ্বারা সমাদৃত হয়। তাঁর গবেষণালব্ধ পুস্তকগুলি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়ে যোগবিদ্যার প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাঁর লিখিত "YOGIC THERAPY"—বইটি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে উচ্চ প্রশংসিত হয়। তিনি বিভিন্ন দেশের (রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, স্পেন ইত্যাদি) সরকার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারতীয় যোগ চিকিৎসা পদ্ধতি, দর্শন প্রভৃতি প্রচার করেন। তিনিই যোগ চিকিৎসার প্রথম পথপ্রদর্শক এবং যৌগিক হাসপাতাল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা অনুসন্ধান পরিষদের Financial Advisory Board-এর সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর একান্ত

প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্কুলসমূহে যোগশিক্ষা প্রচলিত হয়। তিনি বাংলা, অসমীয়া, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁর উপলব্ধ জ্ঞানের আলোকে ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদগুলির উপর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাঞ্জল ভাষ্য প্রণয়ন করেন। জ্ঞান ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক স্বামীজী মহারাজ ১৯৭৯ সালের ৭ই অক্টোবর মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত-শিষ্য, ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগবিদ্যার প্রচারে ভারতে তথা বহির্ভারতে ব্রতী আছেন। স্বামীজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক যোগশিক্ষা ও যোগ-গবেষণা কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এখানকার যৌগিক হাসপাতাল এবং যোগ মহাবিদ্যালয়, যোগবিদ্যা প্রশিক্ষণের অন্যতম কেন্দ্ররূপে সমাদৃত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পনের

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

যোগবলে রোগ-আরোগ্য

[রুগ্ন নর-নারীর অনুষ্ঠান উপযোগী]

প্রথম অধ্যায়

যোগশাস্ত্রে দেহতত্ত্ব ও রোগ-নিদান

যোগবিদ্যা জ্ঞানরূপী বেদসমুদ্রেরই একটি রত্ন। 'যোগ' শব্দের অর্থ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ বা মিলন, ভক্ত ও ভগবানের মিলন। সুতরাং সৃষ্টির নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ আস্বাদন অর্থাৎ পরমাত্মার মাঝে অবগাহনের সাধনার নামই যোগ।

আমাদের দেশের যোগশাস্ত্র দুইটি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারার নাম রাজযোগ, আর একটি হঠযোগ। রাজযোগের বিস্তৃত বিবরণ আছে পাতঞ্জল যোগদর্শনে। পাতঞ্জল দর্শন চারটি পাদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত— সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে মন-বুদ্ধি স্থির ও শান্ত হইয়া সমাধি অবস্থা লাভ করিলে তবেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব। সাধককে সমাধি অবস্থা লাভ করিতে হইলে যত রকম বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় তাহার বিবরণ পাই আমরা এই সমাধিপাদে। সাধনপাদে পাই আমরা সাধনার বিবরণ। ইচ্ছা করিলেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায় না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ। এই সব আত্মশুদ্ধির সাধনায়, মনঃশুদ্ধির সাধনায় সিদ্ধ না হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না।

সাধনার দ্বারা মনকে বশ করিতে পারিলে আমরা বহুবিধ অলৌকিক

শক্তির অধিকারী হইতে পারি, সৃষ্টি রহস্য জানিতে পারি। ইচ্ছামত এই জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্যান্য ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিতে পারি, ইচ্ছামত অদৃশ্য হইতে পারি, অপরের মনোভাব জানিতে পারি। এইরূপ বহুবিধ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করার প্রণালী আছে এই বিভূতিপাদে। মন-বুদ্ধির রাজ্য অতিক্রম করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিতি, ভাগবতস্বরূপে অবস্থিতির প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে কৈবল্যপাদে। সুতরাং রাজযোগ বিশেষভাবে জোর দিয়াছে মনঃশুদ্ধির সাধনার উপর।

কিন্তু হঠযোগ বিশেষভাবে জোর দিয়াছে দেহশুদ্ধির উপর। দেহশুদ্ধির সাধনায় সিদ্ধ না হইলে মনঃশুদ্ধি সুসম্পন্ন হয় না—ইহাই হঠযোগের অভিমত। **'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'**—শরীরই সাধনার ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমি যদি সুদৃঢ় হয়, তবেই এই ভিত্তির উপর উচ্চস্তরের জীবনসৌধ, দিব্য জীবনের আকাশচুম্বী সৌধ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর। সুতরাং হঠযোগের মতে দেহটা যন্ত্র আর দেহকে ধারণ করিয়া আছেন আত্মারূপী যন্ত্রী। দেহ ও দেহস্থ মন, বুদ্ধি ও অহংকার প্রভৃতি এই আত্মারই বিভূতি বা শক্তি। এই শক্তির খেলাই চলিতেছে অহর্নিশি দেহযন্ত্রের ভিতরে। যদি দেহস্থ স্নায়ু, পেশী ও গ্রন্থির কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে, দোষমুক্ত থাকে, তাহা হইলে এই দেহযন্ত্রের ভিতরে আত্মার দেবভাব, ভাগবতভাব স্ফুরিত হইয়া উঠিবে। আর এই দেহযন্ত্রে ত্রুটি ঘটিলে দেহ-মন পাশবিকভাবেরই লীলাভূমি হইয়া উঠিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—যকৃতের ক্রিয়া স্বাভাবিক না থাকিলে মানুষের মেজাজ হয় খিট্‌খিটে, ব্যবহার হয় রুক্ষ, কর্কশ। পিতৃগ্রন্থি (Sex-gland) স্বাভাবিক না থাকিলে, অতিক্রিয় বা স্বল্পক্রিয় হইলে মানুষ হয় অত্যধিক কামুক ও স্বার্থপর। মঙ্গল গ্রন্থি (Thymus) দোষযুক্ত হইলে মানুষ হয় চোর-ডাকাত ও নরঘাতক। শিবসতী গ্রন্থি (Pituitary) দোষযুক্ত হইলে মানুষ হয় ক্ষুদ্রচেতা, পরছিদ্রান্বেষী, নির্দয়, ঘুষখোর, কালোবাজারী। এইজন্যই দেহশুদ্ধি না হইলে, দেহ রোগমুক্ত ও নির্দোষ না হইলে মনঃশুদ্ধি সম্ভবপর নয়, দেবমনের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর নয়।

এইজন্যই হঠযোগ কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—**পৃথিবীর কোনো মানুষই খারাপ নয়, মানুষের অন্তরে রহিয়াছে ভাগবত সত্তা। এই ভাগবত সত্তাকে জাগ্রত করা, মানুষকে ভাগবতস্বরূপে, ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই যোগের লক্ষ্য।** সুতরাং আমরা যাহাদের খারাপ বলিয়া মনে করি—তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও খারাপ নয়; তাহাদের দেহযন্ত্র, দেহস্থ গ্রন্থি প্রভৃতির ক্রিয়া দোষযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই কুকাজ ও কুচিন্তা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। নির্দোষ পথ্য এবং যোগের ক্রিয়াদির সাহায্যে দেহযন্ত্রের এই ত্রুটি অনায়াসে সংশোধন করিয়া পশুমানবকে দেবমানবে রূপায়িত করা যায়। এইজন্যই হঠযোগ দেহশুদ্ধির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছে। দেহ শুদ্ধ হইলেই মনও শুদ্ধ হইবে। এই শুদ্ধ মনই আত্মস্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক।

হঠযোগের আরও দুইটি শাখা আছে। একটির নাম **লয়যোগ** এবং আর একটির নাম **স্বরোদয় যোগ**। লয়যোগে আছে—মনকে একাগ্র করিবার নানাবিধ আনন্দদায়ক সহজ পন্থা। এইসব চিত্তবৃত্তি নিরোধের সহজ সাধনপন্থা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা আছে আমাদের **ধ্যানযোগ** নামক গ্রন্থে।

স্বরোদয় যোগের লক্ষ্য—শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। ইড়া ও পিঙ্গলার উপর প্রাধান্য স্থাপিত হইলে ইড়া ও পিঙ্গলার শ্বাস ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহকে চিরদিন ব্যাধিমুক্ত রাখিতে পারি। সুষুম্নার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্থাপিত হইলে মনকে ইচ্ছামত একাগ্র করিয়া ধ্যানের উচ্চভূমিতে আমরা আরোহণ করিতে পারি, আমাদের পার্থিব মনকে দেবমনে রূপায়িত করিতে পারি। সুষুম্না অবলম্বনেই মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া সাধক আত্মার অনন্তস্বরূপ, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ আস্বাদন করেন।

স্বরোদয় যোগের নিয়মে যাত্রার সময় নির্ধারিত করিলে সবরকম দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। এই স্বরোদয় যোগের সাহায্যে গুণবান পুত্র-কন্যা লাভ করা যায়; পূর্বেই মৃত্যুর সংবাদ জানা যায়।

[এই স্বরোদয় যোগের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের **বিবিধ প্রাণায়াম ও নেতি-ধৌতি** নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।]

"**প্রকরোতি সর্বম্ ইতি প্রকৃতিঃ**"—সমস্ত কিছু যিনি সৃষ্টি করেন, সমগ্র সৃষ্টি যাহা হইতে প্রসূত, তিনিই **প্রকৃতি**। তন্ত্র মতে ইনি চিন্ময়ী মায়াশক্তি এবং সাংখ্যমতে ইনি জড়প্রকৃতি শক্তি। ইনি সগুণা; সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণান্বিতা। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত অবস্থা, ত্রিগুণের বৈষম্য বা বিক্ষোভের ফলেই সৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। সুতরাং সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ বা ত্রিশক্তির সাহায্যেই প্রকৃতি চেতন অচেতন প্রভৃতি সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু গড়িয়া তোলেন।

সত্ত্বগুণ স্বপ্রকাশ স্বরূপ। সত্ত্বগুণকে আরও সহজ ভাষায় বলা যায় আত্মশক্তির মূল স্পন্দন। 'রজঃ' শব্দের অর্থ শক্তি। সুতরাং **রজোগুণকে** বলা যায় ক্রিয়াশক্তির মূল স্পন্দন। এই ক্রিয়াশক্তিই সৃষ্টিকে গড়ে এবং ভাঙ্গে। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় ইহাকে বলা যায় Becoming or Mutative principle। অরূপশক্তির রূপসৃষ্টির প্রবেগ বা ক্রিয়াশক্তির কার্যরূপকেই বলে **তমোগুণ**।

শক্তির এই তমো-অংশ হইতেই পঞ্চতন্মাত্রের (Source of five Elements) উৎপত্তি। এই পঞ্চতন্মাত্র হইতেই প্রথমে সৃষ্টির কারণরূপী মহাকাশ উদ্ভূত হইয়াছে। "**আকাশাৎ বায়ু**"—এই আকাশ হইতেই বায়ু বা মহাপ্রাণশক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। "**আকাশপবনাৎ অগ্নিসম্ভবঃ**"— এই আকাশ ও বায়ুর মিলন হইতেই অগ্নি বা মহাজ্যোতির আবির্ভাব। "**খর্বাতাগ্নের্জলম্**"—এই আকাশ, বায়ু ও অগ্নির মিলনে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি-বীজধারিণী অপ্‌তত্ত্ব বা কারণবারির উদ্ভব। "**ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী**"—আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও বারিতত্ত্বের মিলনে স্থূল মহাব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ ক্ষিতিতত্ত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা সূক্ষ্ম মহাব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। এই সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত আবার পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া স্থূল পাঞ্চভৌতিক জগৎ অর্থাৎ লক্ষ কোটি

নীহারিকা, লক্ষ কোটি ছায়াপথ, লক্ষ কোটি সৌরজগৎরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে; সৃষ্টির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু সংগঠনের, সৃষ্টির প্রত্যেকটি স্পন্দনের মূলে এই **পঞ্চভূতের** মায়া এবং সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিশক্তির খেলা।

সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি **মহত্তত্ত্ব** বা **সমষ্টিবুদ্ধি** (Universal Intelligence)। বেদ মতে সৃষ্টির আদি দেবতাকে বলা হয় **হিরণ্যগর্ভ**। 'হিরণ্য' অর্থ দিব্যচেতনা, দিব্যজ্যোতিঃ। এই দিব্যচেতনা ও স্বপ্রকাশ সত্ত্বগুণের যিনি ধারক তিনিই হিরণ্যগর্ভ। "**হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে বিশ্বস্য ধাতা পতিরেক আসীৎ**"—দিব্যচেতনা হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব। সুতরাং হিরণ্যগর্ভই সৃষ্টির আদি জনক, ইনিই বিশ্ববিধাতা, ইনিই বিশ্বচেতনা (Sum total of Consciousness)।

প্রকৃতির দ্বিতীয় সৃষ্টি—**অহংকার** (Universal Will power)।

প্রকৃতির তৃতীয় সৃষ্টি—**পঞ্চতন্মাত্র** (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র; এই পঞ্চতন্মাত্র ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক উপাদানের গুণরূপে উহাদের সহিত সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ) ও **পাঞ্চভৌতিক জগৎ** অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কার্যরূপ অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। শক্তির স্থিতিস্থাপকতাই তমোগুণ বা তমঃশক্তি। এই তমঃশক্তির সাহায্যেই পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ডগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সৃষ্টি মোটামুটি ভাবে সপ্তস্তরে বিভক্ত—মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চমহাভূততত্ত্ব। এই সপ্তস্তর বা সপ্ত তত্ত্বেরই প্রতিরূপ বেদ ও পুরাণের—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সপ্তলোক বা সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড। এই সপ্তলোককে আরও সংক্ষেপ করিয়া বলা হয় **ত্রিলোক**—ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং দ্যুলোক। [এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ আমাদের **ঈশোপনিষদ্** গ্রন্থে দ্রষ্টব্য]।

যোগীরা বলেন—"ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ"—ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে আমাদের দেহাভ্যন্তরেও তাহার

সমস্তই আছে। আমাদের দেহটিও একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। পঞ্চতত্ত্বের আদি তত্ত্ব আকাশভূত (Eternal Time & Space) সত্ত্বগুণের সাহায্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছে। দেহস্থ আকাশভূত দেহবিশ্বের ধারক; আকাশের বিশেষ গুণ—শব্দ। দেহে শব্দগ্রহণ ক্ষমতার অধিকারী শ্রবণেন্দ্রিয়। এই শ্রবণেন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করিয়াই আকাশভূতের কার্যকারিতার প্রকাশ। শরীরের সমস্ত আকাশ বা ছিদ্র অর্থাৎ রোমকূপ, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, মজ্জা প্রভৃতির ফাঁক বা গর্তগুলি এই আকাশতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত।

বায়ুভূতে সত্ত্ব ও রজঃশক্তির প্রকাশ। বায়ুভূতের বিশেষ গুণ—স্পর্শ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণ—শব্দ। এই বায়ুই আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ে সুখভোগের অনুভব জাগায়। এই বায়ুই দেহে প্রাণশক্তি, প্রাণবীজ ও প্রাণকোষ নির্মাতা। এই বায়ুই দেহের সমুদয় যন্ত্রগুলিকে, দেহের রস-রক্তকে সর্বাঙ্গে পরিচালিত করে।

তেজোভূত বা অগ্নিতত্ত্বে রজঃশক্তির প্রকাশ। এই তেজোভূতের বিশেষ গুণ—রূপ। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। দেহস্থ এই তেজোভূতই দৃষ্টিশক্তি বা রূপোপভোগ ক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই অগ্নিই আমাদের দেহের শক্তি ও বল। এই অগ্নিই দেহে জঠরাগ্নিরূপে খাদ্যবস্তু জীর্ণ করিয়া দেহে রস-রক্ত উৎপন্ন করে, দেহের তাপ রক্ষা করে, দেহের পোষণ ও বর্ধন করে।

জলভূত বা অপ্‌তত্ত্বে রজঃ ও তমঃ শক্তির প্রকাশ। জলভূতের প্রধান গুণ—রস। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এই অপ্‌তত্ত্ব বা জলভূতের কার্যকারিতা অর্থাৎ রসাস্বাদনশক্তিও রসনাকে কেন্দ্র করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। শরীরের যাবতীয় রস-পদার্থ অর্থাৎ রস, রক্ত, শুক্র প্রভৃতি সমস্ত তরল পদার্থ এই জলভূত হইতে উৎপন্ন।

পৃথ্বীভূত বা ক্ষিতিতত্ত্বে তমঃশক্তির প্রকাশ। ক্ষিতিতত্ত্বের বিশেষ

গুণ—গন্ধ; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করিয়াই পৃথ্বীতত্ত্বের কার্যকারিতার বিশেষ প্রকাশ। অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা প্রভৃতি দেহের সমুদয় স্থূল পদার্থই পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন।

যোগশাস্ত্রে আকাশভূতের যিনি নিয়ন্তা বা অধিপতি, তাঁহার নাম **ইন্দ্র**। **"ইন্ধে ভূতানি"**—পঞ্চভূত ইহার প্রভাবেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া, সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহার ব্যোম এবং আকাশরূপ দেহে সহস্র অক্ষি বিরাজিত। এই সহস্র অক্ষির প্রশাসন দ্বারাই ইনি সমগ্র সৃষ্টিকে সুশাসনে রাখেন। এইজন্য ইঁহার আর এক নাম **সহস্রাক্ষ পুরুষ**। বায়ুভূত বা মরুৎতত্ত্বের যিনি অধীশ্বর তাঁহার নাম **বায়ু** বা **মাতরিশ্বা** ; ইনিই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত মহাপ্রাণশক্তি। এই বায়ুই বিশ্বলীলায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ব্যষ্টি আধারে ফুটিয়া উঠেন প্রাণরূপে। তেজস্তত্ত্বের অধিপতির নাম **অগ্নি**। সমগ্র সৃষ্টিকে ইনি জানেন, এইজন্য ইঁহার আর এক নাম **জাতবেদা**। **"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"**—অরূপ সৃষ্টিকে **ইনিই** রূপায়িত করিয়া তোলেন। ইনিই শক্তিস্বরূপ। ইনিই প্রাণশক্তি প্রবাহের আধার ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড (ব্যষ্টি দেহ) গড়িয়া তোলেন। অপ্‌তত্ত্ব বা কারণবারির যিনি অধীশ্বর তাঁহার নাম **বরুণ**। আনন্দধারা, রসধারাই নিখিল প্রাণ প্রকাশের মূল প্রস্রবণ। তাই বেদে বরুণকে বলা হয় "অসুর"। "অসু" অর্থ প্রাণ; মহাপ্রাণলীলা প্রকাশের তিনি আধার; তিনি রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ।

আমাদের এই অতিস্থূল পৃথিবীতেও আকাশভূতের ক্রিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। বায়ু আকাশের মতো অতি সূক্ষ্ম নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম ; এইজন্য বায়ুকে আমরা চোখে দেখি না, কিন্তু বায়ুর স্পর্শ অনুভব করি। অগ্নি আকাশ ও বায়ুর মতো সূক্ষ্ম নয়, আবার জল-মাটির মতো স্থূলও নয়। বিদ্যুৎ, আলো, জ্যোতিঃ প্রভৃতি অগ্নির যাবতীয় রূপই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং অগ্নির স্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মের মাঝামাঝি। জলভূতের রূপ মাটি-পাথরের মতো অতি-স্থূল নয়; অর্ধস্থূল। পৃথ্বীভূতে তমোভাব বা জড়ত্বের বিশেষ প্রকাশ। শক্তির প্রকাশও পৃথ্বীভূতে স্তব্ধ ;

এজন্য মাটি-পাথরকে আমরা শক্তিহীন জড়পদার্থ বলিয়া মনে করি। অতিসাত্ত্বিকতা হেতু, অতিসূক্ষ্মতা হেতু আকাশভূতের ক্রিয়াও আমাদের কাছে অপ্রকাশ থাকে। জগৎ জুড়িয়া, সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া আমরা ঝড়, বিদ্যুৎ ও মেঘরূপে **বায়ু, অগ্নি ও বরুণ**—এই ত্রিদেবতা বা ত্রিশক্তির খেলা বিশেষভাবেই প্রত্যক্ষ করি। আমাদের দেহ-বিশ্বেও এই **ত্রিশক্তি** বা **ত্রিদেবতারই** বিশেষ প্রাধান্য।

গ্রন্থি পরিচয়

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেমন সপ্তলোক বা সপ্তস্তরে বিভক্ত, আমাদের দেহ ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি সপ্তলোকে, সপ্তস্তরে বিভক্ত। দেহের এক একটি স্থান এক এক লোকের, এক এক তত্ত্বের বিশেষ কর্মকেন্দ্র। এই কর্মকেন্দ্রগুলির নাম **চক্র** বা **গ্রন্থিস্থান**। পাঠকদের ধারণার সুবিধার জন্য প্রাকৃত সৃষ্টির স্তর বিন্যাসের নামানুকরণেই আমরা এই গ্রন্থিগুলির নামকরণ করিয়াছি। ইহাদের নাম—মহৎগ্রন্থি, অহংগ্রন্থি, ব্যোমগ্রন্থি, বায়ুগ্রন্থি, অগ্নিগ্রন্থি, বরুণগ্রন্থি এবং পৃথ্বীগ্রন্থি। যোগী সাধকেরা মানসিক স্তর বিভাগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থি বা চক্রস্থানকে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় মনস্তত্ত্ব নয়, দেহতত্ত্ব—এইজন্যই **"প্রাজাপত্যসূত্রম্"** প্রভৃতি অর্ধ-যৌগিক এবং অর্ধ-আয়ুর্বেদিক গ্রন্থাদির অনুসরণে আমরা গ্রন্থিগুলির নূতন নামকরণ করিলাম।

দেহের প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলির অন্তর্মুখী রস সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। এই অন্তর্মুখী রস রক্তের সহিত মিশিয়া দেহ গঠন ও দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়; ইহার সূক্ষ্মাংশ দ্বারা মন গঠিত হয়, মানসিক পরিপুষ্টি লাভ হয়। দেহের সমুদয় গ্রন্থিই এইভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় দেহ গঠন এবং মানসিক জীবন গঠনে আত্মনিয়োগ করে। পরস্পরের এইরূপ সহযোগিতা সত্ত্বেও এক এক দেহে এক-একটি

গ্রন্থিক্রিয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। যে দেহে যে গ্রন্থির বিশেষ আধিপত্য তাহাকে সেই গ্রন্থিপ্রধান লোক বলা হয়।

ব্যোমগ্রন্থি বা নভঃগ্রন্থি—দেহের প্রত্যেকটি তত্ত্বের ক্রিয়াই সর্বদেহব্যাপী, তবুও ইহাদের প্রধান অপ্রধান কর্মকেন্দ্র আছে। দেহে আকাশতত্ত্বের প্রধান কর্মকেন্দ্র কণ্ঠপ্রদেশ। [বক্ষাস্থি এবং ললাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নামই কণ্ঠপ্রদেশ।] এই কণ্ঠপ্রদেশই ব্যোমগ্রন্থিস্থান। ইন্দ্রগ্রন্থি (Thyroid), উপেন্দ্রগ্রন্থি (Para-Thyroid), তালুগ্রন্থি (Tonsil), লালাগ্রন্থি (Salivary Glands) প্রভৃতি কণ্ঠপ্রদেশের পাঁচটি প্রধান গ্রন্থি এই ব্যোমগ্রন্থির অন্তর্গত। এই ব্যোমগ্রন্থিগুলির অন্তর্মুখী রস রোগবিষকে নষ্ট করিয়া দেহকে সুস্থ-সবল রাখিতে বিশেষ ভাবেই সহায়তা করে। এই গ্রন্থিগুলি সুস্থ-সবল থাকিলে দেহের অন্যান্য স্নায়ু-গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইতে পারে না। এই গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া রক্তের সহিত যথোচিত অন্তর্মুখী রস মিশাইয়া দিতে না পারিলেই দেহ রোগাক্রান্ত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থির অন্তর্মুখী রসের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা মন গঠিত হয়, মানসিক জীবন পরিপুষ্টি লাভ করে। ব্যোমতত্ত্বে সত্ত্বগুণের বিশেষ আধিক্য। এইজন্য ব্যোমগ্রন্থিপ্রধান লোকের মনও হয় সাত্ত্বিক বা দেবোপম। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ব্যোমগ্রন্থি স্বভাবতঃই একটু অধিকতর জোরালো। এইজন্য সুস্থ-সবল ব্যোমগ্রন্থিযুক্ত মেয়েদের স্বভাবে স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেরই আধিক্য প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটিলে অর্থাৎ গ্রন্থিটি কখনো অতিক্রিয়, কখনো অল্পক্রিয় হইলে অথবা দুর্বল হইয়া পড়িলে স্বভাবে আর প্রশান্ত ভাব, সাম্য ভাব থাকে না। উচ্চ চিন্তা বা কোনো বিষয় লইয়া গভীর চিন্তা করার ক্ষমতাও হ্রাস পায়; বিষাদ ও নিরুদ্যমভাব মনকে যেন অভিভূত করিয়া রাখে; অলসতা, কর্মবিমুখতা স্বভাবের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

বায়ুগ্রন্থি—বক্ষঃপ্রদেশই বায়ুর প্রধান কর্মকেন্দ্র। এই বক্ষঃপ্রদেশেই বায়ুগ্রন্থি অবস্থিত। ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র, মঙ্গলগ্রন্থি (Thymus) এবং

প্রাণকোষ নির্মাণকারী গ্রন্থি প্রভৃতি পাঁচটি প্রধান গ্রন্থি এবং অনেকগুলি উপগ্রন্থি এই বায়ুগ্রন্থির অন্তর্গত। বায়ুই যেমন দেহের প্রধান রক্ষক ও পরিচালক; এই বায়ুর প্রধান কর্মকেন্দ্র ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রও তেমনি দেহের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দায়িত্বশীল গ্রন্থি। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের বিশ্রামের সুযোগ আছে, কিন্তু এই যন্ত্রদ্বয়ের বিশ্রামের সুযোগ নাই। দিবা-রাত্র ইহাদের পরিশ্রম করিতে হয়। এই দুইটি যন্ত্রের ক্ষণিক বিশ্রাম দেহের চিরবিশ্রামে পরিণত হয়।

এই বায়ুগ্রন্থির অন্তর্গত গ্রন্থিগুলি সুস্থ-সবল থাকিলে দেহের সমস্ত কার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, দেহের কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটে না। এই গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া পড়িলে দেহের অন্য কোনো গ্রন্থি সে অভাব পূরণ করিতে পারে না; দেহের স্নায়ু, ধমনী এবং অন্যান্য যন্ত্রগুলি তখন আর সঠিকভাবে সক্রিয় হইতে পারে না, দেহ রুগ্ন হইয়া পড়ে।

এই বায়ুগ্রন্থি যাহার সুস্থ-সবল সে হয় আত্মজয়ী, মনোজয়ী এবং শুদ্ধ শান্ত মহাকর্মী। এইরূপ ধীর-স্থির, মনোজয়ী মহাকর্মীরা মনুষ্যসমাজের শ্রদ্ধা বিশেষভাবেই আকর্ষণ করেন। ইঁহারাই বায়ুগ্রন্থি প্রধান লোক। এই বায়ুগ্রন্থি যাহাদের মাঝে বিশৃঙ্খল তাহারা হয় অস্থিরমতি, অতিপ্রলাপী, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, দ্রুতগমনশীল এবং কৃশ।

অগ্নিগ্রন্থি—প্লীহা, যকৃত, সূর্যগ্রন্থি বা অগ্ন্যাশয় (Pancreas), শুক্রগ্রন্থি (Suprarenal or Adrenal Glands) প্রভৃতি পাঁচটি প্রধান গ্রন্থি দেহস্থ অগ্নিদেবতার প্রধান কর্মকেন্দ্র। অগ্নিদেবতার অপ্রধান কর্মকেন্দ্র অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পাচকরস উৎপন্নকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রন্থিগুলি সমগ্র উদর-প্রদেশ বা পাকস্থলী জুড়িয়াই বিদ্যমান।

অগ্নিরূপী সূর্য পৃথিবীকে যদি প্রয়োজনীয় উত্তাপ পরিবেশন না করিতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি কোনো প্রাণীরই আবির্ভাব সম্ভবপর হইত না; পৃথিবী কঠিন বরফস্তূপে পরিণত হইত—পৃথিবীর কোথাও প্রাণস্পন্দনের চিহ্ন ফুটিতে পারিত

না। দেহস্থ অগ্নিদেবতাও ঠিক এমনিভাবে দেহে প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখেন। এই অগ্নি যেদিন আর দেহে তাপ বিতরণ করিতে পারে না, সেদিন দেহের প্রাণস্পন্দন নিভিয়া যায়, দেহ মৃত্যুর দ্বারা কবলিত হয়।

এই অগ্নিগ্রন্থি যে অন্তর্মুখী রস উৎপন্ন করে উহা আধুনিক রাসায়নিকদের আবিষ্কৃত শক্তিশালী নাইট্রিক এসিড (Nitric Acid), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrocloric Acid), সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid) প্রভৃতির মতো ভয়াবহ দাহিকাশক্তিসম্পন্ন। যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি উপাদান দ্বারা রাসায়নিকরা এসিড তৈয়ারী করেন সেই উপাদান আমাদের দেহের মাঝেও আছে। আমাদের দেহস্থ অগ্নিদেবতা উহার সাহায্যে নিজের যন্ত্রশালাস্বরূপ অগ্নিগ্রন্থিগুলি হইতে অগ্নিরস বা এসিড সৃষ্টি করেন। এই অগ্নিরসই পাচক রস, পিত্ত রস, অম্লরস প্রভৃতি নামে খ্যাত। দেহের এই অগ্নিই দেহে তাপরক্ষা করিয়া দেহযন্ত্রগুলির পরিচালনায় সাহায্য করে, ভুক্ত অন্নকে দগ্ধ করিয়া উহাকে রস-রক্তে পরিণত করে; দেহের মাংস, মেদ, অস্থি প্রভৃতি গঠনে সহায়তা করে।

এই অগ্নিগ্রন্থিপ্রধান লোকেরা হয় মহাতেজস্বী, মহাউদ্যমী, নিরলস মহাকর্মী। জনসাধারণের উপর নেতৃত্ব করার ইহাদের আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে। এই অগ্নিগ্রন্থিপ্রধান লোকের ভিতর হইতেই রাজনৈতিক নেতা, যুদ্ধনেতা, যুদ্ধপ্রিয় সেনাপতিমণ্ডলীর আবির্ভাব হয়। এই গ্রন্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটিলে এই অগ্নিপ্রধান লোকের উদ্যম-উৎসাহ, ইহাদের দৈহিক তেজঃশক্তি নিয়োজিত হয় কামের সেবায় অথবা ঝগড়া-বিবাদ প্রভৃতি সামাজিক অহিত অনুষ্ঠানে। ইহাদের দম্ভ, অহংকার এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায় যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজনের চিত্তও ইহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে। সামান্য অসুবিধা বা শারীরিক ক্লেশ উৎপন্ন হইলেই ইহারা অত্যন্ত অস্থির ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। আহারাদি বিষয়ে ইহারা প্রায়ই সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, এইজন্য ইহারা প্রায়ই ‘পেটরোগা’ হয়।

বরুণগ্রন্থি—মূত্রগ্রন্থি (Kidney), প্রজাপতিগ্রন্থি [পুরুষদেহের পিতৃগ্রন্থি (Testis), কন্দর্পগ্রন্থি (Cowper's gland), মদনগ্রন্থি (Prostate gland) এবং নারীদেহের মাতৃগ্রন্থি (Ovary), রতিগ্রন্থি (Bartholin's gland), মিথুনগ্রন্থি (Skene's gland)] প্রভৃতি নিম্নোদরের পাঁচটি প্রধান গ্রন্থিকে এক কথায় বলা হয় বরুণগ্রন্থি। অন্যান্য দেহরক্ষী জীবাণু উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রন্থিগুলি (Lymphatic glands) এই বরুণগ্রন্থির অন্তর্গত। অপ্‌তত্ত্ব বা কারণবারি হইতে যেমন সৃষ্টির উদ্ভব, তেমনি এই বরুণগ্রন্থির অন্তর্মুখী রসে সন্তানবীজ শুক্রকীট উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখে। এই বরুণগ্রন্থি নিঃসৃত রসধাতু হইতে, শুক্র হইতে দেহের সমস্ত উপাদান—স্নায়ু, তন্তু, কোষ, মাংস, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সমস্তই গঠিত হইয়া উঠে। বরুণগ্রন্থির আর এক নাম 'সোমগ্রন্থি'। 'সোম' শব্দের অর্থ জল এবং অমৃত প্রভৃতি। জল বা অপ্‌তত্ত্বের অধীশ্বর বরুণ। এই জন্যই বরুণগ্রন্থিকে সোমগ্রন্থি বলে। দ্যুলোক বা অমৃতলোকের আর এক নাম সোমলোক। মস্তকের ঊর্ধ্বস্থানই দেহব্রহ্মাণ্ডের দ্যুলোক। এই দ্যুলোক ও মস্তিষ্কের ঊর্ধ্ব অংশেও একটি ব্যোমগ্রন্থি আছে, উহার বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

এই বরুণগ্রন্থিপ্রধান লোকের ব্যবহারে খুব সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। ইহাদের মিষ্ট ব্যবহার ও মিষ্ট বাক্যে জনসাধারণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করে। এই গ্রন্থিপ্রধান নর-নারীর দেহ বিশেষ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়। ইহারা যে কাজে হাত দেয় তাহাতেই উন্নতি লাভ করিয়া বৈষয়িক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ইহারা বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। এই গ্রন্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটিলে নর-নারী হয় স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, পরছিদ্রান্বেষী, পরনিন্দুক এবং কাম-ক্রোধপরায়ণ।

পৃথ্বীগ্রন্থি—অস্থি ও মাংসময় স্থূল দেহ উৎপাদনই পৃথ্বীগ্রন্থির কার্যকারিতার ফল। শক্তির প্রকাশ, শক্তির কার্যকারিতা পৃথ্বীগ্রন্থিতে স্তব্ধ ; সুতরাং পৃথ্বীগ্রন্থি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পৃথ্বীগ্রন্থিপ্রধান লোকের দেহটি হয় রক্ত, মাংস ও মেদাধিক্যে একটু ভারী। স্বভাব-চরিত্রে ইহারা বিশেষ উদার এবং সহিষ্ণু। কোনো কিছু অর্জনের জন্য ইহাদের ভিতর তীব্র ব্যাকুলতা বা উদ্যম-উৎসাহ প্রকাশ পায় না; গোযানের মতোই ইহাদের জীবনরথ জীবনপথে ধীরে সুস্থে চলিতে থাকে। জাগতিক কোনো সমস্যা দ্বারা ইহারা মনকে ভারাক্রান্ত করে না; বিবাদ-বিরোধ এবং দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ইহারা যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে।

এই গ্রন্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইলে এই গ্রন্থিপ্রধান নর-নারীরা একটু স্বার্থপর হইয়া উঠে, ভোগবিলাসের প্রতি ইহাদের চিত্ত অত্যাসক্ত হয়।

অহংগ্রন্থি—দেহব্রহ্মাণ্ডে অহংতত্ত্বের স্থান ললাটপ্রদেশ। শিবসতীগ্রন্থি (Pituitary Gland), দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়শক্তির পরিচালক পাঁচটি প্রধান গ্রন্থি এই অহংগ্রন্থির কর্মকেন্দ্র। আমাদের অহং বা আমিত্ব যেমন জীবনের সর্ববিধ ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করে তেমনি এই অহং গ্রন্থিরও ব্যোম, বায়ু প্রভৃতি দেহস্থ পঞ্চগ্রন্থির উপর কর্তৃত্ব বিদ্যমান। এই পঞ্চগ্রন্থির দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা অহংগ্রন্থি যথাসাধ্য সংশোধন করে।

এই অহংগ্রন্থিপ্রধান লোকের ভিতর হইতেই উচ্চ প্রতিভা, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মানবপ্রেমিক সাধু-মহাত্মার আবির্ভাব ঘটে। এই গ্রন্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটিলে স্বভাবে নীচতা, শঠতা, হৃদয়হীনতা, দুষ্টবুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

মহৎগ্রন্থি—ললাটপ্রদেশস্থ অহংগ্রন্থিগুলির কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে সোমগ্রন্থি, বৃহস্পতি বা দেবক্ষগ্রন্থি (Pineal Gland), রুদ্রগ্রন্থি, সহস্রারগ্রন্থি প্রভৃতি পঞ্চগ্রন্থি অবস্থিত। ইহারা সকলেই মহৎগ্রন্থির অন্তর্গত এবং মহৎগ্রন্থির প্রধান কর্মকেন্দ্র। মহৎগ্রন্থির এই কর্মকেন্দ্রগুলিই মহৎ ভাবধারা, উচ্চ ভাবধারা সৃষ্টির কারখানা। এই মহৎভাব, উচ্চভাবের প্রকাশেই মানুষের

দেবজন্ম লাভ হয়, মানুষ দেবভাবাপন্ন হইয়া উঠে। এই মহৎগ্রন্থিগুলির অন্তর্মুখী রসের নাম সোমধারা। এই সোমধারা বা অমৃতধারা মস্তক হইতে নামিয়া আসিয়া দেহের সমুদয় গ্রন্থিকে, দেহের সমুদয় স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল-সুস্থ ও প্রাণবান রাখিতে সাহায্য করে।

এই গ্রন্থিপ্রধান লোকই আমাদের পৃথিবীতে মহাপুরুষ বা অবতাররূপে পূজিত হন। ইঁহারাই ভূ-দেবতা, মর্ত্যজগতের মহাব্রাহ্মণ। ভগবৎপ্রাপ্তি বা আত্মস্বরূপ অনুভবের অপার্থিব আনন্দ ইঁহারাই জীবনে আস্বাদন করেন। ইঁহাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কখনো কলঙ্কের রেখাপাত হয় না। সংসারের, ভোগজগতের পঙ্কিলতা, অশুচিতা ইহাদের সুসংস্কৃত মনকে, শুদ্ধ মনকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে না। একাধারে ইহারা মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রেমিক। দৈহিক রোগ, শোক, দৈহিক সবলতা-দুর্বলতা এই গ্রন্থি-ক্রিয়ার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং ইঁহারা চিররুগ্নই হউন বা স্বাস্থ্যবান হউন, জাগতিক রোগ-শোক ইঁহাদের স্বভাবে কখনো বৈষম্য বা বিকার সৃষ্টি করিতে পারে না। সাধারণ মানুষের মাঝে এই মহৎগ্রন্থির ক্রিয়া অস্ফুট থাকে।

এই মহৎগ্রন্থিস্থানের অব্যবহিত ঊর্ধ্বেই ব্রহ্মরন্ধ্র। এই ব্রহ্মরন্ধ্রই দিব্যাকাশ ও দেহাকাশকে যুক্ত রাখিয়াছে। এই ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রারপ্রদেশই গুণাতীত ভূমি, চেতনার অনন্ত পারাবার। চেতনার এই অনন্ত পারাবারে, চেতনার এই পরমোর্ধ্বস্থানে বিজ্ঞানঘন চেতনার (Crystalized consciousness) আধার যোগশাস্ত্রোক্ত কৈলাস পর্বত অবস্থিত। **এই কলুষমুক্ত কৈলাস বা বিজ্ঞানঘন দিব্যচেতনাই পরমশিব ও পরমাশক্তির অধিষ্ঠান-ভূমি।**

প্রত্যেক মানুষের মাঝেই যে এক-একটি গ্রন্থিরই বিশেষ প্রাধান্য থাকে তাহা নয়, অনেকের মাঝে আবার একাধিক গ্রন্থিরও বিশেষ প্রাধান্য থাকে। ইহাদিগকে বলে 'মিশ্রগ্রন্থিপ্রধান' লোক। একাধিক গ্রন্থির গুণ ও দোষ ইহাদের মাঝে সমানভাবে প্রকাশ পায়। আমাদের এই রোগারোগ্য গ্রন্থে

গ্রন্থিতত্ত্ব লইয়া আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। [যোগীদের গ্রন্থিতত্ত্ব লইয়া ভবিষ্যতে আমাদের একখানা পৃথক পুস্তক রচনা করার ইচ্ছা আছে।]

পাশ্চাত্য গ্রন্থিতত্ত্ব আমরা মোটামুটি অধ্যয়ন করিয়াছি। পাশ্চাত্য গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁহাদের এই নূতন আবিষ্কার লইয়া বালকের মতো খুব উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই, গ্রন্থিস্রাব দ্বারাই মানুষের জীবন, মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে গ্রন্থিতত্ত্বের আবিষ্কার নূতন নয়, উহা অতি প্রাচীন। ভারতীয় গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্‌দের মতে দেহযন্ত্রের পিছনে যে যন্ত্রী আছেন সেই যন্ত্রীর ইচ্ছাতেই দেহস্থ গ্রন্থি পরিচালিত হয়। সুতরাং গ্রন্থিগুলি দেহাধীশের কর্মকেন্দ্রস্বরূপ। পাশ্চাত্য গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্‌রা ভারতীয় গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্‌দের মতো অন্তর্দৃষ্টি এখনও লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহাদের গ্রন্থিতত্ত্ব এখনো পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

[গ্রন্থিতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য বিশদ বিবরণ আমাদের **'সহজ যৌগিক ব্যায়াম'** গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।]

এই অধ্যায়ে দেহতত্ত্ব উপলক্ষ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় আমরা বায়ু, অগ্নি ও বরুণ দেবতার কার্যকারিতার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এই ত্রিদেবতাই প্রাকৃত সৃষ্টির বিধাতা। এই ত্রিদেবতা যখন প্রকুপিত হন, তখন সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যায়। আমাদের দেহস্থ এই ত্রিদেবতাও দেহের প্রাণনক্রিয়া, দেহের তাপরক্ষা, দেহের রস-রক্তাদির সাহায্যে দেহগঠন, দেহপালন ও দেহপুষ্টির বিধান করেন। দেহস্থ এই ত্রিদেবতার সামান্য প্রকোপে দেহ হয় অসুস্থ, বিশেষ প্রকোপে দেহের ঘটে মৃত্যু। যোগশাস্ত্রের আসন-মুদ্রা-প্রাণায়াম—এই ত্রিদেবতার ক্রিয়াকে সাম্যাবস্থায় রাখিবার অব্যর্থ উপায়। এইজন্যই আমরা জোরের সহিত পুনরায় বলিতেছি—**শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নয়, ব্যাধি, জরা ও বার্ধক্যমুক্ত চিরতরুণ দেহ গঠনে, শক্তিশালী মন গঠনে যোগবিদ্যাই আমাদের প্রধান সহায়।** এই

যোগবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানবজাতি চিরদিনের মতো জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে—দুঃখময় মর্ত্যজীবন আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

আয়ুর্বেদে দেহতত্ত্ব ও রোগ-নিদান

আয়ুর্বেদ ও যোগশাস্ত্র উভয়েই বেদমাতার সন্তান। এইজন্যই এই শাস্ত্রদ্বয়কে আমরা সহোদর ভ্রাতা নামে আমাদের বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি। অথর্ববেদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধ প্রভৃতির নাম ও গুণাগুণ সংগৃহীত হইয়া এক লক্ষ শ্লোকসমন্বিত **ব্রহ্মসংহিতা** নামে প্রথম আয়ুর্বেদ গ্রন্থ সংকলিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই এই ব্রহ্মসংহিতাকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচিত হয়। বিরাট আয়ুর্বেদ সাহিত্যের বিস্তৃতি এবং উহার জনপ্রিয়তার জন্য আয়ুর্বেদ **পঞ্চমবেদ** নামে অভিহিত। মহাভারতের যুগের পূর্বেই চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি খ্যাতনামা আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুতসংহিতায় তদানীন্তন ভারতের অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনার মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই—যে সব সৈন্যের পা আহত হইয়া বা অস্থি ভঙ্গ হইয়া অকর্মণ্য হইত, চিকিৎসকেরা সেই পা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কাটিয়া উহার স্থানে লৌহ-নির্মিত পা জুড়িয়া দিতেন। কালের কুটিল প্রবাহে এবং বৈদেশিকদের আক্রমণের ফলে অস্ত্রোপচারের এই সব পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আয়ুর্বেদ গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের চক্রপাণি প্রভৃতি আয়ুর্বেদাচার্যদের গ্রন্থে সুশ্রুত সংহিতার যে সব অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সুশ্রুত সংহিতার প্রচলিত সংস্করণে সেই সব অংশ নাই; ইহাতেই প্রমাণিত হয়—ধ্বংসমুখ হইতে যে সকল প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রক্ষা পাইয়াছে, তাহাও পূর্ণাঙ্গ নয়। এই ধ্বংসাবশিষ্ট আয়ুর্বেদ গ্রন্থও জগতের বিস্ময়ের সামগ্রী। সুপ্রাচীন ব্যাবিলন, গ্রীক, মিশর সভ্যতার যখন জন্ম হয়

নাই, সেই সুদূর অতীতের বেদ-বেদান্তজ্ঞানদীপ্ত ভারতে সুসংহত গভীর গবেষণামূলক আয়ুর্বেদেরও প্রচলন ছিল। এক কথায় বলা যায়—ভারতের এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র পৃথিবীর চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক। ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি দ্বারা প্রাচীন গ্রীক ও মিশরের চিকিৎসা-পদ্ধতি কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল কোলব্রুক প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বিশেষভাবেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে নেপাল ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব মৌলিক আয়ুর্বেদগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে উহার মোট সংখ্যা সহস্রেরও বেশি। ধ্বংসাবশিষ্ট এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রগুলি দেখিয়াই আমরা অনুমান করিতে পারি—আয়ুর্বেদাচার্যেরা কি বিরাট আয়ুর্বেদসাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের সুগভীর গবেষণা আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা হইতে কম সমৃদ্ধ নয়; বরং রোগের কারণাদি নির্ণয় প্রভৃতি কোনো কোনো বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণা হইতে আয়ুর্বেদের গবেষণা অধিকতর বৈজ্ঞানিক। এক্স-রে (X-ray) প্রভৃতি বিজ্ঞানের দানগুলি বাদ দিলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন কোনো নূতন বিষয় আজ পর্যন্ত সংযোজিত হয় নাই যাহা আয়ুর্বেদাচার্যদের অগোচরে ছিল বা যাহা লইয়া আয়ুর্বেদাচার্যেরা কোনোরূপ গবেষণা করেন নাই। টীকা দেওয়ার প্রথাকে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির দান বলিয়া আমরা মনে করি—কিন্তু ইহা সত্য নয়। অতি প্রাচীন অথর্ববেদের যুগ হইতে আমাদের দেশে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। শীতের শেষে গরমের প্রারম্ভে বসন্তের টীকা দেওয়া হইত। নিদান (Pathology), অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery), ঔষধ-প্রস্তুতি বিদ্যা (Pharmacology), শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), শরীর-বিজ্ঞান (Physiology), শিশু-চিকিৎসা (Pediatrics), ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery), ঔষধ-ব্যবস্থা পদ্ধতি (Medical Jurisprudence), বিষতন্ত্র (Toxicology), রসায়ন (Chemistry), বাজীকরণ (Aphro-desiac) প্রভৃতি চিকিৎসা বিজ্ঞানের যত শাখা-প্রশাখা আছে সব বিষয়

সম্বন্ধেই আয়ুর্বেদে পৃথক পৃথক মৌলিক গ্রন্থ আছে। এই সব আয়ুর্বেদগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া যদি যুগোপযোগী ভাবে সংস্কার করিয়া লওয়া হয় এবং ঔষধ প্রস্তুতিতে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের সহায়তা নেওয়া হয়, তাহা হইলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির স্থান অনায়াসেই অধিকার করিতে পারিবে।

শীতপ্রধান পশ্চিমদেশের তীব্র শক্তিশালী ঔষধ আমাদের এই গরম দেশের উপযোগী নয়। আমাদের এই গরম দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক। স্বাধীন ভারতের চিকিৎসকদের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমরা আয়ুর্বেদ সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লেখ করিলাম।

যে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বের সাহায্যে ভারতীয় যোগদর্শন সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের বর্ণনা দিয়াছে আয়ুর্বেদও সেই পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া উহার সাহায্যেই দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং দেহব্যাধির কারণ নির্ণয় করিয়াছে।

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্যানিলো যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলস্তথা॥

—সুশ্রুত ২১।৮

—সোম, সূর্য, অনিল অর্থাৎ বরুণ, অগ্নি ও বায়ু এই ত্রিদেবতা যেমন বিশ্ব সৃষ্টি এবং বিশ্বের রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন, তেমনি আবার এই ত্রিদেবতাই দেহবিশ্বকে পালন ও পোষণ করিতেছেন। দেহস্থ এই ত্রিদেবতার নামই আয়ুর্বেদমতে—বায়ু, পিত্ত ও কফ।

বায়ু

বায়ু—"**বায়ুরায়ুর্বলং বায়ুর্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্**"—বায়ুই আমাদের আয়ুস্বরূপ, বায়ুই দেহের বলস্বরূপ, বায়ুই শরীরের বিধাতা অর্থাৎ

পরিচালনকর্তা। এই বায়ু **'পঞ্চধা প্রবিভক্তং শরীরং ধারয়তি'**—পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরকে ধারণ করিয়া আছে। **"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানো কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ॥"**—হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্বশরীরব্যাপী ব্যানবায়ু অবস্থিত।

প্রাণবায়ু—প্রাণবায়ুর কাজ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ, হৃদ্‌যন্ত্র পরিচালন, খাদ্যবস্তুকে উদরে প্রেরণ, ধমনীর সাহায্যে সর্বাঙ্গে রক্ত পরিচালনা, শিরা ও স্নায়ুগুলিকে স্বীয় কর্তব্যে প্রবৃত্ত করা প্রভৃতি।

অপান বায়ু—অপান বায়ুর প্রধান কাজ প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া প্রাণ বায়ুর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় সহায়তা করা; মল, মূত্র, শুক্র প্রভৃতিকে অধঃপাতিত করিতে সাহায্য করা, নারীদেহে সন্তান পোষণ, সন্তান ভূমিষ্ঠ করার ব্যবস্থা করা, রজঃ নিঃসারণ প্রভৃতি ক্রিয়াও অপান বায়ুর কর্তব্যের অন্তর্গত।

সমান বায়ু—সমান বায়ু জঠরাগ্নি অর্থাৎ পাচকপিত্তকে সক্রিয় রাখে। পাকস্থলীর অর্ধজীর্ণ খাদ্যের পাকস্থলী হইতে গ্রহণী নাড়ীতে অর্থাৎ—ঊর্ধ্ব অন্ত্রে গমনে সমান বায়ু সহায়তা করে এবং ঊর্ধ্ব অন্ত্রের পাচকাগ্নিকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া খাদ্য জীর্ণ করিতে সাহায্য করে। জীর্ণ খাদ্যের সার ও অসার ভাগ পৃথক করিয়া অসার ভাগ বৃহদন্ত্রের ভিতর দিয়া মলনাড়ীতে প্রেরণ করে। প্রাণ বায়ু ও অপান-বায়ুর ক্রিয়ার সমতা রক্ষা করার দায়িত্বও এই সমান বায়ুর।

উদান বায়ু—উদান বায়ুর সাহায্যে মানুষ শব্দ করে, কথা বলে, গান করে। এই উদান বায়ুর সূক্ষ্মাংশই মন-বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিকে পুষ্ট করে। যোগশাস্ত্র মতে এই উদান বায়ুর সাহায্যেই কুণ্ডলিনী সহস্রার অভিমুখে অগ্রসর হয়; এই উদানবায়ুর সাহায্যেই সাধকের মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করে।

ব্যান বায়ু—শরীরের রস-রক্তকে প্রয়োজনমত সর্বশরীরে দ্রুত পরিবেশন করা, শরীরের সঙ্কোচন-প্রসারণ, মস্তিষ্কে রক্ত প্রেরণ, দেহ হইতে ঘর্মাদি নিঃসরণ প্রভৃতি ব্যান বায়ুর কাজ। "**ক্রুদ্ধঃ সঃ কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্বদেহগান্। যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্॥**"—এই ব্যান বায়ু কুপিত হইলে সর্বদেহগত রোগ উপস্থিত হয়; যুগপৎ পঞ্চবায়ু কুপিত হইলে দেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

পিত্ত

'**পিত্ত শরীরারম্ভক তেজঃপ্রধান পঞ্চভূত**'—দেহস্থ শরীরগঠনকারী অগ্নিরসই পিত্ত নামে অভিহিত। "**দর্শনং শক্তিরুষ্মা চ ক্ষুৎতৃষ্ণা দেহমার্দবং প্রভা প্রসাদো মেধা পিত্তকর্মাঽবিকারজম্।**" (চরক)—দৃষ্টিশক্তি বিধান, শারীরিক বল বিধান, শরীরের তাপ রক্ষা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাগ্রত করা, দেহের মৃদুতা সম্পাদন, দেহের দীপ্তি রক্ষা, মেধা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, দেহস্থ অধিকারী অর্থাৎ বিশুদ্ধ পিত্তের করণীয় কাজ। '**পিত্ত পঞ্চধা প্রবিভক্তং অগ্নিকর্মণোঽনুগ্রহং করোতি**'—এই পিত্তই পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া দেহের যাবতীয় অগ্নিক্রিয়ার কাজ সম্পাদন করে। এই পঞ্চপিত্তের নাম—পাচক পিত্ত, রঞ্জক পিত্ত, সাধক পিত্ত, আলোচক পিত্ত ও ভ্রাজক পিত্ত।

পাচক পিত্ত—পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, যোগশাস্ত্রের ভাষায় সূর্যগ্রন্থি স্থানে (Pancreas) উৎপন্ন হয়। খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করা, খাদ্যের সারভাগকে রসে পরিণত করিয়া উহার অসার অংশকে মূত্র, পুরীষ ও ঘর্ম হইতে পৃথক করিয়া, দেহে উপযুক্ত তাপ সৃষ্টি করিয়া রোগবিষ নষ্ট করা এবং তাপমানের সমতা রক্ষা করিয়া দেহরক্ষাকারী এবং দেহপোষণকারী কৃমি অর্থাৎ জীবাণু সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং অন্যান্য

পিত্তকর্মে সাহায্য করাই এই পাচক পিত্তের কাজ। এই পাচক পিত্ত দুষ্ট হইলে অজীর্ণ, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময় প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়।

রঞ্জক পিত্ত—যকৃতে উৎপন্ন পিত্তের নামই রঞ্জক পিত্ত। পাচক পিত্ত জীর্ণ অন্নের সারভাগ রসকে সমান বায়ুর সাহায্যে যকৃতে প্রেরণ করে। যকৃত রঞ্জক পিত্তের সাহায্যে ঐ খাদ্যরসকে শোধন করে। ঐ শোধিত খাদ্যরসে আরও কিছু পরিমাণ রঞ্জক পিত্ত মিশ্রিত হইলে ঐ খাদ্যরসে রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং উহা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। খাদ্যকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করে বলিয়াই ইহার নাম রঞ্জক পিত্ত। এই রঞ্জক পিত্তের বাকি অংশ উদরস্থ খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করিবার কাজে নিয়োজিত হয়। এই রঞ্জক পিত্ত দুষ্ট হইলে রক্তহীনতা রোগ, কামলা রোগ সৃষ্টি হয়।

সাধক পিত্ত—এই পিত্তের প্রভাবেই মানবদেহে উদ্যম-উৎসাহ সৃষ্টি হয়, দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করিবার, দুর্লঙ্ঘ্যকে লঙ্ঘন করিবার প্রেরণা জাগে। পাচক পিত্ত ও রঞ্জক পিত্তের সূক্ষ্মাংশই সাধক পিত্তে রূপান্তরিত হয়। মনকে প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন করিতে, সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করিতে এই সাধক পিত্তই সাধককে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সাধক পিত্তই বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মৃতি বর্ধনে সহায়তা করে। সাধক পিত্ত দুষ্ট হইলে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, মূর্ছারোগ, সন্ন্যাসরোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি রোগ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

আলোচক পিত্ত—পিত্তের যে সূক্ষ্মাংশ চক্ষুতে অবস্থিত হইয়া দৃষ্টিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় উহারই নাম আলোচক পিত্ত। সাধকের অতীন্দ্রিয় দর্শন বা দিব্যদৃষ্টি লাভও এই আলোচক পিত্তের সহায়তায় ঘটে। আলোচক পিত্ত দুষ্ট হইলে চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, চোখে ছানি পড়ে।

ভ্রাজক পিত্ত—পিত্তের যে সারভাগ বা সূক্ষ্ম রস দেহে দীপ্তিরূপে ফুটিয়া উঠে, শরীরে বর্ণাভা সৃষ্টি করে, উহার নামই ভ্রাজক পিত্ত। এই

ভ্রাজক পিত্তই চর্মে অবস্থান করিয়া রোগবিষ ও রোগজীবাণুর আক্রমণ হইতে গাত্রচর্মকে রক্ষা করে। এই ভ্রাজক পিত্ত দুষ্ট হইলে বিবিধ চর্মরোগ এবং গাত্রবিবর্ণতা প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়।

'বিদগ্ধং চাম্লমেব চ'—পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লের সৃষ্টি হয়। বিদগ্ধ শব্দের দুইটি অর্থ। একটি অর্থ বিশেষরূপে দগ্ধ হওয়া; আর একটি অর্থ বিকৃত হওয়া। যে সব খাদ্য জীর্ণ হইতে পিত্তের সহায়তা প্রয়োজন, সেই সব খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া ঐ পিত্ত নিজেও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই পিত্ত-জীর্ণ খাদ্যই অম্লরসে পরিণত হয়। জীবদেহের সুস্থ রক্ত সর্বদাই লবণাক্ত থাকে, তবুও উহাতে কিছু পরিমাণ অম্লরস আছে। পিত্তজীর্ণ খাদ্যই রক্তকে প্রয়োজনীয় অম্লরস পরিবেশন করিয়া রক্তের দেহপুষ্টিবিধান ক্ষমতাকে, দেহের শক্তিসামর্থকে অব্যাহত রাখে। এই পিত্ত খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করিতে না পারিলে অজীর্ণ খাদ্যের সহিত এই পিত্তও বিকৃত হয়। এই বিকৃত পিত্ত হইতে দেহে অম্লবিষ সৃষ্টি হয় এবং দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

শ্লেষ্মা বা কফ

রসপ্রধান পঞ্চভূতের সারভাগই শ্লেষ্মা। **"আরুহ্য ধমনীর্গত্বা ধাতুন্ সর্বানয়ং রসঃ, পুষ্ণাতি তদনু স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তনুং গুণৈঃ"**—রক্তবাহী ধমনীর পাশে পাশেই আর এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী আছে, উহারা রক্তের সার রসধাতুকে বহন করে। রক্তের সারভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই রস উক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে। অতঃপর উহা ধমনীপথে গমন করিয়া দেহের সমুদয় গ্রন্থিকে, দেহের সমুদয় ধাতুকে পোষণ করে। এই রসধাতুই স্বীয় গুণ দ্বারা সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই রসধাতুর নামই **শ্লেষ্মা**।

শ্লেষ্মার স্বরূপ—"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা,

তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ।"—শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ, তমোগুণাধিক্য হেতু গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মধুর স্বাদবিশিষ্ট। এই শ্লেষ্মা বিশেষরূপে জীর্ণ হইয়া, বিশেষ রূপে দগ্ধ হইয়া লবণরসে পরিণত হয়। এই লবণরসই রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে ক্ষারধর্মী রাখে। রক্তে লবণের ভাগ হ্রাস পাইলেই দেহ রোগাক্রান্ত হয়। এই শ্লেষ্মা অজীর্ণ হইয়া, বিকৃত হইয়াও লবণাক্ত হয়। এই বিকৃত লবণরসই ঘর্মের সহিত, মূত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

[**"প্রাকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা"**—এই শ্লেষ্মাই প্রাকৃত দেহের বলস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ। **"সঃ চৈব ওজঃ স্মৃতঃ"**—এই শ্লেষ্মাই দেহের ওজঃ ধাতু নামে খ্যাত। এই শ্লেষ্মা বা রসধাতুই দেহ গঠন, দেহ রক্ষণ ও দেহ পোষণ করে।

ওজশ্চ তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্॥
যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টি-পুষ্টিবলোদয়াঃ।
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিন্ তিষ্ঠতি জীবনম্॥
নিষ্পদ্যন্তে যতো ভাবাঃ বিবিধাঃ দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য-লাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥

—(বাগভট্ট)

—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই দেহপোষণকারী সপ্তধাতুর সারস্বরূপ যে তেজ তাহারও নাম ওজঃ। হৃদয়প্রদেশ ওজঃ পদার্থের প্রধান প্রকাশস্থান হইলেও উহার অবস্থিতি সর্বশরীরব্যাপী। ওজঃ দেহস্থিতির কারণ। দেহে ওজঃ বৃদ্ধি হইলে দেহের তুষ্টি-পুষ্টি ও বলোদয় হয়। ওজের নাশ হইলে সব কিছুই নষ্ট হয়, ওজের রক্ষায় জীবনেরও রক্ষা হয়। উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য প্রভৃতি উচ্চ মনোভাব এবং লাবণ্য, সুকুমারতা প্রভৃতি দেহের গুণাবলী এই ওজঃ হইতেই নিষ্পন্ন হয়।]

'শ্লেষ্মা পঞ্চধা প্রবিভক্তং দেহং ধারয়তি'—এই শ্লেষ্মা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া দেহকে ধারণ করিয়া আছে। ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষণ স্থানভেদে এবং কার্যকারিতা ভেদে শ্লেষ্মা এই পঞ্চ নামে অভিহিত।

ক্লেদন শ্লেষ্মা—ক্লেদন শ্লেষ্মা অন্নকে রস দ্বারা জারিত করিয়া উহাকে ক্লিন্ন অর্থাৎ চূর্ণ করে, গলিত করে। খাদ্যবস্তু উদরে প্রবেশমাত্র পাকস্থলীর ধমনীগাত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে এই রস বাহির হইয়া খাদ্যবস্তুকে জারিত করে, ফেনময় করে। ক্লেদন শ্লেষ্মাই পাকস্থলীর পাচকরস। অগ্নিতাপে জল উত্তপ্ত হইয়া যেভাবে অন্নকে সিদ্ধ করিয়া কোমল ও নরম করে, ঠিক তেমনি ভাবেই পাচক পিত্তের তাপে এই পাচকরস বা ক্লেদন শ্লেষ্মা উত্তপ্ত হইয়া অন্নকে ক্লিন্ন করে, আর্দ্র করে, অন্নকে রসে পরিণত করিতে সাহায্য করে। অন্ন হইতেও এক প্রকার পাচক রস নির্গত হইয়া অজীর্ণ বা অর্ধজীর্ণ অন্নকে জীর্ণ করিতে সহায়তা করে—উহাও ক্লেদন শ্লেষ্মা। এই ক্লেদন শ্লেষ্মা দূষিত হইলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

অবলম্বন শ্লেষ্মা—লৌহযন্ত্র তৈলচর্চিত না হইলে সচল হয় না। এইরূপ তৈলচর্চিত হওয়ার ফলেই লৌহযন্ত্রের এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের ঘর্ষণ লাগে না। এই অবলম্বন শ্লেষ্মার শৈত্যগুণ পিত্তের উত্তাপ হইতেও দেহযন্ত্রগুলিকে রক্ষা করে। বক্ষঃস্থলেই দেহের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি অবস্থিত। এইজন্য অবলম্বন শ্লেষ্মা সর্বদেহে বিদ্যমান থাকিলেও উহার বিশেষ অবস্থিতি এবং কার্যকারিতার স্থান বক্ষঃস্থল। হৃদযন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্ এই অবলম্বন শ্লেষ্মা দ্বারা সিক্ত থাকে বলিয়াই বক্ষাস্থির সহিত ইহাদের সংঘর্ষ হয় না। বায়ু এই অবলম্বন শ্লেষ্মাকে প্রত্যেক দেহযন্ত্রে প্রেরণ করে। এই রস দ্বারা সিক্ত করিয়া বায়ু দেহযন্ত্রগুলিকে পরিচালনা করে। এই অবলম্বন শ্লেষ্মা দূষিত হইলে শরীরে জড়তা, অলসতা উপস্থিত হয়।

রসন শ্লেষ্মা—রসস্থান অর্থাৎ জিহ্বাকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয় উহারই নাম রসন শ্লেষ্মা। ইহার অপর নাম বোধক শ্লেষ্মা। সহজ

ভাষায় ইহাকে বলা যায় লালাস্রাব বা লালাগ্রন্থিনিঃসৃত রস। এই রসন শ্লেষ্মাই জিহ্বায় রসাস্বাদ জাগায় এবং অন্ন পরিপাকক্রিয়ায় ক্লেদন শ্লেষ্মাকে সহায়তা করে। এই রসন বা বোধক শ্লেষ্মা দূষিত হইলে অক্ষুধার সৃষ্টি হয়, সমস্ত খাদ্যই বিস্বাদ লাগে।

স্নেহন বা তর্পক শ্লেষ্মা—"স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ"— এই স্নেহন বা তর্পক শ্লেষ্মা স্বীয় স্নেহ বা রসস্রাব দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তর্পণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে। দেহের গ্রন্থিগুলি রক্তের সারভাগ রসধাতুকে জীর্ণ করিয়া সুপুষ্ট হয়। এই সুপুষ্ট গ্রন্থিগুলি হইতেই স্নেহন শ্লেষ্মা বা তর্পক শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়। এই তর্পক-শ্লেষ্মাই সমুদয় দেহযন্ত্রের পুষ্টি বিধান করে। আধুনিক পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানে যাহাকে গ্রন্থির অন্তঃস্রাবী বা অন্তর্মুখী রস (Internal Secretion of the Endocrine Glands) বলা হয়, আয়ুর্বেদে তাহারই নাম স্নেহন বা তর্পক শ্লেষ্মা। এই তর্পক শ্লেষ্মার আংশিক অভাব হইলেও দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। সমগ্র দেহযন্ত্রের উপরই তর্পক শ্লেষ্মার বিশেষ প্রভাব। এই তর্পক শ্লেষ্মার দ্বারা স্নাত হইয়া, তর্পক শ্লেষ্মা হইতে পুষ্টির উপাদান গ্রহণ করিয়া চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয় প্রভৃতির কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে। এই শ্লেষ্মার অভাব হইলে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। মস্তিষ্কে অবস্থিত গ্রন্থিগুলির অন্তর্মুখী রস দ্বারা দেহের যাবতীয় গ্রন্থিগুলি, ইন্দ্রিয়গুলি পরিপুষ্ট হয়। এইজন্য আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে—তর্পক শ্লেষ্মার প্রধান কর্মকেন্দ্র, প্রধান অবস্থিতিস্থান মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কস্থিত এই তর্পক শ্লেষ্মাকেই যোগগ্রন্থে বলা হইয়াছে **সোমধারা, অমৃতধারা**। মস্তিষ্কক্ষরিত এই সোমধারা দ্বারাই দেহস্থ সপ্তধাতু সর্বদা প্রাণবান্ থাকে। এই স্নেহন বা তর্পক শ্লেষ্মাই সূক্ষ্মাকারে ঘর্মগ্রন্থিস্থানে অর্থাৎ সমুদয় চর্মপ্রদেশে ব্যাপ্ত থাকিয়া চর্মপ্রদেশকে রোগমুক্ত রাখে। এই স্নেহন বা তর্পক শ্লেষ্মা দুষ্ট হইলে স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়; দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়।

শ্লেষণ শ্লেষ্মা—দেহের সমুদয় অস্থিসন্ধি, দেহের গ্রন্থিস্থানগুলি যে রসধারায় প্লাবিত থাকে উহারই নাম শ্লেষণ শ্লেষ্মা। এই শ্লেষণ শ্লেষ্মার

অবস্থিতির জন্য অস্থিতে অস্থিতে সংঘর্ষ হয় না। এই শ্লেষণ শ্লেষ্মা অস্থিসন্ধিস্থানের স্নায়ু ও পেশীকে সবল, সুস্থ ও সরস রাখে বলিয়াই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথোচিতভাবে নাড়াচাড়া করিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। দেহের শ্লেষণ শ্লেষ্মা দুষ্ট হইলে, দুর্বল হইয়া পড়িলেই অস্থিসন্ধিস্থানে রোগবিষ সঞ্চিত হয়, অস্থিসন্ধিস্থান বাতরোগে আক্রান্ত হয়, যক্ষ্মার পূর্বাভাস প্লুরিসি প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

ত্রিদোষ

শুধু বায়ু, শুধু পিত্ত বা শুধু কফ প্রকুপিত হইয়া, দূষিত হইয়া যে রোগ সৃষ্টি করে, উহা একদোষজ রোগ। এই একদোষজ রোগ সহজেই আরোগ্য হয়। বায়ু-পিত্ত, বায়ু-শ্লেষ্মা বা পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রভৃতি দুই দোষ প্রবল হইয়া যে রোগের সৃষ্টি হয়, উহা অপেক্ষাকৃত কঠিন আকার ধারণ করে। এই দ্বিদোষজ রোগ আরোগ্য হইতে একটু বিলম্ব হয়। বায়ু-পিত্ত-কফ—এই ত্রিধাতু প্রকুপিত হইয়া যে রোগের সৃষ্টি হয়, উহা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া উঠে। এই ত্রিধাতুর যে কোনো ধাতু নষ্ট না হইলে রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের মাঝে যতদিন দুর্বলতা প্রকাশ না পায়, অভ্যন্তরের শত্রুরাও ততদিন বিদ্রোহ করিতে সাহস পায় না, বহিঃশত্রুরাও ততদিন রাষ্ট্র আক্রমণে ভয় পায়। আমাদের দেহরাষ্ট্রের কর্ণধার বায়ু, পিত্ত ও কফ (যোগশাস্ত্রের ভাষায় বায়ু-অগ্নি-বরুণ), এই প্রধান তিন রাষ্ট্রনায়ক পরস্পরের সহযোগিতায় সবল হাতে যতদিন দেহরাষ্ট্র পরিচালনা করেন ততদিন আভ্যন্তরীণ রোগবীজ এবং বহিরাগত রোগবীজ দেহরাষ্ট্রের, দেহদুর্গের কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। এই তিন রাষ্ট্রনায়কের কাজে যখন অসহযোগিতা প্রকাশ পায়, দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখনই দেহদুর্গ আভ্যন্তরীণ শত্রু বা বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইজন্যই আয়ুর্বেদে সমস্ত রোগের মূল কারণকে বলা হয় ত্রিদোষ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে রোগবীজাণু সংক্রমণই রোগসৃষ্টির মূল কারণ। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে এই মতবাদ সত্য নয়। সুস্থ-সবল দেহের মাঝেও সকল রকম রোগবীজাণু বিদ্যমান থাকে। অধিকাংশ অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবক-যুবতীর দেহে যক্ষ্মা-বীজাণু, কলেরা-বীজাণু, টাইফয়েড এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগবীজাণু বর্তমান; কিন্তু উহারা দেহের কোনো অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। দেহ দোষযুক্ত না হইলে দেহস্থ রোগবীজ দেহে বর্ধিত হইতে পারে না; বাহিরের রোগবীজাণুও দেহে সংক্রমিত হইয়া দেহের কোনো অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। সুতরাং রোগবীজাণু সংক্রমণ রোগের কারণ নয়; উহা রোগের পরিণতি বা পরবর্তী কার্য অর্থাৎ উহা রোগের দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় ধাপ।

ভূপৃষ্ঠে কোনো জিনিস পচিয়া উঠিলেই উহাতে অসংখ্য বীজাণু সৃষ্টি হয়। দেহাভ্যন্তরে খাদ্যবস্তু যদি ভালো জীর্ণ না হয়, দেহে যদি মল সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে ঐগুলি পচিয়া দেহে রোগবিষ সৃষ্টি করে। এই রোগবিষে জর্জরিত হইয়া দেহস্থ বায়ু-পিত্ত-কফ প্রকুপিত হইয়া উঠে, দুষ্ট হইয়া উঠে এবং উহাদের কার্যকারিতা দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন এই রোগবিষের আশ্রয়ে বিনা বাধায় দেহে অসংখ্য রোগবীজাণুর সৃষ্টি হইতে থাকে। বাহিরের রোগবীজাণুও দেহের এই দূষিত অবস্থায় দেহে প্রবেশ করিয়া বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায়। সুতরাং দেহ দোষযুক্ত হওয়ায় দেহের বায়ু-পিত্ত-কফের ক্রিয়ায় বৈষম্যের ফলে দেহ রোগবিষ বৃদ্ধির অনুকূল হওয়াই রোগবৃদ্ধির মূল কারণ। এইজন্যই আয়ুর্বেদাচার্যের মতে রোগের মূল কারণ—**ত্রিদোষ। আয়ুর্বেদাচার্যের এই 'ত্রিদোষ' মতবাদ আধুনিক যুগের 'রোগ-বীজাণু সংক্রমণ' মতবাদের চেয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক।**

কৃমি বা রোগবীজাণু

রোগবীজাণু সংক্রমণ মতবাদও আধুনিক নয়। উহাও অতি প্রাচীন।

আয়ুর্বেদে রোগবীজাণুর নাম কৃমি। **"ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।"**—বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে কৃমি দ্বিবিধ। আবর্জনা, দূষিত জল ও পুরীষ হইতে যে রোগবীজাণু উৎপন্ন হয় বা শরীরের ময়লা ঘাম হইতে চর্মের বহির্ভাগে বা চুলের মাঝে যে রোগবীজাণু উৎপন্ন হয়, উহার নাম **বাহ্য কৃমি**। শরীরের ভিতরে উৎপন্ন রোগবীজাণুর নাম **অভ্যন্তর কৃমি**। এই অভ্যন্তর কৃমি ত্রিবিধ—কফজ, রক্তজ ও পুরীষজ।

কফজ কৃমি—**"কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্বতঃ"**—দূষিত কফ বা শ্লেষ্মা হইতে আমাশয়ে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব অন্ত্রে (গ্রহণী নাড়ীতে) এই কফজ কৃমি উৎপন্ন হয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

রক্তজ কৃমি—**"রক্তবাহিশিরাস্থানরক্তজা জন্তবোঽণবঃ"**—শরীরের রক্ত দূষিত হইলে এই দূষিত রক্তে অণু প্রমাণ রক্তজ কৃমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রক্তবাহী শিরাস্থানে অর্থাৎ সমুদয় রক্তে ছড়াইয়া পড়ে। বসন্ত, জলবসন্ত, হাম, পাঁচড়া, ফোঁড়া, দদ্রু প্রভৃতি যাবতীয় কুষ্ঠ বা চর্মরোগের মূল এই রক্তজ কৃমির কার্যকারিতা।

পুরীষজ কৃমি—অন্ত্রে সঞ্চিত পুরীষ অর্থাৎ মল পচিয়া এই পুরীষজ কৃমি উৎপন্ন হয়। এই পুরীষজ কৃমি বা রোগবীজাণুই বর্ধিত হইয়া আমাশয়, ওলাউঠা, অতিসার, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে। সুতরাং এই পুরীষজ কৃমির কার্যকারিতা দেহের নিম্নাংশে অর্থাৎ পক্বাশয় হইতে মলদ্বার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই রোগবীজাণু কদাচিৎ কখনো পাকস্থলীর ঊর্ধ্বেও ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় রোগীর উদ্গার ও নিঃশ্বাস পচা মলের মতো অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

আয়ুর্বেদাচার্যেরা নাড়ীবিজ্ঞানে এমন দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন যে রোগের প্রারম্ভেই নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন—কি কি দোষের ফলে রোগ সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার ভোগকাল কতদিন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আয়ুর্বেদাচার্যদের মতো নাড়ীবিজ্ঞানে দক্ষতা আজ পর্যন্ত অর্জন করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোগ বিবরণ

যোগাচার্য ও আয়ুর্বেদাচার্যদের দেহতত্ত্ব ও রোগনিদান তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বাধ্যায়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানও যোগীদের মতোই দেহস্থ গ্রন্থিক্রিয়ার সন্ধান পাইয়া ক্রমশঃ দার্শনিক হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ আধুনিক গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্‌কে যদি আমরা প্রশ্ন করি—"গলগণ্ড রোগের কারণ কি?" তিনি এক কথায় উত্তর দিবেন—"Over activity of Thyroid—থাইরয়েডের অতিক্রিয়া।" অনুরূপ প্রশ্নে যোগীরা বলিবেন—"নভঃগ্রন্থির দুর্বলতা।" আয়ুর্বেদাচার্যেরা বলিবেন—"প্রদুষ্ট বায়ু ও কফদোষ মিলিত হইয়া এই রোগ সৃষ্টি করে।" এই দার্শনিকোচিত কারণ বর্ণনায় সাধারণ লোক উপকৃত হয় না। যেভাবে রোগের কারণাদি বর্ণনা করিলে সাধারণ লোকের অন্তর স্পর্শ করে, সাধারণে নিজ নিজ রোগসৃষ্টির মূল কারণ জ্ঞাত হইয়া সাবধান হইতে পারে, আমরা সেই বিষয়ে সচেতন থাকিয়াই যোগাচার্যদের, আয়ুর্বেদাচার্যদের এবং আধুনিক গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্‌দের দার্শনিক পরিভাষা যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাষায় রোগের কারণ, প্রতিকার এবং নিয়ম-পথ্যাদির বর্ণনা দিতেছি। আমাদের এই বর্ণনা, আশা করি রোগীদের পক্ষে দুর্বোধ্য হইবে না। আয়ুর্বেদাচার্যদের একটি মূল্যবান উপদেশ আছে—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥

—ঔষধ ব্যবহার না করিয়াও কেবলমাত্র পথ্যবিধি পালনের দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু যথোচিত পথ্যবিধি যে পালন করে না, শত ঔষধ সেবনেও তাহার রোগমুক্তি হয় না। যাহারা আমাদের এই বইয়ের

যোগক্রিয়ার সাহায্যে রোগ আরোগ্যে ইচ্ছুক, তাহাদেরও আমরা এই নিয়ম-পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে অনুরোধ জানাইতেছি। নিয়ম-পথ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটিবে। যোগবিদ্যা অনুষ্ঠানে অনিচ্ছুক ব্যক্তি এই পুস্তকে বর্ণিত নিয়ম ও পথ্যের বিধি পালন করিয়া চলিলে তাহারও রোগমুক্ত হওয়ার আশা আছে, কিন্তু **নিয়ম-পথ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়া যোগক্রিয়া অনুষ্ঠানেও রোগারোগ্যের আশা কম।**

অজীর্ণ

লক্ষণ—ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, মুখের শ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ দিয়া জল ওঠা, পেটে বায়ু সঞ্চিত হওয়া, বুক ধড়ফড় করা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা তরল ভেদ প্রভৃতি।

কারণ—"আহারবৈষম্যাৎ অজীর্ণং জায়তে নৃণাম্"—আহারের বৈষম্য হেতু অজীর্ণ সৃষ্টি হয়। অসময়ে ভোজন, দ্রুত ভোজন, গুরুভোজন, প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্বিজাতীয় বা আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ, অক্ষুধায় বা অল্পক্ষুধায় খাদ্যগ্রহণ, যথোচিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অন্ত্রপরিচালক স্নায়ুগুলির দুর্বলতা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ।

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি উহা প্রথমে পাকস্থলীতে গিয়া পাকস্থলীর পাচকরস, যকৃতের পিত্তরস প্রভৃতির সাহায্যে অর্ধজীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর এই অর্ধজীর্ণ খাদ্য পাকস্থলী হইতে গ্রহণীনাড়ীতে (ঊর্ধ্ব অন্ত্রে) গমন করে। বিভিন্ন পাচকরস, পিত্তরস সম্মিলিত হইয়া গ্রহণীনাড়ীতে অবস্থিত অর্ধজীর্ণ খাদ্যকে সূর্যগ্রন্থি-রসের (Pancreas) আয়ুর্বেদের ভাষায় অগ্ন্যাশয়স্থিত পাচকপিত্তের সহায়তায় সম্পূর্ণ জীর্ণ করিবার ব্যবস্থা করে। গ্রহণীনাড়ীতে অবস্থিত এই খাদ্য সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইলে উহা পচিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই অজীর্ণ খাদ্য অন্ত্রের পথ অবরুদ্ধ

রাখে বলিয়া বায়ুর চলাচলেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় দেহশোধনকারী বায়ু দেহোৎপন্ন এই বিষ নিঃশ্বাসের সহিত সম্পূর্ণ বাহির করিয়া দিতে পারে না; অজীর্ণ খাদ্যকে মলনাড়ীও মলরূপে দেহ হইতে নিঃসারিত করিয়া দিতে পারে না; মলের সহিত ঐ বিষ দেহ হইতে বাহির হওয়ার সুযোগ না পাইলে তখন উহা রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে। এই বিষাক্ত রক্তকে শোধন করিবার জন্য দেহের রক্তশোধনকারী প্লীহা, যকৃত, মূত্রগ্রন্থি (কিড্‌নি), ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। এই অজীর্ণ খাদ্যরসে জর্জরিত হইয়া দেহস্থ স্নায়ুগুলিও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত স্নায়ুগুলিও তখন আর স্বীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হয় না, সমস্ত দেহ ব্যাপিয়াই তখন একটা বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে।

এক প্রকার অজীর্ণ রোগে পাকস্থলীর অম্লরস কমিয়া যায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে ইহার নাম 'য়্যাটমিক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া' (Atomic Dispepsia)। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে প্লীহা ও যকৃত যখন দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন আর তাহাদের প্রয়োজনীয় পাচকরস উৎপন্ন করার ক্ষমতা থাকে না, ফলে খাদ্যপরিপাকের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

এই রোগটি কষ্টদায়ক হইলেও প্রাণসংশয়কারী নয়। কিন্তু এই রোগটিই আবার বহু প্রাণসংশয়কারী রোগের জনক। এই অজীর্ণ রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে উহা হইতে স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, পিত্তশূল, পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রক্ষত, মূত্র-পাথুরী, পিত্ত-পাথুরী প্রভৃতি জীবনসংশয়কারী ব্যাধিগুলি সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই রোগটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় ; রোগের প্রারম্ভেই রোগটিকে তাড়াইবার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসা—ভোরে ৩নং সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি (৪র্থ অধ্যায়ে সহজ বস্তিক্রিয়ার বিবরণ দ্রষ্টব্য)। বস্তিক্রিয়ার বিধান

অনুযায়ী, আসন-মুদ্রাদি অনুষ্ঠানের পর দন্তধাবন ও মলত্যাগ প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিবে। এই বস্তিক্রিয়া ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩ ও নং ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

বৈকালে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার এবং নং ২—৪ বার, উড্ডীয়ান ৪ বার, অর্ধকূর্মাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৯—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। কোষ্ঠতারল্য থাকিলে সহজ অগ্নিসার ক্রিয়া ৪০ বার; সর্বাঙ্গাসন ৪ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট এবং উষ্ট্রাসন ৪ বার।

দ্বিপ্রহর এবং রাত্রির প্রধান আহারের পর দক্ষিণ নাসায় অন্ততঃ এক ঘণ্টা শ্বাস প্রবাহিত রাখিবে। দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহের সময় প্রয়োজনীয় পাচক পিত্ত ও পাচক রসাদি উৎপন্ন হইয়া খাদ্য জীর্ণ করিবার ব্যবস্থা করে। ('শ্বাস পরিবর্তনের কৌশল' তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

শরীরে সবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে "**ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি**" অনুযায়ী স্নায়ু ও গ্রন্থি সবলকারী অন্যান্য আসন-মুদ্রাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে (এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি' দ্রষ্টব্য)। জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—দেহের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্যই খাদ্য গ্রহণের আবশ্যকতা। এই আবশ্যকতার উদ্ভব হইলেই তীব্র ক্ষুধার উদ্রেক করিয়া দেহপ্রকৃতি দেহপরিচালককে জানাইয়া দেয় এখন তাহার খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। **অপ্রয়োজনে অর্থাৎ অক্ষুধায় বা অল্পক্ষুধায় কখনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। এই নিয়মটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকিবে।** অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে অথবা সুস্বাদু খাদ্যের প্রলোভনে কখনো যেন এই নিয়মটি লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি না হয়। এই রোগটি যতদিন নির্মূল না হয়

ততদিন ভোরে ও বৈকালে জলযোগের অভ্যাস বন্ধ রাখা উচিত। যদি এই সময় বিশেষ ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহা হইলে মিষ্টি কমলা, আনারস, পেঁপে, লেবুর সরবত, আঙুর, আপেল, বেদানা প্রভৃতি ফলের ভিতর হইতে নিজের রুচিমত কিছু ফলাদি গ্রহণ করিবে। রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভোরে ও বৈকালে অন্য খাদ্যগ্রহণের প্রলোভন বর্জন করিয়া চলিবে।

দ্বিপ্রহরে খাদ্য গ্রহণও যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বিশেষ উপদেশ—কখনো উদর পূর্ণ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিবে না ; উদরের অর্ধেক খাদ্য দ্বারা পূর্ণ করিবে, বাকি অর্ধেক অবাধে বায়ু চলাচলের জন্য এবং জলপানের জন্য খালি রাখিবে। যতদিন জলযোগ বন্ধ রাখিয়া শুধু দুইবেলা আহার করিবে ততদিন আহারান্তে কিছু পরিমাণ রসাল ফল গ্রহণ করিবে।

চর্বিজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ ঘি, মাখন ও তেলেভাজা প্রভৃতি অজীর্ণ রোগীর পক্ষে গ্রহণ করা উচিত নয়। মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। একান্তই উহা ত্যাগ করিতে না পারিলে যথাসাধ্য কম গ্রহণ করিবে। আমাদের শরীরের রক্ত সমুদ্রের জলের মতোই লবণাক্ত। এই রক্ত হইতেই শরীরের যাবতীয় উপাদান গঠিত হয় ; রক্তই শরীরের যন্ত্রগুলিকে পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করিয়া উহাদিগকে কর্মক্ষম রাখে। অগ্নিতে কাষ্ঠাদি দগ্ধ হইয়া যে ভস্ম উৎপন্ন হয় উহা ক্ষারধর্মী অর্থাৎ লবণাক্ত। জঠরাগ্নিতে ফল, শাক-সব্‌জি ও দুগ্ধ প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য দগ্ধ হইয়া যে ভস্ম উৎপন্ন হয় উহাও এইরূপ ক্ষারধর্মী। এই ক্ষারভস্ম রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে লবণাক্ত রাখে। জঠরে আমিষ খাদ্য এবং চর্বি ও চিনিজাতীয় খাদ্য (কার্বোহাইড্রেট) দগ্ধ হইয়া যে ভস্ম উৎপন্ন হয় উহা অম্লধর্মী। এই অম্লভস্মও রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে অম্লধর্মী করে। দেহের সুস্থ রক্ত যদিও ক্ষারধর্মী অর্থাৎ লবণাক্ত, তবুও উহাতে কিছু পরিমাণে

অম্লরসের ভাগ থাকে। রক্তে যদি এই অম্লরসের মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অম্লবিষে জর্জরিত হইয়া দেহস্থ অগ্নি-উদ্দীপক যন্ত্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পায়। এইজন্যই অজীর্ণ রোগীদের আমিষ ভোজন উচিত নয়। আমিষ খাদ্য হিংস্র পশুর খাদ্য, উহা মানুষের খাদ্য নয়। চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণের মাত্রাও হ্রাস করা প্রয়োজন। সুতরাং ভাত প্রভৃতি অম্লধর্মী খাদ্যের পরিমাণ শাক-সবজির এক-চতুর্থাংশের বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। সুসিদ্ধ ডাল সুস্থ-সবল লোকের এবং রোগীদেরও মহোপকারী খাদ্য, সুতরাং সুসিদ্ধ ডালও অজীর্ণ রোগীর পক্ষে সুখাদ্য ও লঘুপাক খাদ্য।

ভাত, রুটি ও অন্যান্য শক্ত খাদ্য খুব ভালো করিয়া চিবাইয়া খাইবে। আমাদের খাদ্য পরিপাকের প্রাথমিক আয়োজন হয় মুখগহ্বরে। ভাত, রুটি প্রভৃতি চিনিজাতীয় খাদ্য (Carbohydrate) পুরাপুরি হজম করার শক্তি পাকস্থলীর পিত্তরস ও পাচকরসের নাই। মুখের অভ্যন্তরস্থিত লালাগ্রন্থি নিঃসৃত লালারসই এই চিনিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করে। খাদ্যকে নিষ্পেষিত করিয়া উহাকে লালারসে মিশ্রিত করিবার জন্যই মুখে দন্তের সৃষ্টি। মনে রাখিবে—উদরে দন্ত নাই, সুতরাং দন্তের কাজ দন্ত দ্বারাই সমাধা করিবে। দন্ত দ্বারা সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত না হইয়া কোনো খাদ্যই যেন উদরে প্রবেশ না করে—এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এই লালারস শুধু চিনিজাতীয় খাদ্যকেই জীর্ণ করে তাহা নয়, উহা অন্যান্য খাদবস্তুকেও জীর্ণ করিতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। দন্ত দ্বারা সুচর্বিত হইয়া, প্রচুর লালারস মিশ্রিত হইয়া বিভিন্নজাতীয় খাদ্য যখন উদরে প্রবেশ করে তখন ঐ লালারসের প্রভাবে উদরস্থ পরিপাকযন্ত্রগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া খাদ্যকে জীর্ণ করিবার উপযোগী পরিমিত পিত্তরস ও পাচকরস উৎপন্ন করে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যাদি খুব ভালোভাবে চর্বণ করিয়া উদরস্থ করিবে। অজীর্ণরোগীর পক্ষে শাক-সবজি, ঘোল, পাতলা দুধ, রসাল ফল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্যই সুপথ্য।

দ্বিপ্রহরের আহার বেলা ১১টা হইতে ১টার মধ্যে এবং রাত্রির আহার

রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ ৮টা—৯টার মধ্যে সমাধা করিবে। অক্ষুধায় আহার এবং অপরিমিত আহারের মতো অপরাহ্নে এবং অধিক রাত্রিতে আহার অজীর্ণ রোগ সৃষ্টির কারণ। দ্বিপ্রহরের পর সূর্যতাপও যেমন হ্রাস পায়, জঠরাগ্নিও তেমন মন্দীভূত হয়। রাত্রের আহার জীর্ণ হইতে ৮/১০ ঘণ্টা সময় লাগে। এইজন্য রোগী-অরোগী সকলেরই মধ্যাহ্নে এবং রাত্রির প্রথম প্রহরে আহার্য গ্রহণ করা কর্তব্য। দ্বিপ্রহরের আহারের পর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। ছাত্র, শিক্ষক, চাকুরে প্রভৃতি সকলেরই এই নিয়মটি পালন করা কর্তব্য। খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুল, কলেজ, অফিসে দৌড়ান উচিত নয়। স্কুল বা অফিস যাত্রার আধ ঘণ্টা পূর্বেই আহারাদি সমাধার ব্যবস্থা করিবে। রাত্রেও অনুরূপভাবে খাদ্য গ্রহণের পর আধঘণ্টা বা একঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া শয়ন করিতে যাইবে। রাত্রে শয়নের পূর্বে আঙিনায় বা মুক্ত বারান্দায় কিছু সময় পদচারণা করিয়া শয়ন করিলে সহজেই সুখনিদ্রার আবির্ভাব ঘটিবে।

চা গরমদেশের উপযোগী পানীয় নয়। তামাকের 'নিকোটিন' বিষের মতো চায়ের ভিতরের 'ট্যানিন' বিষ জঠরাগ্নিকে দুর্বল করে। সুতরাং অজীর্ণরোগী অনিষ্টকর কুপথ্য জ্ঞানে চা বর্জন করিবে। চা দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট করে। ধূমপানও অজীর্ণরোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। চা পান এবং ধূমপানের অপকারিতার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের **ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন** নামক গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অজীর্ণ রোগারোগ্যে উপবাস বিশেষভাবেই সহায়তা করে। একাদশী তিথি এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথি উপবাসের উপযুক্ত সময়। একাদশী তিথি হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত পৃথিবী একটু রসস্থ হয়। পৃথিবীর এই রসোদ্রেকের লক্ষণ প্রকাশ পায় নদী ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে। একাদশী তিথি হইতেই সমুদ্র ও নদীর জল বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়; বৃদ্ধি চরমে ওঠে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে। সমুদ্রে এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী নদী, নালা, পুকুর প্রভৃতিতে এই জলোচ্ছ্বাস প্রচুর

পরিমাণে হয় বলিয়া উহা আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমুদ্র হইতে দূরবর্তী নদী, নালা, পুকুর প্রভৃতিতেও এই সময় জল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা খুব অল্প মাত্রায় হয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পৃথিবীমাতার দেহ যখন এইরূপ রসাল হইয়া উঠে তখন তাঁহার সন্তান-সন্ততিদের দেহেও রসাধিক্য ঘটে। **এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রের স্বাস্থ্যনীতিতে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই একাদশী তিথিতে উপবাস এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় নিশিপালনের বিধান রহিয়াছে।** এই বিধান মানিয়া চলিলে দেহ সহজে রোগাক্রান্ত হয় না।

উপবাস রোগারোগ্যের ও দীর্ঘায়ু লাভের সহায়ক। অজীর্ণরোগী উপবাসের বিধান পালন করিয়া চলিলে অল্পায়াসেই অজীর্ণরোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। একাদশী তিথিতে উপবাস করিলে ঐ উপবাসের সময় প্রচুর শীতল জল পান করিবে। এই স-অম্বু উপবাসেও অক্ষম হইলে দিনে একবার মাত্র অল্প পরিমাণে রসাল ফল ও দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। উপবাসে অক্ষম ব্যক্তিরা একাদশী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে।

অন্ত্র-উপাঙ্গ প্রদাহ (এপেণ্ডিসাইটিস)

লক্ষণ—ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি সরু মুখ থলিয়ার মতো এই উপাঙ্গটি অবস্থিত। সাধারণতঃ ইহার আকার লম্বায় ৩/৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১/০ ইঞ্চি। কোনো কোনো দেহে এই উপাঙ্গটি ইহার চেয়েও বৃহদাকারে দেখা যায়। দেহে এই উপাঙ্গটির প্রয়োজনীয়তা কি, দেহবিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই অন্ত্র উপাঙ্গটির স্ফীতি এবং তজ্জনিত তলপেটের বেদনাই এই রোগের লক্ষণ। এই উপাঙ্গটি যখন পাকিয়া ফাটিয়া যায়, তখন রোগটি মারাত্মক হইয়া উঠে। এ রোগটি যৌবনকালের ব্যাধি। অনাগত যৌবন এবং বিগত

যৌবনে কদাচিৎ এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

কারণ—আয়ুর্বেদ মতে এই রোগটি পিত্তদোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই রোগে অন্ত্রোপাঙ্গের আকার উডুম্বর (যজ্ঞডুমুর) ফল সদৃশ হয় এবং উহা পাকিয়া ফাটিয়া রোগীর বিপদ ঘটায়। এই রোগটির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আধুনিক যুগের চিকিৎসকমণ্ডলী এখনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেসব যুবক শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ, অতি আলস্যবশতঃ যাহারা বদ্ধ গৃহেই অধিকাংশ সময় যাপন করে, মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ বা খেলাধূলায় যাহাদের রুচি নাই, যাহারা অত্যধিক আমিষখাদ্য প্রিয়, দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু এবং পিত্তদোষ হেতু তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। শক্ত মল, অর্ধজীর্ণ খাদ্যের টুকরা, কৃমি অর্থাৎ রোগজীবাণু অথবা দেহসঞ্চিত বিষাক্ত গ্যাস ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে নামিবার সময় মলপূর্ণ বৃহদন্ত্রে প্রবেশে বাধা পাইয়া ঐ সমস্ত দূষিত অনিষ্টকারী পদার্থ এই ক্ষুদ্র অন্ত্রোপাঙ্গটির ভিতর যদি কিছু পরিমাণ ঢুকিয়া যায়, তাহা হইলে এই রোগের সূচনা হয়। সুতরাং অগ্নিমান্দ্য হেতু পিত্তদোষ, অম্লদোষ, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং দেহসঞ্চিত বিষাক্ত পদার্থই এই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ।

চিকিৎসা—ভোরে—সহজ বস্তিক্রিয়া (১নং বা ২নং) ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর টাববাথ ৫ মিনিট। টাবে বসিয়া অশ্বিনী মুদ্রা ২০ বার, মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার। ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

মধ্যাহ্নে—টাববাথ ১০-১৫ মিনিট এবং টাবে বসিয়া ভোরের অনুরূপ ক্রিয়াদি অভ্যাস করিবে।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, মৎস্যাসন ২ মিনিট, পশ্চিমোত্তান আসন ৬ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, নং-২—৩ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩ প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শশাঙ্গাসন বা শীর্ষাসন ৩ মিনিট।

নিয়ম-পথ্যাদি—কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের অনুরূপ (কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ (হার্ণিয়া)

অন্ত্র প্রভৃতি তলপেটের নাড়ীগুলিকে স্ব স্ব স্থানে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য তলপেটে সুরক্ষিত আবরণী বা গহ্বর (abdominal wall) আছে। **'পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ'**—দেহস্থ দূষিত বা ক্ষোভিত বায়ু যে রোগে অন্ত্রাংশ বা অন্য কোন নাড়ীর স্বস্থান হইতে বিচ্যুতি বা বহির্গমন ঘটায়, উহার নামই অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বা হার্ণিয়া রোগ।

লক্ষণ—তলপেটের আবরণীতে ২/৩টি ছিদ্র আছে। একটি ছিদ্রপথে পুরুষদের মুষ্কদ্বয় পরিচালক ধমনী ও স্নায়ুরজ্জু এবং মেয়েদের জরায়ুতেও অনুরূপ স্নায়ুরজ্জু নামিয়া আসিয়াছে। এই ছিদ্রপথে কোনো নাড়ী নামিয়া আসিলে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে তাহার নাম **ইন্‌গুইনাল হার্ণিয়া** (Inguinal Hernia)। তলপেটের যে ছিদ্রপথে পদদ্বয় অভিমুখে ধমনী প্রভৃতি বাহির হইয়া গিয়াছে, ঐ ছিদ্রপথে কোন নাড়ী স্বস্থানচ্যুত হইয়া বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে বলে **ফেমোরাল হার্ণিয়া** (Femoral Hernia)। শিশুদের কখনো কখনো নাভিছিদ্রের ভিতর দিয়া নাড়ী বাহির হইয়া আসে, ইহার নাম **আম্‌বিলিক্যাল হার্ণিয়া** (Umbilical Hernia)।

এই বিভিন্ন হার্ণিয়া রোগগুলিরও আবার তিনটি অবস্থা আছে। এই বর্ধিত নাড়ীকে হস্ত দ্বারা সহজে ভিতরে ঢুকাইয়া দিতে পারা যায় অথবা বস্তিস্নায়ু আকর্ষণ করিয়া উহাকে ঊর্ধ্বে তোলা যায়। বর্ধিত নাড়ীর এইরূপ অবস্থাকে বলে রিডিউসিব্‌ল (Reducible) হার্ণিয়া। বহিরাগত নাড়ী যখন শক্ত হইয়া যায়, হস্ত দ্বারা আর ভিতরে ঢোকানো যায় না, তখন তাহাকে বলে ইরিডিউসিব্‌ল (Irreducible) হার্ণিয়া। এই বহিরাগত নাড়ী ফুলিয়া

যখন গুহ্যদ্বারের আংটির সহিত জড়াইয়া যায় তখন তাহাকে বলে স্ট্র্যাঙ্গল্‌ড (Strangled) হার্ণিয়া।

কারণ—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ অতি অল্প বয়সেই আমরা শিশুদের মাছ, মাংস, ডিম, মাখন, ঘি-তৈল মসলাযুক্ত খাদ্য এবং ঘিয়ে ভাজা ও তেলে ভাজা খাদ্য, চিড়া, মুড়ি ও চা খাইতে দিই। ইহার ফলে অল্প বয়সেই শিশুদের যকৃতটি অসুস্থ হইয়া পড়ে! যকৃত অসুস্থ হইলে জঠরাগ্নিও দুর্বল হয়। জঠরাগ্নি দুর্বল হইলে তলপেটের স্নায়ু-পেশী দুর্বল হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি করে। কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি হইলে অপানবায়ু কুপিত হয়, প্রাণাদি অন্যান্য বায়ুও দূষিত হয়, ফলে রক্তও দূষিত হইয়া দেহের সমুদয় যন্ত্রগুলিকেই দুর্বল করিয়া ফেলে। দেহের এইরূপ দূষিত অবস্থায় মলপূর্ণ অন্ত্রের উপর কুপিত বায়ুর চাপ পড়িলে সেই চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ত্রাংশ স্থানচ্যুত হয়। এই স্থানচ্যুত অন্ত্রাংশ পূর্বোক্ত ছিদ্রপথে অন্য অঙ্গের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। এইভাবে ছোটো বড়ো সকলেরই আহারের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য যকৃত খারাপ হইয়া শরীরে দূষিত অম্ল-পিত্ত সঞ্চিত হইয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ উৎপন্ন হইয়া এই রোগটির সৃষ্টি হয়।

ইন্‌গুইনাল হার্ণিয়া এবং ফেমোরাল হার্ণিয়া কষ্টদায়ক হইলেও উহা প্রাণসংশয়কারী নয়। বহু লোক সারা জীবন ব্যাপিয়াই এই রোগ বহন করিয়া চলে। স্ট্র্যাঙ্গল্‌ড হার্ণিয়াই বিপজ্জনক। এই হার্ণিয়ায় মলদ্বার রুদ্ধ হইলে মল বমির মতো মুখপথে বাহির হয়। এই হার্ণিয়া পাকিয়া উঠিলে বা রক্ত চলাচলের পথ রুদ্ধ করিলে অস্ত্রোপচার ছাড়া রোগীর আর তখন বাঁচিবার উপায় থাকে না।

চিকিৎসা—(ভোরে) ৩নং সহজ বস্তিক্রিয়া। বস্তিক্রিয়ার অঙ্গস্বরূপ শুধু বিপরীতকরণী মুদ্রা, যোগমুদ্রা এবং পবনমুক্তাসন অভ্যাস করিবে। বস্তিক্রিয়া ও প্রাতঃকৃত্যাদির পর অবগাহন স্নান বা টাববাথ ৫ মিনিট ; অতঃপর মূলবন্ধ মুদ্রা, অশ্বিনী মুদ্রা, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৮, নং ৯ এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

দ্বিপ্রহরে—অবগাহন স্নান বা টাব বাথ ১০—১৫ মিনিট। টাবে বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩—৬ মিনিট।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, মূলবন্ধ মুদ্রা, অশ্বিনী মুদ্রা, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, অগ্নিসার ধৌতি, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৪; শশাঙ্গাসন বা শীর্ষাসন।

রোগের প্রকোপ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম। ১নং বা ২নং জলস্নানবিধি যথাযথ পালন করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—আজকাল হার্ণিয়া রোগীদের জন্য ট্রাস (Truss) ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা একটি ছোটো 'প্যাড' (গদি)। এই প্যাড হার্ণিয়ার উপর রাখিয়া উহাকে কোমরের সহিত বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই প্যাড ব্যবহার করিলে হার্ণিয়া যখন তখন বাহির হইয়া দৈনিক কাজ-কর্মের অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। বলা বাহুল্য, এই ট্রাস ব্যবহারে রোগ দূর হয় না। হার্ণিয়া আরোগ্য হইবে কোষ্ঠবদ্ধতা নিরাময় হইলে, যকৃত সুস্থ-সবল হইলে, জঠরাগ্নি স্বাভাবিক হইলে এবং দেহস্থ বায়ু দোষমুক্ত হইলে।

হার্ণিয়া রোগীদের কোনো ভারি বস্তু বহন করা অনুচিত। হাঁচি ও কাশির ফলেও সময় সময় হার্ণিয়া বাহির হইতে পারে। পায়খানার সময়ও কোঁথ দিয়া পায়খানা করার অভ্যাস ত্যাগ করিবে। খাদ্যাদি সম্বন্ধেও খুব সাবধানে থাকিবে, উদর-পূর্তি করিয়া খাইবে না, ক্ষুধা রাখিয়া খাইবে। খাদ্যবস্তুতে উদর পূর্ণ হইলে অন্ত্রে চাপ পড়ে, ঐ চাপে হার্ণিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে। এইজন্যই হার্ণিয়া রোগীর "আধপেটা" খাওয়া উচিত। এইরূপ খাদ্যসংযমে জঠরাগ্নি দ্রুত সবল হইয়া উঠিবে। জলও বারে বারে খাইবে, একবারে বেশি পরিমাণে খাইবে না। রোগ প্রবল হওয়ার উপক্রম দেখিলে উপবাস করিবে। উপবাসের সময় বারে বারে লেবু বা কমলার রস মিশ্রিত জল খাইবে। এই রোগেও অজীর্ণ ও অম্লরোগের নিয়ম-পথ্যাদি যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া চলিবে। (অজীর্ণ ও অম্লরোগ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। আমিষ খাদ্য এবং সংহত খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

অধিকাংশ তরুণেরাই ইন্‌গুইনাল হার্ণিয়াকে "একশিরা" রোগ বলিয়া ভুল করে এবং ভুল চিকিৎসার দরুণ আরোগ্য না হওয়ায় হতাশ হইয়া পড়ে।

অম্লরোগ

লক্ষণ—"**অবিপাকক্লমোৎক্লেশতিক্তাম্লোদ্‌গারগৌরবৈঃ**"—ভুক্তান্নের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, তিক্ত বা অম্ল উদ্‌গার, বুক-জ্বালা, অরুচি প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। বলা বাহুল্য, অম্লরোগ অজীর্ণ রোগেরই পরিণতি।

কারণ—প্রাণবায়ু "অক্সিজেন" জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অঙ্গারাম্ল বায়ুতে (Carbonic Acid Gas) পরিণত হয়। উদরের প্রধান প্রধান ধমনীগুলির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য উপবায়ুগ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলি অঙ্গারাম্ল বায়ুর নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই উপবায়ুগ্রন্থিগুলিই (Gastric Glands) পাচকরস সৃষ্টির কারখানা। খাদ্য পাকস্থলীতে আসিলে এই গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে এবং প্রচুর পাচকরস নিঃসৃত করে।

পাকস্থলীর এই পাচকরস অম্লধর্মী। অক্ষুধায় বা অল্পক্ষুধায় খাদ্য গ্রহণ করিলে অথবা অপরিমিত খাদ্য গ্রহণ করিলে পাকস্থলীর এই উপবায়ুগ্রন্থিগুলিকেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং অতিরিক্ত পাচকরস উৎপাদন করিতে হয়। এই পাচকরস এবং মুখের লালাগ্রন্থিনিঃসৃত লবণাক্তরস এবং যকৃতোৎপন্ন পিত্তরস যে খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না, পাকস্থলী হইতে উহা গ্রহণী-নাড়ীতে অর্থাৎ ঊর্ধ্বঅন্ত্রে (Duodenum) গিয়া উপস্থিত হয়। এইখানে পুনরায় জোরের সহিত দহনক্রিয়া আরম্ভ হয়; এই দহনক্রিয়ায় সূর্যগ্রন্থিরসের অর্থাৎ পাচক পিত্তের (Pancreatic juice) ক্ষমতাই সর্বাধিক। এই গ্রহণী নাড়ীতে সূর্যগ্রন্থি রসের সাহায্যার্থে সূর্যগ্রন্থিরস (অ্যাড্রিনাল), উপবায়ুগ্রন্থিনিঃসৃত পাচকরস এবং যকৃতনিঃসৃত পিত্তরসও আসিয়া মিলিত হয়। এই সমুদয় পাচকরসের সম্মিলিত শক্তিতেও যে খাদ্য জীর্ণ হয় না, তাহা মলের সহিত বাহির হইয়া যায়, নতুবা অন্ত্রে থাকিয়া পিত্তরসাদি সহ পচিয়া

অম্লবিষে পরিণত হয় এবং দেহস্থ বায়ু ও রক্ত প্রভৃতিকে দূষিত করে। এইভাবে দেহে অম্লবিষ সৃষ্টি হইয়া উহা বুকে উপস্থিত হইলে বুক জ্বালা করে, গলদেশে আসিলে গলা জ্বালা করে। রক্তের সহিত এই অম্লবিষ মিশিয়া রক্তের ক্ষারধর্মকে নষ্ট করিয়া দেয়।

খাদ্যকে জীর্ণ করিবার জন্য এই উপবায়ুগ্রন্থিগুলি হইতে যে পাচকরস উৎপন্ন হয়, উহা আধুনিক যুগের রসায়নবিদদের নির্মিত এসিড (Acid) -এর মতই ভয়ানক শক্তিশালী। এসিড নির্মাণ করিতে হাইড্রোজেন (Hydrogen), অক্সিজেন প্রভৃতি বায়ুর দরকার হয়। উদরের পাচক-রসও অনুরূপ বায়ু হইতে বায়ুগ্রন্থির সাহায্যে তৈয়ারী হয়, তাই ইহারাও রাসায়নিকদের এসিডের মতই ভয়ানক শক্তিশালী। পিত্তরসও আগুনের মত দাহিকাশক্তিসম্পন্ন। সুস্থ অবস্থায় এই পাচকরস, পিত্তরস খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া নিজেরাও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহারা অজীর্ণ হইলে অম্লবিষে পরিণত হয়। শরীরের স্নায়ু, পেশী ও অন্যান্য যন্ত্রগুলি এই অম্লবিষে জর্জরিত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। যে রক্ত শরীরের সমুদয় গ্রন্থিকে, সমুদয় যন্ত্রগুলিকে খাদ্য ও পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করে, সেই রক্তে অম্লবিষ সঞ্চারিত হইলে শরীরের স্বাস্থ্য স্বভাবতঃই বিপন্ন হইয়া পড়ে।

এই অম্লরোগ বৃদ্ধি পাইলেই **অম্লশূল** রোগের সৃষ্টি হয়। এই অম্লশূল রোগে দেহে রক্তের অভাব হয় বলিয়াই দেহের স্নায়ুগুলি দেহাধীশের নিকট বিশুদ্ধ রক্তের প্রার্থনা জানাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করে। বিশুদ্ধ রক্তের জন্য স্নায়ুর এই ক্রন্দনই ভয়াবহ যন্ত্রণা ও বেদনার আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্যই শূলরোগীদের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

চিকিৎসা—ভোরে ৩নং সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। সহজ বস্তিক্রিয়ার পরে উড্ডীয়ান, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৮ এবং ভ্রমণ প্রাণায়াম। অতঃপর বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি।

বৈকালে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২; শয়নপশ্চিমোত্তান, পবনমুক্তাসন, সর্বাঙ্গাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার।

রোগের প্রবলতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম।

দ্বিপ্রহরে এবং রাত্রির আহারের পর যদি ইড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসায় শ্বাস থাকে, তাহা হইলে উহাকে পিঙ্গলা বা সূর্যনাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত করিয়া দিবে। প্রধান আহারের পরে যাহাতে পিঙ্গলায় অন্ততঃ একঘণ্টা শ্বাস থাকে সেই বিষয়ে যত্ন করিবে।

অম্লশূলের বেদনার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিবে—কোন্ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে উহা বন্ধ করিয়া অপর নাসায় শ্বাস সঞ্চারণের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এইভাবে শ্বাস পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দ্রুত শূলবেদনা হ্রাস পাইবে। ("শ্বাস পরিবর্তনের কৌশল" ৩য় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

নিয়ম ও পথ্য—যতক্ষণ বুক জ্বালা, গলা জ্বালা ও অম্লশূলের বেদনা বা উহার সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ লেবুর রস সহ ঈষৎ গরম জল ছাড়া অন্য কোন পথ্য গ্রহণ করিবে না। অম্ল ও অম্লশূলের বেদনা দূর হইলে গরম জলের পরিবর্তে শীতল জল পান করিবে। অম্লরোগীর সাধারণতঃ জলপিপাসা বেশি হয় না, তবুও তাহার দৈনিক ৫/৬ গ্লাস জল খাওয়া উচিত।

উপবায়ুগ্রন্থিগুলির (Gastric Glands) অতিক্রিয়তার জন্য অম্লরোগীর একটু অতিরিক্ত ক্ষুধা থাকে। এই অতিরিক্ত ক্ষুধার জন্য অম্লরোগী নিজের খাদ্যের সঠিক পরিমাণ স্থির করিতে পারে না। তাই তাহারা একটু অত্যাহারী হয়। পূর্বের অভ্যাসমত সকালে ও বৈকালে জলযোগের সময় উপস্থিত হইলেই অম্লরোগীর পাকস্থলীতে অত্যধিক পাচকরস উৎপন্ন হইয়া 'দুষ্ট' ক্ষুধাও উৎপন্ন করে। এই 'দুষ্ট' ক্ষুধা সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে। এক গ্লাস জল খাইলেও এই দুষ্ট ক্ষুধা হ্রাস

পায়। জলযোগের প্রয়োজন বোধ করিলে টকজাতীয় বা মিষ্টিজাতীয় রসাল ফল গ্রহণ করিবে। অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না।

অম্ল বা অম্লশূল বেদনা আরোগ্যের পরও ২/৩ দিন খুব লঘু পথ্য গ্রহণ করিবে। এই সময় শাক-সবজি না খাইয়া শাক-সবজির ঝোল, ফলের রস ও ঘোল পথ্যরূপে গ্রহণ করা উচিত। যতদিন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হইবে ততদিন খাদ্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগই যাহাতে ক্ষারধর্মী খাদ্য হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। ঘি, মাখন, তৈল প্রভৃতি চর্বি জাতীয় খাদ্য, মাংস, ডিম, ছানা, ছানার তৈয়ারি খাদ্যাদি অম্লরোগীর পক্ষে বিশেষভাবে বর্জনীয় এবং ঘিয়ে-ভাজা খাদ্য, অতিরিক্ত তৈল-মশল্লাদিযুক্ত খাদ্য, দধি, ঘন ডাল প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য অম্লরোগীর পক্ষে অপকারী। কিন্তু চর্বিজাতীয় খাদ্য একেবারে বর্জন করা উচিত নয়। রন্ধনে অতি অল্পমাত্রায় তৈল বা ঘি ব্যবহার করিবে। পাতে ঘি-মাখন খাইবে না; সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টি-মিঠাই খাইবে না। অম্লরোগীর পক্ষে দুধের চেয়ে ঘোল অধিকতর উপকারী। দুধ সহ্য হইলে এক বলকের পাতলা বা জল মিশানো দুধ খাইবে। গোদুগ্ধের চেয়ে নারিকেল দুগ্ধ অম্লরোগীর পক্ষে অধিকতর হিতকারী। সুযোগ থাকিলে দ্বিপ্রহরে ও রাত্রির আহার্যের সঙ্গে কিছু নারিকেল (নারিকেল কোরা) গ্রহণ করিবে অথবা আধা পোয়া বা এক পোয়া নারিকেল দুগ্ধ খাইবে। ঝুনা নারিকেল পিষিয়া গরম জলে মিশাইলেই নারিকেল-দুগ্ধ তৈয়ারি হয়। উপবাসও অম্ল রোগারোগ্যে বিশেষভাবেই সহায়তা করে। (অন্যান্য নিয়ম-পথ্যাদির জন্য "অজীর্ণ রোগ" বিবরণ দ্রষ্টব্য)। অম্লরোগী বেলা ১২টা পর্যন্ত কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। এই নিয়ম অম্লরোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে।

অম্লরোগ দমনে রাখার জন্য রোগীরা সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে সোডা ব্যবহার করে। ডাক্তারেরা এ্যাল্ক্যালাইন (Alkaline mixture), সোডি-বাই-কার্ব (Sodi-bi-carb), ক্যালোমেল (Calomel) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করেন। এই সমস্ত ক্ষারজাতীয় ঔষধ সাময়িকভাবে

পাকস্থলীর অম্লদোষ নষ্ট করে, কিন্তু এই ঔষধগুলিই আবার উপবায়ুগ্রন্থিগুলিকে অতিক্রিয় করিয়া এমন অবস্থায় আনয়ন করে, যাহার ফলে জঠরে খাদ্যের বিনা উপস্থিতিতেও উপবায়ুগ্রন্থিগুলি অম্লরস উৎপন্ন করিতে থাকে। ফলে সাময়িক রোগমুক্তির কিছুদিন পর আবার প্রবল আকারে রোগের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং **ঔষধ এই রোগকে আরোগ্য না করিয়া আরও জটিল করিয়া তোলে** এবং পরিণামে পাকস্থলীর ক্ষত রোগ (Gastric ulcer) পাকস্থলী-প্রদাহ বা অম্লশূল রোগ সৃষ্টি করে।

অর্ধোন্মাদ রোগ

লক্ষণ—মানবসমাজে এমন নর-নারী আছে যাহাদের আচার-ব্যবহার ও কার্যাদি তাহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের এবং প্রতিবেশী সুরুচিসম্পন্ন লোকের মনঃপূত হয় না। ইহাদের স্বভাবে একটি না একটি অসামঞ্জস্য থাকে। কেহ অতি অহংকারী, কেহ অতি অভিমানী, কেহ অতিশয় প্রভুত্বপ্রিয়, কেহ অতি খোসামুদে, কেহ অতি ক্রোধী, কেহ অতি কামুক, কেহ নারীবিদ্বেষী, কেহ অতিমাত্রায় নারীঘেঁষা, কাহারও স্ত্রীর চরিত্রের উপর সর্বদাই একটা অমূলক সন্দেহ, কেহ কুঁড়ের বাদশা, কাহারও জুয়াখেলার উপর, কাহারও মদ্যপানের উপর অত্যধিক ঝোঁক, কেহ বা ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বরই ভালোবাসে, কেহ বা নাস্তিকতা জাহির করিয়া তৃপ্তি পায়। মেয়েদের স্বভাবেও অনুরূপ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, কেহ বা পুরুষ বিদ্বেষী, কেহ বা অতিমাত্রায় পুরুষঘেঁষা, কেহ চরিত্রবান্ স্বামীর চরিত্রে সর্বদাই সংশয়াপন্ন, কাহারও শুচিবাইয়ের উৎপাতে বাড়ির লোক, আত্মীয়-স্বজনরা অতিষ্ঠ, কেহ বা অতি সহজেই পরপুরুষের প্রলোভনে পড়ে, কেহ বা সামান্য ব্যাপার লইয়া অতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, কাহারও খিটখিটে মেজাজে পরিবারের সকলেই বিরক্তি বোধ করে। বহু নর-নারীর স্বভাবে এইরূপ অসামঞ্জস্য আছে। ইহাদিগকে আমরা সহজ ভাষায় বলি—'আধ পাগলা' বা 'ছিটগ্রস্ত' লোক।

কারণ—অপ্রবুদ্ধ জীবনে দেহ-মনের কার্যকারিতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া থাকে। দৈহিক ব্যাপার দ্বারা মনও প্রভাবান্বিত হয়, মানসিক ব্যাপারও দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দেহস্থ গ্রন্থিক্রিয়ায় কোনো বৈষম্য প্রকাশ পাইলে ইহাদের স্বভাবেও এইরূপ বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। সুতরাং অর্ধোন্মাদ বা ছিট্‌গ্রস্ততাও একজাতীয় রোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—অগ্নিগ্রন্থি অর্থাৎ অন্নপরিপাকশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী গ্রন্থিগুলির, যকৃৎ প্রভৃতির ক্রিয়ায় ত্রুটি ঘটিলে মানুষের স্বভাব হয় খিট্‌খিটে। প্রজাপতিগ্রন্থি অর্থাৎ যৌনগ্রন্থির অতিক্রিয়ায় মানুষ হয় অতি ক্রোধী ও অতি কামুক। বায়ুগ্রন্থি অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের ত্রুটিতে মানুষ হয় স্বার্থপর এবং চঞ্চলস্বভাব। অহংগ্রন্থি অর্থাৎ শিবসতীগ্রন্থি প্রভৃতির ত্রুটিতে মানুষ হয় অবিবেচক এবং ক্রূরপ্রকৃতি। (এই বিষয়ে অন্যান্য বিবরণ আমাদের প্রকাশিত **"সহজ যৌগিক ব্যায়াম"** গ্রন্থের 'আকৃতি ও স্বভাবের উপর গ্রন্থিক্রিয়ার প্রভাব' নামক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।) সুতরাং মানুষের এই ছিট্‌গ্রস্ততা বা 'আধ-পাগলা' ভাবের মূলে রহিয়াছে তাহার বিভিন্ন গ্রন্থিক্রিয়ার ত্রুটি, গ্রন্থির অতিক্রিয়তা বা স্বল্পক্রিয়তা।

চিকিৎসা—এইরূপ ছিট্‌গ্রস্ত বা অর্ধোন্মাদ লোককে 'রোগী' নামে অভিহিত করিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে। হিতাকাঙ্খী আত্মীয়-স্বজন ইহাদিগকে যৌগিক আসন-মুদ্রা ও ধৌতি-বস্তিক্রিয়া অভ্যাসে উৎসাহ দিবেন। সর্দি না থাকিলে দিনে অন্ততঃ দুইবার টাববাথ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অজীর্ণ রোগারোগ্যের জন্য যে সমস্ত আসন-মুদ্রার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে উহাই রোগী প্রথমতঃ অভ্যাস করিবে। অতঃপর ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধির নিয়মানুযায়ী আসন-মুদ্রার পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের ব্যবস্থা করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—রোগী অত্যধিক আমিষভোজী না হয় এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যনীতিও যাহাতে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করিয়া চলে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের চিকিৎসা অবলম্বন করিবে। অতিরিক্ত পান, তামাক, চা বা অন্য কোনো

নেশায় রোগী আসক্ত থাকিলে সেই আসক্তি দূর করিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগীর ত্রিসন্ধ্যা, নয়ত অন্ততঃপক্ষে ২বার টাব-বাথ বা অবগাহনস্নানের ব্যবস্থা করিবে।

অর্শ রোগ

লক্ষণ—বৃহদন্ত্রের শেষাংশ অর্থাৎ মলনাড়ী (rectum) হইতে যে সমস্ত শিরা-উপশিরা বাহির হইয়া মলদ্বার ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, মলদ্বারে বায়ু ও রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইলে এই শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার সৃষ্টি করে। এই গুটিকাগুলির নাম 'বলি'। আঙুরের গুচ্ছের মতো একত্র অনেকগুলি বলি উৎপন্ন হয়। যেগুলি মলদ্বারের ভিতর উৎপন্ন হয়, সেইগুলিকে বলে 'অন্তর্বলি' ; যেগুলি বাহিরে উৎপন্ন হয়, সেগুলিকে বলে 'বহির্বলি'। এই বলিতে মলদ্বারের দূষিত রক্ত আসিয়া সঞ্চিত হয়। এইজন্যই এই বলিতে সময় সময় 'চিন্‌চিনে' জ্বালা বা 'চর্‌চরা' বেদনা বা চুলকানির সৃষ্টি হয়। এই বলি বা গুটিকা ফাটিয়া যে রক্তস্রাব হয়, উহার নামই **অর্শ**।

কারণ—যকৃৎদোষ এই রোগের প্রধান কারণ। শারীরিক পরিশ্রম-বিমুখীনতা, স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি এই রোগের আনুষঙ্গিক কারণ। যকৃৎদোষের সহিত কোষ্ঠতারল্য বিদ্যমান থাকিলে শরীরের বহু বিষ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সুযোগ পায়, এইজন্য এইরূপ রোগীর অর্শ রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না। যকৃৎদোষের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতার মিলন হইলেই অর্শ রোগ সৃষ্টি হয়। যকৃৎ কেন খারাপ হয় আমরা তাহা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি ('কামলা রোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য)। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত—কোনো একটি কারণ বা দুইটি কারণের জন্যই রোগ সৃষ্টি হয় না, অন্যান্য বহু কারণও উহার সহিত মিলিত হয়

বলিয়াই জটিল রোগ সৃষ্টির সুযোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই রোগটিও সর্বদৈহিক রোগ, ইহার প্রকাশ হয় শুধু অর্শরূপে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ২ এবং তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি, বস্তিক্রিয়া ও প্রাতঃকৃত্যাদির পর জলস্নান বিধি ১নং বা ২নং। স্নানের সময় জলে দাঁড়াইয়া বা টাবে বসিয়া অশ্বিনী মুদ্রা ২০ বার, মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, নং ২—৪ বার। বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, শয়নপশ্চিমোত্তান, পবনমুক্তাসন, অগ্নিসার ধৌতি, অশ্বিনীমুদ্রা, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৮; সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শশাঙ্গাসন। সহজ অগ্নিসার ক্রিয়া।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগটি প্রলেপাদি বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে অথবা ঔষধ সেবনে আরোগ্য না হইলে প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্যেরা অস্ত্রোপচার করিতেন। আধুনিক চিকিৎসকেরাও এই রোগের প্রবলতায় অস্ত্রোপচার করেন। বলা বাহুল্য, রোগের মূল কারণ অস্ত্রোপচারে দূর হয় না। অস্ত্রোপচারের ফলে এই রোগবিষই দেহের অন্য স্থানে অন্য ভাবে প্রকাশ পায়। আমাশয় ও পেটের অসুখ সৃষ্টি করিয়া দেহপ্রকৃতি যেরূপ অন্ত্রসঞ্চিত দূষিত মল বাহির করিয়া দেহটিকে নির্দোষ ও রোগমুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে, অর্শ রোগটিও ঠিক সেইরূপ দেহকে রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রাকৃতিক প্রচেষ্টা মাত্র। দেহপ্রকৃতি দেহের অবিশুদ্ধ রক্ত অর্শ আকারে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সুতরাং ঔষধ প্রয়োগে অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ করিবার চেষ্টা অনুচিত। উহা দ্বারা রোগকে সাময়িক ভাবে চাপা দেওয়া হয় মাত্র, অন্য কোন লাভ হয় না। উহাতে রোগারোগ্যের সহায়তা না হইয়া বরং অনিষ্ট হয়। রোগের মূল কারণ যকৃৎ দোষ ভালো হইলে অর্শ আপনা হইতেই ভালো হইবে।

অর্শের রক্তস্রাব অধিক পরিমাণে হইতে আরম্ভ হইলে ২।৩ দিন উপবাস দিবে। উপবাসের সময় ডাবের জল এবং অন্যান্য সুমিষ্ট বা ঈষদম্ল ফলের রস খাইবে এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করিবে। অর্শের অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ করিতে উপবাসই সর্বোত্তম উপায়।

দীর্ঘদিনের অর্শ রোগী ভোরে একটু আনারস, আঙুর, বেল-পানা, পেঁপে, কিস্‌মিস্‌ (খাওয়ার অন্ততঃ আধঘণ্টা আগে ভিজাইয়া রাখিতে হয়), বেদানার রস, লেবুর সরবত প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোনো পথ্য গ্রহণ করিবে না। দ্বিপ্রহরে জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত রাখার জন্য ভোরের আহার সম্বন্ধে অর্শ রোগীর বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ক্ষুধা বোধ না হইলে ভোরে ফলাহারও বর্জন করিবে। ভোরে চা পানও অর্শ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। পরিপাকশক্তি অনুযায়ী দ্বিপ্রহরের পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শাক-সব্জি একটু বেশি পরিমাণে খাইবে। ঘি, মাখন, থোড়, মোচা, কাঁচকলা, ইঁচড়ের তরকারী, ঘন দুধ ও ক্ষীরাদি এবং মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য অর্শ রোগীর খাওয়া উচিত নয়। একপোয়া, দেড়পোয়া পাতলা দুধ বা ঘোল দ্বিপ্রহরে ভাত বা রুটির সহিত গ্রহণ করিবে। পেঁপে, ওল, ডুমুর, কচু, পুঁই, পালং প্রভৃতি বিভিন্ন টাট্‌কাশাক, কচি চালকুমড়া, পটল প্রভৃতি অর্শ রোগে সুপথ্য। রোগারোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যের কঠোরতাও হ্রাস করা যাইতে পারে। অর্শ রোগী প্রত্যহ অন্ততঃ ৩ বার টাববাথ গ্রহণ করিবে এবং টাবে বসিয়া অশ্বিনীমুদ্রা ও মূলবন্ধমুদ্রা অভ্যাস করিবে।

আংশিক অক্ষমতা এবং অক্ষমতা রোগ

লক্ষণ—২/১ মিনিট সহবাস হইতে না হইতে যদি রেতঃস্খলন হয়, উহাই আংশিক অক্ষমতা রোগ। সহবাসে অসামর্থ্যই অক্ষমতা রোগ।

কারণ—আংশিক অক্ষমতা এবং অক্ষমতা রোগকে আয়ুর্বেদে বলা

হইয়াছে **ক্লৈব্য বা ক্লীবতা রোগ**। এই ক্লৈব্য রোগ সপ্তবিধ। যথা—

(১) **মানসিক ক্লৈব্য**—পুরুষের প্রথম সহবাস দিবসে অথবা দীর্ঘদিন পরে স্ত্রীর সহিত মিলনের অতিরিক্ত ভাবাবেগ বশতঃ খুব দ্রুত রেতঃস্খলন হয়। স্মরণ-মননের ফলে পূর্ব হইতেই শুক্রকোষ শুক্রে পূর্ণ থাকে বলিয়াই মিলনের প্রারম্ভে স্খলন ঘটে।

স্ত্রী যদি অনুগতা না হয়, স্ত্রীর তিক্ত-রুক্ষ ব্যবহারে স্ত্রীর উপর যদি স্বামীর মন বিরূপ থাকে, বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকে, তাহা হইলে এইরূপ স্ত্রীর সহিত সহবাস সময়ে স্বামীর হৃদয়ে যথোচিত ভাবাবেগ ও আবেগ-উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না; ইহার ফলে স্বামীর দ্রুত স্খলন হয়—ইহাও মানসিক ক্লৈব্য।

(২) **পিত্তজ ক্লৈব্য**—শরীর স্বাস্থ্যহীন হইয়া শরীরে পিত্তবিষ সৃষ্টি হইলে ঐ পিত্তবিষে জর্জরিত হইয়া শুক্রবাহী শিরা, শুক্র উৎপাদক গ্রন্থিগুলি, জননযন্ত্র পরিচালক স্নায়ুগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে; ইহার ফলে সহবাসশক্তি ক্ষীণ হয়, সহবাস সময়ে দ্রুত রেতঃস্খলন হয়।

মর্‌ফিয়া (আফিমের সারভাগ হইতে প্রস্তুত ঔষধ) ও অন্যান্য বিষাক্ত ঔষধ অত্যধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে অথবা অতিরিক্ত মদ, গাঁজা, তামাকাদি সেবন করিলে উহার বিষে যকৃৎ খারাপ হইয়া, পিত্তদোষ সৃষ্টি হইয়া আংশিক অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি করে—ইহাও পিত্তজ ক্লৈব্য।

(৩) **শুক্রনিরোধজ ক্লৈব্য**—বিবাহ না করিয়া ভরা যৌবনে যাহারা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে অথবা বিবাহের পরও দাম্পত্য ব্যবহারে উদাসীন থাকিয়া যাঁহারা দার্শনিক চিন্তায় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি মস্তিষ্কের কাজে দীর্ঘ সময় আত্মনিয়োগ করেন, কিম্বা যাঁহারা চিত্ত জয় করিয়া দীর্ঘ সময় ধ্যান-ধারণাদিতে নিযুক্ত থাকেন, সেই সমস্ত নিষ্কাম অতিরিক্ত সংযমীদেরও আংশিক অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি হয়—ইহার নামই শুক্রনিরোধজ ক্লৈব্য।

(৪) **শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্য**—প্রথম যৌবনে অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ হস্তমৈথুনাদি দ্বারা অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিলে অথবা বিবাহিত জীবনে অসংযমী হইয়া অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিলেও আংশিক অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি হয়—ইহাই শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্য।

(৫) **মেঢ্রজ ক্লৈব্য**—উপদংশাদি কুৎসিত ব্যাধির দ্বারা দেহ আক্রান্ত হইলে ঐ ব্যাধি প্রবল হইয়া আংশিক অক্ষমতা বা পুরোপুরি অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি করে—ইহার নাম মেঢ্রজ ক্লৈব্য।

(৬) **ধ্বজভঙ্গ ক্লৈব্য**—নারীসহবাসে অতি উচ্ছৃঙ্খল হইলে বীর্যবাহী শিরা ছিন্ন হইয়া ধ্বজ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের উত্থানশক্তি রহিত হয়—ইহার নাম ধ্বজভঙ্গ ক্লৈব্য।

(৭) **সহজ ক্লৈব্য**—পুরুষের পিতৃগ্রন্থি (Testes) ও মেয়েদের মাতৃগ্রন্থির (Ovary) ত্রুটি হেতু জন্মাবধি যে ক্লৈব্য জন্মে, উহাই সহজ ক্লৈব্য।

যে যে কারণে পুরুষদের আংশিক অক্ষমতা বা অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি হয়, ঠিক সেই সেই কারণে মেয়েদেরও আংশিক অক্ষমতা বা অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি হয়। হস্তমৈথুনাদি দ্বারা মেয়েরা যদি অবিবাহিত জীবনে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করে, মাতৃ-অঙ্গকে যখন তখন অস্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত ক্ষোভিত করে, অথবা বিবাহিত জীবনে যে পরিমাণ সহবাস স্বাস্থ্যকর তাহার চেয়ে যদি অতিরিক্ত সহবাসপ্রিয় হয়, তাহা হইলে মেয়েদের শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্য উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, নারীদের শুক্র এবং পুরুষদের শুক্রের আকৃতি-প্রকৃতি এক রকম নয় ; এই শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্যের প্রাথমিক লক্ষণ—সহবাস অন্তে দুর্বলতা বোধ করা, মাথাধরা প্রভৃতি। এই শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মেয়েদের প্রদরাদি রোগ সৃষ্টি করে। সক্ষম স্বামীর সহবাসে স্ত্রীর শীঘ্র বা বিলম্বে অর্থাৎ কোনো সময়েই যদি সুখদায়ক চরম তৃপ্তির (Orgasm) অনুভব না হয়—উহাই মেয়েদের ধ্বজভঙ্গ ক্লৈব্য। এইরূপ রুগ্না নারীর সন্তানাদিও হয় না।

মানসিক ক্লৈব্য ও শুক্রনিরোধজ ক্লৈব্য স্বাভাবিক দাম্পত্য ব্যবহারের অনুশীলনে আপনা হইতেই আরোগ্য হয়। যে সমস্ত রোগের ফলে 'পিত্তজ ক্লৈব্য' ও 'মেঢ্রজ ক্লৈব্য' রোগ সৃষ্টি হয়, ঐ সব রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা হইলেই ঐ রোগজ ক্লৈব্যগুলিও ভালো হইয়া যায়। 'সহজ ক্লৈব্যের' মূলে থাকে জননযন্ত্রের অসম্পূর্ণতা, সুতরাং এই ক্লৈব্যের কোনো চিকিৎসা সম্ভবপর নয়। চিকিৎসার প্রয়োজন শুধু 'শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্য' এবং 'ধ্বজভঙ্গ ক্লৈব্যে'র। যে সমস্ত যৌগিক ক্রিয়ায় শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্য অর্থাৎ আংশিক অক্ষমতা রোগ আরোগ্য হয়, উহাই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় অনুষ্ঠান করিলে 'ধ্বজভঙ্গ ক্লৈব্য' অর্থাৎ অক্ষমতা দূর হইবে।

চিকিৎসা—ভোরে ৩নং সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুযায়ী আসন-মুদ্রাদি। বস্তিক্রিয়া ও প্রাতঃকৃত্যাদির পর ১নং জলস্নানবিধির নিয়মানুযায়ী জলে দণ্ডায়মান অবস্থায় অথবা ২নং জলস্নানবিধিমত টাবে বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ও মহাবন্ধমুদ্রা অভ্যাস করিবে। অতঃপর সহজ প্রাণায়াম নং ২ এবং নং ৩ ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম। দ্বিপ্রহরের স্নানের সময় ভোরের অনুরূপ জলে দণ্ডায়মান হইয়া বা টাবে বসিয়া শক্তিচালনী মুদ্রা ও মহাবেধ মুদ্রা অভ্যাস করিবে। সন্ধ্যায় হলাসন, উষ্ট্রাসন, মূলবন্ধ মুদ্রা, মহাবন্ধমুদ্রা, সহজ প্রাণায়াম নং ৩, ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গাসন ও মৎস্যাসন, শবাসনে শক্তিচালনী এবং শীর্ষাসনে মহাবেধ।

সুদীর্ঘ ৬ মাস বা এক বৎসর ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান দ্বারা ফুসফুসকে যথেষ্ট সবল করিতে না পারিলে মহাবেধ মুদ্রার ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান হয় না। সুতরাং ক্লৈব্যরোগী ২/৩টি সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম যত্ন সহকারে প্রত্যহ অভ্যাস করিবে।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম। সপ্তাহে তিন-চার দিন আতপস্নান।

নিয়ম ও পথ্য—যতদিন শুক্রক্ষয়জ রোগ হইতে উৎপন্ন অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ বা অনিচ্ছাকৃত রেতঃস্খলন বন্ধ হইয়া ধারণাশক্তি দৃঢ় না হয়, ততদিন অবিবাহিত যুবকেরা বিবাহ করিবে না; বিবাহিত যুবকেরাও

ধারণাশক্তি দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে শয়ন করিবে না। বিশেষ নিষ্ঠার সহিত উভয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া চলিবে। যে সমস্ত কারণে কামোত্তেজনা জাগিতে পারে, তাহা যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিবে। স্বামী এই রোগে আক্রান্ত হইলে স্ত্রী স্বামীকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না; নিজের অন্তরঙ্গ সখীদের কাহারও নিকট স্বামীর এই রোগের বিবরণ প্রকাশ করিবে না। এই উপদেশ রক্ষা করিয়া না চলিলে স্বামীর মনে এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যাহার ফলে স্বামীর রোগারোগ্যের আর আশা থাকে না।

স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগও ভালো হইতে থাকে, সুতরাং সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিবে। জলস্নানবিধি যথাযথ পালন করিয়া চলিবে। প্রস্রাবের পর শীতল জল দ্বারা জননেন্দ্রিয়প্রদেশ ভালো ভাবে ধৌত করিবে। এই শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্যরোগ যখন সৃষ্টি হয়, তখন দেহের যাবতীয় গ্রন্থিগুলির, স্নায়ুগুলির ক্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা সর্বদৈহিক রোগ। এই রোগীদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগারোগ্য প্রণালী অবলম্বনে এই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগারোগ্যের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিবে।

লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্যই এই রোগে সুপথ্য। হজমশক্তির ত্রুটি না থাকিলে অথবা যকৃৎ খারাপ না থাকিলে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের খাদ্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাঁটি ঘি বা মাখন গ্রহণ করিবে এবং অর্ধসের বা একসের খাঁটি দুধও প্রত্যহ খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। সুপক্ক কলা (রাত্রে নয়, দিনে) এবং অন্যান্য ফলাদিও রোগীর পক্ষে উপকারী। প্রত্যহ টাট্‌কা শাক-সব্‌জিও অন্য খাদ্যের তুলনায় একটু বেশি মাত্রায় গ্রহণ করিবে। বিশেষভাবে মনে রাখিবে—কোনো ঔষধ, এমন কি আধুনিক যুগের গ্রন্থিজাত ঔষধেও (Gland medicine) এই রোগ নির্মূলভাবে আরোগ্য করিতে পারে না; একমাত্র যৌগিক ক্রিয়াতেই এই রোগ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়।

আমাশয়

লক্ষণ—দেহের দূষিত বায়ু এবং দূষিত পাচকরস অন্ত্রের অজীর্ণ বিকৃত খাদ্যের সহিত মিশিয়া যখন মলনাড়ীতে প্রদাহ উপস্থিত করে এবং কফমিশ্রিত মল পুনঃ পুনঃ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়, উহার নামই আমাশয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে আমাশয় রোগের নাম **প্রবাহিকা**। এই রোগে পুনঃ পুনঃ মল অধোদেশে প্রবাহিত হয় বলিয়া অথবা প্রবাহন বা কুন্থন দ্বারা পুনঃ পুনঃ মল নিঃসারণ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম প্রবাহিকা।

কারণ—ডাল আমাদের এই গরমদেশে আমিষখাদ্যের অভাব পূরণ করে। উহা মাংসের যোগ্য প্রতিনিধি; মাংসের চেয়েও পুষ্টিকর, অথচ মাংসের অপকারিতা ইহাতে নাই। কিন্তু এই ডাল যদি অসিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহাও অজীর্ণ মাংসের মতোই দেহের পক্ষে অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। অচর্বিত কাঁচা ফল এবং অন্যান্য অচর্বিত খাদ্যকণা অথবা অর্ধ-সিদ্ধ ডাল যখন অন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উদরের পঞ্চাগ্নি মিলিত হইয়াও এই খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না। এই অজীর্ণ খাদ্যকণাগুলি তরল ভেদাকারে দেহ হইতে বাহির হওয়ার সুযোগ যদি না পায়, তাহা হইলে উহা পচিয়া অন্ত্রকে বিষাক্ত করে। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলি ঐ বিষে আক্রান্ত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে। দেহের এই বিপদে দেহে অন্যান্য গ্রন্থিরসও প্রচুর পরিমাণে বৃহদন্ত্রে উপস্থিত হইয়া ঐ দূষিত মল নিষ্কাশিত করিবার কাজে পঞ্চাগ্নিরসকে প্রাণপণে সহায়তা করে। এই সমস্ত পাচকরসাদি ঐ বিষাক্ত মলের সংস্পর্শে গিয়া কফাকারে পরিণত হয়। এইজন্যই এই রোগে মল 'কাদাকাদা' ও কফাশ্রিত হয়।

আধুনিক যুগের চিকিৎসকেরা একজাতীয় রোগবীজাণুকে এই রোগের কারণরূপে নির্ধারণ করেন। এই রোগবীজাণু দূষিত জল ও মাছি প্রভৃতি দ্বারা মানবদেহে সংক্রামিত হয়। আয়ুর্বেদমতে রোগবীজাণু রোগের কারণ

নয়, গৌণ কারণ অর্থাৎ রোগবৃদ্ধির হেতু। শরীরে রোগ সৃষ্টি না হইলে উহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় না। দেহে রোগ সৃষ্টি হয় দেহস্থ ধাতুবৈষম্যের ফলে, দেহে অত্যধিক দূষিত পদার্থ সঞ্চয়ের ফলে।

চিকিৎসা—(ভোরে) ৩নং সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি; অতঃপর স্নান বা অর্ধস্নান; সহজ অগ্নিসার ৬০ বার, ভ্রমণ প্রাণায়াম। (দ্বিপ্রহরে)—স্নানের সময় সহজ অগ্নিসার ৫০ বার। (সন্ধ্যায়)—সহজ অগ্নিসার ৬০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং এবং ২নং; ভ্রমণ প্রাণায়াম। ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলস্নানবিধি এবং জলপানবিধি যথাসাধ্য অনুসরণ করিবে। এই যৌগিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ আমাশয় রোগ ২/১ দিনের মধ্যে আশ্চর্যভাবে আরোগ্য হইবে।

নিয়ম ও পথ্য—রোগীর জ্বর থাকিলে প্রথম দিনে উপবাস দিবে। উপবাসের দিনে ৫/৭ গ্লাস জল পান করিবে। জলের সঙ্গে ২/৩ বার কিছু পরিমাণ লেবুর রস বা কমলার রস মিশাইয়া দিবে। জ্বরের দ্বিতীয় দিনেও এইরূপ স-অম্বু উপবাস দিলে জ্বর দ্রুত আরোগ্য হইবে। জ্বর অন্তে তৃতীয় দিনে রোগীকে ঘোল, পাতলা বার্লি, ডাবের জল অথবা কমলা, আপেল প্রভৃতি ফল পথ্যরূপে দিবে। জ্বরমুক্তির পর রোগীর স্বাভাবিক ক্ষুধার উদ্রেক হইলে সকালে ইক্ষুগুড়সহ পোড়া বা কাঁচা বেলের পানা, দ্বিপ্রহরে কাঁচাকলা ও থানকুনি পাতার ঝোল, মুগ বা মুসুর ডালের জুস অথবা সুপক্ক কলাসহ ঘোল ও পুরাতন তেঁতুলের চাট্‌নিসহ রোগীকে ভাত পথ্য দিবে। অতঃপর রোগের প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে অন্যান্য তরিতরকারি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরশূন্য সাধারণ আমাশয় রোগেও উক্ত নিয়মে প্রথম দিন উপবাস দিয়া পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে হয়। এই উপবাস দ্রুত রোগ আরোগ্যের সহায়ক। এই রোগের স্থিতিকাল পর্যন্ত রোগীকে দুধ এবং চর্বিজাতীয় কোনো খাদ্য খাইতে দিবে না। রোগীর তরিতরকারি রন্ধনেও অতি সামান্য তৈল বা ঘি ব্যবহার করিবে।

রোগের প্রবলতার সময় আমাশয় রোগীকে পুনঃ পুনঃ বাহিরে যাইতে দেওয়া অনুচিত, তাহার জন্য বেডপ্যানের ব্যবস্থা করিবে। এই সময় রোগীর তলপেটে ঠাণ্ডা লাগাইতে নাই; তলপেটে একটা ফ্লানেল জড়াইয়া দিবে। উক্ত যৌগিক ব্যায়ামে সব রকমের নূতন বা পুরাতন আমাশয় রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

লক্ষণ—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের বাহ্যিক লক্ষণ সাধারণ সর্দির মতো, কিন্তু উহা সর্দির চেয়ে বহুগুণ যন্ত্রণাদায়ক। শুষ্ক কাশি, পিঠে বেদনা, অল্প জ্বর, মাথাধরা, মাথার যন্ত্রণা, তালুগ্রন্থির (Tonsil) কিঞ্চিৎ স্ফীতি প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ এই রোগটি বিপজ্জনক নয়, কিন্তু সময় সময় এই রোগটি বিপজ্জনক হইয়া ব্যাপক মহামারীর সৃষ্টি করে। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর অর্থাৎ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে পৃথিবীর ১০ কোটি লোক প্রাণ ত্যাগ করে। ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দেও অনুরূপ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে বহুলোকের প্রাণনাশ হয়। এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগটি জটিল হইয়া প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, ম্যানিন্‌জাইটিস রোগে পরিণত হইতে পারে।

কারণ—এই রোগটি উৎপত্তির মূল কারণ নভঃগ্রন্থির ও বায়ুগ্রন্থির দুর্বলতা—অর্থাৎ তালুগ্রন্থি (টন্‌সিল), ইন্দ্রগ্রন্থি (থাইরয়েড), ফুসফুস প্রভৃতির ক্রিয়া দুর্বল না হইলে এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না। আয়ুর্বেদমতে এই রোগটি বাত-শ্লেষ্মা জ্বরের অন্তর্গত। বায়ু দুষিত হইয়া, শ্লেষ্মার ক্রিয়া দুর্বল হইলে খাদ্যজীর্ণকারী কোষ্ঠাগ্নিও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শরীর রসস্থ হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে একজাতীয় অতিসূক্ষ্ম রোগবীজাণু দেহে সংক্রামিত হইয়া এই রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগবীজাণু দ্বারা ফুসফুস আক্রান্ত হইলে তাহাকে বলে Respiratory Influenza

(রেসপিরেটরি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা)। এই রোগবীজাণু দ্বারা অন্ত্র আক্রান্ত হইলে উহাকে বলে Gastro-Intestinal Influenza (গ্যাস্‌ট্রো-ইন্টেস্‌টাইন্যাল্‌ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা)। এই রোগবীজাণু দ্বারা স্নায়ুগুলি আক্রান্ত হইলে উহাকে বলে Nervous Influenza (নার্ভাস ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা)। Respiratory অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্র সম্পর্কিত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি ও নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করে। কখনও কখনও রোগীর নাক-মুখ দিয়া রক্ত পড়ে, রোগীর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, রোগী প্রলাপ বকে।

গ্যাসট্রো-ইন্‌টেস্‌টাইন্যাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পাকস্থলীতে, অন্ত্রে, মূত্রগ্রন্থিতে প্রদাহ উপস্থিত হয়, অন্ত্র ফুলিয়া উঠে; উদরাময় রোগ সৃষ্টি করে এবং কখনও কখনও উহা কামলা রোগোৎপত্তির কারণ হয়। নার্ভাস ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জটিল হইলে জ্বরের উত্তাপ অত্যধিক হয় এবং উহা প্রাণঘাতী Meningitis (ম্যানিন্‌জাইটিস) রোগ সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা—জ্বরাবস্থায় মধ্যে মধ্যে এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাস পরিবর্তন করিয়া দিবে, দীর্ঘ সময় এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে দিবে না। জ্বর বিরাম হইলে প্রত্যহ ভোরে সাধ্যমতো যে কোনো একটি সহজ বস্তিক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে এবং আতপস্নান গ্রহণ করিবে। সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩, নং ৭ ভোরের দিকে ১০/১২ বার এবং বৈকালে বা সন্ধ্যায় ৪/৫ বার অভ্যাস করিবে। ভ্রমণ প্রাণায়াম দুই বেলাই করিবে, অতঃপর রোগারোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে "ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি" অনুযায়ী অন্যান্য আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিবে। বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি সকালবেলা অভ্যাস করিলে এই রোগ দ্রুত আরোগ্য হইবে।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগে আক্রান্ত হইলে তিনদিন বাইরের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া শয্যায় থাকিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। রোগের প্রথম দিন উপবাস দিবে। উপবাসের দিন লেবুর রসসহ গরম জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। দ্বিতীয় দিনে নিজের রুচিমতো লঘুপথ্য গ্রহণ

করিবে। এই নিয়মে চলিলে তৃতীয় দিনে জ্বর বন্ধ হইবে এবং অন্যান্য উপসর্গ বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে।

এই রোগটির কোনো ঔষধ নাই, এই রোগে ঔষধ সেবন উচিতও নয়। এই রোগারোগ্যের জন্য 'ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট' প্রভৃতি নামে যে সব ঔষধ বিক্রয় হয়, উহাতে এই রোগ আরোগ্য হয় না এবং রোগের যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দেয়। আয়ুর্বেদাচার্যেরা বলেন—'কয়েকদিন বিশ্রাম ও পথ্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিলেই এই রোগ ভালো হয়।' **"দেয়মৌষধং নবমে অহনি"**—৮ দিন নিয়ম-সংযম পালন করিলেও যদি রোগটি ভালো না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে উহা জটিল কোনো রোগে পরিবর্তিত হইবার উপক্রম করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় রোগের লক্ষণাদি বিচার করিয়া নবম দিনে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত যৌগিক ক্রিয়ায় বিনা ঔষধেই চিরজীবনের মতো রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

আমাদের এই পুস্তকে উল্লিখিত ভ্রমণ-প্রাণায়াম যাহারা ভালোভাবে আয়ত্ত করিবে, তাহাদের কখনও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকিবে না।

উদরাময় বা অতিসার

(ডায়েরিয়া)

লক্ষণ—'আময়' অর্থ রোগ। উদরের আময়, এইজন্য ইহার নাম উদরাময় বা পেটের অসুখ। তলপেটে বেদনা, ঘন ঘন তরল দাস্ত এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ বৃহদন্ত্রে যদি অনেক দিন ধরিয়া মল সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেহপ্রকৃতি অতিরিক্ত তরল দাস্ত সৃষ্টি করিয়া এই অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। উদরের পাচক-পিত্ত, রঞ্জক-পিত্ত, পাচক-রস প্রভৃতি মিলিত

হইয়াও গ্রহণী নাড়ীতে একাধিক দিনের সঞ্চিত অর্ধজীর্ণ খাদ্যকে যখন আর জীর্ণ করিতে পারে না, তখন বায়ু কর্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া এই অজীর্ণ পাচক-রসাদি সহ অজীর্ণ খাদ্য তরলাকারে অতিমাত্রায় নিঃসারিত হয় বলিয়া আয়ুর্বেদে ইহার আর এক নাম **অতিসার**।

কারণ—বিষম ভোজন (গুরুভোজন বা অপরিমিত আহার), বিরুদ্ধ ভোজন (মাছ, মাংস ও ডিম এবং ঘি, মাখন ও মিষ্টি-মিঠাই প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ), অসময়ে ভোজন, দ্রুতভোজন (ভালোভাবে চর্বণ না করিয়া গলাধঃকরণ), অধ্যশন (পূর্বের আহার ভালো জীর্ণ না হইতেই পুনরায় ভোজন), মনঃপীড়া বা শোকার্ত মন লইয়া ভোজন অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু কৃমিদোষ প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা—আমাশয় রোগের অনুরূপ।

নিয়ম ও পথ্য—আয়ুর্বেদমতে এই উদরাময় বা অতিসার রোগ ৮/৯ রকম। ত্রিদোষযুক্ত অতিসার রোগ রোগীকে খুব কষ্ট দেয়, সহজে ইহা আরোগ্য হইতে চায় না। পিত্তাধিক্যের ফলে এই রোগ সৃষ্টি হইলে মলের রং সবুজ বা পীতবর্ণ হয়। পিত্ত নিঃসরণ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হইলে মলের রং কাদামাটির মতন হয়। শ্লেষ্মাধিক্যের ফলে মল সাদা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। বায়ুপ্রকোপের ফলে মল অরুণবর্ণ ও ফেনাযুক্ত হয় এবং অতি অল্প পরিমাণে মল মুহুর্মুহু নির্গত হয়।

এই রোগে প্রথমদিন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে। যদি মলে পিত্তাধিক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উপবাসের সময় লেবুর রস সহ প্রচুর জল পান করিবে। যদি মলে শ্লেষ্মাদোষ বা বায়ুদোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উপবাসের সময় জলের সহিত লেবুর রসের পরিবর্তে অল্প পরিমাণে চুনের জল বা খাওয়ার সোডা মিশাইয়া ঐ জল পান করিবে। রোগের দ্বিতীয় দিনে টক বা মিষ্টি ফল অথবা ডাবের জল, বার্লি, শটিফুড, ছানার জল প্রভৃতি পথ্যের ভিতর হইতে রোগীর রুচিমতো পথ্য নির্বাচন করিবে। রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্যের পরও কয়েক

দিন খাদ্য বিষয়ে সাবধান থাকিবে। চর্বিজাতীয় খাদ্য, মসল্লাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য ও শাক বর্জন করিবে।

এই রোগে ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদেও সতর্কবাণী আছে—'**ন চ সংগ্রাহকং দদ্যাৎ পূর্বমামাতিসারিণে। অকালে সংগ্রহীতস্তু বিকারান্ কুরুতে বহূন্**'॥—অতিসার রোগ প্রকাশ পাইলেই ধারক ঔষধ সেবন করিবে না ; ধারক ঔষধের সাহায্যে এই রোগ বন্ধ করিলে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়—দেহের দূষিত পদার্থ নিঃসারিত হইতে বাধা পাইয়া অন্য জটিল মারাত্মক রোগাকারে উহা প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত যৌগিক ক্রিয়াগুলিতে তিনদিনের মাঝেই এই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

উন্মাদ রোগ

লক্ষণ—দেহাধীশ বুদ্ধির এবং তাহার প্রধান কর্মচারী মনের রাজধানী বা কর্মকেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত। এই মস্তিষ্কে অবস্থিত আজ্ঞাবাহী নাড়ীগুলি বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত মনের আদেশ-নির্দেশ সমগ্র দেহরাজ্যে বিজ্ঞাপিত করে। মস্তিষ্কে অবস্থিত গ্রন্থিগুলি মনের ভাব ও চিন্তা প্রকাশের বাহন বা যন্ত্রস্বরূপ। যে গ্রন্থি ও স্নায়ুগুলি বুদ্ধি ও মনের সংযোগসূত্র রক্ষা করে সেইগুলির কার্যকারিতায় যদি কোনো কারণে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির সহিত মনের সংযোগসূত্র নষ্ট হইয়া যায় ; মানুষের জীবন-বীণার তার ছিন্ন হইয়া যায়। জীবন-দেবতা তখন আর এই জীবন-বীণার ছিন্ন তারে জীবন-সুরের ঝঙ্কার তুলিতে পারেন না। মনের উপর বুদ্ধির আর তখন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। দেহরূপ রাষ্ট্রনৌকা তখন কাণ্ডারী বিহীন হইয়া বিপথে চলিতে আরম্ভ করে।

রাত্রিকালে আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন মনের উপর বুদ্ধির কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এইজন্য স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই মনে হয়।

বুদ্ধির কার্যকারিতা শুরু হইলে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্নে দেবতা বা প্রিয়জনের কথা মনে হইলে আমরা তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া খুশি হই। স্বপ্নে ভূত, প্রেত বা বাঘ দেখিয়া আমরা ভয় পাই। স্বপ্নে শত্রুর কথা মনে হইলে শত্রুদর্শনে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি। এইজন্যই স্বপ্নদর্শন কখনো আমাদের মনে আনন্দের, কখনো বিষাদের, কখনো ভয়ের, কখনো বা ক্রোধের উদ্রেক করে। পাগলও এইরূপ বুদ্ধিনিয়ন্ত্রণ মুক্ত মনোজগতে অর্থাৎ স্বপ্নরাজ্যে থাকিয়া কল্পনা অনুযায়ী যাহা খুশি তাহা দর্শন করে এবং উহার জন্য আপনমনে হাসে, কাঁদে, গান করে, অকারণে অন্যকে গালাগালি দেয়, কল্পনার শত্রুকে খুন করিতে উদ্যত হয়—উন্মাদ রোগের ইহাই সাধারণ লক্ষণ।

কারণ—পাগল হওয়ার কারণ অসংখ্য। এই সমস্ত কারণ অবলম্বনে একখানা পৃথক গ্রন্থই রচনা করা যায়। আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রধান প্রধান কয়েকটি শারীরিক ও মানসিক কারণের কথাই শুধু উল্লেখ করিব।

পিতা-মাতার মধ্যে যে কোনো একজন যদি কামক্রোধপরায়ণ ও অস্থিরচিত্ত হন এবং অপরজন যদি স্বাস্থ্যহীন হন, তাহা হইলে এই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে কাহারো কাহারো উন্মাদ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। উন্মাদ রোগ প্রকাশের অনুকূল দেহ লইয়াই ইহারা জন্মগ্রহণ করে।

তামাক, বিড়ি, সিগারেট, নস্য, গাঁজা প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করিলে উহার 'নিকোটিন' বিষ দেহে সঞ্চিত হইয়া, দেহের স্নায়ুগুলিকে, মস্তিষ্কের স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলিকে আক্রমণ করে। দেহের জীবনীশক্তি এই আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হইলে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়া মস্তিষ্কবিকৃতি রোগ অর্থাৎ উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়।

অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধতা এবং পিত্তদোষও উন্মাদ রোগের একটি প্রধান কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতায় দূষিত মল অন্ত্র মধ্যে থাকিয়া শরীরে যে বিষ

উৎপন্ন করে, ঐ বিষে জর্জরিত হইয়া শরীরের স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। এই বিষের সহিত পিত্তবিষের সংমিশ্রণ ঘটিলেই মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়া উন্মাদ রোগ উৎপন্ন করে।

অত্যধিক কামচিন্তায়, কামাবেগে শরীরে রক্তের চাপের সমতা থাকে না। অত্যধিক কামোত্তেজনার ফলে রক্ত প্রবল বেগে মস্তিষ্কে উঠিয়া গেলে ঐ রক্তের চাপে যদি মস্তিষ্কের শিরা-তন্তু বা গ্রন্থিকোষ ছিন্ন হইয়া জট পাকাইয়া যায়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক আর স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে না, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিপর্যয় উপস্থিত হইয়া উন্মাদ রোগ সৃষ্টি করে।

মেয়েদের দীর্ঘস্থায়ী ঋতুবন্ধ রোগের ফলেও উন্মাদ রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। যে সমস্ত মেয়ে অত্যধিক পান খায়, তাহারাও মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। খয়ের ও চুনের বিষে দেহের সমুদয় স্নায়ু ও গ্রন্থি বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, শুধু পান অপকারী নয়। পানের সহিত খয়ের, চুন, জরদা, দোক্তা, কিমাম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য যুক্ত হয় বলিয়াই উহার অতিরিক্ত সেবনে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে।

যে কোনো বিষয়ে মাত্রাধিক্যই উন্মাদ রোগের কারণ হইতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্যের অতিমাত্রায় অভাব, অধিক রাত্রি জাগিয়া প্রত্যহ অধ্যয়ন, সাংসারিক বিষয় লইয়া অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা, হঠাৎ অত্যধিক শোক, আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ, অত্যধিক রোগযন্ত্রণা প্রভৃতি বহু কারণেই উন্মাদ রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। বলা বাহুল্য, পূর্ব হইতেই শরীর দোষযুক্ত না থাকিলে শুধু এইসব কারণেই উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং এইসব কারণ মুখ্য নয়, গৌণ। আয়ুর্বেদের ভাষায় দেহ দোষযুক্ত হওয়া, দেহে ত্রিদোষ প্রবল হওয়াই এই রোগের মূল কারণ।

এই ত্রিদোষের মাঝেও অন্য দোষগুলির চেয়ে বায়ুদোষ যদি অধিকতর প্রবল হয়, তাহা হইলে ঐ বায়ুদোষ বুদ্ধি ও স্মৃতির সহিত যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া কল্পনাপ্রিয় মনকে স্বপ্নরাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং বাতোন্মাদ রোগ সৃষ্টি করে। এই বাতোন্মাদ রোগী আপন মনে নাচে, গায়, আকাশের

দিকে তাকাইয়া আপনমনে বিড়বিড় করে, নানারকম অঙ্গবিক্ষেপ করে বা রোদন করে। অনুরূপভাবে পিত্তদোষ অত্যুগ্র হইয়া **পিত্তোন্মাদ** রোগ সৃষ্টি করে। পিত্তোন্মাদ রোগী যখন-তখন বিবস্ত্র হয়, অতি অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হইয়া অপরকে গালাগালি দেয় বা প্রহার করিতে উদ্যত হয়। এই পিত্তোন্মাদ রোগই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বদ্ধোন্মাদ রোগ বা বিপজ্জনক পাগলামীতে পরিণত হয়। ত্রিদোষের মধ্যে কফদোষ অধিকতর প্রবল হইয়া **কফোন্মাদ** রোগ সৃষ্টি করে। কফোন্মাদ রোগী নিরিবিলি থাকিতে ভালোবাসে। রোগী পুরুষ হইলে মেয়েদের সান্নিধ্য পছন্দ করে, পুরুষের সংশ্রব এড়াইয়া চলিতে চায়। রোগী মেয়ে হইলে তাহার মাঝেও এইরূপ শ্রেণীবিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং বিপরীত শ্রেণীর অর্থাৎ পুরুষের সান্নিধ্যে তাহাদের মন শান্ত থাকে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রবল অবস্থায় অর্থাৎ বদ্ধোন্মাদ রোগে জল-চিকিৎসা ছাড়া অন্য চিকিৎসা অচল। বদ্ধোন্মাদ রোগীকে উন্মাদ হাসপাতালে এক সপ্তাহ বা তদূর্ধ্ব সময় জলের মাঝে নাক ও মুখ ছাড়া অন্যান্য সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এইজন্য ৬/৭ ফুট লম্বা মৎস্যাকার এক জাতীয় জলাধার তৈয়ারি করা হয় ; এই জলাধারের মাঝে পাগলের মস্তক ছাড়া অন্যান্য সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া দিয়া পাগলকে আটকাইয়া রাখিতে হয়। বদ্ধ পাগলকে সাধারণ পাগলের পর্যায়ে উন্নীত করিতে এই উপায় ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কাহার ব্যবহার সহৃদয়তাপূর্ণ, কাহার ব্যবহার নির্মম—এ বিষয়ে অবোধ শিশুর মতো পাগলেরও অনুভবশক্তি খানিকটা সচেতন। প্রায়ই দেখা যায়, সহৃদয় ব্যক্তির আদেশ-নির্দেশ, অনুরোধ পাগলেরা প্রায়ই অমান্য করে না। এইরূপ সহৃদয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পাগলের যত্ন নিলে এবং পাগলকে নেশার আসক্তি হইতে বিরত করিয়া তাহাকে দিয়া অল্প-অল্প যোগক্রিয়া অভ্যাস এবং তিনবেলা দীর্ঘসময় ধরিয়া ভালোভাবে স্নান করাইতে পারিলে অধিকাংশ সাধারণ পাগলই আরোগ্য লাভ করিবে। আমরা ২/১টি পাগলের সহিত মিশিয়া এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সুফল

পাইয়াছি। খেলাচ্ছলে উহাদের দ্বারাও যোগক্রিয়া অভ্যাস করানো যায়। পাগল যতদিন যোগক্রিয়া অভ্যাসের উপযুক্ত না হয়, ততদিন ১নং সহজ বস্তিক্রিয়ায় যে ভাবে জলপানের বিধি আছে সেই ভাবে রোগীকে প্রত্যহ ভোরে এক সের গরম জলে এক ছটাক* লেবুর রস ও দুই তোলা নুন মিশাইয়া পান করাইবে। দুইবেলাই রোগীকে মাত্র ২/১ মিনিট সহজ শীর্ষাসন অভ্যাস করাইবে। এইসঙ্গে নিম্নোক্ত 'নিয়ম-পথ্যবিধি' পালন করিলে পাগলের মনও অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া যোগক্রিয়া অভ্যাসের উপযোগী হইবে। অতঃপর কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পাগলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামের বিভিন্ন বিভাগ হইতে রোগীর অভ্যাস উপযোগী কয়েকটি বাছিয়া লইয়া উহা রোগীকে অভ্যাস করাইবে। রোগীকে সকালে-বিকালে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইবে এবং খেলাচ্ছলে কিছু সময় ভ্রমণ-প্রাণায়ামও অভ্যাস করাইবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে সঙ্গে থাকিয়া রোগীকে বিপরীতকরণী, সর্বাঙ্গাসন এবং বমন ধৌতি অভ্যাস করাইতে পারিলে এবং তিনবেলা দীর্ঘ সময় ব্যাপী স্নান করাইলে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। রোগারোগ্যের পরও অন্ততঃ ৬ মাস বা এক বছর উন্মাদরোগীর অম্লরোগ বা কামলারোগের চিকিৎসা প্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

নিয়ম ও পথ্য—পাগলের দেহের রক্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত অম্লধর্মী হয়, এইজন্য উহাদের সর্দি হয় না। দেহসঞ্চিত দূষিত অম্ল, দূষিত পিত্তের প্রভাবে পাগলের পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক সর্বদা গরম থাকে। মস্তিষ্কের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় যতক্ষণ না নামে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর শীত-শীত বোধ না হয়, ততক্ষণ রোগীকে প্রত্যহ স্নান করাইবে। মাথা গরম হইলে রোগী উত্তেজিত হয় এবং প্রলাপ বকিতে থাকে। রোগীর যখনই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে, তখনই তাহার মাথায় জল ঢালিয়া রোগীকে শীতল করিবার ব্যবস্থা করিবে। যতক্ষণ মাথা শীতল না হয়, প্রলাপ না

---

* ১ ছটাক = ৫ তোলা = $^{১}/_{১৬}$ সের

থামে, অস্থিরতা না কমে, ততক্ষণ দ্বিধাহীন চিত্তে রোগীর মাথায় শীতল জলের ধারা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ জলধারা প্রয়োগের অব্যবহিত পরে আবার যদি মাথা গরম হইয়া উঠে, তাহা হইলে মাথা পুনরায় ধোওয়াইয়া উহার উপরে একখানা ভিজা তোয়ালে বা গামছা রাখিয়া দিবে। রোগী নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত মস্তিষ্কের তাপ সাম্য রাখার জন্য পুনঃ পুনঃ রোগীর মাথা ধোওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

দেহসঞ্চিত অম্লবিষ, পিত্তবিষ প্রভৃতি রক্তের সহিত মস্তিষ্কে উঠিয়া রোগীর এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা দোষ দূর করিয়া দিতে পারিলে এই বিষ বহু পরিমাণে মলের সহিত বাহির হইয়া যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়; সুতরাং উন্মাদরোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলেই মাথা গরম হইয়া রোগীর উন্মাদ অবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ভোর হইতে রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর রোগীকে একগ্লাস জল পান করাইবে। এই জলের সহিত কখনো লেবুর রস, কখনো বা কমলার রস মিশাইয়া দিবে। প্রত্যহ ২/১ চামচ মধুও (একবার মাত্র) রোগীকে জলের সহিত সেবন করাইবে। জলের পরিবর্তে রোগীকে সময় সময় ডাবের জলও দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ জলপান রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা আরোগ্যের পক্ষেও সহায়ক এবং ইহার ফলে প্রস্রাবের মাত্রাও একটু বর্ধিত হইয়া প্রস্রাবের সহিত বহু রোগবিষ বাহির হইয়া যাইবে।

উন্মাদরোগীর পক্ষে শাক-সব্জী, দুধ, ঘোল এবং ঋতুভেদে বিভিন্ন ফলাদি সুপথ্য। উন্মাদরোগীর পরিপাকযন্ত্রে কিছু না কিছু ত্রুটি থাকেই; সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রোগীর জন্য লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। আমিষ খাদ্য কোষ্ঠবদ্ধতাকারক এবং উহা অম্লধর্মী খাদ্য। পাগলের দেহে স্বভাবতঃই অম্লাধিক্য ও পিত্তাধিক্য বিদ্যমান থাকে; এইজন্য আমিষ খাদ্য পাগলের পক্ষে অপকারী। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ দূর হইলে এবং হজমশক্তি স্বাভাবিক হইলে দ্বিপ্রহরে রোগীকে নিরামিষ

তরকারী ও শাক-সব্জী দেওয়া যাইতে পারে। রাত্রে অল্প পরিমাণে রুটি (অথবা ভাত), তরকারী এবং দেড় পোয়া বা আধসের দুধ রোগীর পথ্যরূপে নির্বাচন করিবে। বলা বাহুল্য, দুধের পরিবর্তে গুঁড়া দুধ (Powder milk বা ঐ জাতীয় খাদ্য) পাগল রোগীকে কখনও দিবে না। গুঁড়া দুধ টাট্‌কা দুধের মত উপকারী নয়, উহা অপকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধতাকারক। দুধ সংগ্রহে অসমর্থ হইলে রোগীকে নারিকেলের দুধ বা চীনাবাদামের দুধ দিবে। নারিকেল পিষিয়া চিপিলেই দুধ বাহির হইবে। নারিকেল ও চীনাবাদাম পিষিয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইলে সহজেই দুধ তৈয়ারি হয়। প্রত্যহ আধখানা নারিকেল অথবা খোসাশূন্য একছটাক চীনাবাদাম রোগীর দুধের অভাব বহুলাংশে পূরণ করিবে।

উন্মাদরোগীকে মারধোর করা, তাহার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করা অত্যন্ত অন্যায়। মাথা গরম হইলেই রোগী অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয় এবং অস্বাভাবিক আচরণ করে ; সুতরাং জলধারার সাহায্যে রোগীর মস্তিষ্ক সর্বদা শীতল রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। মাথা গরম না থাকিলেও তিনবেলাই রোগীকে দীর্ঘসময়ব্যাপী স্নান করাইবে। পেটে গ্যাস হইলেই রোগীর মাথা গরম হয়, সুতরাং পেটে যাহাতে গ্যাস না হয়, সেইভাবে পথ্যের পরিমাণ নির্ধারিত করিবে।

উপদংশ (সিফিলিস্)

লক্ষণ—এই রোগবিষ দেহে উৎপন্ন হইয়া বা অন্য দেহ হইতে **সংক্রামিত** হইয়া রোগীর অঙ্গে ক্ষতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণতঃ জননেন্দ্রিয়েই প্রথমে এই ক্ষত উৎপন্ন হয়। প্রথমে একটি মটরদানার মতো গোলাকার 'ফুস্কুড়ি' হয়। ফুস্কুড়িটির চারিপাশ বেশ শক্ত থাকে। ফুস্কুড়িটি বর্ধিত হইয়াই ক্ষত উৎপন্ন করে। এই ক্ষতে কোনো বেদনা থাকে না বা পুঁজোৎপত্তি হয় না। এই ক্ষত প্রকাশ পাইবার পর

উরুসন্ধিতে অর্থাৎ কুঁচকিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বাঘি' উৎপন্ন হয়। এই বাঘিগুলিতেও পুঁজোৎপত্তি হয় না। একমাস দেড়মাসের মধ্যে এই ক্ষত শুকাইয়া যায় এবং বাঘিগুলিও বসিয়া যায়। কোনো রোগীর দেহে প্রথম হইতেই সপুঁজ ক্ষত ও বাঘি উৎপন্ন হয়। এইরূপ রোগীর সংখ্যা খুব কম। এইরূপ সপুঁজ ক্ষত ও বাঘির তুলনায় শুষ্ক ক্ষত ও বাঘি অধিকতর অনিষ্টকারী। এই লক্ষণগুলি রোগের প্রথম পর্যায়।

এই ক্ষত ও বাঘি শুকাইয়া যাওয়ার দেড়মাস বা দুইমাস পরে শরীরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বাহির হয়।—ইহাই রোগের দ্বিতীয় পর্যায়। দেহস্থ বায়ু অত্যধিক দূষিত হইলে এই স্ফোটকগুলি হয় কৃষ্ণবর্ণ। আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে ইহার নাম **বাতিকোপদংশ**। এই বাতিকোপদংশে সুচিবেধবৎ যন্ত্রণা এবং 'দপ্‌দপানি' বিদ্যমান থাকে। স্ফোটকগুলি পীতবর্ণ এবং ক্লেদ ও দাহযুক্ত হইলে উহা **পৈত্তিকোপদংশ**। শরীরের রক্ত অতিশয় দূষিত হইয়া তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন করে, ইহাই **রক্তজোপদংশ**। **কফজোপদংশ** ঘনস্রাবযুক্ত এবং কুণ্ডবিশিষ্ট অর্থাৎ খুব চুলকায়। বায়ু-পিত্ত-কফ এই ত্রিধাতু অত্যধিক দূষিত থাকিলে **ত্রিদোষজ উপদংশ** সৃষ্টি হয়। এই ত্রিদোষজ উপদংশে সবরকম উপদংশের লক্ষণই যুক্ত থাকে। ত্রিদোষজ উপদংশ অতিশয় দুরারোগ্য।

কারণ—"অধাবনাৎ অত্যুপসেবনাদ্বা যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশাঃ"—যে সমস্ত নারী ও পুরুষ প্রত্যহ জননেন্দ্রিয় পরিষ্কার করে না, যাহারা অত্যধিক সহবাস করে অথবা দুষ্টযোনি অর্থাৎ রোগাক্রান্ত যোনি উপভোগ করে তাহারাই উপদংশ রোগে আক্রান্ত হয়।

অত্যধিক সহবাসের ফলে দেহের রক্ত নিঃসার হইয়া কিংবা দেহে ত্রিদোষ সৃষ্টি হইয়া অথবা রক্ত বিকৃত হইয়া এই রোগবিষ বা রোগবীজাণু আপনা হইতেই দেহে সৃষ্টি হইতে পারে। প্রত্যহ বহুপুরুষ সহবাসের ফলে পতিতা মেয়েদের দেহেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এই রোগাক্রান্ত নারীর সহবাসে পুরুষদেহে এবং এই রোগাক্রান্ত পুরুষদেহের

সহবাসে নির্দোষ নারীদেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়। বলা বাহুল্য, দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতার প্রধান স্থান পতিতালয়গুলিই এই জঘন্য রোগোৎপত্তির এবং রোগ সংক্রমণের প্রধান কেন্দ্র; সভ্যসমাজের বিষাক্ত ব্রণস্বরূপ, মানবতার কলঙ্কস্বরূপ এই পতিতালয়গুলি যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন এই কদর্য ব্যাধির বিস্তৃতিও রোধ করা সম্ভব হইবে না। এই সব রোগীর গামছা-তোয়ালে ব্যবহার করার ফলে অথবা এইসব রোগীর ক্ষতস্পর্শের ফলে নির্দোষ লোকেরও এই সব রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। তবে এই উপায়ে রোগসংক্রমণ কদাচিৎ ঘটে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি, টাববাথ ৫ মিনিট, টাবে বসিয়া অগ্নিসার ধৌতি ১নং ১০ বার, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার; বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি ; সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩, নং ৮, উড্ডীয়ানবন্ধ। (দ্বিপ্রহরে)—টাববাথ ১৫ মিনিট, টাবে বসিয়া ভোরের অনুরূপ মুদ্রাদি। (সন্ধ্যায়)—সহজ প্রাণায়াম নং ৭, নং ৯, নং ১০, শয়নপশ্চিমোত্তান, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শীর্ষাসন, অগ্নিসার ধৌতি, ভ্রমণ-প্রাণায়াম। নূতন রোগীর দ্বিপ্রহরে কিছু সময় জননেন্দ্রিয়ে রোদ লাগাইবার ব্যবস্থা করিবে।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, উপবাসবিধি এবং জলপানবিধি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—ত্রিফলার কাথ দ্বারা অথবা আধুনিক যুগের পচন-নিবারক (Antiseptic) কোনো ঔষধ বা সাবান দ্বারা প্রত্যহ ক্ষতগুলি ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবে। ক্ষতগুলিতে মলম স্বরূপ ত্রিফলাভস্ম বা পারদ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষতের স্রাব কখনও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না।

চা, সিগারেট, তামাক, মদ প্রভৃতি কোনো মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করিবে না। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দধি, ঘোল এবং দুগ্ধজাত মিষ্ট-দ্রব্যাদি ভোজন করিবে না। দিনে ঘৃতপক্ক নিরামিষ আহার এবং রাত্রে কিছু ফল-মূল বা

রুটি-তরকারী গ্রহণ করিবে। রাত্রের ভোজন যেন খুব লঘু হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। প্রত্যেক একাদশী তিথিতে উপবাস দিবে। উপবাসের দিনে লেবুর রসসহ প্রচুর পরিমাণে জল পান করিবে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রে কিছুই খাইবে না অর্থাৎ নিশিপালন করিবে। দেহের ক্ষতাদি আরোগ্য হইলে দুগ্ধাদি পথ্য গ্রহণে কোনো বাধা নাই।

এই রোগ আরোগ্যের পরও পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং রোগারোগ্যের পরও দুই বৎসর অপেক্ষা না করিয়া সহবাস বা বিবাহাদি করিবে না। সর্ববিধ স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিবে। সক্ষম হইলে একাদিক্রমে তিন দিন উপবাস দিবে—ইহার ফলে দেহের রোগবীজাণু সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া দেহ চিরতরে রোগমুক্ত হইবে।

ঋতুরোগ

স্বল্পরজঃ, অতিরজঃ, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি স্ত্রীব্যাধিকে এক কথায় বলা হয় ঋতুরোগ।

লক্ষণ—নারীদেহ সন্তানধারণের উপযুক্ত হইলে নারী দেহে ঋতুর প্রকাশ হয়, আবার সন্তানধারণের ক্ষমতা যখন লোপ পায়, তখন স্থায়ী ভাবে ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ১২ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে এবং শীতপ্রধান দেশে ১৪ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে সুস্থ-সবল মেয়েদের দেহে প্রথম ঋতুর প্রকাশ হয়। প্রতি চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ২৮ দিন অন্তর ঋতুর প্রকাশই স্বাভাবিক নিয়ম। শারীরিক নানা ত্রুটির জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কাহারো দেহে ২৯/৩০ দিন অন্তর, কাহারো বা ২৬/২৭ দিন অন্তর ঋতু প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ৫০ বৎসর বয়সে মেয়েদের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। শরীরের সবলতা ও দুর্বলতা, শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতার তারতম্য অনুযায়ী ৪৫ বৎসরে বা ৫৫ বৎসরেও ঋতু বন্ধ হইতে দেখা যায়।

প্রতি মাসেই ঋতুস্নাতা নারীর জরায়ু ভ্রূণের বাসস্থানের জন্য স্বীয় অঙ্গের ঝিল্লীর (পাতলা চামড়া) সাহায্যে ভ্রূণের বাসোপযোগী প্রাথমিক গৃহ নির্মাণ করে। ভ্রূণের দেহ গঠনের জন্য কিছু অতিরিক্ত রক্তও জরায়ুপ্রদেশে আসিয়া সঞ্চিত হয়। ভ্রূণ উৎপন্ন না হইলে অসহনীয় দুঃখে অভিমানে ক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রূণের এই গৃহ জরায়ুমাতা ধ্বংস করিয়া দেয়। এইজন্যেই কবিত্বের ভাষায় বলা হয়—'ভ্রূণের অভাবে জরায়ুর ক্রন্দনের নামই ঋতু'—সন্তানলাভবঞ্চিতা জরায়ুমাতার দরবিগলিত অশ্রুধারাই ঋতুস্রাব। ভ্রূণদেহ গঠনের জন্য জরায়ুপ্রদেশে যে রক্ত সঞ্চিত হয়, ভ্রূণ গঠিত না হইলে ঐ রক্তও শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং ঐ অপ্রয়োজনীয় রক্ত অনাগত ভ্রূণের ভগ্নগৃহের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উপাদান সঙ্গে করিয়া ঋতুস্রাবরূপে বাহির হইয়া যায়।

সাধারণতঃ তিন দিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যেই জরায়ুর শোকাশ্রু নিবারিত হয়, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়। ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে অভিমানিনী জরায়ুমাতা দুঃখ-অভিমান ত্যাগ করিয়া আবার নবোৎসাহে ভাবী ভ্রূণের জন্য, ভাবী সন্তানের জন্য গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করে। যতদিন গৃহে ভ্রূণের আগমন না হয়, ততদিন মাসিক ঋতুরও বিরাম হয় না, সন্তান-পাগলিনী জরায়ুমাতার শোকাশ্রু বেগেরও পরিসমাপ্তি ঘটে না।

যৌবনে সন্তানসম্ভাবিতা না হওয়া সত্ত্বেও ঋতু বন্ধ হইলে উহাকে বলে **ঋতুরোধ রোগ বা নষ্ট ঋতু**। প্রত্যেক মাসিক ঋতুতে সর্বসুদ্ধ এক পোয়া রক্ত নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক স্রাবের চেয়ে স্রাব কম হইলে উহাকে বলে **অল্পরজঃ রোগ**। স্রাব এক পোয়ার অতিরিক্ত হইলে উহাকে বলে **অতিরজঃ রোগ**। কখনো নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, কখনো নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ঋতুর আবির্ভাব হয়। এইরূপ বিশৃঙ্খলভাবে ঋতুর আবির্ভাবকে বলে **অনিয়মিত ঋতুরোগ**। আবার কখনও দুই সপ্তাহের মধ্যেও ঋতু বন্ধ হয় না, বন্ধ হইলেও ২/৪ দিন পর আবার ঋতুর প্রকাশ হয়। কখনো কখনো ২/৩ মাস ঋতু বন্ধ থাকিয়া আবার ঋতু প্রকাশ পায়। ঋতুর এইরূপ বিশৃঙ্খলাকেও অনিয়মিত ঋতুরোগ বলে।

কারণ—যোগশাস্ত্রের ভাষায় নভঃগ্রন্থি, বরুণগ্রন্থি অর্থাৎ ইন্দ্রগ্রন্থি (থাইরয়েড), মাতৃগ্রন্থি (ওভারী), রতিগ্রন্থি (বার্থোলিন্স্ গ্ল্যাণ্ড) প্রভৃতি দুর্বল হইলেই ঋতুরোগ উপস্থিত হয়। দেহে প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ রক্তের অভাব হইলেই এই গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ রক্ত হইতেই গ্রন্থিগুলি স্বীয় খাদ্য আহরণ করে। রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য আহরণ করিতে পারিলে গ্রন্থিগুলিও প্রয়োজনীয় অন্তর্মুখী রস সৃষ্টি করিয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া দিতে পারে। গ্রন্থির এই অন্তর্মুখী রসই দেহকে সবল-সুস্থ রাখিতে, রোগাক্রমণের হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিতে বিশেষভাবেই সাহায্য করে।

প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অম্ল ও অজীর্ণ রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ, যকৃৎ রোগ, দীর্ঘদিনের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে শরীরে প্রয়োজনীয় সুস্থ রক্তের অভাব ঘটে, শরীরের রক্ত দূষিত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এইরূপ দূষিত ও নিস্তেজ রক্ত হইতে গ্রন্থিগুলি আর প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এইরূপ রুগ্ন নারীর দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাবেই ভ্রূণদেহ গঠনোপযোগী প্রয়োজনীয় রক্ত জরায়ুতে আসিয়া সঞ্চিত হইতে পারে না। দুর্বল মাতৃগ্রন্থি স্বীয় অন্তর্মুখী রস হইতে ভ্রূণদেহ গঠনোপযোগী উপাদান (Corpus Luteum) প্রস্তুত করিয়া ঐ সঞ্চিত রক্তের সহিত মিশাইয়া দিতে পারে না, রক্তক্ষীণ নারীদেহ ভাবী ভ্রূণের জন্য এক পোয়া রক্তও জরায়ুতে পাঠাইতে পারে না, অতি অল্প পরিমাণ রক্ত আসিয়া জরায়ুতে সঞ্চিত হয়—এইজন্যই ঋতুর প্রকাশ রুদ্ধ হইয়া **ঋতুরোধ রোগ** সৃষ্টি করে। এই অল্প রক্তও ঋতুর সময় শরীর হইতে বাহির হইতে না পারিয়া শরীরকে আরও দূষিত ও রুগ্ন করিতে থাকে।

রক্তহীন কৃশ মেয়েরা যেমন এই ঋতুবন্ধ রোগে আক্রান্ত হয়, তেমনি অত্যধিক মোটা হইয়া পড়িলেও মেয়েরা এই ঋতুবন্ধ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। অস্বাভাবিক মোটা হওয়াও রুগ্ন দেহের পরিচায়ক ('মেদবৃদ্ধি রোগ' দ্রষ্টব্য)।

ঋতুরোগ, অনিয়মিত ঋতু, স্বল্পরজঃ, অতিরজঃ প্রভৃতি সমুদয় ঋতুরোগের মূল কারণ একই—শরীরে প্রয়োজনীয় সুস্থ রক্তের স্বল্পতা এবং তাহার ফলে শরীরে একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ সৃষ্টি। শরীরে অত্যধিক দোষ সৃষ্টি হইলে দেহপ্রকৃতি অতিরজঃ রোগ সৃষ্টি করিয়া দেহ হইতে বহু বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাববাথ ৫ মিনিট। টাবে বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, মহাবন্ধ ২০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৫, নং ৮।

দ্বিপ্রহরে—অবগাহন স্নান বা টাববাথ। ১০ মিনিট টাবে বসিয়া অথবা নদী বা পুকুরের শীতল জলে দাঁড়াইয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ১০ বার, মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, শক্তিচালনী মুদ্রা ৪ বার।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গাসন ও মৎস্যাসন, শয়ন-পশ্চিমোত্তান বা পশ্চিমোত্তান; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৫, নং ৭ ; শক্তিচালনী মুদ্রা, শীর্ষাসন বা শশাঙ্গাসন। অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি ও জলপানবিধি পালন করিবে। সহ্য হইলে তিন বেলাই স্নান করিবে। মাঝে মাঝে আতপস্নান করিবে।

নিষেধ—যতদিন ঋতুস্রাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সহজ প্রাণায়াম বা ভ্রমণ-প্রাণায়াম ছাড়া অন্য কোনো ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না।

নিয়ম ও পথ্য—ঋতুর প্রথম তিনদিন অগ্নিসেবা অর্থাৎ রন্ধনাদি মেয়েদের পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এই সময়ে জরায়ু রক্তে পরিপূর্ণ থাকে, সুতরাং ভাতের হাঁড়ি, কড়াই প্রভৃতি নামান-উঠান করিতে গেলে জরায়ুর স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা ঘটে। দ্বিতীয়তঃ ঋতুর সময় দেহসঞ্চিত বহু বিষাক্ত পদার্থ ঋতুর সহিত বাহির হইয়া যায়। ঋতুর সময় রন্ধন করিলে খাদ্যে ঐ রোগবিষ বা রোগবীজ সম্পৃক্ত হইয়া স্বামী-পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের রোগসৃষ্টির কারণ হইতে পারে। এইজন্যই ঋতুর প্রথম তিনদিন

মেয়েদের পক্ষে রন্ধন বিশেষভাবে হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই তিনদিন স্বামী বা পুত্র-কন্যাদি সহ শয়ন করিলে তাহাদের দেহে রোগবিষ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। এই কারণেই হিন্দুসমাজে ঋতুর তিনদিন পৃথক শয়নের নির্দেশ আছে।

পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এইসব নিয়ম-প্রথার প্রতি অবহেলা দেখা যাইতেছে। এইরূপ অনুকরণ আমাদের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। শীতপ্রধান দেশের নিয়মকানুন গরমদেশে চলে না। শীতপ্রধান দেশে রোগবীজাণু সহজে প্রবল হইতে পারে না। গরমদেশে রোগবীজাণু সহজেই প্রবল হইয়া উঠে এবং সহজেই অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। এইজন্য গরমদেশে রোগবীজাণু বিস্তৃতি সম্বন্ধে অধিকতর সতর্কতারও প্রয়োজন। সুতরাং ঋতুর সময়ে মেয়েদের সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের যে বিধি-নিষেধ প্রচলিত আছে উহা কুসংস্কার প্রসূতও নয়, মেয়েদের উপর অবজ্ঞাপ্রসূতও নয় ; উহা স্বাস্থ্যবিধিসম্মত।

গ্রাম্য মেয়েরা মাসিক ঋতুর সময় সমাজের প্রাচীন প্রথা এখনও মানিয়া চলে। তাহারা রন্ধনাদি করে না ; কিন্তু কাপড় কাচা, বাসন মাজা, আঙ্গিনা ঝাঁট দেওয়া, বালতি ভরা জল আনিয়া গৃহ পরিষ্কার ও অন্যান্য গুরু পরিশ্রমের কাজে সারাদিন এই সময় ব্যস্ত থাকে। রাত্রে তাহারা সামান্য শয্যার উপকরণ লইয়া ঠাণ্ডা স্যাঁৎস্যেঁতে কাঁচা মেঝেতে শুইয়া কাটায়। ঋতুর সময় এইভাবে চলা স্বাস্থ্যনীতিবিরোধী। ঋতুর তিনদিন খুব হালকা পরিশ্রমের কাজ, শরীরে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা না লাগান এবং রাতে খাটের উপর আরামপ্রদ গরম শয্যায় শয়ন বিধেয়। এইসময় কৌপীন ও ঢিলা জাঙ্গিয়া পরিধান করিবে—মাতৃ অঙ্গ তুলা বা নেকড়া দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে না—উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ঋতুর প্রথম দিনেও স্নানে কোনো বাধা নেই, তবে স্নান যেন ক্লেশকর না হয়, দীর্ঘ সময়ব্যাপী না হয়। ঋতুর তিনদিনই কবোষ্ণ জলে স্নান করিবে ('স্নানবিধি' দ্রষ্টব্য)। স্বল্প পরিশ্রমের গৃহকার্য, প্রাণপ্রিয় আত্মীয়দের চিঠি

লেখা, হালকা গল্প, হালকা কবিতা লেখা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি আনন্দদায়ক কাজে এই তিনদিন অতিবাহিত করিবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ এই সময় যথাসাধ্য কম করিবে। সূচিশিল্পের কাজ এই তিনদিন বন্ধ রাখিবে।

অতিরিক্ত রজঃস্রাব আরম্ভ হইলে রোগিনীর খাটিয়ার পায়ের দিকে আধ ফুট বা এক ফুট উঁচু করিয়া দিবে এবং তাহার তলপেটের উপর একটি ভিজা গামছা রাখিবে এবং মাথার নীচ হইতে বালিশ সরাইয়া দিবে। এইভাবে ৫/৭ মিনিট শুইয়া থাকিলেই অতিস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

যকৃৎ দোষ না থাকিলে এবং পরিপাকশক্তি স্বাভাবিক থাকিলে দ্বিপ্রহরে অন্নের সহিত কিছুটা ঘি বা মাখন গ্রহণ করিবে। দ্বিপ্রহরে ঘোল এবং রাত্রে দুগ্ধপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরিপাকশক্তি অনুযায়ী কিছুটা সুপুষ্ট নারিকেল শাঁস পিষিয়া উহা হইতে দুধ বাহির করিবে অথবা ১৫/১৬টি চীনাবাদাম পিষিয়া জলের সহিত গুলিয়া দুগ্ধের আকারে পরিণত করিবে। রাত্রে দুগ্ধের পরিবর্তে এই নারিকেল-দুগ্ধ বা চীনাবাদাম-দুগ্ধ পান করিবে। এই নারিকেল-দুগ্ধ ও চীনাবাদাম-দুগ্ধ গো-দুগ্ধের চেয়ে পুষ্টিকর। গো-দুগ্ধের বা মহিষ-দুগ্ধের পুষ্টিকর উপাদান নারিকেল ও চীনাবাদামে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

আলু, বিলাতী বেগুন, ট্যাঁড়স, সিম, বরবটি, পেঁপে, পালংশাক, পুঁইশাক, কন্‌কাশাক ও ডাঁটা, সজিনা ফুল ও সজিনা ডাঁটা, উচ্ছে, ওল, চালকুমড়া প্রভৃতি শাক-সবজি এবং সুপক্ক টক ও মিষ্ট ফলাদি ঋতু-রোগে সুপথ্য। আমিষজাতীয় খাদ্য বর্জন করিয়া চলিবে। আমিষ হিংস্র পশুর খাদ্য—মানুষের খাদ্য নয়।

এই রোগে জলপানবিধি যথাযথ পালন করিবে। ('জলপানবিধি' দ্রষ্টব্য)। অতিরজঃ রোগে একবারে একগ্লাস জল পান করিবে না; সিকি বা অর্ধ গ্লাস পান করিবে। এইভাবে বার বার জল পান করিয়া জলপানের মোট পরিমাণ স্থির রাখিবে। শীতকালে শীতল জলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে।

একশিরা (হাইড্রোসিল্)

লক্ষণ—রোগের সূচনায় একটি মুষ্ক ফুলিয়া উঠে। মুষ্কধারণকারী স্নায়ুরজ্জু ও শুক্রবাহী শিরা বেদনাযুক্ত হইয়া টন্ টন্ করে। ক্রমশঃ মুষ্কে জল সঞ্চিত হয়। এই রোগ বৃদ্ধি পাইলে মুষ্ক ফুলিয়া শক্ত হয় এবং বৃহৎ আকার ধারণ করে।

কারণ—রক্তের সারভাগের নামই শুক্র (Vital Fluid)। রক্তবাহী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ধমনীগুলির পাশে পাশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা বা নালী আছে। বিশুদ্ধ রক্ত পরিস্রুত হইয়া, মথিত হইয়া শুক্রে পরিণত হয় এবং এই নালীপথে প্রবাহিত হইয়া দেহের সমুদয় যন্ত্রকে, দেহের সমুদয় গ্রন্থিগুলিকে পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করে। এই শুক্রই দেহে প্রাণকোষ নির্মাণ করে।

শুক্র চলাচলের জন্য যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালী বা শিরা আছে, তেমনি শুক্র সঞ্চিত থাকার জন্য কতকগুলি গ্রন্থিও আছে। এই গ্রন্থিগুলিতেই দেহরক্ষাকারী 'কৃমি' বা প্রাণবীজ উৎপন্ন হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র মতে এই গ্রন্থিগুলির নাম লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডস্ (Lymphatic Glands)। এই গ্রন্থিতে উৎপন্ন দেহরক্ষী প্রাণবীজ বা জীবাণুগুলির নাম শ্বেতরক্তাণু এবং লালরক্তাণু (White & Red Corspuscles)। পুরুষের মুষ্কদ্বয়ও এইরূপ একটি প্রাণবীজ উৎপন্নকারী শুক্রগ্রন্থি। এই শুক্রগ্রন্থিটিই পিতৃগ্রন্থি (Testes) নামে অভিহিত। এই পিতৃগ্রন্থিতে উৎপন্ন প্রাণবীজই মানবের বংশধারাকে অব্যাহত রাখে; এইজন্য এই প্রাণবীজের নাম সন্তানবীজ (Spermatozoa)। কামচিন্তা, কামোত্তেজনা আরম্ভ হইলেই এই পিতৃগ্রন্থি সক্রিয় হইয়া সন্তানবীজ উৎপন্ন করে এবং এই সন্তানবীজগুলিকে প্রয়োজনীয় শুক্রসহ গ্রন্থিসংলগ্ন শুক্রকোষে প্রেরণ করে। শুক্রকোষে সঞ্চিত শুক্র যদি স্বাভাবিক নিয়মে (অর্থাৎ অবিবাহিতদের সুপ্তিস্খলনে এবং বিবাহিতদের সহবাস অবলম্বনে) দেহ

হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সুযোগ না পায় অথবা শোষিত হইয়া পুনরায় রক্তের সহিত মিশিয়া না যায়, তাহা হইলে উহা শুক্রস্থলীতে থাকিয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শরীর অন্যান্য কারণে দূষিত থাকিলে এই বিকৃত শুক্র তরলাকার ধারণ করিয়া মুষ্কশোথ উৎপন্ন করে। মুষ্কদ্বয় তখন বৃহদাকার এবং বেদনাযুক্ত হয়। ইহাই একশিরা রোগ বা মুষ্কশোথ রোগ। একশিরা বা মুষ্কশোথ রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র মুষ্কপ্রদেশ প্লাবিত করে, মুষ্কদ্বয় তখন শক্ত হইয়া সুবৃহৎ হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—ভোরে সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। মলত্যাগের সময় বামহস্ত দ্বারা অণ্ডকোষের থলিটি ধারণ কর। অণ্ড দুইটি হাতের নিম্নে থাকিবে। অণ্ড দুইটিকে থলির শেষপ্রান্তে লইয়া গিয়া সাধ্যমত শক্তভাবে আটকাইয়া ধরিবে। যতবার পায়খানায় যাইবে ততবার পূর্বোক্ত উপায়ে অণ্ড দুইটিকে থলির শেষ প্রান্তে লইয়া গিয়া সাধ্যমত শক্তভাবে আটকাইয়া ধরিয়া রাখিবে। রোগ পুরাতন না হইলে এই উপায়ে ৩/৪ দিনের মধ্যেই রোগটি আরোগ্য হইবে। দীর্ঘদিনের রোগীর রোগারোগ্য হইতে কয়েক মাস সময়ের দরকার হয়। পুরাতন রোগী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য উপকারী যোগক্রিয়াও অভ্যাস করিবে ('ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি' দ্রষ্টব্য)।

মুষ্কপ্রদেশে অধিক পরিমাণে রস সঞ্চিত হইয়া থাকিলে চিকিৎসকের সাহায্যে ছুঁচ দ্বারা ফুটা করিয়া ঐ রস বাহির করিয়া দিবে। ঐ রস বাহির করিয়া দিলেও পুনরায় রস সঞ্চিত হইবে। উল্লিখিত ক্রিয়া অভ্যাসে রস সঞ্চয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

আধুনিক যুগের চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করেন। আমাদের বর্ণিত উপরি উক্ত ক্রিয়াটি অভ্যাসের ফলে চিরস্থায়ীভাবে রোগটি আরোগ্য হইবে। যোগীদের মাঝে প্রচলিত এই সহজ প্রক্রিয়াটি দ্বারা এই রোগ এত দ্রুত আরোগ্য হয় যে ইহার আরোগ্যকারী ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

নিয়ম ও পথ্য—কামভাব, কামোত্তেজনা হইতে মনকে যথাসাধ্য মুক্ত রাখার চেষ্টা করিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠতারল্য থাকিলে উহা আরোগ্যের উপায় অবলম্বন করিবে ('কোষ্ঠবদ্ধতা' রোগারোগ্য প্রণালী দ্রষ্টব্য)। আহার্যদ্রব্য যেন লঘুপাক, পুষ্টিকর ও ক্ষারধর্মী হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যনীতি পালন করিয়া চলিবে।

এলার্জি (Allergy)

লক্ষণ—কোনো খাদ্য দ্রব্য গ্রহণে বা কোনো জিনিসের স্পর্শে শরীরের যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়, ইহারই নাম এলার্জি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ডিম খাওয়া মাত্রই কিছু সংখ্যক নর-নারীর হাঁপানীর টান শুরু হয়। ডিম এই সব লোকের পক্ষে বিষতুল্য। চিংড়িমাছ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহারো সর্বশরীরে আমবাতের মতো স্ফোটক উৎপন্ন হয়। কাহারো আবার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলেই মাথা ধরে ও জ্বর হয়। কোনো কোনো ছেলে-মেয়ে অতি শৈশব হইতেই এই ধরনের এলার্জির দ্বারা আক্রান্ত হয়। আবার কোনো কোনো পরিবারের প্রায় সকলের দেহেই একই ধরনের এলার্জির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, যাহাদের স্বাস্থ্য অটুট, দেহ নির্দোষ, তাহাদের দেহে কখনও এলার্জি উৎপন্ন হয় না।

কারণ—গ্রন্থিক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ রুগ্নগ্রন্থি এবং দেহে সঞ্চিত দূষিত পদার্থই এই রোগের প্রধান কারণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া, অক্ষুধা বা অল্প ক্ষুধায় খাওয়া এবং সুষম পথ্যের অভাবের ফলে যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি রুগ্ন হইতে থাকে ও দেহসঞ্চিত পিত্ত, অম্ল প্রভৃতি দূষিত জিনিস দেহ আর তখন বাহির করিয়া দিতে পারে না, ফলে এই

রোগ উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেহে দূষিত পিত্ত সঞ্চিত হইয়া এই রোগ সৃষ্টি হইলে দেহে স্ফোটক উৎপন্ন হয়। দেহসঞ্চিত দূষিত জিনিসের প্রভাবে ফুসফুস ও টনসিল রুগ্ন হইলে শীতল জলের স্পর্শে এলার্জি সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন গ্রন্থির রুগ্নতার জন্য বিভিন্ন প্রকারের এলার্জি উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১ (৩য় অধ্যায়)। প্রাতঃকৃত্যাদির পর বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি (সপ্তাহে ২ দিন); সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং ১০ বার, ২নং ৩ বার; সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শশাঙ্গাসন ৩ মিনিট।

দ্বিপ্রহরে স্নানের সময়—সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার-ধৌতি ১নং ১০ বার, ২নং ৩ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩—২ মিনিট।

সন্ধ্যায় বা রাত্রিভোজনের পূর্বে বিপরীতকরণী মুদ্রা বা সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট, জানুশিরাসন ৩ বার, সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং ৩ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শশাঙ্গাসন ২ মিনিট।

রোগের প্রকোপ হ্রাস ও রোগ নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামের নিয়মানুযায়ী আসন-মুদ্রা ও প্রাণায়ামের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—সপ্তাহে একদিন উপবাস দিবে। প্রতি সপ্তাহে একদিন পূর্ণ উপবাস এই রোগ তাড়াতাড়ি আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক (তৃতীয় অধ্যায়ে উপবাসবিধি দ্রষ্টব্য)। চা, কফি, পান, বিড়ি, সিগারেট ও নস্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনের অভ্যাস থাকিলে উহা পরিত্যাগ করিবে। যতদিন সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইবে, ততদিন মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি সংহত খাদ্যও সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। এই রোগে চিনি সেবনও নিষিদ্ধ। চিনির পরিবর্তে গুড় খাইবে। দুধ, দই, ঘোল, ডাল, শাক-সবজি ও রসাল ফলাদি—এই রোগে সুপথ্য। জলযোগ দুধ, রুটি, তরকারি ও রসাল

ফলের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখিবে। অক্ষুধা ও অল্পক্ষুধায় খাদ্য গ্রহণ করিবে না। জোরালো ক্ষুধার জন্য দীর্ঘ উপবাস বা ঘন ঘন উপবাস দিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

করোনারী থ্রম্বোসিস্

লক্ষণ—যে রক্তবাহী নাড়ী হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে উহার ইংরাজী নাম **করোনারী**। এই করোনারী বা রক্তবাহী শিরা যখন হৃদ্‌যন্ত্রে **আর প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না**, তখন **রক্তের অভাবে** হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের **প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব হেতু রোগী বুকে ভীষণ যন্ত্রণা** বোধ করে। সেই সঙ্গে গুরুতর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। দেহের **উর্ধ্বাংশে** রক্তের অভাব হেতু রোগীর চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যায়; রোগীর দেহ মৃতবৎ নিশ্চল হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় দেহপ্রকৃতি অধিকতর রক্তচাপ সৃষ্টি করিয়া প্রাণপণে হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। সুতরাং এইসব রোগীর কল্যাণের জন্যই রক্তচাপ বৃদ্ধির প্রয়োজন। এইরূপ অধিকতর রক্তচাপ হেতু রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে সর্বশরীর ঘর্মাক্ত হইয়া বেদনার উপশম হইতে থাকে। অধিক রক্তচাপ সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ রক্তও যদি হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে এই শ্বাসকষ্ট, এই বেদনাই রোগীর মৃত্যুর পূর্বলক্ষণরূপে সূচিত হয়; **রক্তের অভাব** হেতু রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চিরদিনের মতো স্তব্ধ হইয়া যায়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রমতে রক্তের অভাব হেতু হৃদ্‌রোগের এই বেদনার নাম **এঞ্জাইনা পেক্‌টোরিস্**। এই এঞ্জাইনা পেক্‌টোরিস্‌ই বিপদজ্ঞাপক রক্ত-নিশান। ইহার প্রাথমিক আক্রমণে রোগী সতর্ক না হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য হইয়া উঠে। এই এঞ্জাইনা পেক্‌টোরিস্ করোনারী থ্রম্বোসিস্ রোগের পূর্বাভাস।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বৎসর প্রায় দেড় লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় এবং উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

কারণ—দেহের রক্ত হইতেই দেহের গ্রন্থি, স্নায়ু, নাড়ী, শিরা, পেশী প্রভৃতি খাদ্য সংগ্রহ করে। এই খাদ্য গ্রহণ করিয়াই এই সমস্ত দৈহিক যন্ত্র পুষ্টি লাভ করে এবং কর্মক্ষম থাকে। যে দুইটি প্রধান নাড়ী হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে উহার নাম করোনারী। এই করোনারী যখন আর হৃদ্‌যন্ত্রে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না, তখন হৃদ্‌যন্ত্র আর স্বাভাবিকভাবে কাজ করিতে পারে না।

সুস্থ রক্ত সর্বদাই তরল থাকে। উহা কখনও জমাট বাঁধে না। দেহের রক্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেই এই রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা ঘটে। এই রোগ-সৃষ্টির কয়েকটি কারণ আমরা উল্লেখ করিতেছি—

(১) অতিরিক্ত আমিষ ভোজন হেতু শরীরের রক্ত অত্যধিক অম্লধর্মী হইলে এই অম্লবিষে জর্জরিত হইয়া রক্তবাহী শিরা শীর্ণ হইয়া যায় ও ইহাদের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া যায়, শিরামুখে রক্ত জমিয়া যায়। দেহপ্রকৃতি তখন প্রয়োজনীয় রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে পাঠাইতে পারে না, ফলে Angina Pectoris উৎপন্ন হয়।

(২) রক্তের অত্যধিক অম্লবিষকে যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র ও ফুসফুস যখন শোধন করিতে পারে না, তখন ঐ দূষিত রক্তে ক্যানসার রোগবীজের মতো একজাতীয় দূষিত রোগবীজ সৃষ্টি হয়। এই দূষিত রোগবীজাণুর সংস্পর্শে করোনারী নাড়ীতে ঘা উৎপন্ন হয়। ঐ বিষাক্ত ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়। রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায় উক্ত করোনারী শিরা আর হৃদ্‌পিণ্ডে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না। ফলে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

(৩) দেহের রক্ত শোধনকারী যন্ত্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়িলে অবিশুদ্ধ অম্লধর্মী রক্তের মধ্যে পাথর-কণিকার মতো এক জাতীয় শক্ত কণিকা সৃষ্টি হয়। এইগুলি বড় হইয়া করোনারী শিরার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে আর উহার ভিতর দিয়া সহজভাবে রক্ত চলাচল সম্ভবপর হয় না; ফলে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

(৪) শরীরে অত্যধিক চর্বি সঞ্চিত হইলে করোনারী শিরার ভিতরও চর্বি সঞ্চিত হয়। ফলে উহার ভিতর দিয়া রক্ত আর স্বাভাবিকভাবে হৃদ্‌পিণ্ডে যাতায়াত করিতে পারে না; অসুস্থ রক্ত স্বভাবতঃই তাহার তারল্য হারাইয়া ফেলে। সুতরাং অত্যধিক চর্বিযুক্ত দেহ ও অসুস্থ রক্তও এই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে।

(৫) নিরামিষভোজীরা যদি অতিরিক্ত সংহত খাদ্য (ঘি, মাখন, ছানা, ছানার তৈরি এবং ঘিয়ে ভাজা খাবারাদি) গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। আমিষের মতো সংহত খাদ্য গ্রহণেও রক্তে অম্লভাগ বৃদ্ধি পায়।

(৬) শিক্ষিতদের মধ্যে এই রোগের প্রাচুর্য দেখিয়া আধুনিক যুগের চিকিৎসকেরা অনুমান করেন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও জীবনযুদ্ধের জটিলতা হেতু মানসিক উদ্বেগ-অশান্তির জন্য এই রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বলা বাহুল্য চিকিৎসকদের এই অনুমান আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না। আধুনিক যুগের **পথ্যনীতির ত্রুটি** এবং **অত্যধিক ঔষধপ্রীতির** জন্যই এই জাতীয় রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক যুগের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা যোগীদের মতো Internal Secretion সম্বন্ধে যতদিন গভীর জ্ঞান অর্জন করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের নির্দেশিত পথ্যাদি নির্দোষ হইবে না। সুপথ্যের নামে কুপথ্য গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত রোগে মানুষকে অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে।

চিকিৎসা—রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের অনুরূপ ('রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ' দ্রষ্টব্য)। করোনারী থ্রম্বোসিস্ রোগীদের চিকিৎসায় টাববাথ, সহজ

প্রাণায়াম এবং ভ্রমণ-প্রাণায়ামের উপর আমরা বিশেষভাবে জোর দিয়াছি। টাববাথ এবং উল্লিখিত প্রাণায়ামগুলি জমাট-বাঁধা রক্তকে অতিদ্রুত তরল করে। রক্তবাহী শিরাগুলির শীর্ণতা দ্রুত হ্রাস পায়। প্রাণায়ামলব্ধ বিশুদ্ধ অক্সিজেন হৃৎপিণ্ডের রুগ্ন মাংসপেশীগুলিকে দ্রুত রোগমুক্ত করে। এই কারণেই যৌগিক চিকিৎসায় করোনারী থ্রম্বোসিস দ্রুত আরোগ্য হয়।

নিয়ম ও পথ্য—ভারতীয় যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে ছেলে-মেয়েদের ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্লীহা, যকৃৎ ও অন্যান্য দেহ-পোষণকারী গ্রন্থিগুলি অপুষ্ট থাকে। এইজন্য ছেলে-মেয়েদের ১২ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে ঘি, মাখন, ডিম, মাংস, ছানা, ঘিয়ের ও ছানার তৈরি মিষ্টি-মিঠাই প্রভৃতি খাদ্য দেওয়া ভারতীয় যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। ইহার কারণ, এই সমস্ত খাদ্য জীর্ণ করিতে যে পরিমাণ পাচক রসের প্রয়োজন, অপুষ্ট যকৃত প্রভৃতি উহা সরবরাহ করিতে পারে না, বরং উহা উৎপন্ন করিতে গিয়া উহারা অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই পথ্য-ত্রুটির জন্যই অল্পবয়স্কদের যকৃৎ ও অন্যান্য গ্রন্থি দুর্বল হইয়া পড়ে ; ফলে শৈশব হইতেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

আমাদের এই গরম দেশে ৫০ বৎসর বয়সের পর এবং শীতপ্রধান স্থানে ৫৫ বৎসর বয়সের পর মৎস্য, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য এবং উল্লিখিত ঘি, মাখন, ছানা এবং ঘিয়ের ও ছানার তৈরি খাদ্যাদি গ্রহণ হিন্দুশাস্ত্রের পথ্যবিধি অনুসারে নিষিদ্ধ। ইহার কারণ—ঐ বয়স হইতেই প্লীহা ও যকৃৎ দুর্বল হইতে আরম্ভ করে। খাদ্যজীর্ণকরণ কার্যে যৌবনগ্রন্থিরস এবং শিব-সতীগ্রন্থিরসেরও সহায়তা প্রয়োজন। উল্লিখিত পথ্যাদি জীর্ণ করিবার জন্য প্লীহা, যকৃৎ, সূর্যগ্রন্থি ও যৌবনগ্রন্থি প্রভৃতি যৌবনে যে পরিমাণ Secretion দিতে পারে, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে তাহা দিতে পারে না। এই বয়সের পর ঐ সকল খাদ্য গ্রহণ করিলে প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস প্রভৃতি দেহরক্ষী সমুদয় প্রধান গ্রন্থিগুলি অতিক্রিয় হইয়া দুর্বল ও অকর্মণ্য হইতে থাকে। ইহার অপরিহার্য

পরিণামস্বরূপ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, হৃদ্‌রোগ, বাতরোগ, পক্ষাঘাতরোগ এবং করোনারী থ্রম্বোসিস রোগ ও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সুতরাং **এইসব রোগ উৎপত্তির মূল কারণ—পথ্য বিষয়ে ত্রুটি**।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য খাদ্যবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের মতামত ভারতীয় চিকিৎসকেরাও অন্ধভাবে অনুসরণ করিতেছেন। নিজেদের দেশের জ্ঞানী-গুণীদের পথ্যনীতি সম্বন্ধে ইঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পাশ্চাত্যদেশের পথ্যনীতি ইঁহারা অবিচারে এই দেশেও প্রবর্তন করিতেছেন। আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ রোগীদের ডিম, ছানা, মাখন প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা দেন। উল্লিখিত ডিম, ছানা, মাখন প্রভৃতি লঘুপাক খাদ্য, ইহাতে কোনো সংশয় নাই ; কিন্তু এইসব লঘুপাক খাদ্য জীর্ণ করিতে খাদ্যজীর্ণকারী গ্রন্থিগুলির কতখানি অন্তর্মুখী রস দিতে হয়—এইসব খাদ্য দেহে কতখানি দূষিত বস্তু (Uric acid) সঞ্চিত করে, এই বিষয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও দেহবিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইঁহাদের অন্ধ অনুসরণকারী ভারতীয় চিকিৎসকেরা ততোধিক অজ্ঞ, এইজন্য এইসব পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া শিশুদের তাঁহারা চিররুগ্ন করেন ও বয়স্কদের তাঁহারা মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দেন।

দুধের মাঝেই মাখন ও ছানা আছে। দুধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক খাদ্য; ইহা হজমের জন্য গ্রন্থিগুলিকে বেশি রসক্ষরণ করিতে হয় না। কিন্তু ছানা, মাখন প্রভৃতি মানুষের তৈরি সংহত খাদ্য হজমের জন্য গ্রন্থিগুলিকে অত্যধিক অন্তর্মুখী রস দিতে হয়।

একটা ডিমের ওজন সাধারণতঃ এক ছটাক। একটা ডিমের চেয়ে এক ছটাক বাদাম চতুর্গুণ পুষ্টিকর। বাদামের মাঝে ঘি-মাখনের চেয়ে অধিকতর চর্বি আছে, মাংসের চেয়ে অধিকতর প্রোটিন আছে। অথচ এই বাদামের জন্য খাদ্যজীর্ণকারী গ্রন্থিগুলিকে অতিরিক্ত রসক্ষরণ করিতে হয়

না। উহা আমাদের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক খাদ্য। ভারতীয় যোগীদের গ্রন্থির অন্তর্মুখী রস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহারা নির্ভুল পথ্যবিধি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। ভারতীয় যোগীদের পথ্যনীতি গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য খাদ্যবিজ্ঞানীদের এবং চিকিৎসকদের আমরা পথ্যবিধি সংশোধনের অনুরোধ জানাইতেছি।

আমাদের দেহের রক্তের অম্লভাগ কখনও হ্রাস পায় না ; উহা হ্রাসের সম্ভাবনা ঘটিলে দেহস্থ অন্তর্মুখী রস উহা সর্বদা পূরণ করিয়া রাখে। কিন্তু রক্তের ক্ষারভাগের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। রক্তের প্রয়োজনীয় ক্ষারভাগ হ্রাস না পাইলে দেহের রক্ত অসুস্থ হয় না, দেহ রুগ্ন হয় না। **সুতরাং রক্তের অম্লভাগ বৃদ্ধি এবং ক্ষারভাগ হ্রাস পাওয়াই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ**। সুতরাং কোনো রোগীকেই রুগ্নাবস্থায় ডিম প্রভৃতি অম্লধর্মী খাদ্য, ছানা, মাখন প্রভৃতি সংহত খাদ্যের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নয়। এইসব খাদ্য গ্রহণে দেহে দূষিত বস্তু সঞ্চিত হয়। এই রোগে নির্দোষ পথ্য বাঞ্ছনীয়।

করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। অক্ষুধায় কখনও খাদ্যগ্রহণ করিবে না ; ভোরের জলযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিবে। ভোরে খুব ক্ষুধাবোধ থাকিলে শুধু অল্প পরিমাণে রসাল ফল গ্রহণ করিবে। দ্বিপ্রহরে অল্প ভাত বা রুটির সঙ্গে তরকারি ও শাক-সবজি, দই, ঘোল, কলা, দুধ প্রভৃতি খাদ্য নিজের ক্ষুধা অনুযায়ী গ্রহণ করিবে। বৈকালে একগ্লাস লেবুর সরবৎ বা কমলার রস গ্রহণ করিবে। রাত্রে শুধু দুধ-রুটি ও রসাল ফলের মধ্যে খাদ্য সীমাবদ্ধ রাখিবে। দুধ যাহাদের সহ্য হয় না, তাহারা দুধের পরিবর্তে দধি বা ঘোল গ্রহণ করিবে।

চা, সিগারেট, নস্য, পান, দোক্তা, মদ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস থাকিলে উহা সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

কাম্‌লা রোগ (জন্‌ডিস্‌)

লক্ষণ—যকৃৎ যখন খারাপ হইতে আরম্ভ করে তখন আর গৃহীত খাদ্য ভালোভাবে জীর্ণ হয় না ; মুখ দিয়া যখন তখন জল ওঠে ; শরীর অবসন্ন বোধ হয়, মল-মূত্র একটু হলুদবর্ণ হয়। অক্ষিগোলকে একটু শোথ উৎপন্ন হয়, দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এইসব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আয়ুর্বেদমতে ইহাকে বলে **পাণ্ডুরোগ**। পাণ্ডু রোগ যখন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যকৃতের ক্রিয়া অধিকতর খারাপ হয়, দেহে অধিকতর পিত্ত সঞ্চিত হয়, তখন এই পাণ্ডু রোগই কাম্‌লা রোগ নামে অভিহিত হয়। কাম্‌লা রোগ উৎপন্ন হইলে গাত্রচর্ম, চক্ষু প্রভৃতি হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। ঘর্ম ও মূত্র প্রভৃতির রংও হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। মুখে ভয়ানক তিক্ত স্বাদ, ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠতারল্য, দুর্বলতা, মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ—আমাদের দেহের সর্ববৃহত্তম গ্রন্থি ফুসফুস, দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রন্থিই যকৃৎ। ইহার ওজন মানুষভেদে ১$^{১}/_{২}$ সের হইতে ২ সের। এই গ্রন্থিটি অসংখ্য কোষে বিভক্ত। এই গ্রন্থিটির এক এক অংশের কোষ এক একটি বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট। এই যকৃতের এক অংশে চিনি (কার্বোহাইড্রেট), আর এক অংশে পিত্ত এবং অন্য অংশে রক্ত তৈয়ারির কারখানা বিদ্যমান। জীর্ণ খাদ্য রসরূপে পরিণত হইয়া যকৃতে গমন করে। যকৃৎ রঞ্জক-পিত্তের সাহায্যে এই রসকে রক্তে পরিণত করে। রক্তে দূষিত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে, রোগবীজাণু বা রোগবিষ থাকিলে উহা ছাঁকিয়া পৃথক করার ব্যবস্থাও এই যকৃৎ যন্ত্রে আছে। খাদ্যরসের চিনিজাতীয় অংশ হইতেই শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। সূর্যগ্রন্থি (Pancreas)-রসের একাংশ এবং যকৃতের অন্তর্মুখী রসের একাংশ মিলিত হইয়া যকৃতে সঞ্চিত খাদ্যরসের চিনিজাতীয় অংশ হইতে চিনি উৎপন্ন করে। দৈনিক প্রয়োজনীয় কাজে শক্তিক্ষয়ের উপযোগী

প্রয়োজনীয় চিনি রক্তে মিশাইয়া দিয়া বাকি চিনি যকৃৎ স্বীয় কোষে সঞ্চিত রাখে। উপবাসের সময় এই চিনিই জীর্ণ হইয়া শরীরের শক্তিসামর্থ্য যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখে। আমাদের যদি বিপদে পড়িয়া দ্রুত পালাইতে হয় অথবা কোনো বিশেষ প্রয়োজনে দ্রুত দৌড়াইতে হয় বা অধিকতর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তখন এই অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহের জন্য যকৃৎ এই সঞ্চিত চিনি ব্যয় করে। যকৃতের এই ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হইলে শরীর গঠনের প্রধান উপাদান রক্তও দূষিত হয়, প্রয়োজনীয় চিনিও যকৃৎ স্বীয় কোষে সঞ্চিত রাখিতে পারে না।

আমরা যে চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি, পাকস্থলীর পাচক রস উহা জীর্ণ করিতে পারে না। যকৃতে উৎপন্ন পিত্তরসই চর্বিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া উহাকে দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদানে পরিণত করে। শুধু চর্বিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করাই পিত্তরসের একমাত্র কাজ নয়। আমাদের পাকস্থলীর পাচকরস যে সমস্ত খাদ্যকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করিয়া তরল রসে পরিণত করিতে পারে না, সেই সমস্ত অজীর্ণ এবং অর্ধজীর্ণ খাদ্য পাকস্থলীর অব্যবহিত নিম্নে গ্রহণী নাড়ীতে (উর্ধ্ব অন্ত্রে) গিয়া সঞ্চিত হয়। উর্ধ্ব অন্ত্রের এই অজীর্ণ এবং অর্ধজীর্ণ খাদ্যকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করিবার ভার এই পিত্তরস এবং সূর্যগ্রন্থিরসের উপর ন্যস্ত। এই পিত্তরস এবং সূর্যগ্রন্থিরসের সম্মিলিত ক্রিয়ার পর যাহা অসার এবং অজীর্ণ রূপে পড়িয়া থাকে, তাহা বৃহদন্ত্রের ভিতর দিয়া মলনাড়ীতে প্রেরিত হয়। পিত্ত এইভাবেই খাদ্যবস্তু জীর্ণ করিয়া নিজেও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

যকৃৎ হইতে পিত্তরস ক্ষরিত হইয়া পিত্তনালীর ভিতর দিয়া পিত্ত থলিতে (Gall Bladder) গিয়া সঞ্চিত হয়। এই পিত্তথলি হইতে আর একটি নল বাহির হইয়া গ্রহণী নাড়ী অর্থাৎ উর্ধ্ব অন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে। অজীর্ণ এবং কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ উর্ধ্ব অন্ত্র, বৃহদন্ত্র, মলনাড়ী প্রভৃতি অজীর্ণ খাদ্য এবং মলে পরিপূর্ণ থাকিলে গ্রহণীনাড়ী আর পিত্তরস আকর্ষণ করিতে পারে না। যকৃৎকে বাধ্য হইয়াই সর্বদা পিত্তরস সৃষ্টি করিতে হয়। গ্রহণী নাড়ী যখন ঐ পিত্তরস আকর্ষণ করিয়া খাদ্য

পরিপাকের কাজে আর লাগাইতে পারে না, তখন ঐ অপ্রয়োজনীয় পিত্তরস পিত্তথলি ও পিত্তনালী প্লাবিত করিয়া রক্তের সহিত মিশিতে থাকে। যকৃতে উৎপন্ন এই পিত্তরস ভয়াবহ শক্তিশালী রাসায়নিক বিষ। এই বিষ প্রচুর পরিমাণে যখন রক্তের সহিত মিশিতে থাকে, তখন যকৃতের এবং অন্যান্য রক্তশোধনকারী যন্ত্রগুলির আর রক্তকে শোধন করিবার ক্ষমতা থাকে না। দেহোৎপন্ন বিবিধ বিষও তখন নির্বিঘ্নে এই অপ্রয়োজনীয় পিত্তের সহিত মিশিয়া দেহের রক্তকে বিষাক্ত করিতে থাকে। এই বিষে জর্জরিত হইয়া রক্তমধ্যস্থ প্রাণসৃষ্টির প্রধান উপাদান, রক্তকে সুস্থ-সবল রাখার প্রধান উপকরণ রক্তাণুগুলি (Red Corpuscles) সবংশে ধ্বংস হইতে থাকে। এই রক্তাণুগুলির মৃতদেহ দ্বারা যকৃৎ পিত্ত সৃষ্টি করে (এই প্রসঙ্গে রক্তহীনতা রোগ, একশিরা রোগ এবং প্লীহা-যকৃৎ রোগের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। রক্তে পিত্তবিষ যত অধিক মিশ্রিত হইতে থাকে, রক্তাণুর মৃতদেহ সেই অনুপাতেই স্তূপীকৃত হয়। রক্তাণুর এই স্তূপীকৃত মৃতদেহ দ্বারা যকৃৎ মনের সাধে অধিকতর পরিমাণে পিত্তরস সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার ফলে রক্তের প্রায় সমুদয় রক্তাণুই পিত্তবিষে নষ্ট হইয়া যায়। রক্তের মাঝে এই রক্তাণুর অভাব এবং রক্তে অধিক পরিমাণে পীতবর্ণ পিত্ত মিশ্রিত হয় বলিয়াই দেহ হয় হলুদবর্ণ। দেহে এই পিত্তবিষের প্রাধান্যের ফলে যকৃতের চিনি উৎপাদন ও চিনি সংরক্ষণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এইজন্য রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। এইভাবেই কামলা রোগ সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি এবং প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর অগ্নিসার ধৌতি নং ১—৮ বার, নং ২—৪ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩, নং ৯; বারিসার ধৌতি বা বমন ধৌতি।

দ্বিপ্রহরে স্নানের সময়—অগ্নিসার ধৌতি ১নং—১২ বার, সহজ অগ্নিসার—৬০ বার।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শয়নপশ্চিমোত্তান, শীর্ষাসন, পবনমুক্তাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৯।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে।

প্রধান আহারের পর এক ঘণ্টা পিঙ্গলা নাড়ীতে (দক্ষিণ নাসায়) শ্বাস প্রবাহিত রাখিবে।

নিয়ম ও পথ্য—যতদিন প্রস্রাব সম্পূর্ণ হলুদবর্ণ থাকিবে, ততদিন নিয়ম-পথ্যাদি সম্বন্ধেও খুব সতর্ক থাকিবে। পিত্তবিষে আক্রান্ত হইয়া যকৃতের কোষগুলি যদি ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে আর রোগীর বাঁচিয়া থাকিবার আশা থাকে না। কমলালেবু, আনারস, পেঁপে, ঘোল, ছানার জল, ডাবের জল প্রভৃতি জ্বরাবস্থায় রোগীর পথ্য (জ্বরারোগ্য প্রণালী দ্রষ্টব্য)। জ্বর মুক্ত হইয়া শরীর কথঞ্চিৎ সবল হইলে লঘুপাচ্য খাদ্যাদি গ্রহণ করিবে। যতদিন শরীর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হয়, ততদিন অতিরিক্ত ঝালমশলা ও তৈলবর্জিত পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। মানকচু, ওল, পেঁপে, আলু, কাচকলা, মাখন-টানা দুধ, ঘোল, ছানার জল, সহ্য হইলে পাতলা দুধ এবং টক ও মিষ্ট ফলাদি কাম্‌লা রোগীর পক্ষে সুপথ্য। শরীর সুস্থ ও সবলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনিজাতীয় খাদ্য (ভাত বা রুটি প্রভৃতি) এবং দুধ প্রভৃতি পরিমিতভাবে গ্রহণ করিবে। যতদিন দেহ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হয়, ততদিন ভাতের সহিত ঘি বা মাখন খাইবে না। ঘিয়েভাজা কোনো খাবার অথবা ছানা বা ছানার তৈয়ারি কোনো মিষ্টি খাবার এবং ডিম, মাছ ও মাংস সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

[কেন এই সব খাদ্য রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ—উহার কারণ আমাদের "খাদ্যনীতি" নামক পুস্তকে এবং Arrange Right Diet for Human Beings নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।]

কাশি

লক্ষণ—কাশি তিন প্রকার—সরল কাশি (Useful Cough), ঘুংড়ি কাশি (Whooping Cough) এবং শুষ্ক কাশি।

সরল কাশি—সর্দি ঘন হইয়া যে কাশি উৎপন্ন হয়, উহার নাম সরল কাশি। সরল কাশির সহিত ঘন শ্লেষ্মা মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়। শরীরের বিকৃত ও দূষিত পদার্থকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া শরীরকে রোগবিষমুক্ত করিতে সরল কাশি বিশেষভাবেই সাহায্য করে। আয়ুর্বেদমতে সমস্ত রোগই ত্রিধা বা ত্রিদোষযুক্ত। সুতরাং এই সরল কাশিও বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ভেদে ত্রিবিধ। বাতজ কাশিতে কাশির বেগ দীর্ঘ সময় থাকে, বুকে-পিঠে খিল ধরে এবং অল্প পরিমাণে শুষ্ক শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পিত্তজ কাশিতে শরীরে একটু প্রদাহ, সামান্য জ্বর ও পিপাসা থাকে এবং কাশি মুখ হইতে বাহির হওয়ার সময় একটু তিক্ত স্বাদ অনুভূত হয়। কফজ কাশিতে দেহ ভার বোধ, শিরোবেদনা, আহারে অরুচি এবং কাশির বেগের সময় অতিশয় ঘন কফ মুখ হইতে ঘন ঘন নির্গত হয়।

ঘুংড়ি কাশি—এই কাশি খিঁচুনী সহ আবির্ভূত হয় ; সময় সময় কাশিতে কাশিতে গলা বন্ধ হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এই কাশির প্রবল বেগে রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হইয়া সময় সময় নাক বা মুখ দিয়া রক্ত পড়ে। দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলে-মেয়েরাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই কাশির সময় গলার মাঝে একটা 'ঘঙর ঘঙর' আওয়াজ হয় ; এইজন্য আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম হইয়াছে ঘুংড়ি কাশি। এই কাশির সময় অস্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া হয় বলিয়া 'হুপ-হুপ' শব্দ হয়; এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম হইয়াছে Whooping Cough বা হুপিং কাশি।

শুষ্ক কাশি—যে কাশির সহিত শ্লেষ্মাদি নির্গত হয় না, উহার নাম শুষ্ক কাশি। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে রেললাইন রক্ষক লাল নিশান তুলিয়া রেল-ইঞ্জিনের পরিচালককে জানাইয়া দেয়—'সম্মুখে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সতর্ক হও।' দেহপ্রকৃতিও শুষ্ক কাশি সৃষ্টি করিয়া জানাইয়া দেয়, দেহ-রথ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। সুতরাং শুষ্ক-কাশি কোনো রোগ নয়; উহা হাঁপানি, প্লুরিসি, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি জটিল ও মারাত্মক রোগের পূর্বাভাস।

কারণ—**"ধূমোপঘাতাদ্রসতস্তথৈব"**—শ্বাসের সহিত অতিরিক্ত ধূম ও ধূলি গ্রহণ করিলে এবং খাদ্য অজীর্ণ হেতু শরীর রসস্থ হইলে কাশি উৎপন্ন হয়।

যে সমস্ত ছেলে-মেয়ের দেহ ক্ষীণ, যাহাদের নভঃগ্রন্থি, বায়ুগ্রন্থি বা টন্‌সিল, ফুসফুস, ইন্দ্রগ্রন্থি (থাইরয়েড) প্রভৃতি দুর্বল, তাহাদের গায়ে একটু অতিরিক্ত হাওয়া বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দির ভাব হয়। এই সর্দির উপরও যদি অতিরিক্ত হাওয়া বা ঠাণ্ডা শরীরে লাগে তাহা হইলে ঐ সর্দি ঘুংড়ি কাশিতে পরিণত হয়।

রোগবীজাণু দ্বারা ফুসফুস আক্রান্ত হইলে ঐ রোগবীজাণুগুলিকেই দূরে নিক্ষেপের জন্য ফুসফুসে সময় সময় একটা আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এই আক্ষেপের ফলে বায়ু শ্বাসনালীপথে বাহির হইতে বাধা পাইয়া, সজোরে কণ্ঠনালীপথে বাহির হইয়া যায়; বায়ুর এই মুখপথে সশব্দ বহির্গমনই শুষ্ক কাশি নামে পরিচিত। এই শুষ্ক কাশি দ্বিবিধ—ক্ষতজ ও ক্ষয়জ।

"প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ"—প্রাণবায়ু যখন দূষিত উদানবায়ুর অনুগত হইয়া পড়ে, তখন দেহমধ্যস্থ ক্ষতরোগ বা ক্ষয়রোগের সূচনারূপে এই শুষ্ককাশি উৎপন্ন হয়। শরীর অত্যধিক দোষযুক্ত হইলে, ফুসফুস দুর্বল হইলে ফুস্‌ফুস্ আর গভীর উচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, প্রয়োজনীয় বহির্বায়ু আকর্ষণ করিতে পারে না এবং দূষিত অপান বায়ু

গভীর নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দিতেও পারে না। শরীরে তখন দূষিত পদার্থের এবং দূষিত বায়ুর সঞ্চয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রোগীর এই সময় শ্বাসের দৈর্ঘ্য বা গভীরতা হ্রাস পায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ ও দ্রুততর হইতে থাকে। দেহে এই সময় দূষিত অপান বায়ুরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বায়ু দুষ্ট হওয়ায় পিত্ত এবং কফ দূষিত হইয়া দেহে ত্রিদোষ সৃষ্টি করে। দেহের এইরূপ দূষিত অবস্থায় রোগবীজাণু ফুসফুসকে আক্রমণ করিয়া ফুসফুসে ক্ষত উৎপন্ন করে। **"স পূর্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্"**—এইরূপ ক্ষত উৎপত্তির সূচনায় শুষ্ক কাশি উৎপন্ন হয়, পরে ক্ষত উৎপন্ন হইলে কাশির সঙ্গে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। ইহাই **ক্ষতজ** কাশি। ফুসফুস আক্রান্ত হইয়া এইভাবে প্লুরিসি প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহা যক্ষ্মায় পরিণতি লাভ করে। রোগবীজাণুর দ্বারা যখন ফুসফুসের অংশবিশেষ আক্রান্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখনও শুষ্ক কাশির সহিত রক্ত নির্গত হয়। ইহারই নাম **ক্ষয়জ** কাশি।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৯ ; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

মধ্যাহ্নে—আতপস্নান ১০/২০ মিনিট। সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ প্রাণায়াম, শয়ন-পশ্চিমোত্তান, অগ্নিসার ধৌতি, শীর্ষাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, নং ৭ এবং নং ৯।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম।

নিয়ম ও পথ্য—রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ধূম ও ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন স্থান বর্জন করিবে। ঠাণ্ডা লাগাইবে না, শরীরকে যথোচিত গরম রাখার উপযোগী জামা-কাপড় পরিধান করিবে। ভোরের নির্মল বায়ুর মাঝে প্রত্যহ ভ্রমণ করিবে। সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে 'কোষ্ঠবদ্ধতা' রোগারোগ্য প্রণালী অবলম্বন করিবে। বাতজ কাশি এবং ঘুংড়ি কাশি রোগে ২ তোলা পুরাতন তেঁতুল জলে গুলিয়া উহার সহিত ২ তোলা ইক্ষুগুড় মিশাইয়া দিনে দুই-তিনবার খাইবে, তাহা হইলে ঘন কাশি তরল হইয়া সহজেই বাহির হইয়া যাইবে। সাধারণ কাশিরোগে সর্দিরোগ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে। প্রাণায়াম যত অধিক সময় করিতে পারিবে তত তাড়াতাড়ি সর্দি-কাশি ভালো হইবে।

শুষ্ক-কাশির লক্ষণ দেখা দিলেই বিশেষভাবে সতর্ক হইবে। পরিপাক শক্তি দুর্বল না হইলে কোনো রোগবিষই দেহে প্রবল হইতে পারে না; সুতরাং জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত রাখিবার জন্য যত্নশীল হইবে। অজীর্ণ, অম্ল এবং কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ থাকিলে ঐ সব রোগারোগ্যের প্রণালী সর্বাগ্রে অবলম্বন করিবে। অম্লধর্মী খাদ্য মাছ, ডিম, মাংস সম্পূর্ণ বর্জন করিবে এবং ভাত-রুটি, ঘি-মাখন প্রভৃতি অতি কম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দুধ, ফল ও শাক-সব্‌জি প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে। রাত্রে খুব লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। দুধ-রুটির সহিত একমুঠা কিস্‌মিস্‌ বা ২/৩টি মনাক্কা এই রোগীর রাত্রির পথ্যরূপে নির্বাচিত হওয়া উচিত। ২/৩ ঘণ্টা ভিজান কিস্‌মিস্‌ই রোগীর পথ্যোপযোগী হয়। শুষ্ক-কাশি মৃত্যুর সতর্কবাণী, ইহা স্মরণে রাখিয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া চলিবে। **ব্রহ্মচর্যের অভাব এই রোগের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।**

কুষ্ঠরোগ

আয়ুর্বেদে চর্মরোগকে বলে কুষ্ঠরোগ। ১৮ রকম চর্মরোগের বিবরণ ও চিকিৎসাপ্রণালী আয়ুর্বেদগ্রন্থে আছে। আয়ুর্বেদে যাহা বাতরক্ত-ব্যাধি (গলিত কুষ্ঠ) নামে অভিহিত, এ যুগে তাহাকেই আমরা বলি কুষ্ঠরোগ

(Leprosy)। এই কুষ্ঠরোগ দ্বিবিধ—সংক্রামক এবং অসংক্রামক। যে কুষ্ঠ শরীরে ক্ষত উৎপন্ন করে, উহাই সংক্রামক কুষ্ঠ।

লক্ষণ—এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ—আক্রান্ত স্থানের চামড়া সাদাটে হইয়া একটু অস্বাভাবিক হয়। ঐ আক্রান্ত স্থানের রক্তবাহী শিরা প্রভৃতিও একটু মোটা হয় এবং ঐ স্থানের বোধশক্তি সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রোগী ঐ আক্রান্ত স্থান দেখিয়া ধারণাও করিতে পারে না যে, সে মহাব্যাধি কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। ফলে রোগ বিনা বাধায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কুষ্ঠরোগের প্রথম আক্রমণ হাতে ও পায়েই বেশি হয় ; পরে নাকে, কানে, মুখে প্রভৃতি সর্ব অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। আক্রান্ত স্থানের লোমগুলি উঠিয়া যায়। রোগের দ্বিতীয় স্তরে—যখন তখন জ্বরভাব, দেহাস্থিতে বেদনা, অজীর্ণ, অত্যন্ত শারীরিক দুর্বলতা, অকারণে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হওয়া অথবা কোনো সময়েই ঘর্ম নির্গত না হওয়া, মাথায় যন্ত্রণা, প্রচুর পরিমাণে মাথার চুল ও ভ্রূর লোম খসিয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগের তৃতীয় স্তরে—বোল্‌তার দংশনে চর্মের অবস্থা যেরূপ হয়, শরীরে নানাস্থানে সেইরূপ ব্রণ সৃষ্টি হইতে থাকে। শরীরের স্নায়ুগুলিতে ছুঁচ ফোটার মতো যন্ত্রণা হয়; কপাল, গাল, নাক, কান প্রভৃতির চর্ম সঙ্কুচিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে।

রোগের চতুর্থ স্তরে—রোগাক্রান্ত স্থানের বোধশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়, শরীরে লাল লাল চাকা চাকা দাগ হয়, হাত ও পায়ের আঙ্গুল খসিয়া পড়িতে থাকে। নাক ও মুখের চেহারা বিকৃত ও বীভৎস হয়।

কারণ—দেহস্থ বায়ু ও রক্ত যখন অত্যন্ত দোষদুষ্ট হয়, তখন রক্তশোধনকারী প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি, ফুসফুস প্রভৃতি গ্রন্থিক্রিয়ার বিপর্যয় উপস্থিত হয়। উহারা আর রক্তকে যথোচিতভাবে শোধন করিতে পারে না। এই অশোধিত রক্তে রোগবিষ প্রবল হইয়া রক্ত ও চর্মকে দূষিত করিয়া এই রোগের সৃষ্টি করে। চর্মস্থিত রসধাতু এই রোগবিষকে আর

প্রতিহত করিতে পারে না, এইজন্যই অঙ্গ গলিত হইয়া খসিয়া পড়ে।

আয়ুর্বেদ মতে অজীর্ণে ভোজন, ঈষৎ বিকৃত মৎস্য-মাংস এবং শুষ্ক মৎস্য-মাংস ভোজন এই রোগের প্রধান কারণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারত, চীন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে—মৎস্য হইতেই কুষ্ঠরোগবীজ মানবদেহে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ দেখা যায় মৎস্যই যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহাদের মাঝেই কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। উত্তর ভারতের অধিকাংশ লোকই মাছ খায় না, তাই উত্তর ভারতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য। পূর্বভারতবাসী অর্থাৎ বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের লোক অত্যন্ত মৎস্যপ্রিয়, তাই এই তিন প্রদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও অত্যধিক। দক্ষিণ ভারতের যে অঞ্চলে মৎস্যই প্রধান খাদ্য, সেই অঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর প্রাদুর্ভাব বেশি।

এই বিষয়ে চীনদেশের অবস্থা ভারতেরই অনুরূপ। চীনের উত্তরাংশে নদীর সংখ্যা খুব কম, মৎস্য আমদানিও কম, উত্তর চীনে তাই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও অত্যল্প। দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের মৎস্যই প্রধান খাদ্য, নদীবহুল দক্ষিণ চীনে মৎস্যও প্রচুর পাওয়া যায়, তাই দক্ষিণ চীনে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

কুষ্ঠরোগোৎপত্তি সম্বন্ধে এই যে প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত, ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে ইউরোপের বিখ্যাত ডাক্তার হাচিন্‌সন্ (Dr. Hutchinson) বহুদিনব্যাপী গবেষণা করিয়াছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানে কুষ্ঠরোগের প্রভাব বেশি এবং যে সমস্ত স্থানে কুষ্ঠরোগ নাই সেই সমস্ত স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়া কারণাদি অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমাদের ভারতে আসিয়া কুষ্ঠপ্রধান স্থানগুলিতে অবস্থান করিয়া তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন। দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান এবং গবেষণার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে **মৃত মৎস্য যখন ঈষৎ বিকৃত হয়, তখন সেই মৎস্যের মাঝে কুষ্ঠরোগ বীজাণু সৃষ্টি হয়।** লবণাক্ত সংরক্ষিত মৎস্য যথোচিতভাবে লবণাক্ত না করিলে সেই মাছও আংশিকভাবে বিকৃত হয়।

এই লবণাক্ত আংশিক বিকৃত মাছে এবং শুট্‌কি মাছেও এই কুষ্ঠরোগ বীজাণুর সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে একই শ্রেণীর বিকৃত মাছের মাঝে কতকগুলিতে এই রোগবীজাণু সৃষ্টি হয়, আবার কতকগুলিতে হয় না। যেগুলিতে রোগবীজাণু সৃষ্টি হয় সেইগুলি ভক্ষণ করিয়াই মানুষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। আয়ুর্বেদমতে শুধু বিকৃত মৎস্য নয়, বিকৃত মাংস ভক্ষণেও কুষ্ঠ হইতে পারে। এই বিষয়টিও কতখানি সত্য তাহা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিরামিষভোজীদের মাঝে এই কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব কদাচিৎ দেখা যায়। নিরামিষভোজীরা সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু অন্য কুষ্ঠরোগীর রোগবীজ নিরামিষভোজীদের দেহে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকেও রোগাক্রান্ত করিতে পারে।

পাইওরিয়া রোগের দন্তপুঁজ দীর্ঘদিন যাবৎ যদি দেহে সঞ্চিত হয় এবং দেহপ্রকৃতি যদি ঐ পুঁজ দেহ হইতে বাহির করিয়া না দিতে পারে, তাহা হইলে এই সঞ্চিত পুঁজের মাঝে কুষ্ঠরোগের বীজ উৎপন্ন হয়। পাইওরিয়া রোগ হইতে এইভাবে কুষ্ঠরোগ উৎপত্তির বিবরণ প্রাচীন বা নবীন কোনো চিকিৎসাশাস্ত্রেই নাই ; কিন্তু আমরা কুষ্ঠরোগ লইয়া গবেষণা করিতে গিয়া ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। কুষ্ঠরোগীদের পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—প্রায় সমুদয় কুষ্ঠরোগীই পাইওরিয়া রোগাক্রান্ত। সুতরাং **দীর্ঘদিনের পাইওরিয়া রোগ কুষ্ঠরোগ সৃষ্টিরও একটি প্রধান কারণ**। আমাদের আবিষ্কৃত এই কারণটি আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আয়ুর্বেদমতে রোগবীজাণু সংক্রমণ রোগের মুখ্য কারণ নয়, গৌণ কারণ। যে মৎস্যে কুষ্ঠরোগবীজ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পরিবারের পাঁচজন মিলিয়া খাইলেও সকলেরই কুষ্ঠ হয় না। এই পাঁচজনের মাঝে একজন হয়ত রোগাক্রান্ত হইবে। সুতরাং রোগের মূল কারণ—শরীরের দোষযুক্ত অবস্থা, শরীরের 'ত্রিদোষ' সৃষ্টি। শরীর দোষশূন্য থাকিলে কোন রোগবীজাণুই দেহকে রোগাক্রান্ত করিতে পারে না। আর শরীর দোষযুক্ত হইলে যে কোনো কঠিন ব্যাধি দেহকে আক্রমণ করিতে পারে, দেহে যে কোনো কঠিন ব্যাধির রোগবীজাণু সৃষ্টি হইতে পারে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকৃত্য ও স্নান (স্নানবিধি নং ১ বা ২) ; অনন্তর সহজ অগ্নিসার ৩০ বার ; অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২ ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩ ; বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

দ্বিপ্রহরে—চালমুগরার তৈল সর্বশরীরে মর্দন করিয়া আতপস্নান অনুষ্ঠান করিবে। স্নানের সময় জলে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, নং ২—৪ বার। সন্ধ্যায়—উড্ডীয়ান, অগ্নিসার ধৌতি, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ; শীর্ষাসন, উষ্ট্রাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৭ ও ভ্রমণ প্রাণায়াম।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নান ও জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—কুষ্ঠরোগীর গাত্রসংস্পর্শে কুষ্ঠরোগ হয় না। কলেরার রোগবীজাণুর মতো কুষ্ঠরোগবীজাণুও খাদ্যদ্রব্যের সহিত উদরে প্রবেশ করিয়া রোগ বিস্তার করে। কুষ্ঠরোগীর অতিসান্নিধ্য হেতু রোগীর নিঃশ্বাসবায়ু শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলেও রোগবীজ উদরে যাইতে পারে। সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর ঘর্মগ্রন্থি হইতেও ঘর্মের সহিত কুষ্ঠরোগবীজাণু বাহির হইয়া অপরকে সংক্রামিত করিতে পারে। কুষ্ঠরোগীর ব্যবহৃত কোন বাসনপত্রে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ এবং কুষ্ঠরোগীর কাছে বসিয়া খাদ্যগ্রহণ বিশেষভাবেই নিষিদ্ধ। কুষ্ঠরোগীর হস্তস্পৃষ্ট ফলাদি খাদ্যও বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

কুষ্ঠের সূচনা বুঝিতে পারিলে অথবা কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে সংহত খাদ্য (অর্থাৎ ঘি, মাখন, ছানা, ছানার তৈরি এবং ঘি দ্বারা তৈয়ারি খাবারাদি) গ্রহণ করিবে না। মৎস্য এবং অন্যান্য আমিষ খাদ্য বর্জন করিবে। দ্বিপ্রহরে খাদ্যের সঙ্গে যে কোনো একটি তিক্ত খাদ্য প্রত্যহই গ্রহণ করিবে। নিমপাতা, উচ্ছে, করলা, সজিনার ফুল-ডাঁটা প্রভৃতি বিশেষ

উপকারী তিক্ত খাদ্য। এই সমস্ত তিক্ত খাদ্যের, কুষ্ঠবীজ ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। অন্যান্য খাদ্যও যাহাতে লঘুপাচ্য ও ক্ষারধর্মী হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। রাত্রে দুধ ও রসাল ফল পথ্যরূপে গ্রহণ করিবে। প্রতি একাদশী তিথিতে উপবাস দিবে। উপবাসের দিন প্রয়োজনানুরূপ জলপান অথবা লেবুর রস সহ জলপান করিবে। দন্তে পাইওরিয়া রোগ থাকিলে অবিলম্বে সমুদয় দন্ত উৎপাটন করিবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ

লক্ষণ—জিহ্বার উপর ময়লা সঞ্চিত হওয়া, হঠাৎ মাথা ধরা বা মাথা ভার, মুখে দুর্গন্ধ, তলপেটে ভারবোধ, অনিদ্রা, শারীরিক দুর্বলতা, খিটখিটে মেজাজ, দুইদিনের মাঝে মল ত্যাগ না হওয়া অথবা কাদাকাদা দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ কিংবা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মল ত্যাগ প্রভৃতি কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ।

কারণ—চিকিৎসাশাস্ত্রমতে কোষ্ঠবদ্ধতাই দেহের প্রায় সমুদয় রোগ উৎপত্তির কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু অন্ত্রে মল পচিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে দূষিত করে। রক্তই দেহ গঠন করে, রক্তই দেহযন্ত্রগুলিকে খাদ্য ও পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করে। এই রক্ত দূষিত হইলে শরীরযন্ত্রগুলি আর স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে না, বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাবে উহারা দুর্বল হইয়া পড়ে; সমস্ত দেহযন্ত্রেই তখন একটা বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

অন্ত্রে মল পচিয়া রোগবিষ বা রোগবীজাণু সৃষ্টি হইতে থাকে। সুতরাং দেহস্থ অপরিষ্কৃত অন্ত্র, মলবদ্ধ অন্ত্র রোগ সৃষ্টির প্রধান কারখানা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লিখিত কোষ্ঠবদ্ধতার কয়েকটি প্রধান কারণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) **অতিরিক্ত ঔষধ প্রীতি** (Drug Habit) : সমস্ত ঔষধেই

অল্পাধিক পরিমাণে বিষ আছে। অতিরিক্ত ঔষধ সেবনে এই বিষ দেহে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত বিষের অতি অল্প পরিমাণই মল, মূত্র ও ঘর্ম প্রভৃতির সহিত বাহির হইয়া যায়, বাকি অংশ দেহে সঞ্চিত থাকিয়া দেহের অনিষ্ট সাধন করে। এই বিষের প্রভাবে অন্ত্রের সমুদয় স্নায়ুগুলি অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই স্নায়ুগুলি সবল থাকিলে অন্ত্রের মল ইহারা সহজেই মলনাড়ীতে প্রেরণ করিতে পারে। ঔষধ বিষে জর্জরিত হইয়া ইহারা অবসন্ন ও দুর্বল হয় বলিয়াই মলবেগ রুদ্ধ থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। এই কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য পুনরায় ঔষধ অর্থাৎ ঘন শক্তিশালী জোলাপ প্রয়োগ করা হয় এবং উহার ফলে চিরস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ উৎপন্ন হয়। (The frequent use of strong purgatives ultimately brings chronic Constipation)

(২) অলসতা এবং পরিশ্রমবিমুখীনতা (Deficient reflex from lack of physical exercise and sedentary life)।

(৩) অতিরিক্ত চা, তামাক, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন (Excessive use of strong tea, smoking, opium, drinking of alcohol or alcoholic product etc.)।

(৪) পথ্যাদির ত্রুটি, অতিরিক্ত আমিষ ভোজন এবং প্রয়োজনীয় শাক-সবজি এবং দুগ্ধাদি পথ্যের ব্যবস্থা না করা (Faulty dietetic habits, diet with a large proportion of fish, meat, egg, less of fluid & vegetables favour Constipation)।

অত্যধিক চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং ঝাল-মশলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণে যকৃৎ খারাপ হইয়া স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি করে। অপরিণত বয়সে হস্তমৈথুনাদি বদভ্যাসের বশীভূত হইলে এবং দাম্পত্যজীবনে উচ্ছৃঙ্খল হইলেও স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ;

অতঃপর প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃস্নান (স্নানবিধি দ্রষ্টব্য) ; অনন্তর সহজ অগ্নিসার ৩০ বার ; অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২ ; সহজ প্রাণায়াম নং ৪, নং ৫, নং ৯ এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

মধ্যাহ্নে—স্নানবিধি নং ১ বা নং ২।

সন্ধ্যায়—যোগমুদ্রা, সহজ অগ্নিসার, উড্ডীয়ান, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৪ ; শীর্ষাসন ; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, ১ নং অথবা ২ নং জলস্নানবিধি এবং জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—রাত্রিতে আহার করা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। মনুষ্যেতর জীব-জন্তুরা রাত্রিতে আহার করে না, এইজন্য তাহাদের দেহও সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। মানুষ এই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে বলিয়াই নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি তাহাদের ভোগ করিতে হয়। রাত্রে জঠরাগ্নি স্বভাবতঃই দুর্বল থাকে। রাত্রির আহার জীর্ণ হইতে ৮/১০ ঘণ্টা সময় লাগে। অধিক রাত্রে আহার করিলে ভোরের মাঝে তাহা জীর্ণ হয় না। এইজন্য অধিক রাত্রে আহার করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের খাদ্য অজীর্ণ হেতু ভোরে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। ভোরের আর্দ্র বায়ু কোষ্ঠ পরিষ্কারের পক্ষেও বিশেষ সহায়ক। বিলম্বে শয্যাত্যাগ এবং এই বায়ুর সংস্পর্শের অভাবে স্বভাবতঃই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমান সভ্যতার আবহাওয়ায় সন্ধ্যার পূর্বে আহারের ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এইজন্য রাত্রির প্রথম প্রহর অর্থাৎ রাত্রি ৯-৯.৩০ টার মধ্যে রাত্রির আহার সমাধা করিবে ; রন্ধন এবং পরিবেশনকারিণীরাও যাহাতে রাত্রে এক প্রহরের মধ্যে আহার সমাধার সুযোগ পায় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। ৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেমেয়েদের রাত্রিতে ভোজন স্বাস্থ্যহানিকর। সন্ধ্যার পূর্বেই তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা রাখিবে। আমিষ খাদ্য কোষ্ঠবদ্ধতাকারক। আমিষভোজীরা আমিষের চতুর্গুণ শাক-সবজি খাইবে।

আমিষ ও শাক-সবজির এই অনুপাত রক্ষিত না হইলে আমিষভোজীদের কোষ্ঠবদ্ধতা বিদূরিত হয় না।

ঘি, মাখন, তৈল প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্যকে হজম করিবার শক্তি লালাগ্রন্থিরসের বা পাচকরসের নাই ; একমাত্র পিত্তরসই উহাকে জীর্ণ করিতে পারে। আধুনিক যুগে আমাদের দেশের শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের জলখাবারের প্রধান উপকরণ—লুচি, কচুরি, সিঙ্গারা প্রভৃতি। নিত্য এইগুলি এবং অন্যান্য চর্বিজাতীয় খাদ্য উদরস্থ হয় বলিয়া যকৃতে উৎপন্ন সমুদয় পিত্তকেই এই চর্বিজাতীয় খাদ্য জীর্ণ করিবার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়। পিত্তের আর একটি কাজ—গ্রহণী নাড়ী বা ঊর্ধ্ব অন্ত্রে সঞ্চিত অর্ধজীর্ণ খাদ্যের পচন নিবারণ করা এবং উহা জীর্ণ করিতে সূর্যগ্রন্থিরসকে (Pancreatic juice) সহায়তা করা। অত্যধিক চর্বিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিবার কাজে বিব্রত থাকিতে হয় বলিয়া যকৃৎ আর প্রয়োজনীয় পিত্তরস অন্ত্রে পাঠাইতে পারে না, ঐ অন্ত্রসঞ্চিত খাদ্যকে জীর্ণ করিতে সূর্যগ্রন্থিরসকেও পিত্ত এইরূপ অবস্থায় বিশেষ কোনো সাহায্য করিতে পারে না—ফলে অন্ত্রের ঐ সঞ্চিত খাদ্য যথাসময়ে জীর্ণ না হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি করে। প্রয়োজনীয় পিত্তরসের অভাবে ঐ সঞ্চিত খাদ্য অল্পসময়ের মধ্যেই পচিয়া উঠিয়া দেহে অম্লবিষ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণে এইজন্যই অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল প্রভৃতি বহু রোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে চর্বিজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। ছানা ও ছানার তৈয়ারি খাবারাদিও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগীর পক্ষে অপকারী।

দাম্পত্যজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যৌবনে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের একটি বিশেষ কারণ, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দাম্পত্য ব্যবহারে বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও ধমনীগুলি অতিক্রিয় হয়, অত্যধিক উত্তেজিত হয়। এইজন্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সহবাসের অব্যবহিত পরেই ইহাদের মাঝে একটা অবসাদ আসে, উহাদের দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। উচ্ছৃঙ্খল দম্পতি উহাদের এই বিশ্রামের সুযোগ দেয় না—ফলে মলনাড়ীতে

সময়মত মল নিঃসারণের কাজে এই শ্রান্ত স্নায়ুগুলি আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। এইজন্যই দাম্পত্য জীবনের অপব্যবহার কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের আর একটি প্রধান কারণ।

দাম্পত্য জীবনের অপব্যবহারে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের দেহে অধিকতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যৌনসংবেদন পুরুষদেহে একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু মেয়েদের বক্ষাদি সমস্ত অঙ্গের সহিত উহা বিজড়িত। এইজন্যই দাম্পত্য জীবনের অপব্যবহারে মেয়েরা ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যহীন হইতে থাকে। আমাদের এই আত্মবিস্মৃত দেশের প্রায় প্রত্যেক ভদ্র ঘরের বিবাহিতা তরুণীরা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করে। মেয়েদের এই স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বংশের ছেলেদের সকলেই স্বাস্থ্যহীন রোগপ্রবণ দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

সন্তানক্ষুধা না জাগিলে নারীপশু পুরুষপশুকে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। চা-বাগানের কুলি এবং অন্যান্য মজুর শ্রেণীর মেয়েদের মাঝে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ খুব কম, এক রকম নাই বলিলেই চলে। নিজেরা প্রয়োজন বোধ না করিলে নারীপশুর মতো এই মজুরশ্রেণীর মেয়েরাও স্বামীকে বিশেষ উদ্দেশ্যে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। এইসব মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে, তাই পত্নীদের তোয়াজ করিয়া, তাহাদের রুচি-অরুচি বিচার করিয়া, তাহাদের মনের দিকে তাকাইয়া স্বামীদের চলিতে হয়। ভদ্র ঘরের মেয়েদের এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই, তাই স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত রাখিবার সাহস ইহাদের মাঝে জাগ্রত হয় নাই। সাংসারিক আরাম এবং অন্ন-বস্ত্র-অলংকারের বিনিময়ে বিবাহিতা নারীরা নিজের অরুচি সত্ত্বেও, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পতিতা নারীদের মতো স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে স্বামীকে যখন তখন দেহদান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। দাম্পত্য জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা হয়, কিন্তু তাহার আয়ুক্ষয় হয় না। দেহরক্ষাকারী শুক্র ধাতু অপরিমিত ব্যয়

হইয়া আয়ু হ্রাস পায় স্বামীর। শুক্র ধাতুর অপরিমিত ব্যয়ে পুরুষদেহের রোগ প্রতিষেধক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সামান্য রোগেই স্বামীর ঘটে অকালমৃত্যু। স্বামীকে এই অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে ভদ্রঘরের সতী-স্বাধ্বীদেরও ঐ মজুরশ্রেণীর মেয়েদের মতো দাম্পত্য ব্যবহারে সুদৃঢ় হইতে হইবে। বিবাহিত পুরুষদের রোগাক্রমণে যৌবনমৃত্যু ও প্রৌঢ় বয়সের মৃত্যুর মূলে থাকে দাম্পত্য ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলতা।

দুই-একটি সন্তানের মা হইলেই অধিকাংশ মেয়েদের যৌনক্ষুধা হ্রাস পায়। পুরুষদের যৌনক্ষুধা হ্রাস করার উপায়—শারীরিক পরিশ্রম, অবসর সময়ে দেশের-দশের উন্নতিকর কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখা এবং মানসিক কৃষ্টির অনুশীলন অর্থাৎ সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন অথবা যোগ ও জপ-তপ, ধ্যানে আত্মনিয়োগ। প্রত্যেক বিবাহিত যুবককেই মনে রাখিতে হইবে—দেশের ও সমাজের সে অপরিহার্য অঙ্গ; দেশের ও সমাজের প্রতি তাহার দায়িত্ব আছে। স্বাস্থ্যহীনা স্ত্রী এবং স্বাস্থ্যহীন সন্তান জাতীয় কল্যাণের এবং জাতির উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। সুতরাং নিজ নিজ দাম্পত্য ব্যবহারকে এমন শুচিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে যাহাতে স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা না হয় এবং বংশে রুগ্ন সন্তানের আবির্ভাব না ঘটে।

সুপক্ক রসাল ফল জীর্ণ করিতে পঞ্চপাচকাগ্নির কোনো অগ্নিরই দরকার হয় না। রসাল ফল নিজের রসেই নিজে জীর্ণ হয়। ফলের রস বিশেষ ভাবেই কোষ্ঠপরিষ্কারক, ফলের রসে শরীরপুষ্টির যথেষ্ট উপাদান থাকে, অথচ উহা জীর্ণ করিতে পাকস্থলীকে কোনো বেগ পাইতে হয় না। মিষ্ট, অম্ল প্রভৃতি যাবতীয় রসাল ফলই শুধু কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ নয়, প্রায় যাবতীয় রোগেরই সুপথ্য। রসাল ফল অম্ল হইলেও উহা ক্ষারধর্মী খাদ্য, সুতরাং উহা দেহের অম্লবিষ নষ্ট করিতেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। কাঁচাবেল পোড়া, কাঁচাবেলের মোরব্বা, পাকা বেলের সরবৎ কোষ্ঠবদ্ধতারোগীর পক্ষে অমৃততুল্য পথ্য।

অধিকাংশ অসমীয়া এবং বাঙালি পরিবারে আটার ভূষিগুলি ফেলিয়া দিয়া আটার রুটি বা লুচি তৈয়ারি করা হয়। আটার ভূষি কোষ্ঠ পরিষ্কারের পক্ষে সহায়ক। আধুনিক যুগের খাদ্যবিজ্ঞানের মতে আটার অভ্যন্তরস্থ ভিটামিন 'বি' আটার ভূষির সহিত বাহির হইয়া যায়। সুতরাং আটার ভূষি না ফেলিয়াই আটা ব্যবহার করিবে। যে সমস্ত কলে ছাঁটা আটায় ভূষি অত্যল্প পরিমাণে থাকে, উহার সহিত কিছু ভূষি মিশাইয়া রুটি তৈয়ারি করিবে। দিনে ভাত এবং রাত্রে রুটি (উদ্ভিজ্জ ঘৃত বা তৈলে ভাজা লুচি বা পুরী নয়) কোষ্ঠবদ্ধতারোগীর আদর্শ পথ্য। আমাদের পূর্ব ভারতের সুস্থ লোকের পক্ষেও দিনে ভাত এবং রাত্রে রুটি পথ্য হওয়া উচিত। কোষ্ঠবদ্ধতারোগী দৈনিক একসের অল্প জ্বালের দুধ পান করিবে। আধসের বা একপোয়া দুধ পানের ব্যবস্থা করাও যাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহারা প্রত্যহ দুইবেলা কিছু পরিমাণ নারিকেল বা নারিকেল-দুধ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবে। কিছু পরিমাণ ভিজা কিস্‌মিস্‌ ও পাকা বেল কোষ্ঠবদ্ধতারোগীর পক্ষে বিশেষ সুপথ্য।

ক্যান্‌সার (কর্কট রোগ)

লক্ষণ—শরীরের যে কোনো স্থানে একপ্রকার সূত্রবৎ (ফাইব্রয়েড) বিষাক্ত বীজাণু জমিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহা দ্বারা লিম্ফ্যাটিক ভেসেল (রক্তবাহী টিস্যু) আক্রান্ত হইয়া একপ্রকার অর্বুদ (Tumour) সৃষ্টি করে এবং ক্রমশঃ ঐ অর্বুদ ক্ষতরূপে পরিণত হয়। ঐ ক্ষতস্থান হইতেও ক্যান্‌সার-তন্তু নির্গত হইয়া রক্তের মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে এবং ঐ তন্তু যে কোনো জায়গায় আবদ্ধ হইয়া ঐ স্থানে নূতন ক্ষত সৃষ্টি করে। এইভাবে শরীরের এক অঙ্গের ক্যান্‌সার অন্য অঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

অন্যভাবেও এই ক্যান্‌সার রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। শরীরে যে কোনো স্থান কাটিয়া গেলে ঐ কাটাস্থানের ক্ষত ক্যান্‌সার ক্ষতরূপে

পরিণত হইতে পারে। শরীরের যে কোনো স্থানে ঘর্ষণ হেতু ক্ষত হইলে ঐ ক্ষতও ক্যান্সার ক্ষতরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। মোট কথা, শরীরে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টির উপযোগী বিষ সৃষ্টি হইলে উহা যেভাবেই হউক শরীরের যে কোনো স্থানে আক্রমণ করিয়া ক্ষতরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেই। সুতরাং শরীরের যে কোনো স্থানে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সাধারণতঃ ফুসফুস, যকৃৎ, মূত্রাশয়, অন্ত্র, পাকস্থলী, জিহ্বা, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি স্থানে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়েদের সাধারণতঃ জরায়ু ও স্তনেই বেশির ভাগ ক্যান্সার হয়।

কারণ—আয়ুর্বেদে এই রোগটি অর্বুদ রোগের অন্তর্গত। আয়ুর্বেদ মতে পিত্তাদি ত্রিধাতু ও রক্ত দূষিত হইয়া যে অর্বুদ সৃষ্টি হয়, আধুনিক যুগে উহাকে আমরা ক্যান্সার রোগ বলি। শরীরের রক্ত অত্যধিক অম্লধর্মী হইয়া রক্ত দূষিত হইলে দেহ এই রোগ সৃষ্টির অনুকূল হইয়া উঠে এবং দেহস্থ দূষিত রক্তের মাঝে তখন ক্যান্সার রোগবীজাণুর সৃষ্টি হয়। আমরা আমাদের পথ্য প্রকরণে (আমাদের '**খাদ্যনীতি**' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) অম্লধর্মী ও ক্ষারধর্মী খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। মানবদেহের পক্ষে অম্লধর্মী খাদ্যের তুলনায় ক্ষারধর্মী খাদ্যের পরিমাণ অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথ্যের ত্রুটি হেতু দেহে অম্লধর্মী রক্তের প্রাধান্য হইলে ঐ রক্তের অম্লবিষ সম্পূর্ণভাবে শোধন করিবার জন্য যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, মূত্রাশয় প্রভৃতি বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে। এই ৪টি যন্ত্রের উপরেই দেহের রক্তশোধনের ভার বিশেষভাবে ন্যস্ত। দীর্ঘদিনের পথ্যত্রুটি হেতু দেহের এইসব রক্তশোধনযন্ত্র যখন দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন রক্তে অম্লবিষ সঞ্চিত হয়। রক্তের এই অম্লবিষের মাঝেই ক্যান্সার রোগের বীজাণু উৎপন্ন হয়। ঐ রোগবীজাণু সূত্রাকারে জমিয়া দেহের যে কোনো স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রোগবীজাণু ধ্বংসকারী শ্বেতরক্তাণুগুলির হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ দুর্গ তৈয়ারির ব্যবস্থা করে। উহাদের এই দুর্গই টিউমাররূপে প্রকাশ পায়। অতঃপর এই টিউমারস্থিত বিষের প্রভাবে ঐখানে ঘা উৎপন্ন হয়।

অত্যধিক আমিষভোজীদের মাঝেই সাধারণতঃ এই রোগের প্রাদুর্ভাব

বেশি। নিরামিষভোজীদের মাঝেও যাহারা অত্যধিক ঘি-মাখন প্রিয়, ছানা এবং ছানা হইতে জাত মিষ্টি-মিঠাই, ঘিয়ের তৈয়ারি খাবারাদির প্রতি অর্থাৎ মানুষের উদ্ভাবিত সংহত খাদ্যের প্রতি যাহাদের অত্যধিক আসক্তি আছে, তাহাদেরও এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। পাইওরিয়া রোগও ক্যান্‌সার রোগ সৃষ্টির একটি বিশেষ কারণ।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এই রোগ সৃষ্টির কারণ এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন—ধূম্রপান এই রোগ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ। আমাদের মতে ধূম্রপান প্রধান কারণ নয়, আনুষঙ্গিক কারণ। পথ্যদোষ হেতু যাহাদের রক্ত স্বভাবতঃই অম্লধর্মী তাহারা যদি আবার ধূম্রপায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাদের দেহ সহজেই এই রোগ আক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে। রক্তের অম্লবিষের সহিত তামাকের নিকোটিন বিষ মিশ্রিত হইলে রক্তে আরও অধিক অম্লবিষ সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ ঘটে, ফলে সহজেই দেহে ক্যান্‌সার রোগবীজাণু সৃষ্টি হইতে পারে। ধূম্রপায়ীরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই বাঁচে না। যাহারা **ধূম্রপান বা ঐ জাতীয় কোনো নেশায় আসক্ত নয়**, তাহাদের কঠিন পীড়াও সাধারণতঃ প্রাণঘাতী হয় না। বলা বাহুল্য, যাহারা পথ্যনীতি মানিয়া চলে, সুষম পথ্য বা আদর্শ পথ্য গ্রহণ করে, তাহাদের পরিমিত ধূম্রপানে ক্যান্‌সার রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা ঘটিবে না। দোক্তা ও চুনযুক্ত পান এই রোগে বর্জনীয়।

চিকিৎসা—ভোরে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; অতঃপর স্নানবিধি নং ১ বা নং ২। স্নানান্তে বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

দ্বিপ্রহরে—স্নানবিধি নং ২—২০ মিনিট, স্নানের সময় সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, ২নং—৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩ ও ৪—প্রত্যেকটি ১ মিনিট। বৈকালে ভ্রমণ-প্রাণায়াম, স্নানবিধি নং ৩। সন্ধ্যায় বা রাত্রিভোজনের পূর্বে—সর্বাঙ্গাসন ৪ মিনিট,

মৎস্যাসন ২ মিনিট, পশ্চিমোত্তান ৪ বার, সহজ অগ্নিসার ২৫ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং—১০ বার, ২নং—৪ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৭ ; শীর্ষাসন বা শশাঙ্গাসন ৩ মিনিট।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি এবং জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—অক্ষুধায় কোনো কিছু আহার করিবে না। শুধু লেবুর রস সহ জলপান করিয়া উপবাসে থাকিবে—যতক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়। ফুসফুসে ক্যান্সার হেতু খাদ্য গলাধঃকরণে যতদিন অসুবিধা থাকিবে ততদিন ফলের রস, নারকেল দুধ, বাদামের দুধ ও ভেজিটেবল সুপ প্রভৃতির মাঝে খাদ্য গ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখিবে। ফুসফুস ছাড়া দেহের অন্যত্র ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত ভাবে পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইবে—ভোরে এক গ্লাস বেলের সরবৎ, বেল অভাবে নারিকেলের দুধ বা ১ পোয়া খাঁটি গোদুগ্ধ পান করিবে। দ্বিপ্রহরে অল্প ভাত বা রুটি এবং তৎসহ কিছু পরিমাণ সুসিদ্ধ ডাল এবং রুচিমত প্রচুর শাক-সবজি খাইবে। বৈকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ডাবের জল বা অন্যান্য রসাল ফল গ্রহণ করিবে। রাত্রে শুধু ১ পোয়া বা আধসের দুধ। উল্লিখিত খাদ্যের তালিকা ছাড়া রোগাক্রান্ত অবস্থায় অন্য খাদ্য গ্রহণ করিবে না। ক্যান্সার কষ্টদায়ক মারাত্মক ব্যাধি, সুতরাং এই রোগে পথ্যবিধি সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে। আমিষ পথ্য ও সংহত খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। **অজীর্ণ, অক্ষুধা ও গ্যাস প্রভৃতি থাকিলে ১২টা হইতে ১টার মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করিবে। ভোরের দিকে কোনো খাদ্যই গ্রহণ করিবে না। অল্প আহার করিয়া ক্ষুধাকে জাগ্রত না করিলে কোনো রোগই ভালো হয় না।**

কৃশতা

কারণ—ফল-মূল ও শাক-সব্জীর বীজ হইতে আমরা যখন চারা উৎপন্ন করি, তখন দেখিতে পাই—এই চারাগুলির মাঝে কতকগুলি বেশ

সবল, সতেজ ও সুপুষ্ট, আবার কতকগুলি খুব দুর্বল। একই ফল বা ফুলবীজের চারাগুলির এই পার্থক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা দুর্বল চারাগুলি বাদ দিয়া সবল চারাগুলি রোপণ করি। শোনা যায়, গ্রীস দেশেও নাকি মানবসন্তান সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। দুর্বল ও ক্ষীণ সন্তানগুলিকে পাহাড়ের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা হইত। পিতা-মাতার সন্তানবীজের ত্রুটিই বালক-বালিকাদের কৃশ ও দুর্বল হওয়ার একটি প্রধান কারণ। যে সমস্ত পিতা-মাতা স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে বা দারিদ্রের জন্য সন্তানের উপযুক্ত দুগ্ধাদি হিতকারী পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না, তাহাদের ছেলে-মেয়েরা অতি অল্প বয়স হইতেই ভাত, ডাল, মাছ, ডিম এবং অন্যান্য খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়। শিশুর অপরিপুষ্ট পাকস্থলী বয়স্কদের এই খাদ্য সহজে জীর্ণ করিতে পারে না ; এইজন্য শিশুর যকৃৎ ও পরিপাকশক্তি দুর্বল হইতে থাকে এবং ইহার ফলে পেটের অসুখ, অজীর্ণ, কৃমি প্রভৃতি রোগে বালক-বালিকাদের দেহ আক্রান্ত হয়; তাহাদের দেহ কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

বয়স্ক নর-নারীর কৃশ ও দুর্বল হওয়ার প্রধান কারণ—যৌনগ্রন্থিগুলির দুর্বলতা অথবা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং তদনুপাতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব; কিংবা অজীর্ণ, অম্ল, পাইওরিয়া প্রভৃতি বিবিধ রোগ।

চিকিৎসা—(৪—১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের ব্যায়ামবিধি আমাদের **'সহজ যৌগিক ব্যায়াম'** গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

বয়স্ক নর-নারীরা অজীর্ণরোগের চিকিৎসাপ্রণালী অথবা আংশিক অক্ষমতারোগ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—মানবসমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ তাঁহাদের মাঝে শতকরা ৮০/৯০ জনই ক্ষীণ ও দুর্বল দেহধারী, সুতরাং এই ক্ষীণ ও দুর্বল দেহধারীরাও মানবসমাজের সম্পদস্বরূপ। ইহারা দীর্ঘজীবী হইলে, অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিলে মানবসমাজের পক্ষে তাহা লাভজনক।

ক্ষীণ ও দুর্বল বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যসম্মত সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া উল্লিখিত আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করাইলে যৌবনের প্রারম্ভে তাহাদের দেহ যথোচিত সবল, সুস্থ ও সুপুষ্ট হইয়া উঠিবে। বালক-বালিকাদের পথ্যে দুগ্ধ, শাক-সব্জী ও ফলাদির প্রাচুর্য থাকা প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত রাখা জাতির পক্ষে অক্ষমতার অভিশাপ। দেহপুষ্টির জন্য বালক-বালিকাদের দৈনিক অন্ততঃ একসের দুগ্ধ প্রয়োজন। আমাদের এই দরিদ্র দেশে দৈনিক এক পোয়া দুগ্ধও অধিকাংশ শিশু পায় না। বাংলা দেশে প্রাচীনকাল হইতেই একটি প্রথা প্রচলিত আছে—**পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বালক-বালিকাদের মাছ ও মিষ্টি-মিঠাই খাইতে দেওয়া হয় না ; দশ বৎসর পর্যন্ত পাতে কাঁচা ঘি, মাখন, মাংস এবং ডিম খাইতে দেওয়া হয় না।** গরম দেশের পক্ষে এই প্রথাটি অতি সুপ্রথা, শিশুদের পক্ষে ইহা মহাকল্যাণকর। আমিষ খাদ্য শিশুদের দেহ গঠন, দেহপুষ্টির পক্ষে বিঘ্নকর ; ঘি, মাখন প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্য শিশুর যকৃৎকে অতিক্রিয় করিয়া দুর্বল করে। রক্তই দেহ গঠন করে, যকৃতের মাঝেই আছে এই রক্ত তৈয়ারির কারখানা। সুতরাং শিশুদেহের এই কারখানাটি পরিচালনায় যাহাতে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, অভিভাবকদের সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে এই সুপ্রথাটি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভারতীয় চিকিৎসকেরা এই প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রসম্মত সুপ্রথাটিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ফলে আমিষভোজী শিশুদের স্বাস্থ্যও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। **আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে—আমিষ খাদ্য মানুষের খাদ্য নয়, উহা শিয়াল-বিড়ালের খাদ্য, উহা মানুষের পক্ষে অপকারী।**

বয়স্ক নারী-পুরুষেরা কৃশ হয় অজীর্ণ, অম্ল, শুক্রতারল্য, পাইওরিয়া, প্রদর প্রভৃতি ব্যাধি হেতু। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেও শরীর কৃশ হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাধি হেতু কৃশ হইলে সেই ব্যাধির চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে।

খোস-পাঁচড়া, চুলকানি

লক্ষণ—আক্রান্ত স্থানে প্রথমে চুলকানি আরম্ভ হয়, তারপর ঐ স্থানে ফুস্কুড়ির উদয় হয় ; চলতি বাংলায় এইগুলির নাম খোস। আয়ুর্বেদীয় নাম 'কচ্ছু'। এই কচ্ছু হইতে 'খোস' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খোসগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি। অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে আঙুলের ফাঁকে, হাতের কবজিতে, তলপেটে, পায়ে এইগুলি প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই খোসগুলি যখন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং উহাতে পুঁজাদি উৎপন্ন হয়, তখন এইগুলিকে বলে পাঁচড়া। এই পাঁচড়া বড়ো বিরক্তিকর রোগ। এইগুলি সহজে আরোগ্য হইতে চায় না। যতদিন আরোগ্য না হয় ততদিন এইগুলি হইতে পুঁজ-রক্ত পড়িতে থাকে।

চুলকানি বা ঘামাচি অন্য অঙ্গের চেয়ে পিঠেই হয় বেশি। চুলকানি, ঘামাচির আয়ুর্বেদীয় নাম পামা। **"সূক্ষ্মাঃ বহ্বঃ স্রাববন্ত্যঃ প্রদাহাঃ পামেত্যুক্তাঃ পীড়কাঃ কণ্ডুমত্যঃ।"**—এই পামা বা ঘামাচিগুলি অতি ক্ষুদ্রাকারে রোমকূপ জুড়িয়া বহুসংখ্যায় উদিত হয়। এইগুলি অত্যন্ত পীড়াদায়ক, সর্বদা চুলকায়; চুলকাইবার পর এইগুলি হইতে রসস্রাব হয় এবং জ্বালা করে।

কারণ—দেহ দোষযুক্ত হইলে দেহের ভ্রাজক-পিত্তের (আয়ুর্বেদে 'দেহতত্ত্ব বিবরণ' প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ক্রিয়াও দুর্বল হয়। ভ্রাজক পিত্ত তখন আর চর্মপ্রদেশকে রোগমুক্ত রাখিতে পারে না; তর্পকশ্লেষ্মাও ভ্রাজকপিত্তকে এই রোগাক্রমণ প্রতিরোধে যথোচিত ভাবে সহায়তা করিতে পারে না। দেহের এই দোষযুক্ত অবস্থায় এক শ্রেণীর রোগবীজাণু চর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া আশ্রয়-দুর্গ নির্মাণ করে এবং সেখানে নিরাপদে ডিম্ব প্রসব করিয়া বংশবৃদ্ধি করে। অতঃপর এই শত্রুদের সহিত দেহরক্ষাকারী কৃমির অর্থাৎ শ্বেতরক্তাণুর (White Corpuscles) যুদ্ধ শুরু হয়। এই আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুসৈন্য (রোগবীজাণু)

সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিয়া চর্মের বহিঃপ্রদেশে সৈন্যাবাস সৃষ্টি করে। চর্মোপরি অবস্থিত এই সৈন্যাবাস বা রোগবীজাণুর আশ্রয়স্থল-গুলিকেই আমরা বলি খোস-পাঁচড়া বা চুলকানি প্রভৃতি। এই শত্রুসৈন্যাবাসগুলিকে ধ্বংস করার জন্য, চর্মপ্রদেশকে সম্পূর্ণ রোগবীজাণুমুক্ত করিবার জন্য দেহরক্ষী শ্বেত ফৌজবাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করে, বিশ্বস্ত সৈনিকের মতোই ইহারা মৃত্যুবরণেও পশ্চাৎপদ হয় না। যুদ্ধে উভয় পক্ষের নিহত সৈনিকের গলিত শবই রক্তস্রাবরূপে, পুঁজরূপে খোস-পাঁচড়া হইতে নির্গত হয়। সুতরাং এই খোস-পাঁচড়া রোগও সর্বদৈহিক রোগ, ইহার প্রকাশ ঘটে শুধু চর্মপ্রদেশে। কোষ্ঠবদ্ধতা, যকৃতের দুর্বলতা, দেহস্থ রস-রক্তের অশুদ্ধিই এই রোগের প্রত্যক্ষ কারণ।

রক্তে যাহাদের জলীয় অংশ, অসার অংশ বেশি, তাহারাই এই চুলকানি বা ঘামাচি রোগে বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। খাদ্য বিষয়ে অসংযমী শিশুদের, ভোজনবিলাসী স্থূলকায় ব্যক্তিদের এবং কোষ্ঠবদ্ধতারোগীদের রক্ত আংশিক দূষিত হইয়া এই রোগ সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি, অর্ধস্নান বা পূর্ণ স্নান, সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩, নং ৮; উড্ডীয়ান, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

দ্বিপ্রহরে—সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭, ৮—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার, শয়নপশ্চিমোত্তান, সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩, নং ৭ ; অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২।

বয়স্করা এই রোগে বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি অভ্যাস করিবে। এই ধৌতি দ্রুত রোগারোগ্যের সহায়ক।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নানবিধি, জলপানবিধি এবং ১নং বা ২নং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—জীবাণুনাশক মলমাদি দ্বারা খোস-পাঁচড়া ও

চুলকানির অভিব্যক্তিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা অত্যন্ত ক্ষতিকর। জ্বরের প্রবলতার সময় যেমন কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত নয়, জ্বরের তাপ নামিতে আরম্ভ করিলেই চিকিৎসকেরা কুইনাইন প্রয়োগ করেন, এই রোগের প্রথমেও তেমনি কোনো ঔষধ বা মলম ব্যবহার করা উচিত নয়। যাহারা মলমাদি ব্যবহারে ইচ্ছুক তাহারাও রোগের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির পরই উহা ব্যবহার করিবে। দেহপ্রকৃতি দেহসঞ্চিত রোগবিষ খোঁস-পাঁচড়ার সাহায্যে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। এইজন্যই ঔষধ ও মলমাদি দ্বারা এই প্রাকৃতিক রোগারোগ্যের ব্যবস্থাকে বাধা দেওয়া অনিষ্টকর। রোগবৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে যৌগিক ক্রিয়াদির সহিত মলম ব্যবহার করা যাইতে পারে। গন্ধকের মলম খোস-পাঁচড়া আরোগ্যের পক্ষে সহায়ক। স্নানের সময় একখানা তোয়ালে গরম জলে ভিজাইয়া উহাতে সাবান মাখাইয়া রোগাক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিবে; অতঃপর সহ্য মত গরম জল ঢালিয়া খোস-পাঁচড়ার পূঁজ ধৌত করিবে; অতঃপর শরীর শুষ্ক হইলে উহাতে গন্ধকের মলম লাগাইবে।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে সপ্তাহে একদিন উপবাস বিধেয়। উপবাসের দিন পিপাসা অনুযায়ী লেবুর রসসহ পুনঃ পুনঃ প্রচুর জল পান করিবে। আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। অক্ষুধায় বা অল্পক্ষুধায় কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। আমিষ খাদ্য বর্জন করিবে। দুগ্ধ পথ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। শাক-সবজি, রসাল টক ও মিষ্ট ফল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্য এই রোগে সুপথ্য। বমন ধৌতিতে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের দেহে কখনো এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না।

গলগণ্ড রোগ

লক্ষণ—গলদেশের নভঃগ্রন্থিগুলির মাঝে ইন্দ্রগ্রন্থি (Thyroid) একটি সর্বপ্রধান গ্রন্থি, তাহা আমরা গ্রন্থিতত্ত্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থির দৃঢ়

শোথ বা স্ফীতির নামই গলগণ্ড রোগ। এই গ্রন্থিস্থান স্ফীত হইয়া রোগীর উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসে একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে। সাধারণ গলগণ্ড রোগে অন্য কোনোরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা বা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

এই সাধারণ গলগণ্ড রোগ ছাড়া আর একরকম কষ্টদায়ক গলগণ্ড রোগ আছে। এই রোগে চোখের গোলক দুইটি খানিকটা বাহির হইয়া আসে, চোখের পাতা আর স্বাভাবিকভাবে চোখকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, রোগীর বুক ধড়ফড় করে, রোগী সর্বদাই একটা শারীরিক ক্লেশ অনুভব করে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম এক্‌সোপ্‌থ্যাল্‌মিক গয়টার (Exophthalmic Goitre)।

কারণ—দুধ ও শাক-সবজির মাঝে আইওডিন (Iodine) থাকে; প্রাচীন আয়ুর্বেদগ্রন্থে এই আইওডিনের নাম **অরুণক**। দুধ ও শাক-সবজি পথ্য হইতেই আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় অরুণক বা আইওডিন সঞ্চিত হয়। আমাদের দেহস্থ রক্তে আইওডিনের পরিমাণ খুব কম। এই অত্যল্প আইওডিনও আমাদের দেহরক্ষার কাজে অত্যাবশ্যক। রক্ত মধ্যস্থ আইওডিন ইন্দ্রগ্রন্থির প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। এই খাদ্যের অভাবে ইন্দ্রগ্রন্থি দুর্বল হইয়া পড়ে। ইন্দ্রগ্রন্থি দুর্বল হইলে সমগ্র দেহই দুর্বল হইয়া রোগাক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে। এই দুর্বল ইন্দ্রগ্রন্থি দেহের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধানের উপযোগী, দেহস্থ রোগবিষ নষ্ট করার উপযোগী অন্তর্মুখী রস উৎপন্ন করিতে পারে না।

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের খাদ্য সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করে। খাদ্য সরবরাহের পথ রুদ্ধ করিতে পারিলে শত্রুকে পরাভূত করিতে, শত্রুর দুর্গ অধিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। দেহরক্ষী গ্রন্থিদুর্গের মাঝে ইন্দ্রগ্রন্থি একটি প্রধান দুর্গ। আয়ুর্বেদমতে মন্যা নামক নাড়ীদ্বয় এই গ্রন্থির খাদ্য সরবরাহ করে। রক্তের সারভাগ রসধাতু বা শুক্রই গ্রন্থিগুলির খাদ্য। ধমনী বা রক্তবাহী শিরার পাশে পাশেই এই শুক্র বা রসধাতুপ্রবাহের শিরাগুলি

বিদ্যমান। বিশুদ্ধ রক্তই পরিস্রুত হইয়া, মথিত হইয়া শুক্র বা রসধাতুরূপে এই শিরাগুলির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং গ্রন্থিগুলিকে খাদ্য বা পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করে। রোগবিষ বা রোগবীজাণু উক্ত মন্যা নামক নাড়ীদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া ইন্দ্রগ্রন্থির খাদ্য সরবরাহের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, ফলে খাদ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি হয়। এই বাধা অপসারিত না হইলে এই গ্রন্থিস্থান ক্রমশঃ পুরু হয় এবং গ্রন্থি অতিক্রিয় হইয়া ক্রমশঃ দুর্বল ও স্ফীত হইয়া উঠে।

পূর্বেই বলিয়াছি—রক্তে অবস্থিত আইওডিন ইন্দ্রগ্রন্থির একটি প্রধান খাদ্য। কোনো কোনো অঞ্চলের জল ও মাটিতে আইওডিনের পরিমাণ অত্যল্প থাকে; এইজন্য ঐ সব অঞ্চলের শাক-সবজির মাঝে, গোদুগ্ধের মাঝেও আইওডিনের পরিমাণ থাকে খুব কম। এই কারণে এইসব অঞ্চলে গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

সমুদ্রের লবণাক্ত জলে যথেষ্ট আইওডিন থাকে। সমুদ্রের একজাতীয় শেওলা শুকাইয়া দগ্ধ করিয়া আইওডিন তৈয়ারি করা হয়। সমুদ্রের হাওয়ার মাঝেও আইওডিনের ভাগ যথেষ্ট থাকে। এইজন্যই সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কদাচিৎ ঘটে। যে দেশ সমুদ্রতীর হইতে যত বেশি দূরে অবস্থিত, সেই দেশে এই রোগের উৎপাতও সেই অনুপাতে বেশি। এই কারণেই সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চলের বহু লোকের গলগণ্ড রোগ সৃষ্টি হয়। সমুদ্রতীরে বাসের ফলে যে দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, তাহার কারণও বায়ুর সহিত, 'আইওডিন' খাদ্য প্রাপ্তিহেতু ইন্দ্রগ্রন্থির সবলতা।

রক্তে অম্লের ভাগ বৃদ্ধি না পাইলে এই রোগ সৃষ্টি হয় না। সাধারণতঃ দরিদ্র এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ পরিবারে এই রোগ সৃষ্টি হয়। বাংলা ও আসামে এমন বহু গৃহস্থ আছে যাহারা মৎস্য পাইলে অন্য কোনো খাদ্য স্পর্শ করিতে চায় না। দুধ, ফল ও শাক-সবজি প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে অরুচিকর খাদ্য। মৎস্যের একান্ত অভাব না হইলে ইহারা নিরামিষ খাদ্য

গ্রহণ করে না; মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি সম্বন্ধেও ইহারা উদাসীন। এই সব স্বাস্থ্যানভিজ্ঞ লোকেরাই গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৭; মূলবন্ধ, উড্ডীয়ান; অগ্নিসার ধৌতি নং ১, ২ ; বারিসার ধৌতি বা বমন ধৌতি।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, উষ্ট্রাসন, শীর্ষাসন ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৭।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম, আতপস্নান, জলস্নান ও জলপানবিধি যথাসাধ্য অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিছুদিন সমুদ্রতীরে বা সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে গিয়া বাস করিবে। যদি এই সময় স্থান পরিবর্তন সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে ঐ আক্রান্ত ইন্দ্রগ্রন্থিপ্রদেশে প্রত্যহ দুইবার একটু তুলার সাহায্যে আইওডিন লাগাইবে।

ঋতুর সময়, গর্ভাবস্থায়, সন্তানকে স্তনদানের সময় এবং অতিরিক্ত স্বামী সহবাসে মেয়েদের এই ইন্দ্রগ্রন্থিটি অতিক্রিয় হইয়া স্ফীত হয়। অতিরিক্ত সহবাস অথবা অস্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত শুক্রব্যয়ের ফলে পুরুষদেরও এই গ্রন্থিটি কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে। এইরূপ স্ফীতি সাময়িক, সাধারণতঃ এই স্ফীতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; কিন্তু এই স্ফীতি যখন আর হ্রাস পায় না, স্ফীতি যখন স্থায়ী হয় এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সাবধান হইবে। রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত দাম্পত্য ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিবে।

কলেছাঁটা চাল ও আটার পরিবর্তে ঢেকিছাঁটা চাল এবং জাঁতায় ভাঙ্গা গম ব্যবহার করিবে। আমিষ খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দুধ, ফল ও শাক-সবজি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিবে। এইসব নিয়ম-বিধি সহ যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করিলে তরুণ রোগী অচিরেই রোগমুক্ত হইবে।

গোদ

লক্ষণ—এই রোগে শুধু পদদ্বয়ই বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়, কদাচিৎ কখনো হাত আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত স্থানের চামড়া প্রথমে হাতির গায়ের চামড়ার মতো খস্‌খসে ও পুরু হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ ভাঁজে ভাঁজে স্ফীত হইয়া হাতির পায়ের মতো আকার ধারণ করে। এইজন্যই পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম হইয়াছে হাতিরোগ (Elephantiasis)।

কারণ—রক্তবাহী ধমনীগুলির পাশে পাশে আর এক শ্রেণীর ধমনী আছে, আয়ুর্বেদে এইগুলির নাম শুক্রবাহী শিরা। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম Lymph Vessel ; ইহারা রক্তের সারভাগ রসধাতু অর্থাৎ শুক্রকে সর্বাঙ্গে পরিবেশন করে। এই রসধাতু বা শুক্র হইতে দেহের প্রাণকোষ নির্মিত হয়, দেহরক্ষী 'কৃমি' (Corpuscles) উৎপন্ন হয়। দেহের স্নায়ু, গ্রন্থি, অস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত দেহযন্ত্রই এই শুক্র বা রসধাতু হইতে নিজ নিজ পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। একজাতীয় রোগবীজাণু দূষিত রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া পায়ের ঐ শুক্রবাহী শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থানে সঞ্চিত হয় এবং আত্মরক্ষার্থে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে। রোগবীজাণুর এই দুর্গ রচনার ফলে ঐ শিরাগুলিতে স্বাভাবিক রসধাতু প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। এই রসধাতু বা শুক্র প্রবাহ বন্ধ হইলে ঐ স্থান পুরু হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠে এবং গোদ রোগ সৃষ্টি হয়। ইহা গরম দেশের রোগ ; শীতপ্রধান দেশে এই রোগ হয় না।

চিকিৎসা—ভোরে—সহজ বস্তিক্রিয়া (পা ভারী হেতু সহজ বস্তিক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ বিপরীতকরণী অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলে বিপরীতকরণীর পরিবর্তে সহজ বিপরীতকরণী অভ্যাস করিবে) ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; সহজ প্রাণায়াম নং ৪, নং ৫, নং ১০; উড্ডীয়ান; ভ্রমণ-প্রাণায়াম, বারিসার ধৌতি। বৈকালে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—সহজ বিপরীতকরণী, মকরাসন, শয়নপশ্চিমোত্তান, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২ ; জানুশিরাসন ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৭, নং ৯ ; শশাঙ্গাসন।

রোগাক্রান্ত পদদ্বয়কে প্রত্যহ রৌদ্রস্নান করাইবে ; সর্বশরীরেও মাঝে মাঝে আতপস্নান গ্রহণ করিবে। সাধ্যমত ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। ১নং জলস্নানবিধি ও জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—পুলিশ কর্মচারীরা মোজার পরিবর্তে একজাতীয় মোটা ফিতা দ্বারা পা জড়ায়। গোদরোগীও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই এইরূপ ফিতা দ্বারা পা জড়াইয়া রাখার ব্যবস্থা করিবে। শরীরকে দোষমুক্ত রাখিবার জন্য, রক্তকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল প্রভৃতি রোগের নিয়ম ও পথ্যাদি যথাসাধ্য পালন করিয়া চলিবে। চিড়া, মুড়ি প্রভৃতি খাইবে না। চা, মদ্য, ধূমপান, নস্য ও পান প্রভৃতি সমুদয় নেশা সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

জ্বর

লক্ষণ—রূপকের ভাষায় কথা বলা বৈদিক সাহিত্যের একটি বিশেষ রীতি। একই শব্দের সাহায্যে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা গভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। বৈদিক সাহিত্য হইতে উৎপন্ন যোগ, তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই বৈদিক ভাবানুকরণে মাঝে মাঝে রূপকভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে। আয়ুর্বেদে রূপকভাষা প্রয়োগের সুযোগ কম; তবুও আয়ুর্বেদ স্রষ্টা ঋষিদের কবি-মন সময় সময় একটু কবিত্ব প্রকাশ, একটু রূপকভাষা প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

জ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণনা করিতে গিয়া সুশ্রুত ঋষি বলিতেছেন—"**দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধরুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভবঃ**"—দক্ষাপমানহেতু রুদ্রের ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসই জ্বর। দক্ষ শব্দের মূলে 'দশ্' ধাতু। লৌকিক সংস্কৃতে এর

ব্যবহার নাই ; ঋগ্বেদে 'দশ্' ধাতু হইতে 'দশস্য' (যেমন তপ্ ধাতু হইতে 'তপস্যা') এই রূপটি পাওয়া যায়। এই ধাতুটির অর্থ কুশলী হওয়া, সমর্থ হওয়া, সৃষ্টি করা ; সুতরাং এই রূপকটির মূল অর্থ—সৃষ্টিশক্তির (দক্ষের) অপমান হেতু রুদ্র বা প্রাণের যে ক্ষোভ, তাহাই জ্বর প্রদাহ। আধুনিক চিকিৎসকরাও বলেন, জ্বর কোনো মূল রোগ নয়—অন্য কোনোও প্রাণবিকারের একটা চিহ্ন মাত্র।

দক্ষ ও তাঁহার জামাতা রুদ্র বা শিবঘটিত পুরাণের কাহিনী হিন্দু মাত্রেরই জানা আছে। 'দক্ষ' শব্দের আর একটি অর্থ পিত্ত। দেহস্থ অগ্নির নামই পিত্ত। দেহস্থ পিত্তই খাদ্যবস্তু জীর্ণ করিয়া দেহে তাপ সৃষ্টি করে। **"উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরো নাস্তি উষ্মণা বিনা"**—পিত্ত ব্যতীত দেহে তাপ সৃষ্টি সম্ভব নয়, তাপ ব্যতীত জ্বর সৃষ্টি হয় না—সুতরাং জ্বররোগের মূলে পিত্তের প্রকোপ বিদ্যমান। পিত্ত প্রকুপিত হইলে বায়ু আর স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না, বায়ুও প্রকুপিত হইয়া উঠে। প্রকুপিত পিত্ত এবং বায়ুর ক্রিয়া বৈষম্যের ফলেই দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, দেহের বিনাশ ঘটে। যে নিয়মে একটা দেহ বিনষ্ট হয়, সেই নিয়মে একটা ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ ঘটে। ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অগ্নি বা সূর্য প্রতপ্ত হইয়া উঠিলে এই অগ্নিকে বায়ু আর যখন শীতল করিতে পারে না, তখন বায়ুও অত্যধিক প্রতপ্ত হইয়া উঠে—ফলে ব্রহ্মাণ্ড প্রতপ্ত বায়ুও অগ্নি কর্তৃক দগ্ধ হইয়া ধ্বংস হইয়া যায়। প্রলয়কারী ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবতার নিঃশ্বাসই যেন এই প্রতপ্ত বায়ু। দেহের সর্বনাশকারী এই প্রকুপিত পিত্ত ও বায়ুই জ্বর রোগের মূল। এইজন্যই আয়ুর্বেদের ঋষি রূপকের ভাষায় জ্বরকে বলিতেছেন—**"দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধরুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভবঃ"**।

"জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্-দ্বন্দ্ব-সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ"—জ্বর আট প্রকার, পৃথক—অর্থাৎ একদোষযুক্ত, যেমন—বাতজ, পিত্তজ বা শ্লেষ্মাজ ; দ্বন্দ্বজ—অর্থাৎ দ্বিদোষসম্পন্ন, বাত-পিত্তজ, বাত-শ্লেষ্মাজ বা পিত্ত-শ্লেষ্মাজ ; সংঘাতজ—অর্থাৎ সন্নিপাতজ বা ত্রিদোষমিশ্রিত ; আগন্তুজঃ—

অর্থাৎ বাহির হইতে যে রোগবীজাণু আসিয়া দেহকে আক্রমণ করে, তাহা হইতে জাত।

কারণ—"মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষাঃ হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ"— অবিহিত আহার-বিহারের ফলে মন্দাগ্নি উপস্থিত হয়। অজীর্ণ খাদ্যরস অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বিকৃত হইয়া রোগবিষে পরিণত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে অন্ত্র হইতে মল প্রত্যহ যদি অপসারিত না হয়, তাহা হইলে ঐ মল পচিয়া অন্ত্রকে বিষাক্ত করে। এই বিষাক্ত রোগবিষের মাঝে রোগবীজাণু উৎপন্ন হইতে থাকে। শরীরের রক্তও ঐ অন্ত্রের দূষিত রসের সংস্পর্শে আসিয়া দূষিত হইতে থাকে এবং রক্তের ভিতর দিয়া ঐ রোগবিষ সর্বদেহে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই রোগবিষ যখন উপর দিকে উঠিয়া মস্তক আক্রমণ করে, তখন রোগীর মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। উহা যখন হাত-পায়ের পেশীগুলিকে আক্রমণ করে, তখন হাতে-পায়ে জ্বালা-বেদনা আরম্ভ হয়। শরীরে এই রোগবিষ ও রোগবীজাণু প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীররক্ষী জীবাণুগুলি সংখ্যায় বর্ধিত হয় এবং উহারা রোগবীজাণু ধ্বংসের কাজে আত্মনিয়োগ করে। দেহস্থ পঞ্চপাচকাগ্নিও এই সময় সক্রিয় হইয়া সমগ্র দেহে একটা তাপ সৃষ্টি করে। শরীরের এই তাপ রোগবীজাণু সৃষ্টিতে বাধা উৎপন্ন করে এবং রোগবিষ ও রোগবীজাণুগুলিকে যথাসাধ্য দগ্ধ করে। প্লীহা ও যকৃৎ এই সময় প্রচুর রক্তাণু (Red Corpuscles) সৃষ্টি করিয়া রোগবীজাণুদের দ্বারা নিহত রক্তাণুগুলির শূন্যস্থান পূরণ করে এবং রক্তকে শোধন করিয়া রক্তের বিষ নষ্ট করিয়া রক্তকে ক্ষারধর্মী রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই সময়ে দেহরক্ষাকারী কৃমি বা রোগবীজাণুগুলির সহিত রোগবীজাণুর পুরাণবর্ণিত দেবাসুর সংগ্রামের মতো ভয়াবহ সংগ্রাম শুরু হয়। এই সময় হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলি অধিকতর সক্রিয় হইয়া দেহরক্ষী কৃমিবাহিনীকে সহায়তা করে। এইজন্যই জ্বরের সময় হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন বাড়িয়া যায়, রোগীর নাসিকা হইতে উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে। এই যুদ্ধে দগ্ধ রোগবিষ ও নিহত

রোগবীজাণু নিঃশ্বাসের সহিত, প্রস্রাবের সহিত, ঘর্মের সহিত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। এইজন্যই রোগীর নিঃশ্বাস, প্রস্রাব ও ঘর্ম এই সময়ে খুব দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই যুদ্ধে শত্রুসৈন্য (রোগবীজাণু) পরাভূত হইলে অগ্নিগ্রন্থি ও বায়ুগ্রন্থিগুলির অতিক্রিয়তা শান্ত হয়, রোগীর দেহের তাপ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগবীজাণু সাময়িকভাবে পরাভূত হইলে আবার উহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরাক্রমণ আরম্ভ করে। আবার উভয়পক্ষে সংগ্রাম শুরু হয়, দেহে জ্বরের আবির্ভাব হয়। শত্রুবাহিনী স্থায়ীভাবে পরাভূত হইলে আর সংগ্রামের প্রয়োজন হয় না, জ্বরের আর পুনরাবির্ভাব ঘটে না।

চিকিৎসা—জ্বর বর্ধিত হওয়ার সময় কোনো চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে না, নির্বিঘ্নে জ্বরকে বর্ধিত হইতে দিবে। জ্বর বর্ধিত হওয়ার সময় যে কোনো একটা নাসিকাতেই শ্বাস প্রবল থাকে। জ্বর হ্রাস পাওয়ার সময় ঐ নাসিকার শ্বাস পরিবর্তিত করিয়া অন্য নাসায় প্রবাহিত করিয়া দিবে। এই সময় শ্বাস পরিবর্তনে সক্ষম হইলে জ্বর দ্রুত আরোগ্য হইবে। বলা বাহুল্য, পূর্ব হইতেই শ্বাসের উপর একটু আধিপত্য না থাকিলে রোগের সময় ইচ্ছামত শ্বাস পরিবর্তন করা যায় না। জ্বর প্রশমিত হইলে সহজ বস্তিক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। এই বস্তিক্রিয়া, শ্বাস পরিবর্তন এবং উপবাসেই সাধারণ জ্বররোগী আরোগ্য লাভ করে।

নিয়ম ও পথ্য—**"তরুণং তু জ্বরং পূর্বং লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নয়েৎ"**—সাধারণ তরুণ জ্বর শুধু উপবাস দ্বারাই আরোগ্য করিবে, এই তরুণ জ্বরে কোনো ঔষধ খাইবে না—ইহাই আয়ুর্বেদাচার্যদের নির্দেশ। তরুণ-তরুণী এবং প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের দেহই উপবাস গ্রহণের উপযুক্ত। (বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপবাসে লঘুপথ্য গ্রহণীয়।) **"লঙ্ঘনং লঙ্ঘনীয়স্তু কুর্যাদ্ দোষানুরূপতঃ। ত্রিরাত্রম্ একরাত্রং বা অহোরাত্রমথবা জ্বরে।"**—শারীরিক দোষের অনুপাতে জ্বররোগীর এক রাত্রি, এক দিন-

রাত্রি অথবা তিন দিন ও তিন রাত্রি উপবাসের ব্যবস্থা করিবে। **জ্বরো লঙ্ঘনেঽপি জলং পিবেৎ, সর্বাস্ববস্থাসু ন কশ্চিদ্ বারি বর্জয়েৎ**— জ্বররোগে উপবাসের সময় প্রচুর জলপান করিবে। রোগের সকল অবস্থাতেই জলপান বিধেয়, কোনো কারণেই জলপান বন্ধ করিবে না। যতক্ষণ শীত, কম্প প্রভৃতি থাকে ততক্ষণ গরম জল পান করিবে। শীত-কম্প প্রশমিত হইলে বিশুদ্ধ শীতল জল পান করিবে। কোষ্ঠ যত ক্রুরই হউক না কেন, তিনদিন উপবাস এবং সহজ বস্তিক্রিয়া প্রয়োগে অবশ্যই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

সাধারণ জ্বর রোগ নয়, রোগের পূর্বসূচনা। রোগের সূচনায় দেহরক্ষাকারী, দেহ আরোগ্যকারী শক্তির উত্তেজনা এবং সক্রিয়তা জ্বর রূপে প্রকাশ পায়। **জ্বর হইলেই কুইনাইন প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা জ্বর বন্ধ করার চেষ্টা করিলে উহা দেহের স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তির সর্বনাশ সাধন করে।** এইজন্যই আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে রোগ প্রকাশ মাত্রই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। **দেহের নিজস্ব আরোগ্যকারী শক্তি যতদিন সবল থাকে, ততদিন কোনো রোগই দেহে দীর্ঘ স্থায়ী হইতে পারে না। অজ্ঞলোক ঔষধের অপকারিতার বিষয় না জানিয়া যখন তখন ঔষধ গ্রহণ করিয়া দেহের এই আরোগ্যকারী শক্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়— এইজন্যই অত্যধিক ঔষধসেবীর দেহ কখনো সুস্থ থাকে না, এক রোগ দূর হইতে না হইতেই আর এক রোগ আসিয়া তাহার দেহ আক্রমণ করে।**

ঔষধের অপকারিতা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদাচার্যেরা বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন। এইজন্য ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধেও তাঁহারা খুব সতর্ক ছিলেন। আয়ুর্বেদমতে—**বাতিকে সপ্তরাত্রেণ, দশরাত্রেণ পৈত্তিকে, শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্**—যে জ্বরের মূলে আছে বায়ুর প্রকোপ, বায়ুদুষ্টি, তিনদিন উপবাসে এবং উপবাসের পর তিনদিন লঘুপথ্য গ্রহণেও যদি সেই জ্বর ত্যাগ না হয়, তাহা হইলে সপ্তম দিনে রোগারোগ্যের জন্য

ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিবে। এইরূপে পৈত্তিক জ্বরে দশম দিনে এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশ দিনে ঔষধ গ্রহণ করিবে। দেহের আরোগ্যকারী শক্তিকে পূর্ণরূপে জাগ্রত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণেতারা এত বিলম্বে ঔষধ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়াছেন। এই নিয়মে ঔষধ প্রযুক্ত হইলে দেহের আরোগ্যকারী শক্তিকেই সহায়তা করা হয়। **যোগশাস্ত্রমতে ঔষধ প্রয়োগের মোটেই প্রয়োজনীয়তা নাই** ; সুতরাং ঔষধ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শীত ও কম্প থাকিলে দ্বিপ্রহরে রোগীর মাথা প্রচুর জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিবে। অতঃপর রোগীকে একটা জলের টাবে নাভি পর্যন্ত ডুবাইয়া ৫ মিনিট বসাইয়া রাখিবে। জলে বসাইয়া রাখিবার সময় রোগীর গায়ে যেন জামা থাকে। জ্বরের বেগ ১০৪ ডিগ্রি বা তার চেয়ে বেশি হইলে একখানা ভিজা তোয়ালে বা গামছা রোগীর মাথায় স্থাপন করিবে। ঐ তোয়ালে বা গামছায় রোগীর মাথা ও ঘাড়ের খানিকটা যেন ঢাকা পরে। প্রয়োজনমতো ঐ তোয়ালের উপর প্রচুর শীতল জল ঢালিবে বা বরফ-থলি প্রয়োগ করিবে। বলা বাহুল্য, খালি মাথার উপরে কখনো বরফ-থলি স্থাপন করিতে নাই। খালি মাথার উপর খুব দীর্ঘ সময় জল ঢালাও উচিত নয়। এইজন্যই মস্তকের উপর তোয়ালে অথবা গামছা রাখার বিধান।

যতক্ষণ রোগীর ভালো ক্ষুধা বোধ না হয়, ততক্ষণ রোগীকে জল ছাড়া অন্য কোনো পথ্য দিবে না। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দুধ-সাগু, দুধ-বার্লি, ফলের রস প্রভৃতি পথ্য দিবে। জ্বর হইলে শিশু ও বৃদ্ধদের একদিন মাত্র উপবাসে রাখিবে। একদিন উপবাসের পরও যদি উহাদের ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে কমলার রস, আখের রস বা আঙ্গুর-বেদানার রস খাইতে দিবে। এইসব ফলের রস স্বয়ং পাচ্য পদার্থ; ইহাদের পরিপাকের জন্য পাকস্থলীকে বিব্রত হইতে হয় না, ইহারা নিজের রসে নিজেই জীর্ণ হয়।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া জ্বর আয়ুর্বেদে সম্ভবতঃ বাত-জ্বরের অন্তর্গত। এই রোগটি কলেরা-বসন্তের মতো গরম দেশের রোগ। এক শতাব্দী পূর্বেও আমাদের দেশে এই রোগটির বিশেষ আধিপত্য ছিল না। বর্তমান যুগে এই রোগটির অপ্রতিহত প্রাধান্যের জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের নিকট হইতে এই রোগটি 'ম্যালেরিয়া' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি এই নামটি নির্বাচন করিয়াছেন তাঁহার ধারণা ছিল 'ম্যাল্-এয়ারি' (Mal-aire) অর্থাৎ দূষিত বায়ু গ্রহণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এইজন্যই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ম্যালেরিয়া। বর্তমানে এই নামটিই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করিয়া সর্বদেশে স্বনামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কম্প দিয়া জ্বর আসাই এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

কারণ—স্বাভাবিক সুস্থ দেহেও ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু থাকে ; শরীরের রক্ত বিষাক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই রোগবীজ দেহের কোনো অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। রক্ত দূষিত হইয়া নিস্তেজ হইলে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু রক্তমধ্যস্থ লাল রক্তাণুকোষের মাঝে ঢুকিয়া পড়ে। রক্তমধ্যস্থ লাল রক্তাণু (Red Corpuscles) ও শ্বেতরক্তাণুর (White Corpuscles) কার্যকারিতার বিস্তৃত বিবরণ "রক্তহীনতা রোগ" প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সহিত উহার সরবরাহ বিভাগের নিরস্ত্র বাহিনীর যেরূপ সম্পর্ক, শ্বেতকণিকাগুলির সহিত লাল রক্তাণুগুলির সেই সম্পর্ক। শ্বেতরক্তাণু দ্বারা সুরক্ষিত না থাকিলে লাল রক্তাণুগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সুযোগ পাইলেই রোগবীজাণুগুলি নিরীহ লালরক্তাণুগুলিকে মারিয়া নিজেদের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে। দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুগুলির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ম্যালেরিয়া বীজাণু লাল রক্তাণুগুলিকে মারিয়া উহার কোষের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে এবং নিরূপদ্রবে ঐ কোষের মাঝে ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলি যখন স্ফুটনোন্মুখ

হয়, তখন কোষটি ফাটিয়া যায় এবং ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে। নবোৎপন্ন রোগবীজাণুগুলিও পূর্ব্ববৎ এক একটি লাল রক্তাণুকোষকে নিহত করিয়া উহার ভিতরে অবস্থিত হইয়া নিরুপদ্রবে বংশবৃদ্ধির আয়োজন করে। এইভাবে রক্তের মাঝে ক্রমশঃ ম্যালেরিয়া রোগবীজাণুরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। প্লীহা এই ম্যালেরিয়া রোগবীজাণুগুলিকে স্বীয় কোষে আবদ্ধ করিয়া ধ্বংস করিতে থাকে। দেহস্থ শ্বেতরক্তাণু উৎপাদক গ্রন্থিগুলি এই বিপদের সময় প্রচুর পরিমাণে শ্বেতরক্তাণু সৃষ্টি করিতে থাকে। ম্যালেরিয়া রোগবীজাণুগুলি প্রবলতর হইয়া এই গ্রন্থিগুলির সমবেত চেষ্টাকে যখন ব্যর্থ করিয়া দেয়, তখন অতিক্রিয় হইয়া প্লীহার আকার বর্ধিত হইতে থাকে, যকৃৎও অতিক্রিয় হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টির ইহাই প্রাথমিক ইতিহাস।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে 'এনোফিলিস' নামক একজাতীয় মশকই এই রোগ মানবদেহে সংক্রামিত করে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের এই মত আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়। আমরা যেন বিশেষভাবে মনে রাখি—ম্যালেরিয়া রোগবীজাণুর আদি উৎপত্তিস্থান মানবদেহ, মশকদেহ নয়। মানবদেহ হইতেই রক্তের সঙ্গে এই রোগ মশককুল গ্রহণ করে। এই এনোফিলিস মশকদের মাঝেও শুধু নারী-এনোফিলিস মশকরাই এই রোগ বিস্তৃতির বাহন। ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু বিনা বাধায় এই মশকদেহে বংশ বিস্তার করে। মশকের লালাগ্রন্থিতেও এই রোগবীজাণু আসিয়া আশ্রয় লয়। মশকদংশনের সময় এই রোগবীজ মশকের লালার সহিত মানবদেহে প্রবেশ করে।

আবদ্ধ জলই মশকের ডিম্ব প্রসবের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এইজন্য বর্ষাকালেই মশকের বংশবৃদ্ধি হয় বেশি। বর্ষাকালে মাটি হইতে একটা বিষাক্ত গ্যাস নিঃসৃত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। এই দূষিত বায়ু গ্রহণে মানুষের জীবনীশক্তি স্বভাবতঃই একটু দুর্বল হইয়া পড়ে, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগ এবং ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয়। এইজন্য বর্ষাকাল

এবং বর্ষার পরও ২/১ মাস অর্থাৎ হেমন্তকাল ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির সময়।

নিরীহ রক্তাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া বীজাণু কিভাবে বংশ বৃদ্ধি করে, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই জীবাণুগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। এই পূর্ণাঙ্গ রোগবীজাণুগুলি রক্তাণুকোষ বিদীর্ণ করিয়া যখন লক্ষ কোটি সংখ্যায় রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে, তখন গাত্রচর্মের রক্তও দেহাভ্যন্তরে ধাবিত হয়—শত্রুর আক্রমণ হইতে দেহযন্ত্রগুলিকে বাঁচাইবার জন্য। শত্রুর এই আক্রমণের জন্য শ্বেতরক্তাণুগুলি, দেহস্থ যন্ত্রগুলি উত্তেজিত হইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যত হয়। দৈহিক যন্ত্রগুলির এই উত্তেজনার ফলেই রক্ত গরম হয়, রক্তে তাপ উৎপন্ন হয়। শরীরে রোগবীজাণু ধ্বংসের উপযোগী তাপ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে চর্মের রক্ত আবার চর্মে ফিরিয়া আসে। যতক্ষণ চর্মপ্রদেশের রক্ত চর্মে ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণই রোগী শীত ও কম্প অনুভব করে। এইজন্যই শীত ও কম্পসহ ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হয়।

এই শীত এবং কম্প অবস্থা কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্রমশঃ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে পাকস্থলীতে বা গ্রহণী নাড়ীতে অজীর্ণ খাদ্য থাকিলে উহা পিত্তসহ বমি হইয়া যায়। শারীরিক অস্থিরতা, মাথাধরাও এই সময় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতঃপর রোগবীজাণু যখন নিস্তেজ হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে আরম্ভ করে, তখন শরীরের তাপও কমিতে থাকে। ম্যালেরিয়া রোগবীজাণুগুলির যুদ্ধের অস্ত্র উহাদের বিষাক্ত লালা (Toxin)। এই বিষাক্ত লালার বিষক্রিয়া নষ্ট করার জন্য একজাতীয় বিষঘ্নরস (Anti-Toxin) রক্তে উৎপন্ন হয়। এই বিষঘ্ন রসের সহায়তায় শ্বেতরক্তাণুগুলি ম্যালেরিয়া রোগবিষ এবং রোগবীজাণুগুলিকে ধ্বংস করে। পরাজিত রোগবীজাণুর বিষাক্ত লালা রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে, চর্মপ্রদেশের ঘর্মগ্রন্থিগুলি তখন ঘর্ম সৃষ্টি করিয়া ঐ বিষাক্ত লালা বা রোগবিষ ঘর্মের সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়, রোগীর শরীর তখন ঘর্মে সিক্ত হইয়া উঠে। ঘর্মের

ভিতর দিয়া এই রোগবিষ বহু পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় রোগী তখন স্বস্তি বোধ করে। শরীরের তাপ তখন নামিয়া গিয়া জ্বর বন্ধ হয়, মাথাধরা দূর হয়। অতঃপর পরাজিত রোগবীজাণুগুলি রণক্লান্তি দূর করার জন্য এবং সাহায্যকারী নূতন সৈন্য সরবরাহ পাওয়ার আশায় ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করে। পরদিন আবার যথাসময়ে যথানিয়মে রোগবীজাণু অধিকৃত অসংখ্য লালরক্তাণুকোষ বিদীর্ণ হইয়া অসংখ্য নববলে বলীয়ান রোগবীজাণু বা শত্রুসৈন্যের আবির্ভাব ঘটে। আবার পূর্বদিনের মতো উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়। যতক্ষণ শত্রুসৈন্য নিস্তেজ ও নির্জীব না হয়, ততক্ষণ আর লড়াই থামে না, জ্বরেরও বিরাম হয় না।

জ্বর যদি প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় আসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মিত্রপক্ষ এবং শত্রুপক্ষ অর্থাৎ দেহরক্ষাকারী কৃমি এবং দেহধ্বংসকারী রোগবীজাণু সমান বলে বলীয়ান। যদি জ্বর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শত্রুই প্রবলতর হইয়া মিত্রপক্ষকে স্থানচ্যুত করিতেছে। জ্বর নির্দিষ্ট সময়ের পরে আসিলে মিত্রপক্ষের ভাবী জয়লাভই সূচিত করে, দ্রুত রোগমুক্তি ঘটে।

ম্যালেরিয়া বীজাণু যখন অত্যধিক পরিমাণে লালরক্তাণুগুলিকে ধ্বংস করে এবং দুর্বল দেহ যখন আর অধিক পরিমাণে লালরক্তাণু সৃষ্টি করিয়া যথোচিত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না, তখন লালরক্তাণুর অভাবে দেহের রক্তও নিস্তেজ ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, রোগীর রক্তহীনতা রোগ উপস্থিত হয়। এইজন্যই ম্যালেরিয়া রোগ প্রবল হইলে উহার সহিত রক্তহীনতা রোগ যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, যে কারণে অন্যান্য রোগ হয়, ম্যালেরিয়া রোগের কারণও তাহাই অর্থাৎ শরীরে অত্যধিক দূষিত পদার্থের সঞ্চয় এবং রক্তের জীবনীশক্তি হ্রাস। সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতা, দূষিত বায়ুগ্রহণ, দূষিত জলপান, অসংযম, দুগ্ধাদি পুষ্টিকর পথ্যের অভাবই ম্যালেরিয়া রোগের প্রত্যক্ষ কারণ—মশক দংশন নিমিত্ত কারণ মাত্র।

চিকিৎসা—যতদিন জ্বর থাকিবে, ততদিন জ্বর চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে। জ্বর বন্ধ হইলে (ভোরে)—সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২; উড্ডীয়ান, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩ এবং বারিসার ধৌতি। ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, শয়নপশ্চিমোত্তান, যোগমুদ্রা, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, সহজ অগ্নিসার, শশাঙ্গাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৫। **ভ্রমণ প্রাণায়াম ভালভাবে আয়ত্ত হইলে এবং দীর্ঘ সময় অভ্যাস করিলে ম্যালেরিয়া রোগ আর দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না।**

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রমতে একমাত্র কুইনাইন ম্যালেরিয়া রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ। বলা বাহুল্য, ম্যালেরিয়া রোগারোগ্যে কুইনাইনের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। কুইনাইনের বিষে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণুগুলি ধ্বংস হয়, সেই সঙ্গে দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুগুলিও ধ্বংস হয়। দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুগুলির অকালমৃত্যু দেহের রোগপ্রতিষেধক শক্তিকে হ্রাস করে।

কুইনাইন বিষে শ্বেতরক্তাণুগুলি ধ্বংস হইলেও লালরক্তাণুগুলির উহাতে কোনো অনিষ্ট হয় না। এই অরক্ষিত লাল রক্তাণুগুলিকে অধিকার করিয়া ম্যালেরিয়া বীজাণু উহার ভিতরে নিরুপদ্রবে ডিম পাড়িয়া বংশবৃদ্ধি করে—এই বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কুইনাইন ম্যালেরিয়া বীজাণু দ্বারা অধিকৃত এই লাল রক্তাণুগুলির কোনো অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। রোগবীজাণু দ্বারা অধিকৃত এই লাল রক্তাণু কোষগুলি যথাসময়ে ফাটিয়া গিয়া আবার সমস্ত রক্তের মাঝে ম্যালেরিয়া বীজাণু ছড়াইয়া দেয়। এইজন্যই কুইনাইন কখনো নির্মূলভাবে ম্যালেরিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারে না।

ম্যালেরিয়া রোগ আরোগ্যের জন্য অত্যধিক কুইনাইন সেবন বা কুইনাইন ইন্‌জেকশন নেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর। আমাদের দেহপ্রকৃতি

দৈনিক ৫/৭ গ্রেন কুইনাইন বিষ মূত্রাদির সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে। ইহার বেশি কুইনাইন বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা দেহের নাই। যাহারা দ্রুত ম্যালেরিয়া রোগ আরোগ্যের জন্য দৈনিক ১৫/২০ গ্রেন কুইনাইন সেবন করে বা কুইনাইন ইন্‌জেকশন নেয়, তাহারা নিজ দেহের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করে। প্লীহা ও যকৃৎ এই কুইনাইন বিষ রক্ত হইতে ছাঁকিয়া নিজের অঙ্গে শোষণ করিয়া লয়—ঐ বিষ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দিনের পর দিন কুইনাইন বিষ দেহে সঞ্চিত হওয়ায় প্লীহা ও যকৃৎ ঐ বিষ নষ্ট করিতে পারে না; উপরন্তু এই বিষ প্লীহা-যকৃতের সর্বনাশ সাধন করে, প্লীহা ও যকৃতের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়; রোগীর আর রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা থাকে না; রোগীর স্বাস্থ্যলাভের আশা চিরদিনের মতো তিরোহিত হইয়া যায়। **এইজন্যই আমরা সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে কুইনাইন সেবনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছি।**

ম্যালেরিয়া জ্বরের বহু প্রকারভেদ আছে। একদিন বা দুইদিন অন্তর অন্তর জ্বর আসিলে উহাকে বলে **পালা জ্বর**। জ্বর সম্পূর্ণ ত্যাগ না হইয়া জ্বরের উত্তাপ কিছু নামিবার পর পুনরায় জ্বর আসাকে বলে **স্বল্পবিরাম জ্বর** (Remittent Fever)। এই স্বল্পবিরাম জ্বরই প্রবল হইয়া **সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে** (Malignant Malaria or Pernicious Malaria) পরিণত হয়। রোগের সূচনা হইতে সতর্ক হইয়া জ্বর ও ম্যালেরিয়া চিকিৎসাবিধি এবং নিয়ম-পথ্য ও উপবাসবিধি পালন করিয়া চলিলে এইসব মারাত্মক জ্বর হইতেও আত্মরক্ষা করা যায়।

নিয়ম ও পথ্য—দেশে কুইনাইন উৎপাদক সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাষ বাড়াইয়া এবং মশককুল ধ্বংস করিয়া এই রোগ তাড়াইবার পরিকল্পনা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

পাহাড়-জঙ্গলের অর্ধসভ্য বা অসভ্যেরা মশারী টাঙায় না। দৈনিক সহস্র মশকের দংশনেও তাহাদের ম্যালেরিয়া হয় না। শরীরে জীবনীশক্তি

অটুট থাকিলে ম্যালেরিয়া বীজাণুবাহী মশকের দংশনেও ম্যালেরিয়া হয় না। যখন এই অসভ্যজাতির জীবনযাত্রাপ্রণালী সভ্যসমাজের মতো অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে, তখন ইহারাও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় রোগীকে সাধারণ জ্বর রোগের অনুরূপ পথ্য দিবে। রোগ পুরাতন হইলে বিজ্বর অবস্থায় ভাত, তরিতরকারি, ডালের জুস, পাতলা দুধ প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। জ্বরের পুনরাক্রমণ বন্ধ হইলে লঘুপাক ও পুষ্টিকর পথ্য গ্রহণ করিবে। সুস্থ অবস্থায় যাহারা দৈনিক অন্ততঃ আধসের তিনপোয়া দুধ পান করে, ম্যালেরিয়া রোগ তাহাদের সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। দুগ্ধাভাব, দুগ্ধে অরুচি, বিশুদ্ধ জলের অভাব এবং স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির কারণ।

কালাজ্বর (Black Fever)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় গারোপর্বতবাসী গারোজাতিদের মাঝে এই রোগটির বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। গারো ভাষায় 'আজার' মানে রোগ। এই রোগে শরীরের বর্ণাভা কালো হয়, এইজন্য ইহার নাম 'কাল-আজার'। এই কাল আজার নামই সংক্ষিপ্ত হইয়া কালাজ্বর হইয়াছে। গারোপাহাড় অঞ্চল হইতে এই রোগ আসাম, বাঙলা এবং বিহারে ছড়াইয়া পড়ে। এই জ্বর সাক্ষাৎ কাল বা মৃত্যুস্বরূপ, এইজন্যও ইহার নাম **কালাজ্বর**। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে এই রোগের বীজাণুর নাম '**লিসম্যানিয়া**'।

লক্ষণ—এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে রোগীর মুখের লাবণ্য দূর হইয়া মুখের চেহারা কালো হইয়া উঠে, রোগীর প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শক্ত

হয় ; যকৃৎও রুগ্ন এবং বৃহৎ হয়। রোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। এই জ্বর ১০২/১০৩ ডিগ্রির উপর কখনো উঠে না। ৯৯ ডিগ্রি পর্যন্ত নীচে নামে। দিনের মাঝে এইরূপ দুইবার বা তিনবার জ্বর হয় এবং কিছু সময় থাকিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। কুইনাইন প্রয়োগে এই জ্বর বন্ধ হয় না। এই জ্বরে রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার থাকে এবং ক্ষুধার জোর থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। শরীর রক্তহীন এবং অস্থি-চর্মসার হইয়া পড়ে। গায়ের রং ও জিহ্বার রং ক্রমশঃ কালো হয়, মাথার চুল ঝরিয়া পড়ে। এই অবস্থায় রোগীর পেটের অসুখ ও আমাশয় লাগিয়াই থাকে। সময় সময় রক্ত বমন হয়। সর্বদাই রোগীর খুসখুসে কাশি থাকে। রোগীরা সাধারণতঃ এই স্বল্প জ্বরকে গ্রাহ্য না করিয়া যথানিয়মে সাংসারিক কর্তব্যাদি সম্পন্ন করে।

কারণ—আধুনিক চিকিৎসকদের মতে মশার চেয়েও ক্ষুদ্র একজাতীয় পোকার (Sand fly) দংশনে এই রোগ সৃষ্টি হয়। এই পোকাগুলিই দংশনের সময় দেহে কালাজ্বরের বীজ ঢুকাইয়া দেয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের এই সিদ্ধান্ত সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, উহা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, দেহের রোগ প্রতিষেধক শক্তি হ্রাস পাইলে, দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইলে দেহে অসংখ্য রকমের ব্যাধিবিষ, অসংখ্য রকমের ব্যাধিবীজাণু সৃষ্টি হইতে পারে। এইসব ব্যাধির জন্য মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের ঘাড়ে দোষ চাপানো নিরর্থক। ব্যাধির মূল কারণ রোগীর দেহেই নিহিত থাকে। ম্যালেরিয়া রোগের প্রাধান্য যেখানে, এই রোগটিরও প্রাদুর্ভাব সেখানেই বেশি। যাহারা অনেকদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ক্ষীণজীবী হইয়াছে, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং এই রোগটি ম্যালেরিয়া রোগের নিকট আত্মীয়।

আমাদের মতে—ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যখন কুইনাইন বিষের 'প্রতিষেধক বিষ' সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তখনই

উহারা কালাজ্বরের রোগবীজাণুতে পরিণত হয় এবং কুইনাইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ; বলা বাহুল্য, ম্যালেরিয়া রোগের সংস্পর্শ ব্যতীতও এই রোগটির সৃষ্টি হইতে পারে।

চিকিৎসা—(ভোরে) বিজ্বর অবস্থায় ৩নং সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি, সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার ধৌতি, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৭ ; বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার ধৌতি, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, পবনমুক্তাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩; শশাঙ্গাসন।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি ও জলপানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—ম্যালেরিয়া জ্বরের অনুরূপ।

কালাপানি জ্বর (Black Water Fever)

লক্ষণ—কালাজ্বরের চেয়েও ভয়াবহ এবং মারাত্মক আর একটি জ্বরের প্রাধান্য আছে আমাদের দেশে—ইহারই আধুনিক নাম 'ব্ল্যাক্-ওয়াটার ফিভার' বা কালাপানি জ্বর। একাদিক্রমে ২/৩ দিন এই জ্বর স্থায়ী থাকিয়া হ্রাস পাইতে থাকে। পুনরায় জ্বর বৃদ্ধির সময় অতি অল্প পরিমাণে কালো বা বেগুনি রংয়ের প্রস্রাব হয়। এই কালো রংয়ের প্রস্রাবের জন্যই রোগটি 'ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

কারণ—যাহারা কখনো কুইনাইন সেবন করে না, তাহাদের কখনো এই রোগ হয় না। কুইনাইন আবিষ্কারের পূর্বে এই রোগটির অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের মতে ম্যালেরিয়া রোগে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের অপরিহার্য পরিণাম এই 'ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার'। যাহারা দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া রোগে ভোগে এবং যথেচ্ছভাবে কুইনাইন সেবন করে, তাহারাই পরে এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের প্রবল অবস্থায় হৃদ্স্পন্দন বন্ধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কালাজ্বরের মতোই এই রোগেও কুইনাইন প্রয়োগে কোনো উপকার হয় না, উপরন্তু উহা রোগবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমাদের ধারণা, কুইনাইন বিষে প্লীহা, যকৃৎ এবং রক্ত যখন জর্জরিত হইয়া পড়ে, প্লীহা-যকৃতের কর্মশক্তি যখন কুইনাইন বিষে নষ্ট হয়, তখন আর দেহযন্ত্রের শ্বেতরক্তাণু এবং লাল রক্তাণু সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না; তখনই এই রোগটির সৃষ্টি হয়। কুইনাইন বিষ দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেহের রোগ প্রতিষেধক শক্তিকে নষ্ট করে, ফলে লালরক্তাণুগুলিও অরক্ষিত থাকিয়া রোগবীজাণুর আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। এই মৃত লালরক্তাণুগুলি গলিত হইয়া প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া আসে ; এইজন্য প্রস্রাবের রং হয় কালো বা লাল। যে রক্তাণুকোষগুলি রক্তে অবশিষ্ট থাকে উহারা রোগবীজাণুবাসের নিরাপদদুর্গে পরিণত হয়, সমুদয় রক্তের মাঝে এই রোগবীজাণু ছড়াইয়া পড়ে। ডাক্তারেরা রোগের এই অবস্থায় কুইনাইন বর্জন করিয়া শরীরের রক্তকে লালরক্তাণুবাসের উপযোগী লবণাক্ত (Alkaline) করিবার জন্য সোডা-বাই-কার্বন ও কালমেঘ প্রয়োগ করেন অথবা ক্ষারজাতীয় লবণ (Saline) ইনজেক্শন করেন এবং দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য চিনি অর্থাৎ গ্লুকোজ ইন্‌জেক্শন করেন। বলা বাহুল্য, এইসব ঔষধও শেষ মুহূর্তে আর কোন কাজ দেয় না, রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

চিকিৎসা—এই রোগের সূচনা বুঝিতে পারিলেই কুইনাইন বর্জন করিয়া ম্যালেরিয়া রোগের নিয়ম-পথ্য ও চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি

লক্ষণ—মাতৃদেহের জরায়ুর মাঝেই ভ্রূণ অর্থাৎ মানবশিশু জন্ম গ্রহণ করে এবং এইখানেই ১০ মাস (১০ চান্দ্র মাস = শেষ ঋতুদিবস হইতে

গণনা করিয়া ২৮০ দিন = সৌর ৯ মাস ১০ দিন) কাটাইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এই যন্ত্রটি তলপেটের সরলান্ত্র (rectum) ও মূত্রাশয়ের (Bladder) মাঝখানে অবস্থিত। এই যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ ইঞ্চি এবং ঘনত্ব ১ ইঞ্চি ; ইহার ক্রমসূক্ষ্ম মুখটি মাতৃ অঙ্গ দ্বারাভিমুখে স্থাপিত। উহার উর্ধ্বাংশের দুইপার্শ্ব হইতে দুইটি সন্তানবীজবাহী নল (Fallopean tubes) বাহির হইয়া উভয় মাতৃগ্রন্থির (Ovary) সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই মাতৃগ্রন্থি হইতেই সন্তানবীজ জরায়ুতে গমন করে।

নাভিপ্রদেশের কতকগুলি স্নায়ুরজ্জুর সাহায্যে এই যন্ত্রটি ঝুলান থাকে। রবারের থলির মতো প্রয়োজনের সময় এই যন্ত্রটি বর্ধিত হইতে পারে। এইরূপ ঝুলান অবস্থায় থাকে বলিয়াই ইহার নড়াচড়া করার স্বাধীনতা আছে; এইজন্যই পার্শ্বস্থিত অন্ত্র, মূত্রাশয় প্রভৃতির চাপে জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে। শারীরিক দুর্বলতার জন্য জরায়ুধারক স্নায়ুরজ্জু শিথিল হইলেও জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধাদের স্নায়ুশিথিলতার জন্য স্বভাবতঃই জরায়ু স্থানচ্যুত হয়। জরায়ুর স্থানচ্যুতির সাধারণ লক্ষণ—তলপেটে ভার-ভার বোধ, পৃষ্ঠদেশে একটা বেদনা বোধ ; অত্যধিক শ্বেতপ্রদর ক্ষরণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্ষুধামান্দ্য, বাধক বেদনা, স্নায়বিক দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি।

কারণ—প্রয়োজনাধিক সহবাসের ফলে বিবাহিতা মেয়েদের যে ভয়াবহ কোষ্ঠবদ্ধতারোগ সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা কোষ্ঠবদ্ধতারোগ বিবরণে উল্লেখ করিয়াছি। কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে মল জমিয়া মলনাড়ী স্ফীত হয় এবং উহা জরায়ুকে স্বস্থান হইতে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়। অতিরিক্ত সহবাসের ফলে মেয়েদের বস্তিপ্রদেশের সমস্ত স্নায়ুও দুর্বল হইয়া পড়ে—সুতরাং জরায়ু ধারক স্নায়ুরজ্জুগুলিও ইহার ফলে শিথিল হইয়া জরায়ুর স্থানচ্যুতির আনুকুল্য করে। জরায়ু যদি স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রাশয়ের উপর পড়ে, তাহা হইলে সময় সময় মূত্ররোধ হইয়া রোগিণীকে খুব কষ্ট পাইতে হয়। জরায়ু যদি স্থানচ্যুত হইয়া সরলান্ত্রের উপর পরে, তাহা

হইলে উহার চাপে অন্ত্র আর সঠিক ভাবে কাজ করিতে পারে না—ফলে ভয়াবহ কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। তলপেটে জরায়ুতে গুল্ম (Tumour) হইলেও উহার স্ফীতিতে জরায়ুর স্থানচ্যুতি হয়। ঘন ঘন সন্তানের জননী হওয়া এবং চিকিৎসকের সাহায্যে যন্ত্রপাতি দ্বারা সন্তান প্রসব ব্যবস্থার ফলে জরায়ুধারক স্নায়ুমণ্ডলী (Ligaments) শিথিল হইয়া জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটায়। অধিকদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইলে, যকৃৎ খারাপ হইয়া রক্তশূন্যতা রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীর অত্যধিক দুর্বল, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইলেও মেয়েদের দেহে এই রোগ প্রকাশ পায় অর্থাৎ জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১-ক ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; অবগাহন স্নান বা টাববাথ ৫ মিনিট; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৫, নং ৭ ; মূলবন্ধ মুদ্রা, মহাবন্ধ মুদ্রা, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

মধ্যাহ্নে—অবগাহন স্নান বা টাববাথ ১০-১৫ মিনিট। জলে দাঁড়াইয়া বা টাবে বসিয়া মুলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, শক্তিচালনী মুদ্রা ৪ বার।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, যোগমুদ্রা, পশ্চিমোত্তান, শক্তিচালনী মুদ্রা, শশাঙ্গাসন বা শীর্ষাসন; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৫, নং ৯ ; সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, উষ্ট্রাসন।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি এবং জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে। রোগিণীরা বিশেষভাবে মনে রাখিবে—প্রত্যহ স্নানের সময় (তিন বেলা) নদী বা পুকুরের জলে বা স্নানের টাবে নাভি পর্যন্ত ডুবাইয়া মূলবন্ধ ও মহাবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠান করিলে এই রোগ খুব দ্রুত আরোগ্য হয়।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগ সৃষ্টি হইলে জলের বালতি বহন করা, বড়-ডেক্‌চি, কড়াই ইত্যাদি চুলার উপর হইতে নামান-উঠান প্রভৃতি ভারোত্তোলন কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিবে। এই রোগটি জটিল রোগ; এই রোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা, রক্তশূন্যতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, অজীর্ণ প্রভৃতি

বহু রোগ জড়িত থাকে—সুতরাং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক না হইলে এই রোগ আরোগ্য হয় না। যতদিন এই রোগ আরোগ্য না হইবে, ততদিন স্বামী সহবাসে খুব সংযত থাকিবে। কোষ্ঠবদ্ধতারোগ আরোগ্যের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইবে। ঋতুর তিন দিন আরামপ্রদ শয্যায় শয়ন করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবে। ঋতুর সময় রক্ত সঞ্চিত হইয়া জরায়ু ভারী থাকে—এইজন্য রন্ধন ভারোত্তোলনাদি কঠিন পরিশ্রমের কাজ এই সময়ে নিষিদ্ধ।

গরীব ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয় অথচ সেই তুলনায় পুষ্টিকর খাদ্যাদি তাহারা পায় না, তাই ভরা যৌবনেও তাহাদের শরীর দুর্বল হইয়া এই রোগ সৃষ্টি হয়—তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই দুর্দিনে বিলাস-ব্যসনের খরচ, সুদৃশ্য বহুমূল্য কাপড়-জামা ক্রয়ের ব্যয়, সিনেমা দর্শনের খরচ কমাইয়া প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক গৃহকর্তার কর্তব্য। **পুষ্টিকর পথ্যাভাবে মেয়েরা স্বাস্থ্যহীনা হইলে উহা শুধু ব্যষ্টি পরিবারের পক্ষে ক্ষতিজনক নয়, উহা সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি লাভের অন্তরায়। ইহা স্মরণে রাখিয়া প্রত্যেক স্বামীই স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। স্বাস্থ্যানুকূল সংযত দাম্পত্যজীবন যাপন করা এবং গৃহের প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক গৃহকর্তারই বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে করি।**

জরায়ুতে আব হইলে অথবা জরায়ু মাতৃঅঙ্গ দ্বার দিয়া নামিয়া পড়িলে অথবা ঋতুরোধ প্রভৃতি কারণে জরায়ুতে অত্যন্ত প্রদাহ উপস্থিত হইলে আধুনিক চিকিৎসকেরা জরায়ুর উপর অস্ত্রোপচার করেন। রোগগ্রস্ত মাতৃগ্রন্থিকে (ওভারী) এইভাবে কাটিয়া বাদ দেওয়ার প্রথা আজকাল প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি যন্ত্রের সহিত মেয়েদের সমগ্র দেহের এবং মনের স্বাস্থ্য বিজড়িত। এই দুইটি যন্ত্রের যে কোনো একটির অভাব হইলে কোনো যন্ত্রই সেই অভাব পূরণ করিতে পারে না। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। অস্ত্রোপচারের ফলে

এইসব মেয়েদের দেহ হয় আমরণ রুগ্ন এবং মন হয় পঙ্গু। এক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে গিয়া বহু রোগকে আহ্বান করিয়া আনা হয়। এইরূপ পঙ্গু দেহ-মন লইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু অধিকতর শ্রেয়—এইরূপ চিন্তা সময় সময় মনে উদিত হইয়া রোগিণীদের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে। শ্রদ্ধার সহিত যৌগিক ব্যায়াম ও নিয়ম-পথ্যাদি পালন করিয়া চলিলে রোগটি যতই কঠিন হউক না কেন, উহা অবশ্যই নির্মূলভাবে আরোগ্য হইবে। **কখনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং জরায়ু এবং ওভারীতে কোন প্রাণঘাতীরোগ সংক্রমিত না হইলে উহার উপর অস্ত্রোপচার ব্যবস্থায় কখনো সম্মত হইবে না।**

আজকাল পেসারীর (pessary) সাহায্যে নিম্নাগত জরায়ুকে ঊর্ধ্বে ঠেলিয়া স্বস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত নয়—উহা পতনোন্মুখ গৃহকে ঠেকা দিয়া রাখার প্রচেষ্টার অনুরূপ। ইহাতে রোগারোগ্যের কোনো সহায়তা হয় না। বরং উহা স্বাস্থ্যের অবনতিতেই আনুকূল্য করে। শরীরকে দোষমুক্ত রাখা, শরীরকে অধিকতর সবল করিয়া তোলার ব্যবস্থা করাই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। **অতিরিক্ত পান খাওয়ার অভ্যাস, অতিরিক্ত চা-পানের বদভ্যাসও দৃঢ়তার সহিত বর্জন করিবে।** এইগুলি ত্যাগ করিতে না পারিলে শরীর রোগমুক্ত হয় না। নিজের অসুস্থতার জন্য সন্তান-সন্ততিরাও দুর্বল হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং গৃহকে হাসপাতালে পরিণত করে। নিজের এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া মাতাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। অন্যান্য নিয়ম ও পথ্য সম্বন্ধে “ঋতুরোগ” ও “কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ” বিবরণ দ্রষ্টব্য।

টন্‌সিল (Tonsil)

লক্ষণ—তালুপ্রদেশের গ্রন্থিটির নামই টন্‌সিল। গলনালী এবং

মস্তিষ্কের প্রবেশপথে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এই গ্রন্থিটি যখন ফুলিয়া উঠে এবং ইহার আকার বৃদ্ধি পায়, তখনই ইহা টন্‌সিল রোগ নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

কারণ—যোগশাস্ত্রমতে এই টন্‌সিল বা তালুগ্রন্থিটি ব্যোমগ্রন্থির অন্তর্গত। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র মতে এই গ্রন্থিটি Lymphatic Glands-এর অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থিটির বিশেষ গুরুত্ব, বিশেষ দায়িত্ব আছে। মস্তিষ্কই দেহরাজ্যের রাজধানী। এই রাজধানী-দুর্গের প্রধান তোরণ রক্ষার ভার, এই রাজধানীকে পূর্ণ নিরাপদ রাখিবার দায়িত্ব এই টন্‌সিল বা তালুগ্রন্থিটির। বায়ুর সহিত বা রক্তের সহিত কোনো দূষিত পদার্থ যাহাতে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কের অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে, এইজন্য এই গ্রন্থিটিকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। প্লীহা, যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থি দুর্বল থাকিলে দেহের সমুদয় রক্ত শোধিত হয় না, ফুসফুস দুর্বল থাকিলে দেহস্থ বায়ুও সম্পূর্ণ শোধিত হইতে পারে না। এই অশোধিত রক্ত, অশোধিত বায়ু যখন মস্তিষ্কে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখন ঐ অশোধিত রক্ত এবং অশোধিত বায়ুকে এই গ্রন্থিটি পুনরায় শোধন করিবার ব্যবস্থা করে। সুতরাং উল্লিখিত ৪টি গ্রন্থির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবার দায়িত্ব এই গ্রন্থিটির। দূষিত পদার্থের মাত্রাধিক্য হেতু শোধনক্রিয়ার শক্তি যখন তাহার সামর্থ্যকে অতিক্রম করে, তখনো গ্রন্থিটি প্রাণপণে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে থাকে; সাধ্যাতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে অতিক্রিয় হইয়া গ্রন্থিটি বৃহত্তর হয় এবং গ্রন্থি সঞ্চিত দূষিত পদার্থের (Toxic matter) প্রভাবে গ্রন্থিটি ফুলিয়া যায় এবং রুগ্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং যে সব ছেলে-মেয়ের জীবনীশক্তি স্বাভাবিকভাবেই কম, যাহাদের ফুস্‌ফুস্‌ দুর্বল, যাহাদের দেহে প্রয়োজনীয় তাপ-রক্ষক চর্বি নাই, তাহারাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে একগ্লাস ঈষৎ গরম জল পানের পর) যোগমুদ্রা ৮ বার, অর্ধচক্রাসন ২ বার, ভুজঙ্গাসন ৪ বার, পদহস্তাসন ৪ বার;

পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নং ১, নং ২ এবং নং ৩—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম নং ৩—৩ মিনিট।

দ্বিপ্রহরে—আতপস্নান (শীতকালে ১৫/২০ মিনিট এবং গ্রীষ্মকালে ৯/১০ মিনিট); পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩।

সন্ধ্যায়—পশ্চিমোত্তান আসন ৪ বার, উষ্ট্রাসন ৩ বার, মকরাসন ৪ বার, ত্রিকোণাসন ১০ বার, পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম নং ৩—২ মিনিট।

টন্‌সিল সাধারণতঃ অল্পবয়স্কদের রোগ বলিয়া তাহাদের উপযোগী চিকিৎসা প্রণালীই লিখিত হইল। বয়স্করা টন্‌সিল রোগে আক্রান্ত হইলে তিনবেলাই ভ্রমণ-প্রাণায়াম এবং ৩/৪টি সহজ প্রাণায়াম এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যাসন অভ্যাস করিবে। প্রাণায়াম যত বেশি মাত্রায় করিতে পারিবে তত তাড়াতাড়ি টন্‌সিল আরোগ্য হইবে।

টন্‌সিলে ব্যথা-বেদনা হইলে, টন্‌সিল ফুলিয়া উঠিলে অথবা টন্‌সিল বৃদ্ধির জন্য সর্দি-কাশি প্রভৃতি সহজে আরোগ্য না হইলে আধুনিক যুগের ডাক্তাররা টন্‌সিল অপারেশনের ব্যবস্থা করেন। **ডাক্তারদের এরূপ ব্যবস্থা অন্যায় এবং অনিষ্টকর**। সাধারণতঃ ক্রনিক সর্দি-কাশি নিবারণের জন্যই ছেলে-মেয়েদের টন্‌সিল অপারেশন করা হয়। বলা বাহুল্য, টন্‌সিলের দোষ হেতু সর্দি-কাশির সৃষ্টি হয় না। সর্দি-কাশি সৃষ্টি করিয়া টন্‌সিল দেহস্থ দূষিত পদার্থ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। টন্‌সিল অপারেশনের পর সাময়িকভাবে সর্দি-কাশি কিছু দিন বন্ধ থাকে; ইহার কারণ টন্‌সিলের শূন্যস্থান অন্য গ্রন্থিরা হঠাৎ পূরণ করিতে পারে না। অতঃপর বাধ্য হইয়াই ফুসফুসকে টন্‌সিলের অধিকাংশ কাজ সাধ্যমত সমাধা করিতে হয়। ফুস্‌ফুস্‌কেই পুনরায় সর্দি-কাশি সৃষ্টি করিয়া দেহস্থ দূষিত জিনিষ বাহিরে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিতে হয়। ফলে ঐ সব রোগীর টন্‌সিল অপারেশনের কয়েকমাস পরেই আবার সর্দি-কাশি রোগ সৃষ্টি

হয়। সুতরাং টন্‌সিল অপারেশনে সর্দি-কাশির উৎপাত দূর হয় না। ঐ অপারেশনের ফলে দুর্বল ফুসফুস নিজের দায়িত্ব ছাড়াও টন্‌সিলের দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া আরও দুর্বল হয়, ফলে দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং দেহ যক্ষ্মাদি রোগাক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে। সুতরাং টন্‌সিল পাকিয়া প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা উপস্থিত না হইলে কখনও টন্‌সিল অপারেশন করাইবে না। টন্‌সিলের অভাব অন্য কোনো গ্রন্থিই পূরণ করিতে পারে না। এইজন্যই কর্তিত টন্‌সিল রোগীরা কখনো অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। উহাদের কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা নষ্ট হয়। মনের সাম্যভাবও আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়।

নিয়ম ও পথ্য—ছোট ছেলে-মেয়েদের টন্‌সিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সূচনা দেখা দিলে সর্দি বা কাশির লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঘন ঘন হাঁচি হইতে থাকে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পিতা-মাতার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এই সময় প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় দ্বারা শরীরকে গরম রাখার ব্যবস্থা করিবে; রোগীর গলদেশ গলাবন্ধ দ্বারা আবৃত রাখিবে। এই সময় বাহিরে হাওয়া-বাতাসের মাঝে ছেলে-মেয়েদের ছুটাছুটি করিতে দিতে নাই। বাতাসে শৈত্য এবং হাওয়ার অভ্যন্তরস্থ ধূলা-বালি টন্‌সিল বৃদ্ধির সহায়ক।

এই রোগীর মাছ, মাংস এবং ডিম পথ্য বন্ধ করিয়া দিবে। বিস্কুট, লজেন্স, হরলিক্‌স এবং শুষ্ক দুগ্ধ নির্মিত তথাকথিত পুষ্টিকর খাদ্যও বন্ধ করিয়া দিবে। উল্লিখিত হরলিক্‌স এবং গুঁড়া দুধ নির্মিত পথ্য ক্ষুধা নষ্ট করে, কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং যকৃৎকে রুগ্ন করে।

দেহ রুগ্ন হইলে দেহস্থ রক্তের অম্লভাগ হ্রাস করিয়া রক্তের ক্ষারভাগ বৃদ্ধির প্রয়োজন। এইজন্যই যে কোনো রোগ সৃষ্টি হইলে সর্বপ্রথমে মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি বিশুদ্ধ অম্লধর্মী খাদ্য এবং ঘি, মাখন, ছানা প্রভৃতি সংহত খাদ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথ্য ছাড়া আর সমস্ত খাদ্যই প্রয়োজনানুরূপ গ্রহণ করিতে পারিবে। (এই প্রসঙ্গে আমাদের 'খাদ্যনীতি' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

টাইফয়েড

আয়ুর্বেদমতে এই রোগটি সন্নিপাত জ্বরের অন্তর্গত। যে জ্বরে নিপাত বা মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে তাহাকেই বলে সন্নিপাত জ্বর। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী এই সান্নিপাতিক জ্বরকেও ত্রয়োদশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—সিতাঙ্গ, অন্তক, প্রলাপক, রক্তষ্ঠীব, অভিন্যাস, চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি। বর্তমান যুগে ভারতেও এই রোগটিকে সন্নিপাত জ্বর নামে অভিহিত করা হয় না; পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে 'টাইফয়েড' নামেই এই রোগটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

লক্ষণ—এই রোগ আত্মপ্রকাশের ২/১ সপ্তাহ পূর্ব হইতেই ক্ষুধামান্দ্য, সময় সময় মাথার যন্ত্রণা, হাত-পা বেদনা, তলপেটে একটু প্রদাহ, শারীরিক দুর্বলতা বোধ, সামান্য একটু সর্দির ভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগের সূচনাতে প্লীহা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অন্ত্রের **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির** (Mucous Membrane) প্রদাহ উপস্থিত হয়। যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি ও হৃদ্‌যন্ত্র অতিক্রিয় হইয়া উঠে।

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ৭ দিন গত না হইলে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারে না—ইহা টাইফয়েড না অন্য জ্বর? রক্তাদি পরীক্ষা করিয়া দেহে যখন টাইফয়েড বীজাণু পান, তখন তাঁহারা টাইফয়েড সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। কিন্তু সব টাইফয়েড রোগীরই প্রথম সপ্তাহে দেহে টাইফয়েড জীবাণু পাওয়া যায় না; এইজন্যই ডাক্তারদের টাইফয়েড রোগ নির্ধারণ করিতে বিলম্ব হয়। কিন্তু নাড়ীবিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ আয়ুর্বেদাচার্যেরা এই জ্বরের প্রথম দিনেই নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারেন—ইহা টাইফয়েড জ্বরে পরিণত হইবে কিনা।

এই রোগের আক্রমণ শুরু হইলে নাড়ী খুব দ্রুত হয় এবং নাড়ী সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ওঠা-নামা করে অর্থাৎ একটি ঘাত খুব উচ্চ হয়, পরবর্তী ঘাতটি অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং তাহার পরেরটি খুব উচ্চ হয় এবং

প্রত্যেকটি ঘাত নামিবার সময় সমুদ্রতরঙ্গের তটভূমি প্লাবিত করিবার ধরণেই বৃত্তাকারে যেন গড়াইয়া পড়ে। নাড়ীর এই পর পর উচ্চ, নিম্ন এবং গড়ান গতি দেখিয়াই আয়ুর্বেদাচার্যেরা টাইফয়েড সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

প্রথম সপ্তাহ—এই রোগটিতে ভোরের দিকে জ্বর অপেক্ষাকৃত কম থাকে। বৈকালে জ্বরের উত্তাপ সকালের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি হয়। এই নিয়মে জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম দিন ভোরে যদি ৯৯ ডিগ্রি জ্বর থাকে, তাহা হইলে ঐ দিন বৈকালে জ্বরের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০১ ডিগ্রি। দ্বিতীয় দিন ভোরে জ্বর থাকিবে ১০০ ডিগ্রি এবং বৈকালে ১০২ ডিগ্রি। তৃতীয় দিন ভোরে ১০১ ডিগ্রি এবং বৈকালে ১০৩ ডিগ্রি। চতুর্থ দিন ভোরে ১০২ ডিগ্রি এবং বৈকালে ১০৪ ডিগ্রি। সাধারণতঃ এই নিয়মেই জ্বর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আয়ুর্বেদমতে টাইফয়েড দ্বিবিধ—বাত-পৈত্তিক এবং পিত্ত-শ্লৈষ্মিক। গা বমি বমি করা, নাসিকায় রক্তস্রাব অথবা অন্ত্রে ঘা হেতু গুহ্যদেশ দিয়া রক্তস্রাব, মলের রং পীতবর্ণ প্রভৃতি বাত-পৈত্তিক টাইফয়েডের লক্ষণ। পিত্ত-শ্লৈষ্মিক টাইফয়েডে একটু সর্দির ভাব থাকে। ঠিক পথ্যাদির ব্যবস্থা এবং সেবা-শুশ্রূষা না হইলে পিত্ত-শ্লৈষ্মিক টাইফয়েড নিউমোনিয়ায় পরিণত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটায়। এই রোগের ৬ষ্ঠ বা ৭ম দিনে বুকে, পিঠে ও তলপেটে মুসুরডালের আকার একপ্রকার গুটিকা বাহির হয়। এই গুটিকাগুলি দেহে ৪/৫ দিন থাকে, তারপর মিলাইয়া যায়।

দ্বিতীয় সপ্তাহ—এই সপ্তাহে জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জ্বর বৈকালের দিকে সাধারণতঃ ১০৫ ডিগ্রি বা ততোধিক হয়। ভোরে ২ ডিগ্রি কম থাকে। জ্বর বৃদ্ধির সময় রোগী প্রলাপ বকে; কখনো বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগীর পেটও প্রায়ই ফাঁপা থাকে; পুনঃ পুনঃ রোগীর ভেদ হয়। রোগীর ভেদ অর্থাৎ মলের রং সাধারণতঃ সবুজ ও ফেনাযুক্ত হয়। জিহ্বা শুষ্ক, লাল ও চকচকে হয়।

কোনো কোনো রোগীর মলের সঙ্গে অথবা নাসিকা দ্বারা রক্তও নির্গত হয়। পিত্ত-শ্লৈষ্মিক টাইফয়েড হইলে এই সপ্তাহে কাশির উপদ্রব বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় সপ্তাহ—যদি রোগ কঠিন না হয়, তাহা হইলে এই সপ্তাহের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে রোগীর জ্বর এবং আনুষঙ্গিক উপসর্গ হ্রাস পায়। তৃতীয় সপ্তাহে যদি জ্বর হ্রাস না পায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সপ্তাহের মতোই রোগীর জ্বরের উত্তাপ এবং আনুষঙ্গিক উপসর্গ বিদ্যমান থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কু-চিকিৎসার উৎপাত এবং পথ্যের ত্রুটির জন্য এই রোগটি তৃতীয় সপ্তাহে আরোগ্যের পথে না গিয়া বৃদ্ধির পথে যায় এবং ৬ সপ্তাহ বা ৭ সপ্তাহ পর্যন্ত এই রোগ বিদ্যমান থাকিয়া রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ আরোগ্যের পথে যাওয়ার প্রথম লক্ষণ—উদরাময় এবং ভোরের জ্বর বন্ধ হওয়া এবং বৈকালে জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া। অতঃপর ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, জিহ্বা পরিষ্কার হয় এবং রোগীর শারীরিক দুর্বলতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগের নবম সপ্তাহে যদি কোষ্ঠতারল্য বন্ধ হয় এবং সান্ধ্য জ্বর যদি ১০৫ ডিগ্রীর বেশি না হয়, তাহা হইলেই বুঝিবে—রোগীর আরোগ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী, যদি পথ্য সম্বন্ধে রোগী সতর্ক থাকে।

বিপদের লক্ষণ—জ্বরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর বেশি; রোগী মাঝে মাঝে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। রোগীর দেহ মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠে; উদরাময় বা রক্তস্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগী অসাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করে। রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্বল হয়; অচৈতন্য অবস্থায় রোগী বিছানার চাদর টানে এবং শূন্যে হাতড়ায়।

রোগের কারণ—যোগশাস্ত্রমতে বায়ুগ্রন্থির দুর্বলতা এই রোগের প্রধান কারণ এবং ব্যোমগ্রন্থি ও অগ্নি গ্রন্থির দুর্বলতা এই রোগের আনুষঙ্গিক কারণ। আয়ুর্বেদমতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া এই রোগটি সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে এই রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ—

রোগবীজাণু সংক্রমণ। দূষিত জল অথবা দুগ্ধ কিংবা অন্য খাদ্যের সহিত এই রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। বলা বাহুল্য, যোগাচার্য এবং আয়ুর্বেদাচার্যেরা রোগবীজাণু সংক্রমণ মতবাদকে প্রাধান্য দেন না। দেহে জীবনীশক্তি অটুট থাকিলে, দেহে দূষিত বস্তু সঞ্চিত না হইলে কোনো রোগবীজাণুর সাধ্য নাই দেহে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। দেহে দূষিত বস্তু সঞ্চিত হইলে দেহের মাঝে রোগবীজাণুর সৃষ্টি হয়। অত্যাধুনিক ডাক্তারী গবেষণাতেও যোগাচার্য ও আয়ুর্বেদাচার্যদের এই মতবাদ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—কারণ সুস্থ নর-নারীর দেহেও টাইফয়েড বীজাণু, যক্ষ্মা বীজাণু প্রভৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু উহা দেহের কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না—যতদিন দেহে জীবনীশক্তি অটুট থাকে, দেহ দোষমুক্ত থাকে।

চিকিৎসা—আজকাল কতকটা টাইফয়েডের ধরণে অথচ ঠিক টাইফয়েড নয়—এইরূপ দুরারোগ্য মারাত্মক জ্বর প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং উহা সত্যই টাইফয়েড কিনা উহা অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। নির্ভরযোগ্য যৌগিক চিকিৎসকের উপস্থিতি ছাড়া শুধু বইয়ের সাহায্যে এই রোগ চিকিৎসা করিতে যাওয়া উচিত নয়। এই সব কারণেই এই রোগের চিকিৎসা-প্রণালী আমরা দিলাম না।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগে পথ্যবিধির উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। পথ্যের ত্রুটির জন্য এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং মারাত্মক হইয়া পড়ে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে জ্বরের প্রথম দুইদিন শুধু লেবুর রস সহ ঈষৎ গরম বা ঠাণ্ডা জল ছাড়া অন্য পথ্য রোগীকে দিবে না। দুইদিন উপবাসের পরও যদি রোগীর ক্ষুধা বোধ না হয়, তাহা হইলে আরও দুইদিন অনুরূপভাবে শুধু লেবুর রসসহ জলপান পূর্বক রোগীকে উপবাস দিতে হইবে। ২/৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তরই রোগীকে কিছুটা লেবুর রস সহ জল পান করিতে দিবে। এইভাবে চার দিন উপবাসের পর রোগীর স্বভাবতঃই ক্ষুধা বোধ হইবে। রোগীর ক্ষুধাবোধ হইলে ডাবের জল, কমলা, বেদানা, আঙ্গুর, মৌসম্বী (সরবতী লেবু), আনারস প্রভৃতি রসাল

ফল পথ্যরূপে নির্বাচিত করিবে। ক্ষুধার জোর থাকিলে দিনে তিনবার এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত পর একবার—মোট এই ৪ বার রোগীকে পথ্য দিবে। প্রথম সপ্তাহে রোগীকে শুধু এইসব ফলের রস ছাড়া অন্য কোনো পথ্য দিবে না।

শুধু টাইফয়েড নয়, যে কোনো রোগেই ঔষধ সেবন না করিয়া প্রথম সপ্তাহে এইরূপ উপবাস ও পথ্যবিধি পালন করিলে কোনো রোগই প্রবল হইতে বা মারাত্মক হইতে পারে না।

দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম সপ্তাহে উল্লিখিত নিয়মে রোগী উপবাস করিলে দ্বিতীয় সপ্তাহে জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ প্রবল হয় না। সহজ অগ্নিসার অভ্যাসের ফলে ২য় সপ্তাহেই যদি পেট ফাঁপা ও উদরাময়ের ভাব দূর হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগীকে অর্ধেক জল মিশ্রিত একপোয়া পাতলা দুধও দিনে দুইবার পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, উদরাময় বর্তমান থাকিলে দুধ দিবে না; শুধু ফলের রস এবং ডাবের জল প্রভৃতি পথ্যই রোগীকে নিয়মিতভাবে দৈনিক চার বার দিবে।

তৃতীয় সপ্তাহে জ্বর বন্ধ হইলেও রোগীর পথ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। ফলের রস ও জল মিশ্রিত পাতলা দুধ ছাড়া অন্য পথ্য দিবে না। পথ্যের ত্রুটি ঘটিলে চতুর্থ সপ্তাহে এই রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা ঘটে। রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার আছে কিনা সে বিষয়ে প্রত্যহ লক্ষ্য রাখিবে। অপরিষ্কার জিহ্বা অক্ষুধার লক্ষণ। অক্ষুধায় রোগীদের কিছু খাওয়া উচিত নয়, শুধু পিপাসানুযায়ী জল দিতে হয়; সুতরাং জিহ্বা অপরিষ্কার দেখিলেই রোগীর পথ্য সম্বন্ধে সতর্ক হইবে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক এবং জিহ্বা সুস্থ লোকের মতো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে অর্ধাশনে রাখিবে, কখনও পেট ভরিয়া খাইতে দিবে না।

তৃতীয় সপ্তাহে যদি জ্বর বন্ধ থাকে, তাহা হইলে চতুর্থ সপ্তাহে শিউলি পাতা, পল্‌তা পাতা প্রভৃতির সুক্ত, মুসুরডালের জুস, পাতলা দুধ প্রভৃতি

পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। টাইফয়েড রোগে জ্বর বন্ধ হওয়ার পরও দুই সপ্তাহ রোগীকে অন্ন পথ্য দিতে নাই। দুই সপ্তাহ অতীত হওয়ার পর অন্ন পথ্য দিবে।

টাইফয়েড জ্বরে পথ্য সম্বন্ধে যেরূপ সতর্কতার প্রয়োজন, শুশ্রূষা সম্বন্ধেও তেমনি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। জ্বর ১০৪/১০৫ ডিগ্রী উঠিলেও রোগীর মাথায় বরফ দিবে না। দীর্ঘ সময় ব্যাপী জল দ্বারা রোগীর মাথা ধৌত করিয়া জ্বরের উত্তাপ কিছুটা হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিবে। টাইফয়েড রোগীর মাথায় বরফ প্রয়োগ করিলে টাইফয়েড রোগ নিউমোনিয়া রোগে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ঘটে। রোগীর নাসিকা দ্বারা রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে রোগীকে বরফ চুষিতে দিবে।

রোগীর জন্য দুইটি বিছানা সর্বদা প্রস্তুত রাখিবে। একটি বিছানা দূষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে অন্য বিছানায় স্থানান্তরিত করিবে। দ্বিপ্রহরে রোগীর ঘর সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া রোগীর মাথা ধোয়াইবে। দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তরই রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দিবে।

ভারতে টাইফয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব বর্তমানে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোকের জীবনীশক্তি হ্রাসই ইহার মূল কারণ। এই টাইফয়েড রোগের ডাক্তারী চিকিৎসায় গৃহস্থেরা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে। এই রোগের প্রকোপে শত শত বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীর অকালমৃত্যু ঘটিতেছে। আমাদের পুস্তকে উল্লিখিত **সহজ প্রাণায়াম এবং ভ্রমণ প্রাণায়াম—এই রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক**। এইসব প্রাণায়াম ছাত্র-ছাত্রীরা এবং বয়স্করাও যদি কিছুদিন অভ্যাস করিয়া ফুস্‌ফুস্‌কে সবল করিয়া তোলে, তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতে এই ভয়াবহ ব্যাধিকে চিরদিনের মতো নির্বাসিত করা যায়।

ভারতের প্রত্যেক গৃহস্থকেই আমরা এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

দন্তরোগ

লক্ষণ—আয়ুর্বেদে ১৬ রকমের দন্তরোগের বর্ণনা আছে। যখন তখন দাঁত হইতে রক্ত পড়া, দাঁতে পোকা ধরা, দাঁতের রং কালো হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাকে বলা হয় **শীতাদ দন্তরোগ**—এই রোগে শীতল জল অথবা শীতল খাদ্য দাঁতে স্পর্শ করিলে দাঁতের যন্ত্রণা শুরু হয়। দাঁতের গোড়া ফুলিয়া দাঁতে অত্যন্ত যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে উহাকে বলে **দন্তপুপ্পট রোগ**। আমরা এযুগে যাহাকে **পাইওরিয়া** বলি, আয়ুর্বেদে তাহার নাম **দন্তবেষ্ট রোগ**।

দাঁতের সহিত দেহের জীবনীশক্তির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দাঁত দেখিয়াই নির্ধারণ করা যায় কে স্বাস্থ্যবান আর কে স্বাস্থ্যহীন। স্বাস্থ্যবান ছেলে-মেয়েদের দাঁতগুলি সুন্দরভাবে সাজান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্বাস্থ্যহীন, জীবনীশক্তিহীন ছেলে-মেয়েদের দাঁতগুলি এলোমেলো ভাবে সাজান, উঁচু-নীচু, ময়লা অথবা পোকা ধরা। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গেই দাঁতের বর্ণাভা ম্লান হইয়া যায়। কেননা দাঁতের সহিত শরীরপোষণকারী সমুদয় যন্ত্রগুলির বিশেষ সংযোগ রহিয়াছে। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির কোন্ কোন্ গ্রন্থির ক্রিয়া বিশেষ দুর্বল, তাহাও দাঁতের রং দেখিয়া যোগীরা নির্ধারণ করিতে পারেন।

কারণ—শরীরের রক্তে যথোচিত ক্যাল্সিয়াম ও ফসফরাসের অভাব থাকিলে দন্তরোগের সৃষ্টি হয়। যাহারা প্রয়োজনানুরূপ শাক-সব্জী, ফল ও দুধ প্রভৃতি না খাইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে ভাত, আটা প্রভৃতি শর্করা জাতীয় খাদ্য অথবা মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের দেহেই ক্যালসিয়াম প্রভৃতির অভাব ঘটে। স্বাস্থ্যহীনা মায়ের সন্তানেরা ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ রুগ্ন মাতার দেহে স্বভাবতঃই ক্যালসিয়াম কম থাকে, এইজন্য তাহার সন্তানদের স্বভাবতঃই দাঁত খারাপ হয়, দাঁতে পোকা লাগে।

যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে শৈশবে প্রয়োজনীয় মাতৃ-দুগ্ধ ও গো-দুগ্ধ পায় না, তাহারা কৈশোরে বা যৌবনেই দন্তরোগে আক্রান্ত হয়।

বিশুদ্ধ রক্ত হইতেই দেহযন্ত্রগুলি নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করে। ক্ষুধার সময় খাদ্য না পাইলে শিশুরা যেমন খাদ্যের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করে, দন্তমূলের দন্তরক্ষক স্নায়ুগুলি প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ রক্তের সরবরাহ না পাইলে তাহারাও ঐ ক্ষুধার্ত শিশুদের মতোই ক্রন্দন জুড়িয়া দেয়। দন্তরক্ষক স্নায়ুমণ্ডলীর এই ক্রন্দনের নামই **দন্তব্যথা** বা **দন্তশূল**।

পূর্বেই বলিয়াছি—দেহের জীবনীশক্তির সহিত দাঁতের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যে কোনো রোগে জীবনীশক্তি নষ্ট হইলে উহার ফলে দন্তরোগের সৃষ্টি হয়। রক্তের সারাংশের নামই শুক্র। এই শুক্রই শরীরের যাবতীয় যন্ত্রের প্রধান খাদ্য। এই শুক্র শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বল ও পুষ্টি বিধান করে। শরীরের রক্ত দূষিত হইলে, শরীরের রক্ত নিস্তেজ হইলে, শরীরের রক্তে ক্যাল্‌সিয়ামের ভাগ হ্রাস পাইলে দন্তস্নায়ুগুলিও প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান পায় না। এইজন্যই দাঁতের মাড়ী দুর্বল হইয়া দন্তরোগের সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—দন্তশূল বা দন্তবেদনা আরম্ভ হইলে ৪/৫ মিনিট শীর্ষাসন অভ্যাস করিবে। শীর্ষাসন অভ্যাসের সময় অধিকাংশ রক্তই মস্তিষ্কপ্রদেশে উপস্থিত হয় বলিয়া দন্তস্নায়ুগুলি ঐ রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সবল হওয়ার সুযোগ পায় এবং দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণু এই সময় সদলবলে অগ্রসর হইয়া দন্তমূলের রোগবীজাণু দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংসের আয়োজন করে। এইজন্য দন্তশূল রোগারোগ্যে শীর্ষাসন অব্যর্থ ফলপ্রদ। শীর্ষাসন অভ্যাসে অক্ষম হইলে সহজ শীর্ষাসন বা শশাঙ্গাসন অভ্যাস করিবে।

শীর্ষাসনের অব্যবহিত পর এক গণ্ডুষ সরিষার তৈল মুখে পুরিয়া ৪/৫ মিনিট কুলকুচা করিবে। ৪/৫ মিনিট কুলকুচার ফলে তৈলের তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া উহা জলবৎ তরল হইবে, তখন উহা ফেলিয়া দিয়া

শীতল জল দ্বারা মুখ ধুইবে। অতঃপর শীতল জল দ্বারা তৈল কুলকুচার অনুরূপ ২/৩ বার কুলকুচা করিবে। শীতল জল দাঁতের পক্ষে অসহনীয় হইলে কিছু সময় ঐ জল জিহ্বার উপর রাখিবে; অল্পসময়ের মধ্যেই মুখগহ্বরের তাপে ঐ জল শরীরের রক্তের সমান গরম হইয়া উঠিবে। অতঃপর ঐ জলে কুলকুচা করিতে কোনো কষ্ট হইবে না। এইভাবে শীর্ষাসন ও তৈলগণ্ডুষের পর ঠাণ্ডা জলে ২/৩ বার কুলকুচা করিলে দন্তযন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। এই ব্যবস্থাতেও দন্তযন্ত্রণা যদি আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে আরও অতিরিক্ত ৪/৫ মিনিট ঠাণ্ডা জল দ্বারা কুলকুচা করিবে।

যদি দন্তযন্ত্রণার সময় শীর্ষাসন অভ্যাস করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে শুধু শীতল জল দ্বারাই পুনঃ পুনঃ কুলকুচা করিবে। কয়েকবার কুল্‌কুচার পরই দন্তযন্ত্রণা হ্রাস পাইতে থাকিবে। শীতল জল জিহ্বার উপর রাখাও যাহাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহারা ঠাণ্ডা জলের সহিত অতি সামান্য গরম জল মিশ্রিত করিয়া ঐ জলকে শরীরের রক্তের সমান উষ্ণ করিয়া কুল্‌কুচা করিবে। গরম জলে কুল্‌কুচায় দন্তযন্ত্রণা আরোগ্য হয় না—ইহা স্মরণে রাখিয়া যথাসাধ্য শীতল জলে কুল্‌কুচা করিবে। শীতল জল গণ্ডুষে কুল্‌কুচা সাময়িকভাবে দন্তযন্ত্রণা আরোগ্যে সহায়তা করে; কিন্তু ইহা দন্তরোগ দূর করিতে পারে না। দন্তরোগ সমূলে বিনষ্ট করা, দাঁতের গোড়াকে শক্ত করিয়া তোলার ক্ষমতা আছে শুধু শীর্ষাসনের।

আহার গ্রহণের পর মুখে জল পুরিয়া মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশে এই প্রথাটি নাই। জলের শৈত্য দূর হয় এমন পরিমাণ গরম জল শীতল জলের সহিত মিশাইয়া আহারান্তে প্রাচ্য প্রথায় জল দ্বারা মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করিলে পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদেরও দন্তরোগ হ্রাস পাইবে।

পাকস্থলীর পীড়া বা অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় দন্তরোগ সৃষ্টির মূল কারণ ইহা মনে রাখিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লদোষ, পিত্তদোষ প্রভৃতি পাকস্থলীর

পীড়া বিদ্যমান থাকিলে ঐসব রোগারোগ্যের চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিবে এবং ব্রহ্মচর্য রক্ষায় অবহিত হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি ফস্‌ফরাস ও ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবই দন্তরোগের মূল কারণ। শুক্রধাতুর মাঝেই দেহস্থ ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস প্রভৃতি সঞ্চিত থাকে। পেটের পীড়ায় রক্ত অম্লধর্মী হইয়া রক্তের ক্যাল্‌সিয়ামাদি নষ্ট করিয়া দেয়। এইজন্যই দন্তরোগীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য রক্ষা এবং পেটের পীড়া আরোগ্যের ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজন।

নিয়ম ও পথ্য—দাঁতের ফাঁকে, দাঁতের মাড়ীর কিনারে খাদ্যকণা জমা থাকে; মুখগহ্বর ও দাঁত প্রত্যহ ভালোভাবে পরিষ্কার না করিলে এই সমস্ত খাদ্যকণা পচিয়া রোগবীজাণু সৃষ্টি হয় এবং উহারা দন্তমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দন্তের ক্ষতি করিতে থাকে। ফলের ঝুড়ির একটি ফল পচিতে আরম্ভ করিলে ইহার সংস্পর্শে আশেপাশের ফলগুলিও যেমন পচিতে আরম্ভ করে, তেমনি রোগাক্রান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের পাশের দাঁতও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। দাঁত রোগাক্রান্ত হইলে দাঁতের মাড়ীও শিথিল হইয়া যায়। এই শিথিল মাড়ীই রোগবীজাণুকুলের সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত হয়—তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সমস্ত রোগবীজাণু বৃদ্ধি পাইয়া নভঃগ্রন্থি ও স্নায়ুগ্রন্থিগুলিকে অর্থাৎ টন্‌সিল, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতিকে আক্রমণ করে। এইজন্যই যাহাদের দাঁত খারাপ, তাহারা সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টন্‌সিল, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। সুতরাং দাঁতের যত্ন নেওয়া সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। বয়স্করা প্রত্যহ দুইবেলা প্রধান আহারের পর কাষ্ঠশলাকা দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করিবে। আয়নার সামনে বসিয়া দাঁতের ফাঁকগুলি পরিষ্কার করিলে ঐগুলি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা যায়।

১২ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের শীর্ষাসন করা উচিত নয়। ১২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দন্তরোগে আক্রান্ত হইলে উহাদের দুগ্ধ-পথ্যের পরিমাণ একটু বাড়াইয়া দিবে। কমপক্ষে প্রত্যহ আধসের-আড়াইপোয়া দুগ্ধপথ্য পাইলে এবং তৈল ও শীতল জলে কুল্‌কুচা

পূর্বোক্ত নিয়মে অভ্যাস করিলে বালক-বালিকাদের দন্তরোগ সমূলে নির্মূল হইবে। এইসঙ্গে কয়েকটি স্বাস্থ্যাসন ও সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস করাইয়া বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিবে। পরিপাকক্রিয়ার ত্রুটি ঘটিলেই দন্তমূলের রোগবীজাণুগুলি প্রবল হইয়া দন্তযন্ত্রণা সৃষ্টি করে ; সুতরাং দন্তরোগী আহার্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। রাত্রে খুব লঘু পথ্য গ্রহণ করিবে। অজীর্ণের লক্ষণ দেখিলেই উপবাস দ্বারা রোগবিষ নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিবে। আমিষ খাদ্যে ক্যালসিয়াম খুব কম থাকে। দুধ, শাক-সব্জি ও ফলের মাঝে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে; সুতরাং দন্তরোগী আমিষ পথ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দুধ, শাক-সব্জি, ফল প্রভৃতি পথ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। প্রতি ঘণ্টায় দাঁতের মাড়ী ঘসিয়া মুখ ধুইবে। উল্লিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে আমরণ দন্ত কর্মক্ষম থাকিবে এবং দন্তরোগ সৃষ্টি হইবে না।

দুষ্টব্রণ

(কার্বাঙ্কল—Carbuncle)

লক্ষণ—বিষাক্ত বিপজ্জনক ফোঁড়ার নামই দুষ্টব্রণ বা কার্বাঙ্কল। এই দুষ্টব্রণের চতুষ্পার্শ্ব খুব শক্ত এবং স্ফীত হইয়া উঠে, আক্রান্ত স্থান খুব উষ্ণ এবং স্পর্শকাতর হয়। এই ব্রণটি পাকিলে ইহার একাধিক মুখ হয় এবং ঐ মুখ হইতে পুঁজ নির্গত হয়। এই দুষ্টব্রণ যদি ঠোঁটে, মুখে, কপালে বা কণ্ঠের পশ্চাতে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে উহা বিপজ্জনক হয়। রোগীর জ্বরের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রোগী প্রলাপ বকে।

কারণ—প্রধান কারণ দেহে অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয়। দীর্ঘদিনের কোষ্ঠবদ্ধতা, বহুমূত্র, মূত্রগ্রন্থির দুর্বলতা এই রোগের আনুষঙ্গিক কারণ।

চিকিৎসা—ভোরে সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১, বমনধৌতি, সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩—৩ মিনিট। সন্ধ্যায় ভোরের অনুরূপ সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার ধৌতি এবং সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

দেহে দুষ্টব্রণ উৎপত্তি হইলে ৩ দিন উপবাস দিবে। উপবাসের সময় ফল, লেবুর রস মিশ্রিত জল অথবা ডাবের জল গ্রহণ করিবে, অন্য কোনো খাদ্য স্পর্শ করিবে না। উপবাসের সাহায্যেই অল্প সময়ে এই রোগটি আরোগ্য করা যায়, উপবাস না দিলে এই রোগ বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

নিয়ম ও পথ্য—যাহাতে এই স্ফোটকে ঘর্ষণ না লাগে সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবে। উষ্ণ সেঁকে আরাম বোধ করিলে মধ্যে মধ্যে সেঁক দেওয়া ভালো। এই দুষ্টব্রণের পুঁজ নিষ্কাশনের কোনো চেষ্টাই করিবে না, উহাকে ভালোভাবে পাকিবার সুযোগ দিবে; তাহা হইলেই আপনি ফাটিয়া পুঁজ-রক্ত বাহির হইবে এবং জ্বালা-যন্ত্রণা হ্রাস পাইবে। এই ক্ষতস্থানে মলম লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। ঈষৎ গরম গব্যঘৃতের মলম অথবা রক্তচন্দন এবং গাঁদা পাতা ও বিশল্যকরণী পাতার রস সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে—দিনে অন্ততঃ ৩/৪ বার এই মলম ক্ষতস্থানে লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। যদি উল্লিখিত মলম ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও গ্লিসারিন মিশাইয়া তুলা বা নেকড়া দ্বারা লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে।

দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ

লক্ষণ—আয়ুর্বেদে ৭৮টি নেত্ররোগের বর্ণনা আছে। দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ এই ৭৮টি রোগের একটি। আমরা এই একটি রোগ লইয়াই এইখানে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। অন্যান্য ২/১টি প্রধান নেত্ররোগের

কারণও প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইবে। এই দৃষ্টিক্ষীণতা রোগের যাহা কারণ, অন্যান্য নেত্ররোগের মূল কারণও তাহাই।

সাধারণ দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ দ্বিবিধ—(১) কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা এবং দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখা; (২) কাছের বস্তু অস্পষ্ট দেখা এবং দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখা। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এই দুই রকম দৃষ্টিক্ষীণতা রোগের নাম myopia এবং Hyper-metropia।

কারণ—চোখ মেলিলেই এই সুন্দরী ধরণীর বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সহজেই আমাদের চোখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। আমাদের এই দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা যেরূপ সহজ, উহার গঠন প্রণালী কিন্তু সেরূপ সহজ নয়। উহার গঠন প্রণালীর জটিলতা, উহার সূক্ষ্ম কারিগরী মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। প্রথম অধ্যায়ের 'যোগশাস্ত্রে দেহতত্ত্ব বিবরণে' বায়ু, অগ্নি ও বরুণ—এই ত্রিদেবতার কার্যকারিতার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই ত্রিদেবতা মিলিত হইয়াই বিরাট বহির্বিশ্ব এবং জীবের ক্ষুদ্র দেহ-বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু নির্মাণে এই দেবতার বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। দেহে অগ্নিদেবতার কেন্দ্রীয় কার্যালয় সূর্যগ্রন্থি স্থান। এই সূর্যগ্রন্থি নিঃসৃত অন্তর্মুখী রসের স্থূলাংশ খাদ্যাদি পরিপাক করে, যকৃৎকে স্বীয় কোষে চিনি সঞ্চিত করিতে সাহায্য করে; ইহার সূক্ষ্মাংশই চোখের আবরণ বা ঝিল্লীকে (Cornea) এবং ভিতরের অক্ষিপটকে (Retina) আলোক-গ্রহণশক্তি প্রদান করে। চোখের ঝিল্লী এবং অক্ষিপটের মধ্যস্থ স্থানকে বরুণদেবতা তাহার অধীনস্থ গ্রন্থিগুলির অন্তর্মুখী রসের সূক্ষ্মাংশের সাহায্যে সরস, চক্‌চকে রাখার ব্যবস্থা করেন। চক্ষুকে প্রয়োজনমত ধৌত করার জন্য অশ্রুগ্রন্থিগুলি (Tear glands) চোখে জল সৃষ্টি করে। এই অশ্রুগ্রন্থিগুলি বরুণগ্রন্থিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ। বায়ুদেবতা চোখের প্রাণনকার্যাদি, চোখের প্রাণকোষাদি অর্থাৎ আবরক ঝিল্লী, নয়নমণি, অক্ষিপট প্রভৃতি নির্মাণ করেন। আয়ুর্বেদমতে অক্ষিপট প্রভৃতিকে আলোকগ্রহণশক্তি দান করে আলোচক

পিত্ত। চোখে প্রয়োজনীয় রসধাতু সরবরাহ করে তর্পক শ্লেষ্মা। এই ত্রিদেবতা অর্থাৎ বায়ু-অগ্নি-বরুণের কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইলে, আয়ুর্বেদের ভাষায় বায়ু-পিত্ত-কফ প্রকুপিত হইয়া আলোচক পিত্ত, তর্পক শ্লেষ্মা প্রভৃতি দূষিত হইলে চক্ষুরোগ সৃষ্টি হয়।

দেহে বায়ু প্রকুপিত হইয়া যখন রুক্ষ হয়, তখন উহা চোখের রসধাতুকে, তর্পক শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। চক্ষুর প্রথম পটল অর্থাৎ প্রথম স্তরের রস শুষ্ক হইলে অল্প দৃষ্টিদোষ ঘটে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের রসধাতু শুষ্ক হইলে দৃষ্টিদোষ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চতুর্থ পটল শুষ্ক হইলে অক্ষিপট আর স্বাভাবিকভাবে আলোক গ্রহণ করিতে পারে না; রোগীর দৃষ্টিতে দর্শনীয় সমস্ত বস্তুই তখন ঝাপসা অর্থাৎ অস্পষ্ট হইয়া উঠে।

দেহের অগ্নি অর্থাৎ পিত্ত যখন প্রকুপিত হয়, যকৃৎ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয় এবং সর্বদেহের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন আলোচক পিত্ত নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারে না। অবিশুদ্ধ পিত্ত চোখের পটল বা স্তরগুলিকে একে একে বিষাক্ত করিয়া উহাদের রূপ গ্রহণ ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়। চোখে তখন ছানি পড়িতে আরম্ভ করে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু সৃষ্টিতে অগ্নিরই প্রাধান্য রহিয়াছে। এই জন্য চক্ষুর আর এক নাম অগ্নিস্থান। সুতরাং বায়ু বা শ্লেষ্মাদোষের চেয়ে অগ্নি বা পিত্ত দোষই চোখের পক্ষে সর্বাধিক অনিষ্টকর। যকৃতের অন্তর্মুখী রসের সূক্ষ্মাংশই আলোচক পিত্ত গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং যকৃৎ খারাপ হইলে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি শক্তি খারাপ হইবে। **চোখের দৃষ্টি ভয়াবহ ভাবে ক্ষীণ হইয়াছে অথচ যকৃৎ সুস্থ আছে—এইরূপ রোগী পৃথিবীতে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।** যকৃৎ সুস্থ আছে অথচ অন্য কারণে চোখের দৃষ্টি ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এইরূপ ঘটিলে সুস্থ যকৃতের প্রভাবে নাতিবিলম্বে এই ক্ষতির অনেকাংশই পূরণ হইয়া যায়, রোগী আরোগ্য লাভ করে।

দেহে শুধু শ্লেষ্মাদোষ ঘটিলে শ্লেষ্মার সার তর্পক শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া **রাত্র্যন্ধরোগ** এবং অন্যান্য কষ্টদায়ক চক্ষুরোগ সৃষ্টি করে।

অসংযমের দরুণ প্রজাপতিগ্রন্থি (Sex glands) অতিক্রিয় হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িলে ধারণাশক্তি নষ্ট হইয়া স্নায়ুদৌর্বল্য রোগ সৃষ্টি হয়। এই দুর্বল স্নায়ুগুলি প্রয়োজনীয় আলোচক-পিত্ত এবং তর্পক-শ্লেষ্মা চক্ষুকে যথানিয়মে সরবরাহ করিতে পারে না। প্রজাপতি গ্রন্থির এই দুর্বলতা শিবসতীগ্রন্থি (Pituitary) যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করে। দীর্ঘদিনব্যাপী অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিলে শিবসতীগ্রন্থিও দীর্ঘদিন অতিক্রিয় থাকিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উহার আকার কিঞ্চিৎ বর্ধিত হয়। এই শিবসতীগ্রন্থির অব্যবহিত নিম্নে দর্শনেন্দ্রিয়-পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র (Optic nerve centre) অবস্থিত। এই স্নায়ুকেন্দ্রের স্নায়ুগুলির সাহায্যেই দেহাধীশ রূপগ্রহণ ক্ষমতা পরিচালনা করেন। শিবসতীগ্রন্থির আকার বর্ধিত হইলে উহা দর্শনেন্দ্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের খানিকটা আবৃত করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য করে। এই সঙ্কুচিত স্নায়ুগুলি স্বাভাবিকভাবে রূপগ্রহণ করিতে পারে না। স্নায়ুদৌর্বল্যের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচকপিত্ত ও তর্পক শ্লেষ্মার সরবরাহও চক্ষু পায় না—ফলে দেহাধীশ চক্ষুর সাহায্যে আর নিখুঁতভাবে রূপগ্রহণ করিতে পারেন না; দৃষ্টিদোষ ও দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ তখনই সৃষ্টি হয়। সুতরাং অত্যধিক শুক্রক্ষয় এবং ধারণাশক্তির অভাবও দৃষ্টিক্ষীণতারোগের একটি প্রধান কারণ। শুক্রক্ষয়, যকৃৎদোষ এবং বায়ু দুষ্ট হইয়া যে দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ উৎপন্ন করে, উহা ক্রমশঃ দুরারোগ্য হইয়া উঠে। আধুনিক যুগের গ্লুকোমা প্রভৃতি জটিল চোখের রোগও এইরূপ বিবিধ দোষ মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয়।

দাম্পত্য ব্যবহারে মেয়েদের পুরুষের মতো বেশি পরিমাণে শুক্রক্ষয় হয় না; যেটুকু ক্ষয় হয় পুরুষের শুক্র ঐ ক্ষয়-ক্ষতির অধিকাংশই পূরণ করে। এইজন্য দাম্পত্য জীবনের অপব্যবহারে পুরুষের মতো মেয়েদের চোখ খারাপ হয় না। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অপব্যবহারের ফলে

মেয়েদের ধারণাশক্তি যখন ক্ষুণ্ন হয়, মেয়েরা প্রদরাদি রোগে আক্রান্ত হয়, তখন ঐ প্রদরস্রাবের সঙ্গে মেয়েদের দেহস্থ শুক্রও অতিরিক্ত ক্ষয় হইয়া দৃষ্টিক্ষীণতারোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং দাম্পত্য জীবনের অপব্যবহারে মেয়েরা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিক্ষীণতা রোগে আক্রান্ত না হইলেও পরোক্ষভাবে উহা তাহাদের দৃষ্টিক্ষীণতার কারণ হয়। অবিবাহিত মেয়েদের অতিরিক্ত অস্বাভাবিক কামতৃপ্তিতেও ধারণাশক্তি নষ্ট হইয়া দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ সৃষ্টি করে।

কতকগুলি আগন্তুক বা বাহ্য কারণেও সাধারণ দৃষ্টিক্ষীণতারোগ উৎপন্ন হয়। ৪০ বৎসর পার হইলেই আমাদের এই গরম দেশে যৌবনশক্তি হ্রাস পায়, দেহের স্নায়ুগুলি ক্রমশঃ দুর্বলতর হইতে থাকে। এই জন্য এই বয়সে একটু দৃষ্টিক্ষীণতা সৃষ্টি হয়; সাধারণ ভাষায় ইহাকে বলে 'চাল্‌শে ধরা' অর্থাৎ ৪০শে ধরিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা রোগ নয়—ইহা বয়সের ধর্ম। প্রত্যহ দীর্ঘসময়ব্যাপী যদি চোখে ধূম ও ধূলি প্রবেশ করে, প্রত্যহ দীর্ঘসময় যদি সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ (ক্ষুদ্র অক্ষরযুক্ত পুস্তক পাঠ, বস্ত্রের উপর, স্বর্ণালঙ্কারের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য করা প্রভৃতি) করিতে হয়, তাহা হইলেও দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ সৃষ্টি হয়। সিনেমা দর্শনে চোখের স্নায়ুর উপর খুব জোর পড়ে—সুতরাং যাহারা ঘন ঘন সিনেমা দেখে, তাহাদেরও দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ সৃষ্টি হয়। অত্যধিক পান, তামাক ও চা-সেবীদেরও দেহস্থ গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া অন্যান্য রোগের সহিত দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ উৎপন্ন হয়।

ধ্যানপরায়ণ উন্নতমনা সাধকেরা সময় সময় বিদ্যুদ্বর্ণ জ্যোতিঃ অথবা বিশ্বব্যাপী মহাজ্যোতিঃ দর্শন করেন। সময় সময় দিব্যজ্যোতির্ময় দেহধারী দেবতা, ঋষি প্রভৃতিও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হন। এইরূপ দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন এবং জ্যোতির্ময় পুরুষ দর্শনে সাধকের দৃষ্টি নির্মল হয়, কিন্তু চোখের স্নায়ু অবসন্ন হইয়া ঈষৎ দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ সৃষ্টি করে। আয়ুর্বেদাচার্য ঋষিদের বোধ হয় এইরূপ দিব্যদর্শন লাভ হইয়া সাময়িক দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ উৎপন্ন হইত, তাই তাঁহারা দৃষ্টিক্ষীণতারোগের কারণের

তালিকায় এই কারণটিরও নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই কারণটির নাম দিয়াছেন তাঁহারা—অনিমিত্ত কারণ। **"সুরর্ষিগন্ধর্ব-মহোরগানাং সন্দর্শনেনাপি চ ভাস্করস্য। হন্যেত দৃষ্টির্মনুজস্য যস্য স লিঙ্গনাশস্ত্বনিমিত্তসংজ্ঞঃ।। তত্রাক্ষিবিস্পষ্টমিবাবভাতি বৈদূর্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ। বিদীর্যতে সীদতি হ্রীয়তে বা নৃণামভিঘাতহতা তু দৃষ্টিঃ।।"**

সাধারণতঃ কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা এবং দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখার (myopia) মূলে থাকে অগ্নিগ্রন্থির অর্থাৎ যকৃৎ প্রভৃতির ত্রুটি। কাছের বস্তু অস্পষ্ট দেখা এবং দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখার (Hyper-Metropia) মূলে থাকে বরুণগ্রন্থি অর্থাৎ যৌনগ্রন্থিগুলির ত্রুটি। আধুনিক ভাষায়—চশমাধারীদের চশমার 'মাইনাস পাওয়ার' (Minus Power) যকৃৎ দোষের লক্ষণ। চশমার 'প্লাস পাওয়ার' (Plus Power) যৌবনগ্রন্থির দুর্বলতা অথবা জীবনীশক্তিক্ষীণতার লক্ষণ।

চিকিৎসা—যাহাদের অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের জন্য দৃষ্টিক্ষীণতারোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা আংশিক অক্ষমতারোগ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে। যাহাদের যকৃৎ খারাপ হইয়া চক্ষুরোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা কামলারোগ বা প্লীহা-যকৃৎরোগের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে। যাহাদের স্নায়ুদৌর্বল্যের জন্য দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা স্নায়ুদৌর্বল্য রোগের চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে।

যাহাদের চোখে ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বা ছানি পড়িয়াছে তাহারা এক সের শীতলজলের মাঝে অতি অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিবে। ঐ লবণাক্ত জল ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে চোখ ডুবাইয়া চোখ বারবার খুলিবে ও বন্ধ করিবে। অনুরূপভাবে অন্ততঃ ৪/৫ বার ক্রিয়াটি অভ্যাস করিবে। এই ক্রিয়াটি ছানি-রোগ আরোগ্যের সহায়ক।

জলপান এবং জলস্নানবিধি যথাযথ পালন করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—আজকাল দৃষ্টিক্ষীণতারোগ নিবারণের জন্য চশমা ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। স্কুল-কলেজের কচিবয়সের ছেলে-মেয়েরাও

চশমাধারী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের যে কি ভয়াবহ অবনতি ঘটিয়াছে এই চশমাধারী ছেলে-মেয়েরাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, চশমার চক্ষুদোষ দূর করার ক্ষমতা নাই—উহা চক্ষুরোগের অসুবিধাগুলি খানিকটা দূর করে মাত্র। সুতরাং চশমা গ্রহণে নিশ্চিন্ত না হইয়া দৃষ্টিক্ষীণতারোগের মূল কারণগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হইবে।

অত্যধিক অধ্যয়ন বা সূক্ষ্ম কারুকার্যের অনুষ্ঠানেও চোখ খারাপ হয় না, যদি চোখের স্নায়ুর উপর জোর না দিয়া ঐগুলি করা হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতে চোখের স্নায়ুর উপর জোর দিবে না, সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে চোখ মেলিয়া চোখের কার্যাদি অনুষ্ঠান করিবে। ২/৩ মিনিট অন্তর অন্তরই চোখের পাতা বুজিয়া অর্থাৎ চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া ২/৪ সেকেণ্ড চোখকে বিশ্রাম দিবে। অধ্যয়ন, সিনেমা দর্শন এবং অন্যান্য চোখের কাজেও চোখকে বিশ্রাম দেওয়ার এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। মাঝে মাঝে মুক্ত জানালা বা উন্মুক্ত দরজা দিয়া দিগন্তের পানে তাকাইবে। উহা দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় সাহায্য করে। যাহারা দিবসের অধিকাংশ সময় স্বীয় গৃহের জানালা-দরজা পরদায় আবৃত করিয়া বাস করে, তাহাদেরও দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ জন্মিতে পারে।

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই রোগ সৃষ্টি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যকৃৎ দোষের ফলে। সুতরাং যকৃৎকে সুস্থ-সবল করিবার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইবে। ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য, যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলিয়া কখনো কোনো ঔষধ সেবন করিবে না। এইসব ঔষধ ভয়াবহভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে। এইসব বিষাক্ত ঔষধে যৌনগ্রন্থি ও বস্তিস্নায়ুগুলি সাময়িকভাবে অতিক্রিয় হইয়া বিশেষভাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। স্নায়ুগুলির অবসন্নতায়, যৌনগ্রন্থির দুর্বলতায় কেন দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়—তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

দৃষ্টিক্ষীণ রোগীরা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া নবোদিত সূর্যের দিকে ৪/৫ মিনিট তাকাইয়া থাকিবে। বেলা ৮টা-৯টার সময় চোখে ৫/৭ মিনিট রোদ লাগাইবে। সূর্যের দিকে চোখ বুজিয়া তাকাইয়া অথবা

রোদের মাঝে দাঁড়াইয়া রোদের দিকে তাকাইবে—যাহাতে চোখে রোদ লাগে। অতঃপর ছায়ায় আসিয়া ২/১ মিনিট চোখ বুজিয়া চোখের উপর দুই হাতের তালু রাখিয়া চোখ বন্ধ করিয়া চোখকে বিশ্রাম দিবে। এইভাবে ২/১ মিনিট বিশ্রামের পর চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিবে। জল ঝাপ্‌টা দেওয়ার নিয়ম—মুখে খানিকটা জল পুরিয়া রাখিয়া ১৫/২০ বার চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে হয়। শুধু এই সময় নয়, আহারাদির পর অথবা অন্য যে কোনো সময়ে হাত-মুখ ধুইলেও সেই সময় এই নিয়মে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিবে।

অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের জন্য যাহাদের দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ জন্মিয়াছে, তাহারা দ্বিপ্রহরের আহারের সময় ভাতের সঙ্গে আধ ছটাক খাঁটি ঘি বা মাখন খাইবে। যকৃতের দোষ থাকিলে ঘি বা মাখন খাইবে না। ঘি ও মাখনের পরিবর্তে মাঝে মাঝে যে কোনো জাতীয় বাদাম খাইবে। দুগ্ধ দৃষ্টিক্ষীণতা রোগারোগ্যে ও অন্যান্য চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী পথ্য। দুগ্ধ সহ্য না হইলে দধি খাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি—অধিকাংশ চক্ষুরোগী ও দৃষ্টিক্ষীণতারোগীর যকৃতের দোষ থাকে। সুতরাং চক্ষুরোগী ও দৃষ্টিক্ষীণতারোগীর পথ্যের তিন ভাগের দুই ভাগই ক্ষারধর্মী হওয়া উচিত। শাক-সব্জী, দুধ ও ফল ক্ষারধর্মী পথ্য ; ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি অম্লধর্মী পথ্য। **ডিম, চা, তেলে ভাজা ও ঘিয়ে ভাজা খাদ্য চক্ষুর পক্ষে খুব অনিষ্টকারী পথ্য, সুতরাং চক্ষুরোগী এই সব খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।**

চোখে ছানি পড়া—৫৫ বৎসরের পরে সংহত খাদ্য গ্রহণ করিলে চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনা ঘটে। সুতরাং, ছানিপড়ার হাত হইতে যাহারা চক্ষুকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা ৫৫ বৎসরের পর পাতে ঘি-মাখন খাইবে না। ঘিয়ে তৈরি ও ছানার তৈরি মিষ্টি-মিঠাই, তেলে-ভাজা এবং ঘিয়ে-ভাজা জিনিস সাধ্যমত বর্জন করিবে এবং চা, পান ও ধূমপানের নেশাও সাধ্যানুযায়ী হ্রাস করিবে বা পরিত্যাগ করিবে। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য বর্জন করিবে।

ধাতু-দৌর্বল্য

লক্ষণ—এই রোগে প্রস্রাবের প্রারম্ভে বা শেষভাগে তরল শুক্র প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়। এই রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সামান্য উত্তেজনায়, বিনা উত্তেজনায় অথবা স্ত্রীলোক দর্শনে বা স্ত্রীলোকের ছবি দর্শনেও পাতলা ধাতু যখন-তখন প্রস্রাবপথে ক্ষরিত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে দেহের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

মেয়েদের প্রদররোগ এই ধাতু-দৌর্বল্য রোগেরই অন্তর্গত।

কারণ—ধাতু-দৌর্বল্য রোগ আংশিক অক্ষমতা রোগেরই প্রকার বিশেষ। আংশিকভাবে অক্ষম রোগীর ধাতু-দৌর্বল্য রোগ নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ধাতু-দৌর্বল্য রোগীর আংশিক অক্ষমতা রোগ অবশ্যই সৃষ্টি হইবে। দীর্ঘদিন যাবৎ অস্বাভাবিক ভাবে রেতঃপাত অথবা অতিরিক্ত সহবাসের ফলে ধারণাশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে এই ধাতু-দৌর্বল্য রোগ সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—এই রোগের চিকিৎসা এবং নিয়ম-পথ্য 'আংশিক অক্ষমতা' রোগের অনুরূপ ('আংশিক অক্ষমতা রোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

নাসিকায় রক্তস্রাব

কারণ—যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রের (Kidney) ক্রিয়া বিকৃতির জন্য দেহে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইলে দেহপ্রকৃতি ঐ রক্ত নাসাপথে বাহির করিয়া দেয়—সুতরাং এই কারণে নাসিকায় রক্তস্রাব হইলে তাহা অপকারী নয়, উপকারী। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইলে সময় সময় নাসাপ্রদেশের রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হইয়াও নাসাপথে রক্তস্রাব হইতে পারে। যক্ষ্মা, মেনিনজাইটিস, ডিপ্থেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগেও নাসিকা দ্বারা রক্তস্রাব হয়।

চিকিৎসা—যদি যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার ত্রুটির জন্য নাসিকায় রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে কামলা রোগ চিকিৎসা বা প্লীহা ও যকৃৎ রোগ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে। যদি রক্তচাপ বৃদ্ধি এই রোগের কারণ হয়, তাহা হইলে 'রক্তচাপবৃদ্ধি' রোগের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে। রোগী অল্পবয়স্ক হইলে রোগীকে প্রত্যহ ভোরে এবং সন্ধ্যায় যে কোনো ৪টি স্বাস্থ্যাসন ও ৩টি সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস করাইবে। ভোরে যে ৪টি স্বাস্থ্যাসন অভ্যাস করিবে, বৈকালে সেইগুলি বাদ দিয়া অপর ৪টি অভ্যাস করিবে।

এই রোগের নিয়ম ও পথ্য কামলা রোগ বা প্লীহা ও যকৃৎ রোগের অনুরূপ। বলা বাহুল্য, জলপান ও জলস্নানবিধি অবশ্য পালনীয়।

নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ)

লক্ষণ—আয়ুর্বেদের ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ রোগই বর্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে নিউমোনিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। নিউমোনিয়া রোগ দ্বিবিধ—ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া (Broncho-Pneumonia) এবং লোবর নিউমোনিয়া (Lobar-Pneumonia)। ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) রোগেরই পরিণতিস্বরূপ। যে শ্বাসনালীদ্বয় ফুস্‌ফুস্‌ পর্যন্ত প্রসারিত, এই রোগে সেই শ্বাসনালী প্রদাহান্বিত হইয়া ফুস্‌ফুসের কোষগুলিতেও প্রদাহ উপস্থিত করে। ফুসফুসের অংশবিশেষ এইরূপে আক্রান্ত হয়। লোবর নিউমোনিয়ায় একটি ফুস্‌ফুসের সমগ্র অংশ বা উভয় ফুস্‌ফুসের সমগ্র অংশ প্রদাহান্বিত হইয়া উঠে।

হঠাৎ কম্প সহ অত্যধিক জ্বর (১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রি), পার্শ্ববেদনা [একটি ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে বুকের একপাশে, উভয় ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে (ডবল নিউমোনিয়া) উভয় পার্শ্বে বেদনা] শুরু হয়, কাশি এবং কাশির সঙ্গে একটু 'লালচে' ঘন আঠা আঠা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঠোঁট ও

মুখ একটু নীলবর্ণ ধারণ করে। এইগুলিই নিউমোনিয়া রোগের সাধারণ লক্ষণ।. রোগীর ফুস্‌ফুসে পুঁজ উৎপন্ন হইলে রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে।

কারণ—নিউমোনিয়া রোগের বীজাণু সুস্থ সবল দেহেও থাকে। ফুস্‌ফুসে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে এই রোগবীজাণু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ করে। টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের বীজাণুও দুর্বল ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ করিয়া এই রোগ সৃষ্টি করিতে পারে। রক্তকে শোধন করার, রক্তের ভিতরের দূষিত পদার্থকে ছাঁকিয়া রাখার ৫টি যন্ত্র বা কারখানা আমাদের দেহে আছে—মূত্রগ্রন্থি, প্লীহা, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্‌ ও টনসিল। বিশুদ্ধ বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেনের সহায়তায় ফুস্‌ফুস্‌ দেহের দূষিত রক্তকে শোধন করে। শরীরের দূষিত রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফুস্‌ফুসের শোধনক্রিয়ার সামর্থ্যকে যখন অতিক্রম করে, তখন ফুস্‌ফুস্‌ অতিরিক্ত পরিশ্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে ; ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বিশুদ্ধ রক্তের সরবরাহ হৃদ্‌পিণ্ড তখন আর পায় না। এই অবস্থায় দেহে রোগবিষ এবং ব্যাধিবীজ প্রবল হইয়া ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ করে।

চিকিৎসা—জ্বর আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সহ্যমত গরম জল পান করাইবে। প্রতি ১৫/২০ মিনিট অন্তর আধ গ্লাস বা তিনপোয়া গ্লাস (১-১১/২ পোয়া) গরম জল রোগীকে পান করিতে দিবে। যতক্ষণ শরীরে কম্প বা শীতভাব থাকিবে, ততক্ষণ রোগীকে এইভাবে গরম জল পান করাইবে। এইরূপ গরম জল পানে রোগীর দেহ খুব ঘর্মাক্ত হইবে, ঘর্মের ভিতর দিয়া বহু পরিমাণে রোগবিষ বাহির হইয়া যাওয়ার ফলে জ্বরের প্রবলতা দ্রুত হ্রাস পাইবে। জ্বর হ্রাস পাইলে বা বন্ধ হইলে ভোরে ও সন্ধ্যায় ৪ নং সহজ বস্তিক্রিয়ার সাহায্যে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে। কোষ্ঠতারল্য থাকিলে জ্বর হ্রাসপ্রাপ্তির অবস্থায় বা বিজ্বর অবস্থায় রোগী প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ১৫-২০ বার সহজ অগ্নিসার ক্রিয়া অভ্যাস করিবে। রোগীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত একটু ভালো হইলে রোগী দিনের মাঝে ২/৩ বার সহজ প্রাণায়াম নং ৯ অভ্যাস

করিবে। জ্বরারোগ্যের পর ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নানবিধি পালন করিবে। এই রোগটিও জটিল এবং মারাত্মক; সুতরাং নির্ভরযোগ্য যৌগিক চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কেহ পুস্তকদৃষ্টে এই রোগ আরোগ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।

নিয়ম ও পথ্য—রোগীর জ্বর ১০৩ ডিগ্রির উপরে উঠিলেই রোগীর মাথায় জল ঢালিবে বা মাথার উপরে ভিজা গামছা বা তোয়ালে রাখিয়া তাহার উপর বরফের ব্যাগ স্থাপন করিবে। জ্বরের উত্তাপ এই উপায়ে নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। রোগীর গৃহে দরজা ও জানালা সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া রোগীর গায়ে না লাগে, সেই দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। ফুস্‌ফুসের বেদনাস্থানে প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ ৬ মিনিট সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। [সেঁক দেওয়ার নিয়ম—এক টুকরা নেকড়া ফুটন্ত গরমজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইবে, ঐ গরম নেকড়াখানা এক টুকরো ফ্লানেলের মাঝে জড়াইয়া রোগীর ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ স্থানে সেঁক দিবে। নেকড়া ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে পূর্বোক্তরূপে পুনরায় ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া লইবে।] এইরূপ সেঁকের ফলে রোগীর বেদনা এবং কাশির বেগও হ্রাস পাইবে। সহ্যমত গরম জল চায়ের মতো একটু একটু করিয়া চুমুক দিয়া খাইলেও কাশির বেগ মন্দীভূত হয়।

এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রথম দুইদিন শুধু লেবুর রস সহ প্রচুর জলপান করিয়া উপবাস দিতে হয়। দুইদিন উপবাসের পরও যদি ক্ষুধাবোধ না হয়, তাহা হইলে উপবাসের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিবে। ক্ষুধাবোধ হইলে উপবাস স্থগিত রাখিবে। রোগীর জ্বর, কাশি, বেদনা প্রভৃতি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীর জন্য গ্লুকোজ বা দুধ-বার্লি বা দুধ-সাগু, বেদানার রস প্রভৃতি লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। পথ্যের ব্যবস্থা খুব সাবধানতার সহিত করিবে। পথ্য খুব ভালো জীর্ণ না হইলে রোগবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

চিকিৎসকেরা এই রোগে রোগজীবাণু বৃদ্ধি বন্ধের জন্য রসুনের রস,

বাসকপাতার রস, অল্পমাত্রায় আইওডিন বা কুইনাইন রোগীকে ব্যবহার করিতে দেন। রোগীর বেদনা নিবারণের জন্য কোনো কোনো চিকিৎসক মর্‌ফিয়া (আফিমের সার), ষ্ট্রীক্‌নিন (কুঁচিলার বীজ হইতে প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জবিষ) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করেন। রোগীর হৃদ্‌স্পন্দন ক্রিয়া ঠিক রাখিবার জন্য কেহ কেহ রোগীর চিকিৎসায় মদ প্রয়োগ করেন। সেঁকের পরিবর্তে কেহ কেহ এন্টিফ্লোজিষ্টিনের পুল্‌টিস ব্যবস্থা দেন। ধনী রোগীদের উপর সিরাম (রক্তাম্বু) প্রয়োগ করা হয়।

বলা বাহুল্য, এইসব ঔষধে রোগীর বিশেষ কোনো উপকার হয় না। **ঔষধ দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করা যায় না**। পথ্য সম্বন্ধে সতর্কতা এবং যথোপযুক্ত শুশ্রূষাই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদেরও অভিমত।

রোগীর পা সর্বদা গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। এই কাজের জন্য দরকার মতো গরম জলের বোতল, গরম জলের 'রবার ব্যাগ' ব্যবহার করিবে। অষ্টম দিনই এই রোগের সঙ্কটময় দিন। রোগের গতি দেখিয়া এই দিনই বোঝা যায়, রোগ মারাত্মক হইয়া উঠিবে, না দ্রুত আরোগ্যের পথে যাইবে। যথোচিত উপবাস, সতর্ক পথ্যের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা সম্বন্ধে রোগের প্রথম সপ্তাহে খুব সচেতন থাকিলে রোগ আর মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে না। ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়ামাদি নিউমোনিয়া রোগীর অব্যর্থ প্রতিষেধক।

পক্ষাঘাত বা পক্ষবধ রোগ

'**পক্ষ**' শব্দের অর্থ সহায়, অবলম্বন, আশ্রয়। এই রোগে গতি ও স্থিতির প্রধান সহায় এবং অবলম্বন স্নায়ুগুলি আহত হইয়া অবশ হয়, কোনো অঙ্গের স্নায়ু ছিন্ন হইয়া অকর্মণ্য বা নিহত অর্থাৎ কাজের অযোগ্য হয়,—এইজন্যই ইহার নাম **পক্ষাঘাত** বা **পক্ষবধ** রোগ। এই **পক্ষাঘাত**

রোগ কখনো হাত বা পা প্রভৃতি যে কোনো একটি অঙ্গকে বা একাধিক অঙ্গকে বা অর্ধাঙ্গকে আক্রমণ করে। এই আক্রান্ত অঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকে সুতরাং পক্ষাঘাত একরকম স্নায়বিক ব্যাধি।

দেহরাজ্যের রাজধানী মস্তিষ্কে অবস্থিত। এই রাজধানীটি সুদৃঢ় দুর্গের মতোই সুরক্ষিত; সুদৃঢ় অস্থি দ্বারা ইহার চতুর্দিক পরিবেষ্টিত। এই সুরক্ষিত রাজধানীতেই দেহাধীশ বুদ্ধির এবং দেহ পরিচালক মনের প্রধান আবাসস্থল বা কর্মকেন্দ্র অবস্থিত। দেহসৃষ্টিকারী আকাশাদি পঞ্চদেবতার বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রও এই মস্তিষ্কের মাঝেই বিদ্যমান।

কার্যোপযোগী শুধু একটি অঙ্গ সৃষ্টি করিয়া দেহাধীশ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। একটি অকর্মণ্য হইলে আর একটির দ্বারা যাহাতে কাজ চালানো যাইতে পারে, সেইজন্য দেহের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রই দুইটি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং দেহের যন্ত্রগুলি একক নয়, সকলেই জোড়া জোড়া বা যুগলে অবস্থিত। এক পাশের দাঁত অকর্মণ্য হইলে আর এক পাশের দাঁত দ্বারা আমরা দাঁতের কাজ চালাইয়া নিই; এক চোখ কানা হইলে আর এক চোখ আমাদের দর্শন শক্তিকে অব্যাহত রাখে; এক নাক বন্ধ হইলে আর এক নাক আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য চালায়; এক ফুস্‌ফুস্‌ অকর্মণ্য হইলে আর এক ফুস্‌ফুস আমাদের প্রাণরক্ষা করে। দেহরাজ্যের রাজধানী মস্তিষ্কটিও এইরূপ জোড়া বা দুই ভাগে বিভক্ত। উহার বামদিকে বাম মস্তিষ্ক এবং ডানদিনে ডান মস্তিষ্ক অবস্থিত। আমরা ডান হাত দ্বারাই সাধারণতঃ অধিকাংশ প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করি। আমাদের এই ডান হাতের পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র বাম মস্তিষ্কে অবস্থিত। অত্যধিক রক্তচাপের ফলে বা অন্য কোনো দুর্ঘটনার ফলে বাম মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র যদি আহত হয়, তাহা হইলে আমাদের ডান হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইবে। ডান হাতের স্নায়ু-ধমনী, পেশী সমস্ত কিছু সক্ষম থাকা সত্ত্বেও ঐ হাত আর নাড়া-চাড়া করা সম্ভবপর হইবে না। বাম হাতের পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র ডান মস্তিষ্কে অবস্থিত। ডান মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে বাম হস্তের আর কোন কার্যকরী শক্তি থাকে না। ডান হাত পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে বাম হাত পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র অধিকতর সক্রিয় হইয়া ডান হাতের অভাব অনেকটা পূরণ করে। অনুরূপভাবে বাম চক্ষুর স্নায়ুকেন্দ্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে বা নষ্ট হইলে ডান চক্ষুর স্নায়ুকেন্দ্র অধিকতর সক্রিয় হইয়া বাম চক্ষুর অভাব অধিকাংশই পূরণ করে। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়শক্তি পরিচালনার প্রধান কর্মকেন্দ্র এই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে অবস্থিত এই কর্মকেন্দ্রস্থানগুলি হইতেই আমাদের বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যে আমরা বইয়ের বাংলা অক্ষরগুলি দেখিতেছি এই অক্ষরগুলির স্মৃতি যে স্নায়ুকোষে সুরক্ষিত থাকে, ঐ স্নায়ুকোষটি রক্তের চাপে নষ্ট হইলে বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে কোনো বাংলা বই পড়িবার আর আমাদের ক্ষমতা থাকিবে না, বাংলা অক্ষর আমাদের আর বোধগম্য হইবে না—কিন্তু ইহার ফলে আমাদের ইংরাজী বিদ্যা বা হিন্দী বিদ্যার কোনো ক্ষতি হইবে না। ইংরাজী বই, হিন্দী বই পড়িতে, পড়াইতে কোনো অসুবিধা হইবে না। অনুরূপভাবে ইংরাজী বিদ্যার স্মৃতিরক্ষার জন্য আমাদের মস্তিষ্কে যে স্নায়ুকোষ নির্মিত হইয়াছে, রক্তের চাপে বা পক্ষাঘাতে ঐগুলি নষ্ট হইলে আমাদের আর ইংরাজি বই পড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না—কিন্তু উহাতে আমাদের বাংলা বা হিন্দী বই পড়িতে কোনো বাধা হইবে না। মস্তিষ্কের এই কোষগুলির সাহায্যেই দেহাধীশ দেহের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন। এই স্নায়ুকোষগুলির রং ধূসর বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এইগুলিকে বলে 'গ্রে ম্যাটার' (Gray matter)। এই 'গ্রে ম্যাটার' বা স্নায়ুপরিচালক কোষগুলিই দেহাধীশের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ। এই গ্রে ম্যাটার বা স্নায়ুকোষগুলি মস্তিষ্কের উপরাংশে অবস্থিত। এই কোষগুলির অভ্যন্তরে আরও সুরক্ষিত স্থানে মন ও বুদ্ধির কার্যকারিতার কেন্দ্র অহংগ্রন্থি ও মহৎগ্রন্থি অবস্থিত। বুদ্ধির কার্যকারিতার এই কেন্দ্রটি বিকল হইলে এবং উহার সহিত যুক্ত স্নায়ুগুলি অকর্মণ্য হইলে মানুষ পাগল হয়। বুদ্ধির সহিত মনের তখন আর যোগসূত্র থাকে না, বুদ্ধি আর তখন মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে না—ফলে পাগল যা খুশি তাই বলে, যা খুশি তাই করে।

মস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুগুলির সাহায্যেই দেহ পরিচালকের আদেশ-নির্দেশ দেহরাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হয়—এইজন্য এই স্নায়ুগুলির নাম আজ্ঞাবহা নাড়ী। যে কোনো স্নায়ুকোষ অকর্মণ্য হইলে ঐ স্নায়ুকোষযুক্ত আজ্ঞাবহা নাড়ীগুলিও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, উহারা আর প্রয়োজন মতো আদেশ নির্দেশ পরিবেশন করিতে পারে না। এইভাবে আজ্ঞাবহা নাড়ীর অকর্মণ্যতার ফলেও যেমন পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্ট হয়, তেমনি যে সমস্ত স্নায়ু বা পেশীর সাহায্যে আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে প্রয়োজনমতো সঞ্চালিত করিতে পারি, সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো অংশের স্নায়ু বা পেশী অকর্মণ্য হইলে সেই অঙ্গ আমরা আর নাড়াচাড়া করিতে পারি না; ঐসব অঙ্গের সংজ্ঞাবাহী নাড়ীও তখন আর মস্তিষ্কে এইসব বিপদ-সংবাদ প্রেরণ করিতে পারে না। সংজ্ঞাবহা নাড়ীগুলির দুর্বলতার ফলে দেহরাজ্যের ঐ অংশের সহিত মস্তিষ্করূপ রাজধানীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়—ইহার ফলে ঐ সব অঙ্গও অসার ও অচেতন হইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়।

লক্ষণ—যদি জিহ্বা মুখের মাঝে নাড়িতে-চাড়িতে অসুবিধা বোধ হয় অথবা জিহ্বা মুখ হইতে বাহির করিলে যদি একপাশে বাঁকিয়া যায়, তাহা হইলে উহা পক্ষাঘাত রোগের লক্ষণ সূচিত করে।

কারণ—বায়ুই স্নায়ুগুলিকে পরিচালিত করে। এই বায়ু যখন বিশেষভাবে কুপিত হইয়া বিষাক্ত হয়, তখন স্নায়ুগুলিও বিষাক্ত বায়ুর বিষে আক্রান্ত হইয়া অবসন্ন ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে; এইজন্য পক্ষাঘাত রোগ আয়ুর্বেদমতে বায়ুরোগ বা বাত-ব্যাধির অন্তর্গত। শ্লেষ্মা ও পিত্ত কুপিত না হইলে বায়ু বিশেষ কুপিত হইতে পারে না। সুতরাং পক্ষাঘাত রোগে দূষিত বায়ুর প্রাধান্য থাকিলেও মূলতঃ উহা ত্রিদোষজ স্নায়ুরোগ।

অগ্নিগ্রন্থিপ্রধান অর্থাৎ পিত্তপ্রধান লোকের দেহস্থ স্নায়ুগুলি বিশেষ সবল থাকে। উপভোগশক্তিও এই শ্রেণীর লোকের মাঝে স্বভাবতঃই একটু বেশি। এই শ্রেণীর মাঝে যাহারা আত্মসংযমে অভ্যস্ত, তাহারাই

হয় মহা উদ্যমী এবং নিরলস মহাকর্মী। সাধারণ পিত্তপ্রধান লোক অত্যধিক কামসেবার প্রলোভন দমন করিতে পারে না। কাম-ক্রোধ সর্বদা একসঙ্গেই বাস করে; সুতরাং ক্রোধের প্রকাশও ইহাদের মাঝে একটু বেশি। অতিরিক্ত কাম-ক্রোধের সেবায় ইহাদের বস্তিস্নায়ু অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা, পিত্তদোষ প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়। এইসব রোগের জন্য অপান বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠে। এইজন্যই অসংযমী পিত্তপ্রধান লোকের মধ্যেই নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত রোগের অধিক প্রকাশ দেখা যায়। মাছ, মাংস, ডিম, রসুন, পেঁয়াজ, মদ্য প্রভৃতি অত্যধিক পরিমাণে সেবন করিলেও শরীর দূষিত হইয়া রক্তে অম্লবিষের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্টি হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ, পিত্তদুষ্টি প্রভৃতি যে কোনো কারণে শরীর অত্যন্ত দোষযুক্ত হইলে হাত, মুখ, চোখ প্রভৃতি যে কোন অঙ্গে পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী জলপানপূর্বক বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকরণী ৪ মিনিট; সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৪, ৮—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। পা নাড়িবার সামর্থ্য থাকিলে অর্ধশলভাসন ১৫ বার। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাব বাথ ৫ মিনিট। টাব বাথ গ্রহণের ক্ষমতা না থাকিলে অর্ধস্নান বা স্নান ৫ মিনিট। দ্বিপ্রহরে টাব বাথ বা স্নান ১০/১৫ মিনিট।

সন্ধ্যায়—বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকরণী—৪ মিনিট। সহজ প্রাণায়াম যে কোনো ৪টি। অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২। সামর্থ্য থাকিলে অন্য যে কোন আসন ২/৩টি। হাঁটিবার ক্ষমতা থাকিলে দুইবেলাই ভ্রমণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। পক্ষাঘাত রোগীদের জন্য হস্তমুদ্রা ও পদমুদ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, উহা যোগাচার্যদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া লইতে হইবে। পুস্তকে উহা বর্ণনা করা যায় না।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলস্নানবিধি ও জলপানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগের প্রাথমিক আক্রমণ শুরু হইলে তিন দিন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে। উপবাসের সময় প্রচুর জলপান করিবে। উপবাসের প্রথম দিন ভোরে যে কোনো একটি সহজ বস্তিক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে। উপবাসের মধ্যে আর কোনো যৌগিক ক্রিয়া অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। উপবাস অন্তে উল্লিখিত যৌগিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গকে রৌদ্রে রাখিয়া ঐ অঙ্গের স্নায়ু ও পেশী প্রত্যহ ২৫/৩০ মিনিট ধরিয়া মালিশ করিবে। মালিশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠাইবে।

রক্তে অত্যধিক অম্লবিষ সঞ্চিত না হইলে পক্ষাঘাতরোগ সৃষ্টি হইতে পারে না। আমিষ খাদ্য বিশেষভাবেই অম্লধর্মী—সুতরাং পক্ষাঘাতরোগী আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। নিরামিষ খাদ্যের মাঝেও রুটি, ভাত অর্থাৎ শর্করাজাতীয় খাদ্য অম্লধর্মী। ঘি, মাখন ও তৈল প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্যও অম্লধর্মী। পক্ষাঘাত রোগীর পক্ষে এগুলি বিশেষ অনিষ্টকারী। সুতরাং রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত রোগীর পাতে ঘি-মাখন অথবা ঘিয়ের তৈয়ারি এবং ছানার তৈয়ারি খাবারাদি দিবে না। রন্ধনে ঘি বা তেল যথাসাধ্য কম ব্যবহার করিবে। শর্করাজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ ভাত, রুটি প্রভৃতিও রোগীকে খুব অল্প পরিমাণে দিবে। রোগীর ক্ষুধা অনুযায়ী রোগীর জন্য ক্ষারধর্মী খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে। সবরকম শাকসবজি, ডাল, দুধ, দধি, ঘোল, টক ও মিষ্ট ফলই ক্ষারধর্মী খাদ্য। রোগীর মদ্যপান, ধূম্রপান, চা-পান, নস্য গ্রহণ অথবা অতিরিক্ত পান খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

প্রদর

লক্ষণ—অকারণে অর্থাৎ অনুত্তেজনায় যখন তখন মাতৃঅঙ্গ হইতে স্রাব হইলে উহাকে প্রদর রোগ বলে। এই স্রাব যদি ঈষৎ হলুদবর্ণ,

কালো বা লালবর্ণ হয়, তাহা হইলে উহাকে পৈত্তিক প্রদর বলে। ফেনিল বা মাংস-ধোয়া জলের মতো স্রাব হইলে উহাকে বলে বাতজ প্রদর। ঈষৎ পাণ্ডু বা দুধের মতো সাদা স্রাবকে বলে শ্লৈষ্মিক প্রদর। পৈত্তিক প্রদর এবং বাতজ প্রদরকে এক কথায় বলা হয় **রক্ত প্রদর**। মেয়েদের মাঝে সাধারণতঃ শ্বেতপ্রদর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

কারণ—"গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ"—গর্ভপাতের ফলে মেয়েদের বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও গ্রন্থি প্রভৃতি দুর্বল হইয়া এই প্রদররোগ সৃষ্টি হয়। অথবা যে নারীর যতটুকু সহবাস স্বাস্থ্যকর তাহার চেয়ে অতিরিক্ত সহবাস হইলে তাহাদের রতিগ্রন্থি (Bartholin's gland), মাতৃগ্রন্থি (Ovary), মিথুনগ্রন্থি (Skene's gland), জরায়ু (Uterus), শুক্রবাহী শিরা প্রভৃতি দুর্বল হইয়া এই রোগ সৃষ্টি হয়। এই স্রাব অল্প হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু স্রাব অতিরিক্ত হইলে নারীদেহের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অবিবাহিতা মেয়েদের অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি ও বিবাহিতা মেয়েদের অতিরিক্ত সহবাস কোষ্ঠবদ্ধতা রোগেরও একটি প্রধান কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতারোগ প্রসঙ্গে এই বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতারোগ সৃষ্টি হইলে অথবা যকৃৎ খারাপ হইয়া রক্তশূন্যতারোগ দেখা দিলে অথবা পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে বা অন্যান্য কারণে মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও (আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় নারীদেহে ভিটামিনের অভাব হইলেও) এই রোগ সৃষ্টি হয়। ঔষধপ্রিয় মেয়েদের অতিরিক্ত ঔষধ সেবনের ফলে বা অতিরিক্ত ঔষধ ইন্‌জেক্‌সন নেওয়ার ফলে ঐ ঔষধ-বিষে দেহের প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া, স্নায়ুগুলি দুর্বল হইয়া, ধারণাশক্তি ক্ষীণ হইলেও এই রোগ সৃষ্টি হয়।

অল্পবয়স্ক মেয়েদেরও সময় সময় স্রাব হয়। ইহা রসস্রাব; প্রদর-স্রাব নয়। এই স্রাবের কারণ—যোনিপ্রদেশের অপরিচ্ছন্নতা অথবা সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির উত্তেজনা। অপরিচ্ছন্নতার দরুণ যোনিপ্রদেশে প্রদাহ উৎপন্ন

হইয়া অথবা কৃমির উৎপাতে যোনিপ্রদেশ উত্তেজিত হইয়া এইরূপ স্রাব উৎপন্ন করে।

চিকিৎসা—কয়েকটি স্বাস্থ্যাসন এবং কয়েকটি সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস করাইলে এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিলে অল্প দিনের মধ্যেই বালিকাদের রসস্রাব সম্পূর্ণ ভালো হইয়া যায়।

তরুণীদের প্রদর চিকিৎসা পুরুষদের আংশিক অক্ষমতা রোগ চিকিৎসার অনুরূপ ('আংশিক অক্ষমতা রোগ'—বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

একটু যকৃৎ দোষ না থাকিলে রক্তপ্রদর সৃষ্টি হয় না—সুতরাং রক্তপ্রদররোগী শ্বেতপ্রদর চিকিৎসার সহিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসা-প্রণালী অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—২০ বৎসরের পূর্বে মেয়েদের যৌনগ্রন্থি, বস্তিস্নায়ু, শুক্রবাহী শিরাগুলি যথোচিত সুপুষ্ট ও সুদৃঢ় হয় না। অথচ এই বয়সেই আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে ২/৩টি সন্তানের জননী হয়। এইরূপ অল্পবয়সে অত্যধিক সহবাসের ফলে মেয়েদের যৌনগ্রন্থি ও তৎসম্পর্কিত স্নায়ুমণ্ডলীর যে ক্ষতি সাধিত হয়, সারা জীবনেও সেই ক্ষতির আর পূরণ হয় না। এইজন্যই একবার প্রদররোগে আক্রান্ত হইলে এই রোগ হইতে মেয়েরা সহজে অব্যাহতি পায় না। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রদররোগ অস্বাস্থ্যকর দাম্পত্য ব্যবহারেরই পরিণাম। এইজন্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভৃতি সব দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রেই অত্যধিক সহবাস এবং অপরিমিত সহবাস এই প্রদররোগের একটি প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মেয়েরা জাতির জননী, মেয়েদের স্বাস্থ্যনাশে সমগ্র জাতিরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। প্রত্যেক স্বামীরই একথা স্মরণে রাখিয়া নিজেদের দাম্পত্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবে। একই সময়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই যাহাতে দাম্পত্য তৃপ্তি সাধিত হয়, স্বামীর সে বিষয়ে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গায়ে-মাখা সাবান বা রোগজীবাণুনাশক (Antiseptic) সাবান বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলীতে মাখাইয়া উহা দ্বারা এবং জল দ্বারা মাতৃঅঙ্গের অভ্যন্তরস্থ অপরিষ্কৃত ভগাঙ্কুর প্রভৃতি প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে। হাতের আঙুলের নখগুলি কর্তিত রাখিবে, নখের আঘাত লাগিয়া ঐ অঙ্গের অভ্যন্তরভাগ যেন আহত না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। প্রত্যহ মাতৃ-অঙ্গ উল্লিখিত উপায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দিলে অল্পবয়স্ক মেয়েদের স্রাব অল্পদিনের মাঝেই ভালো হইয়া যাইবে।

রোগের অবস্থায় স্বামী সহবাস সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া চলিতে পারিলে উল্লিখিত যোগপ্রক্রিয়াগুলি দ্রুত রোগারোগ্যে সহায়তা করিবে।

অতিরিক্ত অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তির ফলে অবিবাহিতা তরুণীদেরও এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তির বদভ্যাস সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া যৌগিক চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে।

মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য, অধিক তৈল ঘি-মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য রোগের অবস্থায় বর্জন করিবে। দুধ, ঘোল, বিবিধ শাক-সবজি, কিস্‌মিস্‌, বাদাম প্রভৃতি শুষ্ক ফল এবং যে কোনো টক বা মিষ্ট ফল এই রোগে সুপথ্য।

প্রমেহ (গণোরিয়া)

সম্ভবতঃ এই রোগটি বিদেশের আমদানি। প্রাচীন আয়ুর্বেদে এই রোগটির বিশেষ কোনো বিবরণ নাই। মেহ রোগের কিছু লক্ষণ এই রোগেও আছে, এই জন্যই বোধ হয় রোগটি 'প্রমেহ' নামে প্রচলিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'গণোরিয়া' নামেই এই রোগটি সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত।

লক্ষণ—মূত্রনালীতে জ্বালা, মূত্রত্যাগের সময় অতিশয় যন্ত্রণা,

জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও স্ফীতি, জননেন্দ্রিয় হইতে প্রথমে জলবৎ, পরে সাদা বা হলুদ রংয়ের স্রাব পূঁজ নির্গত হওয়া ; কুঁচকিতে, অণ্ডকোষে বেদনার সৃষ্টি; পুরুষাঙ্গের নমনীয়তা ও কোমলতা নষ্ট হইয়া উহা শক্ত হইয়া উঠা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। মেয়েরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে সর্ব প্রথমে তাহাদের মূত্রদ্বার রক্তবর্ণ, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়; দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়, মূত্রত্যাগের সময় অতিশয় জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

কারণ—পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে এই রোগবীজাণুর নাম **গণকোকাস্ (Gonococus)**। এই গণকোকাস্ হইতে গণোরিয়া নামের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ কোনো কোনো উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিচ্ছন্ন নারী বা পুরুষদেহে এই রোগবীজ আপনা হইতেই সৃষ্টি হয়। **উচ্ছৃঙ্খল নারী-পুরুষের মিলনকেন্দ্র পতিতালয়গুলি এই রোগোৎপত্তি ও রোগ সংক্রমণের প্রধান স্থান**। এই রোগ দ্বারা কোনো নারী বা পুরুষ আক্রান্ত হইলে সেই নারী বা পুরুষের সহিত যতগুলি নারী বা পুরুষের সহবাস হইবে, তাহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এই রোগবীজ সংক্রমিত হইবে। এই রোগটি ভয়াবহ ভাবে সংক্রামক। প্রবল জীবনীশক্তিসম্পন্ন না হইলে মানবদেহ এই দুর্ধর্ষ রোগবীজাণুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে না।

রোগ প্রথম প্রকাশ পাওয়ার পর কিছুদিন আবার অপ্রকাশ থাকে, আবার অনিয়ম বা অসংযমের ফলে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রোগের সূচনাতে ভালো চিকিৎসা না হইলে ঐ রোগ আর সহজে আরোগ্য হইতে চায় না।

এই রোগ যখন চাপা থাকে, তখন রোগারোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া অনেক পুরুষ আবার বিবাহাদি করে ফলে ঐ রোগ আবার প্রকাশ পাইয়া নির্দোষ-নিষ্পাপ স্ত্রীর দেহেও সংক্রমিত হয়।

চিকিৎসা—সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাববাথ ১০ মিনিট। টাবে বসিয়া অগ্নিসার ধৌতি ১

নং ২০ বার, ২ নং ৪ বার, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, মূলবন্ধ মুদ্রা ১০ বার, মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। বারিসার ধৌতি বা বমনধৌতি।

মধ্যাহ্নে—টাববাথ ১৫ মিনিট। টাবে বসিয়া ভোরের অনুরূপ ক্রিয়াদি। বৈকালে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—টাববাথ ৫ মিনিট। টাবে বসিয়া ভোরের অনুরূপ ক্রিয়াদি। অতঃপর সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট, উড্ডীয়ান ৪ বার; পশ্চিমোত্তান আসন ৪ বার, শীর্ষাসন ৩ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩ ও ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

নিয়ম ও পথ্য—জননেন্দ্রিয়ের স্রাব বা পুঁজ হাতে লাগিলে সাবান দ্বারা ভালো করিয়া না ধুইয়া ঐ হাত চোখে লাগাইলে চোখে ঐ রোগবিষ সংক্রমিত হইবে এবং ২/৩ দিনের মধ্যেই চোখ অন্ধ হইয়া যাইবে। এই রোগাক্রান্ত মাতার সন্তানদের মধ্যে অধিকাংশ জন্মান্ধ হয়, তাহার কারণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঐ রোগবিষ সন্তানদের চোখে লাগে। সুতরাং এই রোগের স্রাব ও পুঁজ সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে।

এই গণোরিয়া রোগ এবং উপদংশ রোগ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অভিশাপস্বরূপ। এই রোগাক্রান্ত নারী-পুরুষদের কখনো বিবাহাদি করা উচিত নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ-সংযত জীবন যাপন করিতে পারিলে এই নারকীয় রোগ যন্ত্রণা হইতে প্রায়ই মুক্তি পাওয়া যায়।

জননেন্দ্রিয়ে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে পুরুষাঙ্গকে কয়েক মিনিট সহ্যমত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে অথবা ঐ অঙ্গে মাটির পুলটিস (মুখাগ্রটি বাদ দিয়া) লাগাইয়া উহা নেকড়া দ্বারা জড়াইয়া রাখিবে। মাটি খুব উষ্ণ হইলে পুনরায় মাটি পরিবর্তন করিয়া দিবে। এই উপায় অবলম্বনে পুরুষাঙ্গের জ্বালা-যন্ত্রণা অনেকটা উপশম হইবে।

লেবুর রস বা কমলার রস জলের সহিত মিশাইয়া দৈনিক ১০/১২ গ্লাস বা ৫/৬ সের জল খাইবে। রোগযন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিলে শুধু পাতলা দুধ বা জল খাইয়া ২/৩ দিন উপবাস দিবে। রোগী আমিষ ভক্ষণ, টক ফলাদি ভক্ষণ, চা-তামাক-সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন বিশেষভাবে বর্জন করিবে। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের মতো নিরামিষভোজী হইয়া শুদ্ধ সংযত জীবন যাপন করিবে। বিশেষভাবে মনে রাখিবে—এই রোগবীজ দেহ হইতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া না গেলে সহবাসের ফলে অপ্রকাশিত রোগ পুনরায় প্রকাশ পাইয়া নরকযন্ত্রণা সৃষ্টি করিবে। **এই রোগাক্রান্ত নর-নারীর ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজন।** রোগের অপ্রকাশিত অবস্থাতেও প্রত্যহ সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া জননেন্দ্রিয়কে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে। প্রত্যহ আতপস্নান গ্রহণ করিবে। সম্ভবপর হইলে আতপস্নানের সময় বা অন্য সময় কোনো নির্জন স্থানে বা ছাদে গিয়া জননেন্দ্রিয়ে ১৫/২০ মিনিট রোদ লাগাইবে।

পাইওরিয়া (দন্তবেষ্ট রোগ)

লক্ষণ—ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে এই রোগটির নাম দন্তবেষ্ট রোগ। দন্তের গোড়া বেষ্টন করিয়া এই রোগটির সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহার নাম দন্তবেষ্ট রোগ—"**স্রবন্তি পূয়-রুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ। দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ঃ দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ॥**"—দাঁতের গোড়া শ্লথ হইয়া ঐ দন্তমূলস্থানে পূঁজ ও রক্ত উৎপন্ন হয় এবং ঐ পূঁজ-রক্ত যখন তখন ক্ষরিত হয়। দাঁতের মাড়ি টিপিলেই পূঁজ ও রক্ত বাহির হইয়া আসে। ইহার নাম দন্তবেষ্ট রোগ বা পাইওরিয়া।

কারণ—শরীরের রক্ত হইতে দন্তস্নায়ু খাদ্য সংগ্রহ করে। শরীরের রক্ত দূষিত হইলে, শরীরের রক্ত নিস্তেজ হইলে, শরীরের রক্ত অত্যধিক অম্লধর্মী হইয়া উঠিলে দন্তস্নায়ু দন্তপোষণোপযোগী প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর

উপাদান পায় না। দন্তের এই নিস্তেজ অবস্থার সুযোগে দেহস্থ রোগ বীজাণুরা বিনা বাধায় দন্তের কোমল মাড়ির ভাঁজে আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে। এইসব রোগবীজাণুর বিষাক্ত লালা জমাট বাঁধিয়া দাঁতের গোড়ায় পাথরের মতো শক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। ঐ পদার্থ মাড়ির কোমল মাংসকে খানিকটা সরাইয়া দিয়া ঐখানে রোগবীজাণু বাসের উপযোগী কুঠরি নির্মাণ করে। দন্তমূলে এইভাবে বাসোপযোগী সুরক্ষিত দুর্গ তৈয়ারি করিতে পারিলে এই দুর্গের সুরক্ষিত রোগবীজাণু ধ্বংস করা রুগ্ন দেহের শ্বেতরক্তাণুগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তবুও দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুগুলিকে উহাদের অনিষ্টকারিতা রোধ করার জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রামে মৃত ও গলিত শ্বেতরক্তাণু ও রোগবীজাণুদের দেহই পুঁজরূপে দন্তমাড়ি হইতে নির্গত হয়। এই বিষাক্ত পুঁজ মুখ হইতে উদরে গিয়া রক্তকে আরও দূষিত করে, পাকস্থলীর পরিপাকক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

আহার-বিহারে অসংযমের ফলে যকৃৎ খারাপ হইয়া পিত্তাধিক্য বা পিত্তাল্পতার সৃষ্টি করে। যকৃতের এই ত্রুটির জন্য জঠরাগ্নির ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং অজীর্ণ, অম্ল, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠতারল্য প্রভৃতি উদরের বিবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত রোগ শরীরের রক্তকে আরও দূষিত করে। এইরূপ দূষিত রক্ত পাইওরিয়া রোগ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ।

সুষম খাদ্যের অভাবে অর্থাৎ যাহারা অতিরিক্ত মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি অম্লধর্মী খাদ্য গ্রহণ করে, যাহারা স্বাভাবিক খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া মানুষের তৈয়ারি সংহত খাদ্য অর্থাৎ ছানা, মাখন, ঘি এবং ছানার তৈয়ারি ও ঘিয়ের তৈয়ারি খাবারাদি অত্যধিক পরিমাণে গ্রহণ করে, এইরূপ অম্লধর্মী ও সংহত খাদ্য গ্রহণের ফলে তাহাদের রক্তে অম্লভাগ বৃদ্ধি পায়। রক্ত অম্লধর্মী হইয়া উঠিলেই ঐ বিষে রক্তে অবস্থিত ক্যালসিয়াম ধ্বংস হইয়া যায়। দেহস্থ এই ক্যালসিয়ামের অভাব হেতু পাইওরিয়া রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল দাম্পত্যজীবন যাপন করিলে রক্তের

সার শুক্র অত্যধিক নষ্ট হইয়া রক্ত নিঃসার হইয়া পড়ে। এই নিঃসার রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ খুব অল্প থাকে। এইজন্য উচ্ছৃঙ্খল দম্পতিরাও ভরা যৌবনে এই রোগে আক্রান্ত হয়।

দাম্পত্য-জীবনের অপব্যবহারে পুরুষেরই ক্ষয়-ক্ষতি হয় বেশি। এইজন্য পাইওরিয়া মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মাঝে অধিক দেখা যায়।

কৈশোর বা প্রথম যৌবনে যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে অত্যধিক স্বমেহনে অভ্যস্ত হয়, তাহারা যৌনগ্রন্থির ভয়ানক ক্ষতি সাধন করে। ইহাদের স্বাভাবিক ধারণাশক্তি চিরজীবনের মতো নষ্ট হইয়া যায়। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু ইহাদের রক্তেও প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের অভাব সর্বদাই থাকে। এই কারণে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং ধারণাশক্তিহীন বা ধারণাশক্তিক্ষীণ নর-নারীরাও যৌবনে পাইওরিয়া রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

এশিয়া বা আফ্রিকার মতো গরম দেশে ৫০ বা ৫৫ বৎসর বয়সের পরে জীবনীশক্তি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। ফলে এই বয়সের নর-নারীরা সহজেই পাইওরিয়া রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

পাইওরিয়া রোগ ৮/৯ বৎসর বা ততোধিক সময় স্থায়ী হইলে, এই পাইওরিয়া বিষ শ্বেতকুষ্ঠ রোগ বা কুষ্ঠ রোগে পরিণত হইতে পারে।

পাইওরিয়া রোগ হইতে শ্বেতকুষ্ঠ রোগ বা কুষ্ঠ রোগের সৃষ্টি হইতে পারে—ইহা কোনো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থে নাই। কিন্তু আমাদের সংশ্রবে আসিয়া, আমাদের উপদেশ লইয়া যে সমস্ত শ্বেতকুষ্ঠরোগী ও কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই ছিল পাইওরিয়া রোগগ্রস্ত। সর্বপ্রথমে ইহাদের পাইওরিয়া রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করায় ইহাদের শ্বেতকুষ্ঠ রোগ এবং কুষ্ঠরোগও আরোগ্য হইয়াছে। এই কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি—**পাইওরিয়া বিষ দেহে সঞ্চিত হইলে ঐ বিষের মাঝে শ্বেতকুষ্ঠ বা কুষ্ঠরোগের বীজ উৎপন্ন হয়। সুতরাং পাইওরিয়া শ্বেতকুষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগ সৃষ্টিরও একটি প্রধান কারণ।**

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর দন্তধাবন ও প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর অর্ধস্নান বা পূর্ণস্নান অথবা ৬ মিনিট টাববাথ। স্নানান্তে সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং ৫ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২ এবং নং ৩—প্রত্যেকটি ৩ মিনিট। অতঃপর বারিসার ধৌতি। সপ্তাহে দুই-তিন দিন পাইওরিয়া রোগীর বারিসার ধৌতি অভ্যাস বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

দ্বিপ্রহরে—১ নং বা ২ নং স্নানবিধি অনুসরণ করিবে।

বৈকালে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—সর্বাঙ্গাসন ৪ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট, জানুশিরাসন ৪ বার, শয়ন পশ্চিমোত্তান ৫ বার, সহজ অগ্নিসার ২৫ বার, উড্ডীয়ান ৪ বার; হলাসন ৪ বার, শীর্ষাসন ৩ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম যে কোনো ৪টি—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

নিয়ম ও পথ্য—রাত্রির আহারের পর দন্ত ভালোভাবে পরিষ্কার করিবে—দাঁতের ফাঁকে কোনোরূপ খাদ্যকণা যাহাতে জমা না থাকে। অতঃপর আয়ুর্বেদোক্ত ত্রিফলা ভিজা জল দ্বারা কয়েকবার মুখ ধৌত করিবে (হরিতকী, আমলকী ও বহেড়ার নামই ত্রিফলা) অথবা দুই ছটাক জলের সহিত 'ডেটল' বা এই শ্রেণীর দূষিত বীজাণুনাশক ঔষধ পরিমিত পরিমাণে মিশাইয়া উহা দ্বারা কয়েকবার কুলকুচা করিবে। যদি অল্পসংখ্যক দন্ত পাইওরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত লোশনটি দিনে ২/৩ বার দাঁতের গোড়ায় লাগাইবে; টিঙ্কচার আইডিন (Rectified) ১ আউন্স, টিঙ্কচার একোনাইট ১ আউন্স—এই দুইটি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া লোশন প্রস্তুত করিবে এবং একটু তুলার সাহায্যে উহা আক্রান্ত দন্তের গোড়ায় লাগাইবে।

আমিষ খাদ্যে ক্যালসিয়াম খুব অল্পমাত্রায় থাকে। আমিষ খাদ্যে

নানা রকম দূষিত বস্তুও সঞ্চিত থাকে। এইজন্য পাইওরিয়া রোগী আমিষ খাদ্য বর্জন করিবে। নিরামিষ খাদ্য ফল, শাক-সবজি ও দুধে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। এইজন্যই পাইওরিয়া রোগীর পক্ষে নিরামিষ খাদ্যাদি গ্রহণই প্রশস্ত। নিরামিষ খাদ্যের মাঝেও মাখন, ঘি ও ঘিয়ের তৈয়ারি খাবারাদি এবং ছানা ও ছানার তৈয়ারি খাবারাদি বর্জন করিবে। অক্ষুধায় খাদ্যাদি গ্রহণ করিবে না। মাসের মাঝে ২/১ দিন একাদশী বা অমাবস্যা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে উপবাস দিবে (এই বিষয়ে 'উপবাস বিধি' দ্রষ্টব্য)। ক্ষুধার জোর থাকিলে জলযোগের সময় অল্প কিছু বাদাম, পেস্তা বা আখরোট প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। জলস্নানবিধি এবং জলপানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে। (এই প্রসঙ্গে 'দন্তরোগ' চিকিৎসা প্রণালী দ্রষ্টব্য)

পাইওরিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি। পাইওরিয়া রোগ পুরাতন হইলে সমুদয় দন্ত উৎপাটনের ব্যবস্থা করিবে। দন্ত উৎপাটনই পুরাতন পাইওরিয়া রোগ আরোগ্যের একমাত্র উপায়। যতদিন দন্ত উৎপাটন না করিবে ততদিন প্রতি ঘণ্টায় আঙ্গুল দ্বারা দাঁতের মাড়ি ঘষিয়া মুখ ধুইবে।

পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্ত্রক্ষত
(Gastric Ulcer & Duodenal Ulcer)

লক্ষণ—পাকস্থলীর ভিতরের আবরণীর ক্ষতকেই পাকস্থলীর ক্ষত বলে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ ও অক্ষুধা এই রোগের পূর্ব লক্ষণ। রোগসূচনায় খাওয়ার পরেই পাকস্থলীতে অস্বস্তিবোধ বা অল্প বেদনার সৃষ্টি হয়। রোগ বৃদ্ধি পাইলে তীব্র বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়, বমির সহিত সময় সময় রক্তও নির্গত হয়। বমির পর রোগী একটু আরাম বোধ করে।

পাকস্থলীর অর্ধজীর্ণ খাদ্য ঊর্ধ্ব-অন্ত্র অর্থাৎ গ্রহণীনাড়ীতে গিয়া

সঞ্চিত হয়। এই অর্ধজীর্ণ খাদ্যকে পুনশ্চ পাকস্থলীর পাচকরস, যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয়ের অগ্নিরস মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ জীর্ণ করে। এই ত্রিরস খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করিয়া নিজেরাও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অজীর্ণ খাদ্যকে জীর্ণ করিতে না পারিলে অজীর্ণ খাদ্যরসের সহিত এই পাচক-রসও বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষাক্ত রসের সংস্পর্শে অন্ত্রের ঝিল্লীতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। আহারের অব্যবহিত পরেই বেদনা উপস্থিত হইলে উহা পাকস্থলীর ক্ষতের লক্ষণ। আহারের ২/৩ ঘন্টা পরে বেদনা উপস্থিত হইলে উহা অন্ত্রক্ষতের লক্ষণ। পাকস্থলীর ক্ষত উৎপন্ন হইলে রোগীর চেহারা দ্রুত শীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু অন্ত্রক্ষত রোগীর বাহ্যিক চেহারায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। নাভির একটু ঊর্ধ্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অন্ত্রক্ষত বেদনা উৎপত্তির স্থান।

কারণ—আমিষজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিবার জন্য উদরপ্রদেশের উপবায়ু গ্রন্থিগুলি (Gastric glands) হইতে যে অম্লরস ক্ষরিত হয় উহা তীব্র বিষের মতো শক্তিশালী। দেহের অন্যান্য গ্রন্থিনিঃসৃত ক্ষারজাতীয় রস অম্লরসের সমতা রক্ষা করে, উহার বিষাক্ত ক্রিয়াকে দমিত রাখে। দীর্ঘদিনের কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ বা অম্লরোগের ফলে দেহে পরিমিত ক্ষারজাতীয় রসের ন্যূনতা ঘটে, ফলে অম্লরস প্রবল হইয়া দেহের ক্ষতি সাধন করে। এই অম্লরস পাকস্থলীর আবরণীর কোনো অংশে সঞ্চিত হইলে ঐ অম্লবিষে পাকস্থলীর ঐ অংশে ঘা উৎপন্ন হয়—ইহার নাম পাকস্থলীর ক্ষত বা Gastric ulcer। এই অজীর্ণ অম্লবিষ অন্ত্রে সঞ্চিত হইলে অন্ত্রে ঘা উৎপন্ন করে—ইহারই নাম অন্ত্রক্ষত রোগ (Duodenal ulcer) তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আমিষ খাদ্য মানুষের খাদ্য নয়, উহা শিয়াল-বিড়ালের খাদ্য। অজ্ঞতা হেতু বা লোভের বশে যাহারা এই খাদ্যনীতি মানিয়া চলে না, তাহাদের দেহই এই রোগ আক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে। আমিষজাতীয় খাদ্য জীর্ণ হইয়া দেহে অম্লরস সৃষ্টি করে। আমিষজাতীয় খাদ্য অজীর্ণ হইলে

পিত্তাদি পাচক রসও অজীর্ণ হইয়া অম্লরস বা অম্লবিষে পরিণত হয়। দেহের ক্ষার বা লবণজাতীয় রস এই অম্লবিষকে যখন আর নষ্ট করিতে পারে না, দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না, তখনই এই অম্লবিষ পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন করে।

আধুনিক চিকিৎসকদের ভাষায় বলা যায়—সুষম পথ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত আমিষ খাদ্য ও ঘি-মাখন-ছানা প্রভৃতি সংহত খাদ্য গ্রহণ করিলে দেহে ইউরিক এসিড সঞ্চিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি; অতঃপর প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি। অনন্তর বারিসার ধৌতি, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৭ এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম। দ্বিপ্রহরে টাববাথ।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকরণী, যোগমুদ্রা, উড্ডীয়ান, পশ্চিমোত্তান, অগ্নিসার ধৌতি, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৭।

রোগের আক্রমণ হ্রাস পাইলে ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম অবলম্বন করিবে। জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে। জলের সহিত দিনের মাঝে যে কোনো সময় সম্ভবপর হইলে ২ চামচ মধু খাইবে।

নিয়ম ও পথ্য—অতিরিক্ত পান খাওয়া, চা খাওয়া এবং ধূমপানের অভ্যাস থাকিলে উহা সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। পাকস্থলী এবং অন্ত্রক্ষত রোগীর ক্ষত হইতে সর্বদাই রক্ত ক্ষরিত হয়। এই রক্ত মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া যায়, এইজন্য এই রোগীদের মলের রং হয় কালো। যতদিন মলের রং খুব কালো থাকিবে এবং আহারের পর অসহ্য বেদনার সৃষ্টি হইবে, ততদিন তরল খাদ্য গ্রহণ করিবে। পাতলা দুধ, মিষ্ট কমলার রস, বিলাতী বেগুনের রস (কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে), তরিতরকারীর ঝোল, ডাবের জল প্রভৃতি পথ্যরূপে গ্রহণ করিবে। এই পথ্যও অধিক পরিমাণে খাইবে না—অল্প পরিমাণে খাইবে। বেলা ১২টা

পর্যন্ত কোনো পথ্য গ্রহণ করিবে না। পিপাসা লাগিলে শুধু জলপান করিবে। ১২টা হইতে ১টার মধ্যে পথ্য গ্রহণ করিবে। এইভাবে তরল পথ্য এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ গ্রহণের পর যদি আর বমির ভাব, বেদনার ভাব না থাকে, পাকস্থলীতে যদি কোনো অস্বস্তি বোধ না হয়, তাহা হইলে আলু, কচু, লাউ, বেগুন, ওল প্রভৃতি সুসিদ্ধ তরকারীর সহিত পুরাতন চালের অন্ন গ্রহণ করিবে। সহ্য হইলে দৈ, দুধ বা জল মিশান দুধ পথ্যরূপে গ্রহণ করিবে। ঘি, মাখন, ছানা, চিনি প্রভৃতি পথ্য বর্জন করিবে। যতদিন ক্ষত সম্পূর্ণ শুষ্ক না হয়, ততদিন শাক প্রভৃতি ছিবড়া জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিবে না (ছিবড়া জাতীয় কোনো খাদ্য খাইলে উহার রস চুষিয়া খাইয়া ছিবড়া ফেলিয়া দিবে)। ছিবড়া জাতীয় খাদ্য পাকস্থলীতে গেলে উহা পুনরায় পাকস্থলীতে বেদনার সৃষ্টি করিবে, রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটাইবে। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

ক্ষত শুষ্ক হইয়া শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পথ্য সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে। অম্লাধিক্যের ফলে এই রোগ সৃষ্টি হয়—তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অম্লধর্মী আমিষ ও অন্যান্য খাদ্য বর্জন করিবে। অধিক মসল্লাযুক্ত খাদ্য, টক ও মিষ্টি খাদ্য রুগ্নাবস্থায় গ্রহণ করিবে না। রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার পরও অন্ততঃ এক বৎসর পথ্যাদি সম্বন্ধে সতর্ক না থাকিলে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে।

পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্ত্রক্ষত রোগ সৃষ্টি হয় যৌবনে, কিন্তু উহার বিশেষ প্রকাশ ঘটে মধ্যবয়সে অর্থাৎ ৪০ বা তদূর্ধ্ব বয়সে। রোগের প্রথম সূত্রপাতে এই রোগ শীতকালে চাপা থাকে, গ্রীষ্মকালে মাসের মধ্যে ২/১ দিন তলপেটে একটু অস্বস্তি বোধ ও বেদনার সৃষ্টি হয়, এই সময় কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলেই বেদনা প্রশমিত হয়। রোগের দ্বিতীয় স্তরে, বেদনা উপস্থিত হইলেই রোগী সাধারণতঃ সোডা সেবন করে। বলা বাহুল্য, সোডা ক্ষারজাতীয় পদার্থ, এইজন্য অম্লবিষ নষ্ট করার ক্ষমতা উহার

আছে; কিন্তু রোগের অতিবৃদ্ধিতে সেই সোডা বা সোডাজাতীয় অন্য ঔষধ বা খাদ্য আর বেদনা নিবারণ করিতে পারে না—এই বেদনা পাকস্থলী হইতে অন্য অঙ্গেও প্রসারিত হইতে থাকে। রোগের এই প্রবলতার সময় মুখ দিয়াও রক্ত বমন হয়। এইরূপ রক্ত-বমন বন্ধ করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন এবং কিরূপ নিয়ম-পথ্য পালন প্রয়োজন, তাহা আমরা 'রক্ত-পিত্ত বা রক্ত-বমন' নামক রোগের বিবরণে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি (এই প্রসঙ্গে উক্ত রোগ নিবারণ প্রণালী দ্রষ্টব্য)।

বেদনা অসহ্য হওয়ায় পাকস্থলী ক্ষত রোগী এবং অন্ত্রক্ষত রোগী অস্ত্রোপচারের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। পাকস্থলীর ক্ষতে অস্ত্রোপচার যতটা নিরাপদ, অন্ত্রক্ষতে অস্ত্রোপচার কিন্তু ততটা নিরাপদ নয়। অস্ত্রোপচারের ফলে অধিকাংশ রোগীকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

নিষ্ঠার সহিত উপরি উক্ত যৌগিক চিকিৎসা অবলম্বন, উহার পথ্যবিধি এবং উপবাসবিধি বিশেষভাবে পালন করিয়া চলিলে এই রোগে আর কাহাকেও অস্ত্রোপচার এবং কষ্ট ভোগ বা মৃত্যুবরণ করিতে হইবে না।

পিত্ত পাথুরী (Gall Stone)

লক্ষণ—এই রোগে আহার্য গ্রহণের অব্যবহিত পরই রোগী অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, পাকস্থলীতে অল্প অল্প বেদনা বোধ করে। বমি হইয়া খাদ্যদ্রব্য বাহির হইয়া গেলে রোগী আরাম পায়। রোগ প্রবল হইতে আরম্ভ করিলে কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না, বেদনাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই বেদনার সঙ্গে জ্বর, বমি, 'মাথা-ঘোরা' প্রভৃতি উপদ্রব আসিয়া যোগ দেয়। **নাভির দক্ষিণ পার্শ্বে যেখানে পিত্তথলি**

অবস্থিত, সেই স্থানেই প্রথমে বেদনা অনুভূত হয়। যতই রোগ পুরাতন হইতে থাকে, পিত্তথলির পাথর বড় হইতে থাকে; ততই বেদনাও বর্ধিত হইয়া সমস্ত তলপেটে ছড়াইয়া পড়ে। কখনও কখনও বেদনা ঊর্ধ্বে উঠিয়া দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্ন পর্যন্ত প্রসার লাভ করে।

পিত্তথলিতে পাথর উৎপন্ন হইলে পিত্তথলির স্পর্শ প্রবণ কোমল ঝিল্লীগুলি এই বিজাতীয় পদার্থের স্পর্শে পীড়া বোধ করে। রোগের প্রথম অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পর রোগীর পাকস্থলীতে যে একটু অস্বস্তিবোধ হয়, তাহার কারণও এই পিত্তকোষের পাথরের সহিত পিত্তকোষের ঝিল্লীর সংঘর্ষ।

খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলে উহা জীর্ণ করিবার জন্য পিত্তথলি হইতে স্বাভাবিক নিয়মে পিত্ত পাকস্থলী ও গ্রহণীনাড়ী অর্থাৎ ঊর্ধ্ব অন্ত্রে প্রবাহিত হইতে থাকে। পিত্তথলিতে উৎপন্ন পাথর বৃহৎ হইয়া যদি পিত্তনালীপথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে তাহা হইলে ঐ পাথরকে পিত্তথলি হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য দেহপ্রকৃতিতে একটা তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয়। পিত্তথলিসংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলি আরও অধিক সাহায্য পাওয়ার জন্য আর্তনাদ আরম্ভ করে। স্নায়ুগুলির এই 'আকুলি-বিকুলি', স্নায়ুগুলির এই আর্তনাদই বেদনারূপে প্রকাশ পায়। যখন স্নায়ুমণ্ডলী সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐ পাথরকে পিত্তকোষ হইতে বাহির করিয়া অন্ত্রে ঠেলিয়া দেয় অথবা পিত্তকোষের নালীমুখ হইতে উহাকে সরাইয়া দিয়া পিত্তপ্রবাহের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, রোগীর বেদনারও তখন উপশম হয়।

রোগের প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন বহু পাথরই দেহপ্রকৃতি পিত্তথলি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া অন্ত্রপথে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু রোগ বৃদ্ধির ফলে সমুদয় রক্ত যখন দোষযুক্ত হয়, শরীরের স্নায়ু-গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন আর দেহপ্রকৃতি এই পাথর নিষ্কাশিত করিতে পারে না। রোগবিষের প্রভাবে এই পাথর ক্রমশঃ বড় হইয়া রোগীকে

যমপুরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করে। এইজন্য প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্যেরা এই রোগটি সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"**অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরন্তকপ্রতিমো মতঃ। ঔষধে তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্হতি**॥"—অশ্মরীরোগ (পিত্ত-পাথুরী এবং মূত্র-পাথুরী) অতি বিপজ্জনক ব্যাধি—যেন সাক্ষাৎ যম, রোগটি তরুণ হইলে ঔষধসাধ্য, পুরাতন হইলে অস্ত্রোপচারই তাহার একমাত্র চিকিৎসা। প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্যেরা এই রোগে অস্ত্রোপচার করিতেন। আধুনিক যুগের চিকিৎসকেরাও এই রোগে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। পিত্তথলির উপর অস্ত্রোপচার বড়ো বিপজ্জনক, অধিকাংশ রোগীই এই অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বলা বাহুল্য, রোগ চরম অবস্থায় উপনীত না হইলে যৌগিক চিকিৎসায় এই রোগ নির্মূলভাবে আরোগ্য হয়।

কারণ—যকৃৎ হইতে কিভাবে পিত্তরসের সৃষ্টি হয় এবং ঐ পিত্তরসের কার্যকারিতা কিরূপ, তাহা 'কাম্‌লারোগ' প্রসঙ্গে আমরা বর্ণনা করিয়াছি। যকৃৎ শুধু পিত্তরস উৎপন্ন করে না, খাদ্যরসকে রক্তে পরিণত করা এবং ঐ রক্তকে শোধন করার ব্যবস্থাও যকৃতের মাঝে আছে; রক্তের অবিশুদ্ধ অংশ এবং রোগবিষ প্রভৃতিকে যকৃৎ পিত্তের সহিত পিত্তথলিতে প্রেরণ করে। পিত্তথলি হইতে ঐগুলি অন্ত্রে যায়; অন্ত্র ঐগুলি মলনাড়ীতে প্রেরণ করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। রক্তে অধিক পরিমাণে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে ঐ অত্যধিক দূষিত পদার্থের বিষাক্ত জীবাণু পিত্তকে আর স্বাভাবিকভাবে তরল থাকিতে দেয় না; পিত্তরস তখন ঘন হইতে থাকে, দানা বাঁধিতে থাকে। এই ঘন পিত্তরস স্বাভাবিকভাবে আর গ্রহণী নাড়ীতে গমন করিতে পারে না। এই দানাগুলিই ক্রমশঃ শক্ত হইয়া জমাট বাঁধিয়া পাথরে পরিণত হয়। এই পাথর ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁসের ডিমের মতো প্রকাণ্ড হইতে দেখা যায়। পিত্তরস হইতে উৎপন্ন এই পাথরকেই আধুনিক যুগে

বলা হয় পিত্ত-পাথুরী রোগ। প্রাচীন আয়ুর্বেদগ্রন্থে ইহার নাম **'অশ্মরী রোগ'**। ('অশ্ম' অর্থাৎ পাথর)।

সুষম খাদ্যের অভাব এবং অতিরিক্ত আমিষপ্রীতি **এই রোগ সৃষ্টির** একটি প্রধান কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, অম্ল প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াও এই জাতীয় রোগে পরিণতি লাভ করে। **অলসপ্রকৃতি ধনী** কন্যাদের এবং অলসপ্রকৃতি পরিশ্রমবিমুখ অসংযমী পুরুষের মাঝেই এই রোগ প্রকাশ পায়। আহারে সংযমী ও পরিশ্রমী নারী-পুরুষের দেহে এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না। এইজন্যই মজুর শ্রেণীর মাঝে এবং গরীবদের ঘরে এই রোগ দেখা যায় না। জীবিকার জন্য ইহাদের দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, এই পরিশ্রমের ফলে সাধারণতঃ ইহাদের রাত্রি সুনিদ্রায় কাটে—সুতরাং অতিরিক্ত পুষ্টিকর অম্লধর্মী খাদ্য গ্রহণ এবং উচ্ছৃঙ্খল দাম্পত্যজীবন যাপনের সুযোগ ইহাদের কম। এই কারণেই গরীব ও মজুর শ্রেণীর মাঝে এই রোগের প্রকাশ দেখা যায় না।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃস্নান। অতঃপর বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৭, নং ৯ এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

দ্বিপ্রহরে—টাববাথ।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ প্রাণায়াম, শশাঙ্গাসন বা শীর্ষাসন, সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২; সর্বাঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৭, নং ৯।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম। বেদনা উঠিলেই সাধ্যমত যে কোনো একটি সহজ বস্তিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—রোগের আক্রমণ আরম্ভ হইলে মৎস্য, মাংস ও ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য বর্জন করিবে। রোগের প্রবলতার সময় যখন বেদনা

অসহনীয় হইয়া উঠে তখন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে। উপবাসের সময় লেবুর রস সহ প্রচুর জল পান করিবে। **দেহের অম্লবিষ নষ্ট করিবার বিশেষ ক্ষমতা লেবুর রসের আছে।** বেদনা সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ স-অম্বু উপবাসে থাকিবে। বেদনা সাময়িকভাবে প্রশমিত হওয়ার পরও ২/১ দিন অর্ধোপবাস দিবে। অর্ধোপবাসের দিন মাখনটানা দুধ, ঘোল, শাক-সব্জীর ঝোল অথবা ফলাদির রস খাইয়া থাকিবে। খুব বমির উদ্রেক হইলে একখানা ভিজা গামছা পাকস্থলীর উপর রাখিয়া উহাতে অল্প অল্প শীতল জল সেচন করিবে অথবা ঐ ভিজা গামছার উপর একটি বরফথলি স্থাপন করিবে।

যেদিন রন্ধন ও ভোজনের কাজ না থাকে, সেদিন যেমন মেয়েরা গৃহ পরিষ্কারাদি কাজের সময় পায়; উপবাসের দিন দেহযন্ত্রগুলিও তেমনি দেহের আবর্জনা পরিষ্কারের ও রক্তাদি পরিশোধনের বিশেষ সুযোগ লাভ করে। এইজন্যই উপবাস রোগারোগ্যে বিশেষ সাহায্যকারী। অর্ধোপবাসের পরও খাদ্য গ্রহণে খুব সাবধান থাকিবে। ভোরে খুব ক্ষুধার জোর থাকিলে কমলা, আনারস, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা, পাকা আম, কাঁচা বা পাকাবেলের সরবৎ প্রভৃতি হইতে নিজের রুচি মতো খাদ্য বাছাই করিয়া লইবে। বলা বাহুল্য, ভোরে ক্ষুধার জোর না থাকিলে এক গ্লাস লেবুর সরবৎ বা দুই একটি কমলা ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। দ্বিপ্রহরে পরিমিত শাক-সব্জীসহ ভাত বা রুটি এবং ঘোল খাইবে। ভাতের সহিত ঘন ডাল খাইবে না; রুচি মতো অল্প পরিমাণে ডালের জুস খাইবে।

শাক-সব্জী রন্ধনে সামান্য হলুদ ও লঙ্কা ছাড়া অন্য কোনো মসলা ব্যবহার করিবে না; তৈল বা ঘি অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিবে। দ্বিপ্রহরের খাদ্যও অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিবে যাহাতে পাকস্থলীর অর্ধেকের বেশির ভাগ খালি থাকে। বৈকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ডাবের জল, আখের রস অথবা কিছু ফলাহার করিবে। যতদিন রোগের প্রবলতা থাকিবে, ততদিন এইরূপ নিয়ম-পথ্য পালন করিয়া চলিবে।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগ

যোগশাস্ত্র মতে প্লীহা ও যকৃৎ অগ্নিগ্রন্থির অন্তর্গত। আয়ুর্বেদ মতে এই দুইটি গ্রন্থিও রঞ্জকাগ্নি অর্থাৎ রঞ্জক পিত্তের স্থান। খাদ্য জীর্ণ হইয়া যে রস উৎপন্ন হয়, দেহস্থ বায়ু সেই রসকে প্লীহা ও যকৃতে প্রেরণ করে। প্লীহা ও যকৃৎ প্রথমতঃ এই রসকে শোধন করে। এই শোধিত রসের সহিত প্লীহা ও যকৃতের অন্তর্মুখী রস অর্থাৎ রঞ্জক পিত্ত মিশ্রিত হইলে উহার রাসায়নিক ক্রিয়ায় রস রক্তে পরিণত হয়। রক্তবাহী শিরাগুলির মূলস্থান এই প্লীহাও যকৃতের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। প্লীহা ও যকৃতের শোধিত রক্ত এই শিরাগুলির সাহায্যেই হৃদ্‌পিণ্ডে গমন করে ; হৃদ্‌পিণ্ড এই শোধিত রক্তকে প্রয়োজনমতো সর্বশরীরে পরিবেশন করে।

হৃদযন্ত্রের অধোভাগে বামপার্শ্বে প্লীহা অবস্থিত। সাধারণতঃ প্লীহা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়। বায়ুগ্রন্থি ফুসফুস দেহের মাঝে বৃহত্তম গ্রন্থি। অগ্নিগ্রন্থি যকৃৎ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রন্থি। ইহার ওজন মানুষ ভেদে ১॥ সের হইতে ২ সের পর্যন্ত। প্লীহা ও যকৃৎ—এই দুই গ্রন্থি পরস্পরের অনুপূরক। ইহার একটি সুস্থ থাকিলে অন্যটিকে দুর্বল হইতে, রোগাক্রান্ত হইতে দেয় না। একের সাহায্য করিতে গিয়া উভয়েরই যখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়, তখন উভয়েই দুর্বল হইয়া পড়ে।

কারণ—রক্ত সৃষ্টি করা, রক্ত শোধন করা প্লীহা ও যকৃতের প্রধান কাজ। অজীর্ণ ও অম্লাদি দোষে দেহের রক্ত অত্যধিক দূষিত হইলে প্লীহা ও যকৃৎ অতিক্রিয় হইয়া রক্তের এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা করে। এই সংশোধনের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন প্লীহা ও যকৃৎ অতি পরিশ্রমে এবং রোগবিষের প্রভাবে দুর্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই দুইটি গ্রন্থির দুর্বলতায়, রুগ্নতায় দেহের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়ে।

শরীর দূষিত হইলে দেহে রোগবিষ ও রোগবীজাণু সৃষ্টি হয়। আয়ুর্বেদ মতে রোগবীজাণুর নাম কৃমি। এই কৃমি বাহির হইতে আসিয়া

যখন দেহে সংক্রমিত হয়, তখন উহার নাম বাহ্য কৃমি বা আগন্তুক কৃমি। শরীরের ভিতরে যে রোগবীজাণু সৃষ্টি হয়, উহার নাম আভ্যন্তর কৃমি। [কৃমির বিস্তৃত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ের "আয়ুর্বেদে দেহতত্ত্ব বিবরণে" দ্রষ্টব্য।] এই সমস্ত কৃমি বা রোগবীজাণু ধ্বংসকারী প্রতিষেধক বিষ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা এই প্লীহা ও যকৃতের মাঝে আছে। এই প্রতিষেধক বিষের নামই দেহরক্ষী জীবাণু। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় ইহাদের নাম শ্বেত রক্তাণু (White Corpuscles) এবং লাল রক্তাণু (Red Corpuscles)। রোগবীজাণুর আক্রমণে যে সব রক্তাণু প্রাণ ত্যাগ করে, প্লীহা ও যকৃৎ সেইগুলিকে রক্ত হইতে ছাঁকিয়া রাখে। যকৃৎ নিজ দেহে সঞ্চিত এবং প্লীহার মাঝে সঞ্চিত মৃত রক্তাণুগুলিকে স্বীয় দেহে আনয়ন করিয়া উহাদিগকে গলাইয়া পিত্তে পরিণত করে। রক্তে অবস্থিত রোগবীজাণুগুলিকে ধ্বংস করার ব্যবস্থাও প্লীহার মাঝে আছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে রক্তের মাঝে যখন রোগবীজাণু প্রবল হয়, তখন প্লীহার কার্যকারিতাও বাড়িয়া যায়। এইজন্য এই সব রোগে প্লীহার আয়তন বাড়ে। রোগবীজাণুর আধিক্য প্লীহার ধ্বংস ক্ষমতাকে যখন ছাড়াইয়া যায়, তখন প্লীহা অতিক্রিয় হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে।

অত্যধিক চা, তামাক, মদ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে শরীরে যে বিষ সঞ্চিত হয়, ঐ বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া বা ঐ বিষ ধ্বংস করা যখন যকৃৎ ও প্লীহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন ঐ বিষে জর্জরিত হইয়া যকৃৎ ও প্লীহা রুগ্ন হয়।

অত্যধিক তৈল-ঘি প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্য, অত্যধিক ঝাল-মসলা, অত্যধিক ডিম, মাংস প্রভৃতি আমিষ খাদ্যও যকৃৎকে রুগ্ন করে। এই সমস্ত খাদ্য জীর্ণ করার জন্য যকৃৎকে পিত্ত উৎপন্ন করিতে হয়। প্রত্যহ অতিরিক্ত পিত্ত উৎপন্ন করিতে হইলে গুরুতর পরিশ্রমে যকৃতের ক্রিয়া ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়ে, যকৃৎ রুগ্ন হয়। রুগ্ন যকৃৎ ও প্লীহার রক্তশোধনের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। রোগবিষে যকৃৎ ও প্লীহার কোমলতা নষ্ট হইয়া ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৪। অর্ধকূর্মাসন, উড্ডীয়ান; অগ্নিসার ধৌতি ১নং, সহজ অগ্নিসার ৪০ বার।

সন্ধ্যায়—অগ্নিসার ধৌতি ২নং, সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, শয়ন-পশ্চিমোত্তান, হলাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৪; পবনমুক্তাসন ও ভ্রমণ প্রাণায়াম।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি ও জলস্নানবিধি সাধ্যমতো পালন করিবে।

প্লীহা অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কোনো আসন অভ্যাস করিবে না। শুধু সহজ প্রাণায়াম ২/৩টি এবং অগ্নিসার, বিপরীতকরণী, সর্বাঙ্গাসন প্রভৃতি মুদ্রা অভ্যাস করিবে। এইগুলি কিছুদিন নিয়মিতভাবে অভ্যাস করিলেই প্লীহার বর্ধিত আয়তন হ্রাস পাইবে। প্লীহার আয়তন হ্রাস পাইলে উপরি উক্ত আসনাদিও অভ্যাস করিতে পারিবে।

নিয়ম ও পথ্য—মলের রং একটু কালো হইলেই বুঝিবে যকৃৎ দুর্বল হইয়াছে এবং যকৃতের যথোচিত পিত্তরস উৎপাদনের শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। যকৃৎ দুর্বল হইয়া যখন যথোচিত পিত্তরস আর উৎপন্ন করিতে পারে না, তখন ঐ পিত্তরসের ন্যূনতার ফলে চর্বিজাতীয় খাদ্য যথোচিতভাবে পরিপাক হয় না। অন্ত্রের সঞ্চিত খাদ্যও প্রয়োজনীয় পিত্তরসের অভাবে পচিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে। এইজন্যই যকৃৎরোগীর চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। ঘি ও তৈলে ভাজা কোনো জিনিস খাইবে না। চা, তামাক, কফি, মদ, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের বিষে প্লীহা ও যকৃতের বিশেষ অনিষ্ট হয়—সুতরাং প্লীহা ও যকৃৎরোগী মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। **ভারতের মতো গরম দেশে শীতের তিনমাস ব্যতীত অন্য সময় ডিম খাইলে যকৃৎ রুগ্ন হয়।** সুতরাং ভারতবাসীদের শীতের তিনমাস ব্যতীত অন্য সময় মাসে ২/১ দিনের বেশি ডিম খাওয়া উচিত নয়। শীতপ্রধান দেশের লোকেরও প্রত্যহ ডিম খাওয়া অনুচিত।

বলা বাহুল্য, প্লীহা ও যকৃৎ রোগীর ডিম ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্যও সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন এবং অন্যান্য ঔষধ সেবনেও যকৃৎ অধিকতর রুগ্ন হয়—সুতরাং ঔষধের প্রতি আসক্তিও বিশেষভাবে ত্যাগ করিবে। দুধ, ঘোল এবং সুপক্ক টক ফলের রস ঔষধবিষ নষ্ট করিতে সাহায্য করে। সূর্যের তাপেই ফলের রস পরিপাকোপযোগী হইয়া থাকে। এইজন্যই ফলের রস হজম করিতে পাকস্থলীর পাচকরস, পিত্তরস, লালারস প্রভৃতি কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না—**ফল নিজের রসে নিজেই জীর্ণ হয়।** এইজন্যই সুপক্ক রসাল ফল শুধু প্লীহা-যকৃতের রোগে নয়, সর্বরোগেই সুপথ্য। ফল, শাক-সবজি, দুধ, ঘোল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্যই এই রোগের উপযোগী পথ্য।

প্রত্যহ সাধ্যমত শারীরিক পরিশ্রম করিবে। যতদিন রোগমুক্তি না হয়, ততদিন কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ ও অম্লরোগের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবে।

প্লুরিসি (Pleurisy)

লক্ষণ—এই রোগটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আয়ুর্বেদে এই রোগটিকে সম্ভবতঃ যক্ষ্মারোগের পূর্ব সূচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত, এইজন্যই বোধহয় রোগটির পৃথক কোনো নামকরণ করা হয় নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের প্রদত্ত নামটিই এখন আন্তর্জাতিক নামের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। 'শহুরে সভ্যতা' বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগটির প্রকোপও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর নাম প্লুরা (Pleura); এই রোগে প্লুরা আক্রান্ত হয় বলিয়া ইহার নাম প্লুরিসি। প্লুরিসি দুই রকমের—**শুষ্ক প্লুরিসি** ও **সরস প্লুরিসি**। শুষ্ক প্লুরিসিতে শুষ্ককাশি এবং অল্প জ্বর বিদ্যমান থাকে। কাশির বেগ আরম্ভ হইলে রোগী বুকে অত্যন্ত

বেদনা অনুভব করে। শুষ্ক প্লুরিসি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সরস প্লুরিসিতে পরিণত হয়।

ফুস্‌ফুসের উভয় প্লুরা বা আবরণীর মধ্যবর্তী স্থানে জল সঞ্চিত হয়। এই জল সঞ্চয়ের পরিমাণ রোগীবিশেষে একপোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া তিন সের পর্যন্ত দেখা যায়। এই জল সঞ্চিত হওয়ার ফলে ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় ও সংকোচন-প্রসারণ ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। রোগী তখন অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে ; এই সরস প্লুরিসি দ্বারা আক্রান্ত হইলে ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে—যদি রোগী যথেষ্ট সতর্ক হইয়া রোগ নির্মূলভাবে আরোগ্যের ব্যবস্থা না করে।

কারণ—শরীরের অন্যত্র অবস্থিত আবরক ঝিল্লীর তুলনায় ফুসফুসের ঝিল্লী অনেক বেশি পুরু। মুখের আবরক ঝিল্লীতে অবস্থিত লালাগ্রন্থি যেভাবে লালা উৎপন্ন করে, ফুস্‌ফুসের আবরক ঝিল্লীতে অবস্থিত গ্রন্থিগুলিও লালার মতোই একজাতীয় রস উৎপন্ন করে। এই রসে ফুসফুসের আবরক ঝিল্লী সর্বদা অনুষিক্ত থাকে বলিয়াই বক্ষপ্রাচীরের অর্থাৎ পাঁজরের সহিত ফুসফুসের সংঘর্ষ হয় না। রোগবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এই ফুসফুস আবরক ঝিল্লী যখন স্ফীত হয় অথবা ঐ আবরক ঝিল্লীর গ্রন্থিগুলি রোগবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া লালা সৃষ্টি করিতে অক্ষম হয়, তখন ফুসফুস ঝিল্লীর সহিত বক্ষঃপঞ্জরের সংঘর্ষ হইতে থাকে ; এই সংঘর্ষের ক্লেশ এড়াইবার ও পরাক্রান্ত রোগবীজাণু ধ্বংস করিবার আশায় ঐ আবরক ঝিল্লীর স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলি বিশুদ্ধ রক্তের জন্য হৃদযন্ত্রের কাছে এবং রোগবীজাণুনাশক অধিক সংখ্যক দেহরক্ষী সৈন্যের (শ্বেতরক্তাণুর) জন্য প্লীহা প্রভৃতির কাছে আর্তস্বরে আবেদন জানাইতে থাকে। ঐ স্নায়ু-গ্রন্থিগুলির আর্তনাদ এই করুণ সাহায্য প্রার্থনাই রোগীর দেহে অসহনীয় বেদনারূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে শীত-শীত ভাব, পরে বুকের এক পার্শ্বে বেদনা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এই বেদনা বর্ধিত হইয়া অস্ত্রাঘাতের বেদনার মতো অসহনীয় হইয়া উঠে। শ্বাস গ্রহণের সময় এই বেদনা আরও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ফুসফুসকেও রক্ত শোধন করিতে হয়। রক্তশোধক অন্যান্য যন্ত্র অর্থাৎ যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতির ক্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়িলে ফুসফুস প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর রক্তের অভ্যন্তরস্থ সমুদয় রোগবিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না। ফুসফুস যে দূষিত রস রক্ত হইতে ছাঁকিয়া পৃথক করে, ঐ রস দেহ হইতে বাহির হইতে না পারিয়া উহা উভয় প্লুরা বা আবরক ঝিল্লীর মাঝে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত দূষিত রসের জন্যই সরস প্লুরিসি সৃষ্টি হয়। সরস প্লুরিসি সৃষ্টি হইলে রোগীর দেহে আর পূর্ববৎ বেদনা থাকে না।

ফুসফুসের আবরক ঝিল্লীতে সঞ্চিত দূষিত রস নিউমোনিয়া রোগবীজাণু ও যক্ষ্মা রোগবীজাণু সৃষ্টি ও বংশবৃদ্ধির বিশেষ অনুকূল। ইহারা বৃদ্ধি পাইলে ফুসফুসের আবরক ঝিল্লীকে নষ্ট করিয়া ফুসফুসকে আক্রমণ করিয়া বসে। প্লুরিসি মারাত্মক না হইলেও উহা পরিণামে এইভাবে নিউমোনিয়া বা যক্ষ্মায় পরিণত হইয়া মারাত্মক হইতে পারে। ভারতে শতকরা ৬০টি প্লুরিসি রোগী আরোগ্যলাভের পর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। বলা বাহুল্য, অন্যান্য রোগের মতো এই রোগও শরীরে অত্যধিক দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে অনেক সময় হঠাৎ এই রোগ আত্মপ্রকাশ করে। এই ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লাগাটাও গৌণ কারণ বা সাময়িক উত্তেজক কারণ, উহা মুখ্য কারণ নয়। বিশেষভাবেই মনে রাখিবে—ইহা সর্বদেহের ব্যাধি, ফুসফুসের আবরক ঝিল্লী অবলম্বনে ইহার প্রকাশ হয় মাত্র।

চিকিৎসা—সহজ বস্তিক্রিয়া (১নং)। [বলা বাহুল্য, সহজ বস্তিক্রিয়ার অনুষঙ্গী আসন-মুদ্রা অভ্যাস এই রোগে নিষিদ্ধ।] বুকে বেদনা বোধ না হইলে ১ নং সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী জলপান পূর্বক শুধু পবনমুক্তাসন ও যোগমুদ্রা ৫/৬ বার অভ্যাস করিবে। পবনমুক্তাসন ও যোগমুদ্রা অভ্যাসেও অশক্ত হইলে শান্তভাবে শুইয়া থাকিবে। ১৫/২০ মিনিট পর স্বাভাবিকভাবেই মলবেগ উপস্থিত হইবে। যখন জ্বর ও বেদনা

থাকিবে না, তখন সহজ প্রাণায়াম (৭ নং) অনুষ্ঠান করিবে। স্বাভাবিক শ্বাস টানার সময় শ্বাসকে সাধ্যমত একটু দীর্ঘ সময় ধরিয়া টানিবে এবং দীর্ঘ সময় ধরিয়া উহা পরিত্যাগ করিবে। ৩/৪ মিনিট এইরূপ করার পর ২/৩ মিনিট বিশ্রাম লইবে; তারপর আবার ৩/৪ মিনিট প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। সুযোগমত দিনের মাঝে এইরূপ ৫/৬ বার প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ সহজ প্রাণায়াম অভ্যাসে শরীরে সঞ্চিত অপ্রয়োজনীয় কার্বনাদি বিষাক্ত গ্যাস প্রচুর পরিমাণে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, অধিকতর অক্সিজেনের সরবরাহ পাইয়া দেহের রোগ প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আর আশঙ্কা থাকে না। রোগীর দেহ যখন সম্পূর্ণ বেদনামুক্ত হইবে, তখন উপবিষ্ট হইয়া সহজ প্রাণায়াম নং ৩ এবং ৯ অভ্যাস করিবে। শরীর হাঁটাচলার উপযোগী সুস্থ হইলে ভ্রমণ প্রাণায়াম, আতপস্নান এবং ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি অনুযায়ী সহজসাধ্য উপকারী আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস আরম্ভ করিবে। শরীর সুস্থ হইলে বমন ধৌতি, বারিসার ধৌতি আয়ত্ত করিবে। ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও বারিসার ধৌতি ভালোভাবে আয়ত্ত হইলে এবং ইহা অভ্যাস করিলে এই রোগ পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে না।

যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়ার মতো এই রোগেরও কোনো কবিরাজী বা ডাক্তারী চিকিৎসা নাই। রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং উপযুক্ত পথ্যাদির ব্যবস্থাই এই রোগের চিকিৎসা। ডাক্তারগণ সময় সময় রোগীকে আইওডিন ইন্‌জেক্‌সন দেন অথবা রোগীকে অল্প পরিমাণে আফিম খাইতে দেন; অথবা এস্‌পিরিন, ক্যালোমেল প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। এই সমস্ত বিষাক্ত ঔষধ ফুস্‌ফুস্‌ আবরক ঝিল্লীগুলিকে বিষের প্রভাবে অচেতন করিয়া সাময়িক বেদনা উপশমে সাহায্য করে; কিন্তু উহাতে রোগারোগ্য হয় না—বরং ইহারা রোগকে দীর্ঘস্থায়ী করিতেই সহায়তা করে মাত্র। রোগবিষের মতো এইসব ঔষধ বিষও দেহযন্ত্রগুলিকে আরও দুর্বল করে; দেহযন্ত্রগুলির অধিকতর অনিষ্ট সাধন করে।

এই রোগ প্রবল হইয়া দীর্ঘস্থায়ী হইলে সময় সময় রোগ বিষের

প্রভাবে ফুস্‌ফুসের আবরক ঝিল্লী পচিয়া উঠে এবং উহাতে পূঁজ উৎপন্ন হয়। এইরূপ পূঁজ উৎপন্ন হইলে অথবা আবরক ঝিল্লীতে অত্যধিক জল সঞ্চিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অস্ত্রচিকিৎসকের সাহায্য লইয়া ঐ প্রণষ্ট ঝিল্লী এবং সঞ্চিত জল বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। অবশ্য এইরূপ পূঁজ উৎপত্তি এবং অত্যধিক জল সঞ্চয় সচরাচর ঘটে না, কদাচিৎ ঘটে।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তিনদিন উপবাস দিবে। এই তিনদিন শুধু লেবুর রস মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। রোগের প্রারম্ভে এইরূপ উপবাস দিলে রোগ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না। দুইভাগ তিসির তৈলের সহিত একভাগ তার্পিণ তৈল মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রিত তৈল রোগীর বেদনাস্থানে মালিশ করিবে। এই মালিশ ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ দূর করিতে কতকটা সাহায্য করে। মালিশে বেদনার লাঘব না হইলে বেদনার স্থানে ২/৩ বার পরপর গরম ও ঠাণ্ডা সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। একখানা গরমজলে ভিজানো তোয়ালে দ্বারা গরম জলের ব্যাগ বা শিশি জড়াইয়া লইয়া উহা বেদনাস্থানে সহ্যমত পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। ৩/৪ মিনিট গরম সেঁকের পর ৪/৫ হাত লম্বা একখানা কাপড়ের টুকরো ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া ভাঁজ করিবে এবং ঐ ভিজা ভাঁজ করা বস্ত্র আধ মিনিট সময় বেদনাস্থানে প্রয়োগ করিবে; অতঃপর আবার ৩/৪ মিনিট গরম সেঁক দিবে; এইরূপ ৩/৪ বার গরমের পরে ঠাণ্ডা এবং ঠাণ্ডার পরে গরম সেঁক দিবে। রোগী এইরূপ সেঁকে আরাম বোধ করিলে সেঁকের সময় আধঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রোগীর গৃহটি শুষ্ক ও আরামদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘরের দরজা-জানালা এমন ভাবে খুলিয়া রাখিবে, যাহাতে গৃহে বিশুদ্ধ বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকে অথচ রোগীর দেহে বাতাস না লাগে। দিনে দুইবার রোগীর মাথা ধোয়াইয়া দিবে এবং ঐ সঙ্গে তোয়ালে বা গামছা গরমজলে ভিজাইয়া রোগীর সর্বাঙ্গ মুছাইয়া দিবে। রোগীর সর্বাঙ্গ মুছাইবার সময় গৃহের দরজা জানালা বন্ধ রাখিবে।

যতদিন জ্বর থাকিবে ততদিন রোগীকে জল-সাগু, দুধ-সাগু, ডাবের জল, বেদানার রস প্রভৃতি পথ্য দিবে। বলা বাহুল্য, রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে লেবুর রস সহ জল ছাড়া আর কোনো পথ্য দিবে না। জ্বর বন্ধ হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তিন দিন পর্যন্ত তরিতরকারীর ঝোল, মুসুরডালের জুস, পাতলা দুধ, আপেল, আঙ্গুর ও বেদানার রস প্রভৃতি তরল পথ্য রোগীকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। চতুর্থ দিন হইতে ভাত বা রুটির সহিত মসলা বর্জিত তরিতরকারী, দুধ ও ফলাদি রোগীকে পথ্যস্বরূপ দিবে। বেলা ১২টা পর্যন্ত কোনো পথ্য দিবে না, উহা রোগীর যথোচিত ক্ষুধাবৃদ্ধির সাহায্য করিবে। রোগীর পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পাইলে রোগের আরোগ্য লক্ষণ সূচিত হইলে রোগীকে লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। শুষ্ক প্লুরিসি বিপজ্জনক নয়, কিন্তু সরস প্লুরিসি প্রাণঘাতী হইয়া উঠিতে পারে। সরস প্লুরিসি সৃষ্টি হইলে পথ্যাদি সম্বন্ধে আরও সতর্ক হইবে। ক্ষুধার জোর না থাকিলে উপবাস দিবে। এই সময় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে, বেশি নড়াচড়া করিবে না। মল-মূত্র ত্যাগও বিছানায় থাকিয়া বেডপ্যানে সম্পন্ন করিবে। এইরূপ সতর্ক হইয়া চলিলে ৪/৫ বা ৫/৭ দিনের মধ্যেই ঐ সঞ্চিত দূষিত রস দেহপ্রকৃতি অন্যান্য অঙ্গের সাহায্যে দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবে। ২ সপ্তাহের মাঝেও যদি ঐ সঞ্চিত দূষিত রস শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে ঐ দূষিত রসের সংস্পর্শ হেতু ফুসফুসের আবরণী পচিয়া উঠিয়া সমস্ত ফুসফুস বিষাক্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে। সুতরাং ঐ দূষিত রস সঞ্চিত হওয়ার ১০ দিনের মাঝেও যদি জল শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে একজন অস্ত্র চিকিৎসক আনাইয়া পিচকারীর সাহায্যে ঐ দূষিত রস বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

যৌগিক চিকিৎসাবিধি এবং উল্লিখিত নিয়ম-পথ্যাদি রোগাক্রমণের প্রথম হইতে পালন করিয়া চলিলে এই রোগ মারাত্মক হইতে পারে না বা ভবিষ্যতে নিউমোনিয়া বা যক্ষ্মায় পরিণত হইতে পারে না।

ফোঁড়া

লক্ষণ—দেহের চর্মের উপরিস্থিত কোনো স্থান বেদনাযুক্ত, লাল, উত্তপ্ত ও স্ফীত হইয়া পুঁজ উৎপন্ন হইলে তাহাকে সাধারণ ফোঁড়া বলে। ফোঁড়ার আয়ুর্বেদীয় নাম **বিদ্রধি**। যকৃতে, মূত্রাশয়ে, ফুসফুসে বা দেহের অভ্যন্তরস্থ যে কোনো অঙ্গে ফোঁড়া হইতে পারে—এইগুলির নাম আভ্যন্তরীণ ফোঁড়া। সাধারণতঃ ফোঁড়াগুলিতে পুঁজ জমিবার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; অবশেষে উহা পাকিয়া ফাটিয়া যায় এবং অনেকখানি পুঁজ বাহির হইয়া গিয়া ক্ষতস্থান আরোগ্য হইতে থাকে।

কতকগুলি ফোঁড়ায় সাদা রংয়ের পুঁজের পরিবর্তে সবুজ রং-এর পুঁজ বাহির হয় এবং কতকগুলি ফোঁড়া অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর আকারের হয়। এইগুলিকে বলে বিষস্ফোটক বা বিষফোঁড়া। এই বিষফোঁড়াগুলি বড়ো যন্ত্রণাদায়ক। এইগুলি আরোগ্য হইতে খুব দীর্ঘ সময় লাগে। কখনও কখনও এইগুলি প্রাণঘাতী হয়। এই বিষফোঁড়ার চেয়েও আভ্যন্তরীণ ফোঁড়াগুলি অধিকতর বিপজ্জনক।

কারণ—শরীরের সঞ্চিত বিষ বাহির করিয়া দেওয়ার জন্যই প্রাকৃতিক নিয়মে ফোঁড়া উৎপন্ন হয়। **'বিস্ফোটাঃ রক্তপিত্তজাঃ'**—রক্ত ও পিত্ত দুষ্ট হইয়া বিষফোঁড়া উৎপন্ন করে। সঞ্চিত দূষিত পদার্থের জন্য দেহের জীবনীশক্তি যখন অত্যন্ত হ্রাস পায়, শরীরের বিষ চর্মের ভিতর দিয়া ফোঁড়ার আকারে বাহির করিয়া দেওয়ার মতো জীবনীশক্তিও যখন রোগীর থাকে না, তখনই **আভ্যন্তরীণ ফোঁড়া** উৎপন্ন হয়। এই আভ্যন্তরীণ ফোঁড়া পাকিয়া ফাটিয়া যাওয়ার পূর্বে যদি আরোগ্যের ব্যবস্থা অথবা অস্ত্রোপচার করা না হয় তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্যেরা ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া আভ্যন্তরীণ ফোঁড়ায় অস্ত্রোপচার করিতেন। আধুনিকযুগের উন্নততর পাশ্চাত্য অস্ত্রচিকিৎসা পদ্ধতি এই আভ্যন্তরীণ ফোঁড়ায় অস্ত্রোপচার করিয়া

রোগীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে সযত্নে রক্ষা করিতে পারে—যদি ফোঁড়া পুষ্ট হওয়ার পূর্বেই চিকিৎসা আরম্ভ হয়।

চিকিৎসা—সাধারণ ফোঁড়ার চিকিৎসা খোস-পাঁচড়া চিকিৎসার অনুরূপ ('খোস-পাঁচড়ার চিকিৎসা প্রণালী' দ্রষ্টব্য)। আভ্যন্তরীণ ফোঁড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ভোরে—সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি, বমনধৌতি; সহজ প্রাণায়াম নং ৪, নং ৬, নং ৭; উড্ডীয়ান, সুপ্তবজ্রাসন; সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২।

সন্ধ্যায়—শয়ন পশ্চিমোত্তান, সহজ প্রাণায়াম নং ৩, নং ৬, নং ৭। বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকরণী, সহজ অগ্নিসার এবং অগ্নিসার ধৌতি।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নান, জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি ১নং বা ২নং যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—সাধারণ ফোঁড়ায় দুইদিন রাত্রির অন্নাহার বন্ধ রাখিবে। ক্ষুধার জোর না থাকিলে শুধু জল ছাড়া অন্য কিছুই খাইবে না। ক্ষুধা থাকিলে এক পোয়া বা দেড় পোয়া পাতলা দুধ এবং কিছু ফল (কলা বাদে) খাইবে। ফোঁড়ায় পুঁজ হইতে আরম্ভ করিলে গরম তিসির পুলটিস্ দিবে। [তিসির পুল্‌টিস দেওয়ার নিয়ম—তিসির বীজকে একটু ভাজিয়া ভাঙ্গিয়া লইবে এবং উহা গরম করিয়া পুল্‌টিস দিবে।] এই পুল্‌টিসে দ্রুত ফোঁড়া পাকিয়া যায়।

বৃহদাকারে ফোঁড়া কিংবা বিষফোঁড়া উৎপন্ন হইলে তিনদিন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে। উপবাসের প্রথম দুইদিন লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবে। তৃতীয় দিনে পাতলা দুধ, সুপক্ক রসাল ফল অথবা দুধ-সাগু পথ্য গ্রহণ করিবে। বৃহদাকারের ফোঁড়া অথবা বিষফোঁড়ার আবির্ভাবের প্রারম্ভে এইরূপ উপবাস দিলে ফোঁড়া কখনো মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে না বা অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক হয় না। আতপস্নানের সময় এই জাতীয় ফোঁড়ার উপরও কয়েক মিনিট রোদ লাগাইবে।

আভ্যন্তরীণ ফোঁড়া উৎপন্ন হইলে রোগীর দেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্বর সাধারণতঃ ১০১ বা ১০২ ডিগ্রি উঠে। জ্বর বৈকালের দিকে হয় এবং ভোরের দিকে আর জ্বর থাকে না; শরীরের উত্তাপ তখন ৯৭ ডিগ্রিরও নীচে নামিয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ফোঁড়া উৎপত্তি হেতু এই জ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকিবে। এইরূপ জ্বর আরম্ভ হইলেই দৃঢ় সংকল্পের সহিত জ্বর বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উপবাস দিবে। উপবাসের প্রথম তিন দিন শুধু লেবুর রস সহ প্রচুর জলপান করিবে। অতঃপর যতদিন জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় ততদিন অন্নগ্রহণ বন্ধ রাখিয়া জ্বররোগের উপযোগী লঘু-পথ্য গ্রহণ করিবে। এইরূপ উপবাস, বস্তিক্রিয়া ও বমনধৌতি বা বারিসার ধৌতি প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়ায় উদ্গত ফোঁড়া পাকিয়া মিলাইয়া যাইবে ; উহা আর বর্ধিত হইয়া বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পাইবে না।

জ্বর আরোগ্যের পরও ২/১ মাস খাদ্যাদি সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে। ঘি, মাখন, অতিরিক্ত তৈল প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য যথাসাধ্য বর্জন করিয়া ক্ষারধর্মী খাদ্য অর্থাৎ দুধ, ফল ও শাক-সবজি প্রয়োজনানুরূপ গ্রহণ করিবে।

বধিরতা

লক্ষণ—নাদ সাধকেরা ধ্যানতন্ময়তার প্রথম অবস্থায় কর্ণে যেরূপ ভেরী, মৃদঙ্গ বা বংশীধ্বনির মতো শব্দ শুনিতে পান, বধিরতা রোগেরও প্রাথমিক লক্ষণ ঐরূপ শব্দ শ্রবণ—আয়ুর্বেদের ভাষায় 'কর্ণনাদ শ্রবণ'।

কারণ—বধিরতা রোগের বহু কারণ বিদ্যমান। আমরা শুধু প্রধান কয়েকটি কারণের কথা এখানে উল্লেখ করিব—

কর্ণমলাদি দ্বারা কর্ণছিদ্র রুদ্ধ হইলে বায়ু কর্ণের ভিতর দিয়া

যথাযথভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, শব্দতরঙ্গকে মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না—ফলে আংশিক বধিরতারোগ সৃষ্টি হয়।

দুষ্ট পিত্ত, দুষ্ট শ্লেষ্মা যেমন চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, তেমন উহা কর্ণেরও শ্রবণশক্তি নষ্ট করিয়া বধিরতা সৃষ্টি করিতে পারে। প্রদুষ্ট বায়ু দুষ্ট শ্লেষ্মার সহিত যুক্ত হইয়া কর্ণের শব্দবাহী স্রোতকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিলেও বধিরতা রোগ উপস্থিত হয়। দুষ্ট শ্লেষ্মা অর্থাৎ সর্দি রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে উহা কর্ণাভ্যন্তরের শ্রবণতন্তুকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া কঠিন বধিরতা রোগ সৃষ্টি করিতে পারে।

গলার সহিত কানের মধ্যমাংশ একটি ক্ষুদ্র নল দ্বারা যুক্ত। যাহাদের অতিরিক্ত শ্লেষ্মার ধাত তাহাদের নাসিকায়, কণ্ঠে শ্লেষ্মা জমিয়া ঐ সূক্ষ্ম নলের আবরণী স্ফীত হইয়া নলের ছিদ্রটি বন্ধ হইয়া যায়, বাহিরের শব্দ কানের ভিতর প্রবেশের পথ পায় না—ফলে বধিরতা রোগ সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো লোকের খুব জোরে নাসিকা ঝাড়ার অভ্যাস আছে। এইভাবে জোরে নাসিকা ঝাড়িলে নাসিকা ও কণ্ঠের জীবাণুগুলি কানের ঐ সূক্ষ্ম নলের ভিতর প্রবেশ করিয়া জমাট বাঁধে, বাহিরের শব্দ তখন আর কানের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইতে পারে না। ইহার ফলেও সাময়িক বধিরতা প্রকাশ পায়।

অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের জন্য কর্ণমূলস্ফীতি (Mumps) এবং উপদংশরোগ প্রভৃতির জন্যও সাময়িক বধিরতা সৃষ্টি হইতে পারে।

যেসব মায়েদের প্রদর রোগ আছে তাহাদের সন্তানেরা এবং যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে শৈশবে ও কৈশোরে অনিয়মিত আহারের ফলে পেটরোগা হয়, তাহারাই সাধারণতঃ কানপাকা রোগে আক্রান্ত হয়। এই কানপাকা রোগ হইতেই বধিরতা রোগ সৃষ্টি হয়।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে দুগ্ধ বা অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য যাহারা পায় না, জীবনীশক্তি ক্ষীণতা হেতু তাহারাও বধিরতা রোগে আক্রান্ত হয়।

অত্যধিক তামাক বা বিড়ি-সিগারেট সেবনের ফলে উহার **নিকোটিন** নামক বিষের প্রভাবে কানের স্নায়ুগুলি এমন অবসন্ন হইয়া পড়ে যে উহারা আর শব্দতরঙ্গকে মস্তিষ্কে বহন করিতে পারে না। ফলে বধিরতা রোগ সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত চা-পানের ফলে চায়ের **ট্যানিন** বিষও তামাকের নিকোটিন বিষের মতোই কানের স্নায়ুগুলিকে অবসন্ন করিয়া বধিরতা রোগ সৃষ্টি করে।

রক্তের সার রসধাতু বা শুক্র দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলিকে সবল রাখে। প্রথম যৌবনে অস্বাভাবিক বা স্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিলে শুক্রবাহী স্নায়ুগুলি দুর্বল হয় এবং উহার ফলে কর্ণযন্ত্রের স্নায়ুগুলিও দুর্বল হইয়া স্থায়ী বধিরতা রোগ সৃষ্টি করে।

মাদক-দ্রব্য সেবন হেতু বধিরতা রোগে এবং শুক্রক্ষয় হেতু বধিরতা রোগে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে এবং রোগের কারণস্বরূপ ঐ সব বদভ্যাস দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ না করিলে এই বধিরতা রোগ দুরারোগ্য হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ স্থায়ী সর্দিই বধিরতা রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা—যে রোগের জন্য বধিরতা রোগের সৃষ্টি হইয়াছে সেই রোগের চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিবে। রোগের মূল কারণের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক হইবে। সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য 'অজীর্ণ' রোগারোগ্য প্রণালী অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগাক্রান্ত অবিবাহিত যুবকেরা অস্বাভাবিক ভাবে রেতঃপাত করার বদভ্যাস ত্যাগ করিবে; বিবাহিত হইলে সংযত দাম্পত্য-জীবন যাপন করিবে। তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। চা পানের অভ্যাস ত্যাগে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইলে ভোরে একবার মাত্র চা পান করিবে। যকৃতের ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকিলে দ্বিপ্রহরে খাদ্যের সঙ্গে ২/১ চামচ খাঁটি ঘি-মাখন খাইবে। শাক-সবজি, দুধ, ফল

প্রভৃতি ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজনানুরূপ গ্রহণ করিবে। (এই প্রসঙ্গে 'দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য)। স্থায়ী সর্দিরোগ থাকিলে উহা আরোগ্যের উপায় সর্বাগ্রে অবলম্বন করিবে।

বন্ধ্যাত্ব

লক্ষণ—স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন সত্ত্বেও ১৮ হইতে ৩৫ বৎসরের মাঝে যে সব নারী সন্তানসম্ভাবিতা না হয়, তাহাদিগকেই বন্ধ্যা নারী বলে। একটি সন্তান হওয়ার পর যাহাদের আর সন্তান হয় না, তাহাদের বলে **কাকবন্ধ্যা**।

কারণ—পুরুষদেহে পিতৃগ্রন্থি অর্থাৎ মুষ্কদ্বয় (Testis) রক্তমন্থন করিয়া নৃবীজ সৃষ্টি করে। নারীদেহে মাতৃগ্রন্থি অর্থাৎ ডিম্বকোষ (Ovary) অনুরূপভাবেই নৃবীজ সৃষ্টি করে। পুরুষের মতো নাড়ীর এই গ্রন্থিদ্বয় একসঙ্গে একটি থলির ভিতর অবস্থিত নয়, উহা তাহাদের দুই উরুসন্ধির ('কুঁচকি'-র) দুই পার্শ্বে অবস্থিত। মেয়েদের এই মাতৃগ্রন্থি অর্থাৎ ডিম্বকোষদ্বয় যদি যথোপযুক্তভাবে সুগঠিত না হয়, অথবা গ্রন্থিটি নৃবীজ সৃষ্টির উপযোগী সুস্থ সবল না থাকে, তাহা হইলে উহা সুস্থ-সবল নৃবীজ সৃষ্টি করিতে পারে না—ফলে বন্ধ্যাত্ব বা গর্ভপাত অবশ্যম্ভাবী হয়।

নারীদেহের ডিম্বকোষে উৎপন্ন ডিম্বটি (Ovum) ফাটিলে উহার ভিতর হইতে যে নৃবীজটি বাহির হইয়া আসে, উহা ডিম্বকোষসংলগ্ন ডিম্ববাহী নলের (Fallopean Tubes) সাহায্যে জরায়ুতে আসিয়া উপস্থিত হয়। পুং-নৃবীজ এই জরায়ুতে স্ত্রী-নৃবীজের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রূণ উৎপন্ন করে। যে নলের সাহায্যে স্ত্রীবীজ ডিম্বকোষ হইতে বাহির হইয়া জরায়ুতে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ নলের যদি কোনো ত্রুটি থাকে অথবা রোগবিষ বা ব্যাধিবীজাণু যদি ঐ নলের ভিতর বাসা বাঁধিয়া থাকে,

তাহা হইলে উহাদের আক্রমণে স্ত্রী-নৃবীজটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ নারীর বন্ধ্যাত্বের মূল কারণ ইহাই।

যে সমস্ত মেয়েদের একটু কোপন স্বভাব বা রুক্ষ মেজাজ তাহাদের দেহে স্বভাবতঃই বায়ু বা পিত্তদোষাদি বিদ্যমান থাকে। এই শ্রেণীর মেয়েদের দেহে ক্রোধ হইতে এক জাতীয় বিষ সৃষ্টি হইয়া জরায়ুতে সঞ্চিত হয়, পুং-নৃবীজ এই বিষের সংস্পর্শে আসিলে মরিয়া যায়। সুতরাং দেহস্থ এই বিষও এক শ্রেণীর বন্ধ্যাত্বের কারণ।

জরায়ু যদি সন্তানবৃদ্ধির উপযোগী পরিপুষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উহার মাঝে উভয় বীজের মিলনে ভ্রূণ সৃষ্টি হইতে পারে না—ফলে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়।

বিষাক্ত রোগবীজাণু যদি জরায়ুপ্রদেশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে উহা পুং-নৃবীজ ও স্ত্রী-নৃবীজ উভয়কেই আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে। সাধারণ স্রাব অর্থাৎ প্রদরাদি রোগে সন্তান উৎপত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে না; কিন্তু ঐ স্রাব যদি বিষাক্ত হয়, তাহা হইলে পুং-নৃবীজ উহার সংস্পর্শে আসিয়া মরিয়া যায়। সুতরাং বিষাক্ত রোগবীজাণুর জরায়ুপ্রদেশে উপস্থিতি এবং বিষাক্ত প্রদরও বন্ধ্যাত্ব রোগের কারণ হইতে পারে।

মেয়েদের দেহে অত্যধিক চর্বি সৃষ্টি হইলে উহা তাহাদের শিবসতীগ্রন্থি ও মাতৃগ্রন্থির ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে—ফলে ইহাও সন্তানলাভের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইতে পারে।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামী সহবাস যদি আরামদায়ক না হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নারীর ঐ অঙ্গে কোনো ত্রুটি আছে। এই ত্রুটির জন্য পুং-বীজ যথাস্থানে পৌঁছিয়া স্ত্রী-বীজের সহিত মিলিত হইতে পারে না—সুতরাং ইহাও বন্ধ্যাত্বের কারণ হইতে পারে।

কোনো কোনো পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে জরায়ুর স্থানচ্যুতিও বন্ধ্যাত্বের কারণস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি হইলেও ডিম্ববাহী নলের

সংযোগ উহার সহিত ঠিকই থাকে, সুতরাং জরায়ুর স্থানচ্যুতি বন্ধ্যাত্বের কারণ—এই মত আমাদের কাছে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। গরম দেশের অধিকাংশ মেয়েরই জরায়ু একটু স্থানচ্যুত হয়। উহা তাহাদের সন্তানলাভের পক্ষে বিঘ্নদায়ক হয় না।

সন্তানলাভে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান দায়িত্ব। সুতরাং পুরুষের শুক্রতারল্য ও অক্ষমতাদি দোষেও নারীর বন্ধ্যাত্ব রোগ সৃষ্টি হয়।

বিশেষ ধারণাশক্তিসম্পন্ন স্বামী যদি অসংযমী হয়, অত্যধিক সহবাস প্রিয় হয়, তাহা হইলে নারীর বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থি, স্নায়ু প্রভৃতি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ; ফলে সন্তানলাভোপযোগী স্ত্রী-বীজ নারীদেহে সৃষ্টি ও পুষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং অত্যধিক সময়ব্যাপী সহবাসেও নারীর বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়। এই একই কারণে প্রায় প্রত্যহ সহবাস হেতু পতিতা মেয়েদের প্রায়ই সন্তান হয় না।

স্বামীর দেহ যদি অত্যধিক পিত্তদোষে আক্রান্ত থাকে, তাহা হইলে শুক্রেও ঐ পিত্তদোষ সঞ্চারিত হয় এবং উহার বিষাক্ত স্পর্শে স্ত্রী-বীজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কারণেই অত্যধিক পিত্তদোষাক্রান্ত ব্যক্তির পিত্তদোষ কথঞ্চিৎ হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত তাহার সন্তানলাভ হয় না।

পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি অর্থাৎ ২৫ বৎসরের পূর্বে পুরুষেরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে বা স্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণ করে, তাহা হইলে বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থি ও স্নায়ুগুলি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ; যথোচিত সহবাসশক্তিও হ্রাস পায়। এই দুর্বল পিতৃগ্রন্থি সবল-সুস্থ পূর্ণাঙ্গ পুং-বীজ সৃষ্টি করিতে পারে না। এই অপুষ্ট বীজ স্ত্রী-বীজের সহিত মিলিত হইলে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় না—ফলে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়। এই অপুষ্ট বীজের সহিত স্ত্রী-বীজ মিলিত হইয়া যদি ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও ঐ ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না—ফলে গর্ভপাত হয় অথবা ক্ষীণজীবী সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

স্বামী গণোরিয়া, উপদংশ প্রভৃতি কদর্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া

সত্ত্বেও যদি সহবাস বন্ধ না করে, তাহা হইলে ঐসব রোগ স্ত্রীর অঙ্গেও বিসর্পিত হয়। এইসব রোগবিষ দেহে অত্যধিক প্রবল হইলে পুং-বীজ ও স্ত্রী-বীজ উভয়ই নষ্ট করিয়া নারীর বন্ধ্যাত্ব রোগ সৃষ্টি করিতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে দেহে 'ই' ভিটামিনের অভাবও বন্ধ্যাত্বের কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দুগ্ধ, কলা, পালংশাক প্রভৃতি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক বহু আহার্যের মাঝে 'ই' ভিটামিন আছে। এই 'ই' ভিটামিন খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করে না এইরূপ নারী-পুরুষের সংখ্যা আমাদের দেশে নাই বলিলেও চলে। সুতরাং খাদ্যে 'ই' ভিটামিনের অভাব বন্ধ্যাত্বের কারণ নয়, 'ই' ভিটামিনকে দৈহিক উপাদানে পরিণত (Assimilate) করার অক্ষমতাই বন্ধ্যাত্বের কারণ।

চিকিৎসা—অপুষ্ট জরায়ু ও মাতৃগ্রন্থি লইয়া কদাচিৎ ২/১টি নারী জন্মগ্রহণ করে, ইহারা চিরবন্ধ্যা। এইরূপ মুষ্টিমেয় ২/১টি নারী ব্যতীত আর সকলেরই বন্ধ্যাত্ব-দোষ যৌগিক ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির মাঝে কোন্ কারণে বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে। কারণ নির্ণয়ে অক্ষম নর-নারী স্নায়ুদৌর্বল্য রোগের চিকিৎসা প্রণালী অনুসরণ করিবে।

প্রায়ই দেখা যায়, বন্ধ্যা-নারীর শিবসতী-গ্রন্থি, ইন্দ্রগ্রন্থি ও মাতৃগ্রন্থির ক্রিয়া দুর্বল থাকে। যৌগিক ক্রিয়ায় ঐ গ্রন্থিগুলি সবল হয়, ফলে, বন্ধ্যাত্ব-দোষ স্বভাবতঃই দূর হয়।

উল্লিখিত যৌগিক ব্যায়ামে কাকবন্ধ্যা রোগও আরোগ্য হইবে। ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নান, জলস্নান ও জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—স্বাস্থ্যনীতি মানিয়া চলিবে। যে সমস্ত কারণে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়, স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহা পরিহার করিয়া চলিবে।

তামাক, বিড়ি, আফিম, মদ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য শরীরের প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলিকে দুর্বল করে—সুতরাং সন্তান বঞ্চিত পুরুষ মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য গ্রহণ করিবে। মেয়েরাও অতিরিক্ত পান ও তদনুষঙ্গী খয়ের, চুন, কিমাম, জরদা, তামাকপাতা বর্জন করিবে। চা পানের নেশা থাকিলে তাহাও পরিত্যাগ করিবে।

বসন্ত ও জলবসন্ত রোগ

বসন্ত রোগের প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় নাম মসূরিকা। পরবর্তীকালে রোগটি বসন্ত রোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। বসন্তকালই এই রোগের আক্রমণের সময়, এইজন্যই ইহার নাম বসন্ত রোগ। বর্ষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পায়।

লক্ষণ—রোগী প্রথমতঃ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে। এই সময় অধিকাংশ রোগীর নাভি ও নাভির নিম্নপ্রদেশে আমবাতের মতো লাল বর্ণের চাকা চাকা দাগ (Red rashes) উৎপন্ন হয়, সর্বশরীরে বেদনা বোধ হয়, রোগী মাথায় যন্ত্রণা, পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রণা বোধ করে; কোনো কোনো রোগীর খুব বমি হইতে থাকে। রোগী খুব দুর্বলতা বোধ করে। সাধারণতঃ তৃতীয় দিনে জ্বরের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং এই দাগগুলি মিলাইয়া গিয়া মুখমণ্ডলে ও কপালে বসন্ত গুটি আবির্ভূত হইতে থাকে। তিন-চার দিনের মাঝেই বসন্ত গুটি (Eruption) ছড়াইয়া পড়ে। পঞ্চম দিনে এই বসন্ত গুটির (Vesicle) ঊর্ধ্বাংশে জল সঞ্চিত হয় এবং গুটিকার আকার বৃদ্ধি পায়। এই গুটিকার চতুষ্পার্শ্ব স্ফীত ও গোলাকার এবং মধ্যমাংশ একটু নীচু হয় (Round base central depression & inflamed mergin)। এই সময় যদি রোগীর মুখ ফুলিয়া যায়, তবে মুখের এই স্ফীতি হেতু চোখ বন্ধ হইয়া যায়—রোগের এইরূপ লক্ষণ অশুভ। এইরূপ রোগী অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোগের দশম দিনে রোগ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ মুখের গুটিগুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে; অতঃপর হাত-পায়ের এবং গায়ের গুটি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। আর যদি রোগ প্রাণঘাতী হইয়া উঠে, তাহা হইলে একাদশ দিনে পুনরায় জ্বর বৃদ্ধি হয়। জ্বর ও মুখাদি স্ফীতির সহিত জিহ্বাও স্ফীত হয় এবং জিহ্বায় ময়লার আস্তরণ পুরু হইয়া বসন্তগুটিকায় সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে এবং রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

কারণ—পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে রোগবীজ সংক্রমণ হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। আয়ুর্বেদমতে দেহে দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ সৃষ্টি হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। দ্বিদোষজ রোগ মারাত্মক হয় না, ত্রিদোষজ রোগ প্রায়ই মারাত্মক হয়। দেহ দোষযুক্ত হইলে সেই দেহে স্বভাবতঃই রোগবীজাণু সৃষ্টি হয় এবং ঐ রোগবীজাণু অন্য দোষযুক্ত দেহেও সংক্রমিত হইতে পারে।

সাধারণতঃ ভয়াবহ কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণই এই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতা দোষ না থাকিলে এই রোগ সৃষ্টি হয় না। কোষ্ঠবদ্ধতা ছাড়া অন্য কারণে এই রোগ সৃষ্টি হইলে সেই রোগ মারাত্মক হয় না। কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর সমুদয় মল কখনো নিষ্কাশিত হয় না। ৬ মাসের পুরাতন মলও মলনাড়ীর চতুষ্পার্শে কিছু পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। এই সমস্ত দূষিত মলের মধ্যেই প্রাণঘাতী রোগবীজাণুর সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত লোক সুষম খাদ্য গ্রহণ করে না, প্রয়োজনীয় শাক-সবজি, ফল, দুধ প্রভৃতি পথ্য গ্রহণ করে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে না, তাহাদের মাঝেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

দেহপ্রকৃতি দেহ রক্ষা করার জন্যই নিজের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। সঞ্চিত রোগবিষ যাহাতে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই দেহে ঐরূপ বসন্তরোগ সৃষ্টি হয়। দেহবিষকে দেহ হইতে বাছিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার মতো জীবনীশক্তি না থাকিলে রোগীকে অবশ্যই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতে হয়।

চিকিৎসা—গ্রন্থকার ইচ্ছাপূর্বক মৃত্যুপথযাত্রী বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া নিজের দেহে ঐ রোগ সংক্রমণ করেন। উদ্দেশ্য—সহজ সাধ্য যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় কিনা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। বলা বাহুল্য, অতি শৈশবকালে গ্রন্থকারকে বসন্তরোগের টীকা দেওয়া হইয়াছিল; অতঃপর আর কখনো তিনি বসন্তরোগের টীকা গ্রহণ করেন নাই। সংক্রামক বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া গ্রন্থকার ঐ রোগে আক্রান্ত হন। তিনদিন ১০৫/১০৬ ডিগ্রি জ্বর ভোগের পর গ্রন্থকারের মুখে, কপালে এবং ক্রমশঃ শরীরের অন্যান্য স্থানে বসন্ত রোগের গুটিকা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। অতঃপর গ্রন্থকার তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত সহজ বস্তিক্রিয়া, বারিসার ধৌতি এবং সহজ অগ্নিসার ক্রিয়া নিজের উপর প্রয়োগ করেন। প্রথমে জ্বরের তিনদিন, গুটিকা বাহির হইবার পরও তিনদিন ক্রমান্বয়ে এই ৬ দিন লেবুর রস ও নুনসহ ঈষৎ গরম জল এবং অল্প কমলার রস ছাড়া গ্রন্থকার আর কোনো পথ্য গ্রহণ করেন নাই। রোগের চতুর্থ দিন হইতে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত বারিসার ধৌতি এবং সহজ অগ্নিসার তিনি দুই বেলাই অভ্যাস করিতেন। এই ক্রিয়াগুলি অভ্যাসের ফলে বসন্তগুটিকার রস সঞ্চিত হইয়া উহা আর পাকিতে পারে নাই। রোগের ৭ম দিন হইতেই রোগারোগ্যের লক্ষণ সূচিত হইতে থাকে। ১০ম দিনে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করেন।

এই সামান্য ক্রিয়ার সাহায্যেই তিনি এই কঠিন মারাত্মক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন দেখিয়া নিজেও বিস্মিত হইয়াছেন। এইভাবে উল্লিখিত তিনটি ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি বসন্ত রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বারিসার ধৌতি পূর্ব হইতে অভ্যাস না থাকিলে রোগাক্রান্ত অবস্থায় বমন-ধৌতি প্রয়োগ করিবে। সুস্থ অবস্থায় যাহারা আমাদের এই পুস্তকে উল্লিখিত সহজ বস্তিক্রিয়া, সহজ অগ্নিসার, বমনধৌতি এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম প্রভৃতি অভ্যাস করিবে, তাহাদের দেহ কখনো ঐরূপ কঠিন বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবে না।

নিয়ম ও পথ্য—জ্বরের প্রথম তিনদিন শুধু জল ছাড়া অন্য কোনো

পথ্য গ্রহণ করিবে না। পরবর্তী এক সপ্তাহ লেবুর রস সহ জল ও কমলা, বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের রস এবং ডাবের জল ছাড়া অন্য কোনো পথ্য গ্রহণ করিবে না। একাদশ দিবস হইতে রোগারোগ্যের লক্ষণ সূচিত হইলে অন্য লঘু পথ্য গ্রহণ করিবে। এই রোগীর সর্বাঙ্গ কার্বলিক লোশন দ্বারা প্রত্যহ ধৌত করা প্রয়োজন। বোরিক লোশন দ্বারা মাঝে মাঝে চক্ষুও ধৌত করিতে হইবে; উহার ফলে চক্ষু অন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এই রোগটি শুধু বিপজ্জনক নয়, ইহা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক এবং ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধি। সুতরাং এই ব্যাধিটি সম্বন্ধে এশিয়ার মতো গরম দেশের লোকের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

হিন্দুশাস্ত্রে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্যই শিবচতুর্দশী ব্রতের বিধান আছে। সমস্ত দিন-রাত উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। শীত শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই এই ব্রতটি উদ্‌যাপনের সময়। এই সময় সম্পূর্ণ একদিন উপবাসী থাকিলে শীতকালে দেহে সঞ্চিত দূষিত জিনিষ উপবাসের ফলে অনেকটা নষ্ট হয়। এই জন্যই এই ব্রত উদ্‌যাপনকারীর এই সমস্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুব কম। হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানের সহিত তাহার স্বাস্থ্যনীতিও বিশেষভাবে জড়িত আছে। যাহারা মাঝে মাঝে উপবাস দেয়, যাহারা সুষম খাদ্য গ্রহণ করে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকে, তাহারা সহজে এই রোগে আক্রান্ত হয় না।

বমন-ধৌতি বা বারিসার ধৌতি বসন্ত ও জলবসন্ত রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক। এই রোগে আক্রান্ত হইলেও এই ধৌতি অব্যর্থ ফলপ্রদ। পাঁচ বৎসরের বালক-বালিকারাও বমন-ধৌতি অভ্যাস করিতে পারে।

জলবসন্ত (Chicken Pox)

লক্ষণ—বসন্ত রোগের অতি মৃদু অভিব্যক্তির নামই জলবসন্ত। বসন্ত

রোগে রোগীর মাথায় এবং পৃষ্ঠে ভয়ানক যন্ত্রণা থাকে; বমি, খিঁচুনি, প্রলাপ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে; কিন্তু জলবসন্তে এই সমস্ত কিছুই থাকে না। গুটিগুলি অপেক্ষাকৃত বড়ো, সংখ্যায় অল্প এবং পুঁজের পরিবর্তে জল সঞ্চয় হয়। বসন্তরোগের মতো উহা মারাত্মক নয়। তিনদিন পরেই এই রোগের গুটিকা শুকাইতে আরম্ভ করে। চিকিৎসা ও নিয়ম-পথ্য বসন্তরোগেরই অনুরূপ; শুধু কার্বলিক লোশন ও বোরিক লোশন প্রভৃতি এই রোগীদের দেওয়ার দরকার হয় না।

বহুমূত্র রোগ

লক্ষণ—বহুমূত্র রোগ দ্বিবিধ—শর্করাযুক্ত বহুমূত্র (Diabetes Mellitus) এবং শর্করাবিহীন বহুমূত্র (Diabetes Insipidus)। শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় নাম **সোমরোগ**; শর্করাবিহীন বহুমূত্রের নাম **উদক মেহ বা মূত্রাতিসার**।

"......**মূত্রস্থা মক্ষিকাদ্যাঃ**" মূত্রের সহিত চিনি নির্গত হইতে আরম্ভ করিলেই মূত্রে মক্ষিকাদি উপবেশন করে। সুতরাং মূত্রে মাছি ও পিঁপড়া বসিতে দেখিলেই এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হইবে। এই রোগের অন্যান্য লক্ষণ—ঘন ঘন পিপাসা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, মুখে মিষ্টস্বাদ অনুভব, সময় সময় সর্বশরীরে অসহ্য চুলকানির সৃষ্টি হয় অথবা দুষ্ট ব্রণের উদ্ভব হয়। রোগের কঠিন অবস্থায় মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা, মূর্চ্ছা, মূত্রাশয়-প্রদাহ প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ সৃষ্টি হয়। বহুমূত্ররোগীর দেহকে হৃদ্‌রোগ, সন্ন্যাস রোগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। যাহাদের চোখে ছানি পড়ে, প্রায়ই দেখা যায় তাহারাও অল্পাধিক পরিমাণে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত। বহুমূত্র রোগীর হয় কোষ্ঠবদ্ধতা, নয়ত কোষ্ঠতারল্য বিদ্যমান থাকে। তাহার গাত্রচর্ম শুষ্ক, দাঁতগুলি ফ্যাকাশে বা

ময়লা হইয়া যায়। এক কথায় বলা যায়—**বহুমূত্র রোগ দুরারোগ্য কঠিন অজীর্ণ রোগেরই প্রকার বিশেষ।**

কারণ—যোগশাস্ত্রের ভাষায় অগ্নিগ্রন্থির দুর্বলতাই বহুমূত্র রোগের প্রধান কারণ। সূর্যগ্রন্থি (Pancreas) এবং যকৃৎই অগ্নিগ্রন্থির অন্তর্গত প্রধান গ্রন্থি। এই গ্রন্থিদ্বয়ের ক্রিয়া বিপর্যয়ের ফলেই বহুমূত্র রোগ সৃষ্টি হয়। সূর্যগ্রন্থির অন্তর্নিঃসৃত রসের একাংশ প্রবাহিকা নাড়ী অর্থাৎ ঊর্ধ্ব অন্ত্রে সঞ্চিত খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করে, উহার অন্তর্নিঃসৃত রসের আর এক অংশ খাদ্যবস্তু হইতে গ্লুকোজ বা চিনি তৈয়ারি করিয়া উহা সূর্যগ্রন্থিকোষে সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা করে। এই সঞ্চিত চিনিই প্রয়োজনমত দগ্ধ হইয়া দেহের তাপ, দেহস্থ পেশী, তন্তু ও স্নায়ুর জীবনীশক্তি অটুট রাখে।

এই সূর্যগ্রন্থি ও যকৃতের ক্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়িলে যকৃৎ তখন আর প্রয়োজনানুরূপে বণ্টনের জন্য চিনি স্বীয় কোষে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে না। এই চিনি রক্তে যথেচ্ছভাবে প্রবেশ করিয়া রক্তের ক্ষারভাগ (Alkalinity) নষ্ট করিয়া দেয়; ফলে রক্ত তখন সমস্ত দেহযন্ত্রকে বিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করিতে পারে না; রক্তের ক্ষারধর্ম নষ্ট হইলে রক্তের রোগবিষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও দ্রুত হ্রাস পায়। দেহপ্রকৃতি তখন রক্তমিশ্রিত এই অপ্রয়োজনীয় এবং অনিষ্টকারী চিনিকে তরল করিয়া মূত্রগ্রন্থির (Kidney) সাহায্যে ছাঁকিয়া মূত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। রক্তের চিনিকে তরল রাখিবার জন্য দেহে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়—এইজন্যই বহুমূত্ররোগীর পুনঃ পুনঃ জল পিপাসার উদ্রেক হয় এবং জলই আবার প্রস্রাবরূপে দেহ হইতে অনিষ্টকারী চিনি বাহির করিয়া দেয়। প্রস্রাবে চিনি থাকে বলিয়াই উহাতে মাছি ও পিঁপড়া বসে।

সূর্যগ্রন্থি বা অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃস্রাবী রসকে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র নাম দিয়াছে ইনসুলিন (Insulin)। গো, মেষ প্রভৃতি জীব-জন্তুর সূর্যগ্রন্থি হইতে এই ইনসুলিন সংগ্রহ করা হয়। ইনসুলিন ইনজেকশন নিলে সাময়িকভাবে রক্তে চিনির অংশ হ্রাস পায়। বলাবাহুল্য,

ইন্‌সুলিন ইন্‌জেক্‌শনে বহুমূত্ররোগ কখনো আরোগ্য হয় না। তবে রোগের প্রবলতার সময় ঘন ঘন ইন্‌জেক্‌শনের সাহায্যে রোগীকে ৫/১০ বৎসর বা ততোধিক কাল বাঁচাইয়া রাখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে পূর্বে রোগীকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইত; বর্তমান যুগে ইন্‌সুলিন আবিষ্কার হওয়ায় রোগীর সহসা প্রাণনাশের আশঙ্কা কতকটা দূরীভূত হইয়াছে মাত্র।

কোনো কারণে মূত্রাশয় আহত হইলেও যকৃৎকোষের কিছু চিনি মূত্রাশয়ে আসিয়া মূত্রাশয়ের আহত স্থান দিয়া প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। সুতরাং মূত্রাশয় আহত হইলেও প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহা সোমরোগ বা বহুমূত্ররোগ নয়। ইহা একটি ভিন্ন রোগ। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম **রেনাল গ্লাইকোসুরিয়া** (Renal Glycosuria)। সাধারণ ডাক্তারেরা ভুল ক্রমে এই রোগকেও বহুমূত্র মনে করিয়া ইন্‌সুলিন ইন্‌জেক্‌শন দেন। ইহার ফলে ইন্‌সুলিন বিষে হতভাগ্য রোগী অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দাম্পত্যজীবনে উচ্ছৃঙ্খলতায় রক্ত নিস্তেজ হইয়া অগ্নিগ্রন্থির ক্রিয়া দুর্বল হইলে এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাও অগ্নিগ্রন্থিগুলিকে দুর্বল করিয়া এই রোগ সৃষ্টি করিতে পারে। যাহারা অতিরিক্ত চা পান করে অথবা প্রত্যহ যাহারা ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি চিনি সংযুক্ত মিষ্টদ্রব্য আহার করে তাহাদের দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি সঞ্চিত হওয়ার ফলেও এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। অতিরিক্ত মাছ, মাংস বা ডিম ভক্ষণে অথবা অতিরিক্ত ঘৃত, মাখন ও ঘৃতপক্ক জিনিস ভোজনে যকৃৎ ও প্লীহা দুর্বল হইলেও এই রোগ সৃষ্টি হয়। অন্যান্য কারণেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে এই রোগের উদ্ভব হইতে পারে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি ও অর্ধস্নান; সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ২০ বার, ২নং ৬ বার; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, নং ৮, বারিসার ধৌতি বা বমন-ধৌতি।

মধ্যাহ্নে—স্নানের সময় সহজ অগ্নিসার ২৫ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ প্রাণায়াম, যোগমুদ্রা, পশ্চিমোত্তান, সহজ অগ্নিসার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, নং ৪ ; বিপরীতকরণী, পবনমুক্তাসন।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম এবং আতপস্নান। আহারান্তে দক্ষিণ নাসায় এক ঘণ্টা শ্বাস প্রবাহ অব্যাহত রাখিবে।

নিয়ম ও পথ্য—পূর্বেই বলিয়াছি, বহুমূত্র রোগের মূলে আছে অজীর্ণ রোগ। এই রোগে যকৃতের ক্রিয়া দুর্বল থাকে বলিয়া দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় চর্বি দগ্ধ হইতে পারে না—ফলে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিরা প্রায়ই স্থূলকায় হয়। রোগের সূচনা বুঝিতে পারিলেই উপর্যুপরি ২/৩ দিন উপবাস দিবে। উপবাসের সময় প্রচুর জলপান করিবে; অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। এইরূপ সম্পূর্ণ উপবাসে অক্ষম হইলে, উপবাসের সময় প্রয়োজন মতো সুপক্ক অম্লফল অর্থাৎ কমলা, আনারস, আঙ্গুর, ডালিম প্রভৃতি খাইবে। এইভাবে রোগের প্রারম্ভে ২/৩ দিন উপবাস দিলেই রক্তে চিনির ভাগ কমিয়া যাইবে এবং প্রস্রাবেও চিনির ভাগ হ্রাস পাইবে অথবা একেবারেই চিনি পাওয়া যাইবে না। অতঃপর আহারে-বিহারে বিশেষ সংযম অভ্যাস করিবে। সর্বদা সতর্ক থাকিবে—যাহাতে আহারের দোষে অজীর্ণ বা অম্ল সৃষ্টি না হয়, পাকস্থলীতে গ্যাস সৃষ্টি না হয় এবং আহার্যের সহিত অতিরিক্ত চিনি উদরে না যায়।

কোনো ঔষধেই এই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না। যৌগিক ক্রিয়া অভ্যাসে নূতন রোগ খুব দ্রুত আরোগ্য হইবে। রোগ পুরাতন হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে একটু সময় লাগে। একাদশীর উপবাস, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিশিপালন পুরাতন বহুমূত্র রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। বহুমূত্র রোগের প্রবল অবস্থায় ভাত ও রুটির পরিবর্তে কাঁচা কলা সিদ্ধ, ওল সিদ্ধ বা মানকচু সিদ্ধ খাইবে। চাল, আটা, সাগু, বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য হইতে দেহে চিনি উৎপন্ন হয় এবং আমিষজাতীয় খাদ্যে বহুমূত্র রোগীর যকৃতাদি আরও খারাপ হয়। এই জন্যই এই রোগে

আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা উচিত। দধি, নারিকেল প্রভৃতি খাদ্যেও প্রোটিন বিদ্যমান, কিন্তু ইহারা মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্যের মতো অম্লধর্মী নয়, বরং শাক-সব্জীর মতোই ক্ষারধর্মী। সুতরাং বহুমূত্ররোগী আমিষ খাদ্য বর্জন করিয়া উপরি উক্ত দধি ও নারিকেল হইতে দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রোটিন উপাদান সংগ্রহ করিবে। সুপক্ক কলা, বিলাতী বেগুন, থোড়, মোচা, ডুমুর এবং অন্যান্য শাক-সব্জী, বিশেষভাবে টাট্‌কা শাক-পাতা এবং টক ও মিষ্ট ফল এই রোগে সুপথ্য। চা, সিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্য যথাসাধ্য বর্জন করিয়া চলিবে। ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি সংহত খাদ্য এবং ঘিয়ের তৈয়ারি খাবারাদি এবং আমিষ খাদ্য এই রোগে গ্রহণ করা উচিত নয়। এইসব খাদ্য দেহে দূষিত জিনিস (ইউরিক এসিড) সঞ্চিত করিয়া রোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বাতরোগ

লক্ষণ—দেহস্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ সৃষ্টি হয়। এইজন্য ইহার নাম বাত বা বায়ুরোগ। "**বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম**"—বায়ুই দেহরাজ্যের বিধাতা। বায়ুই শরীরের রস-রক্ত প্রভৃতিকে শিরা ও ধমনীর ভিতর দিয়া শরীরের সর্বত্র পরিচালিত করে। নিঃশ্বাসের সহিত, মল-মূত্র ও ঘর্মের সহিত বায়ুই দেহসঞ্চিত বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। দেহে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয় অধিক পরিমাণে হইলে উহার প্রভাবে বায়ুও দূষিত হয়, বায়ুর ক্রিয়াও দুর্বল হইয়া পড়ে। দেহে বায়ুর ক্রিয়া দুর্বল হইলে বায়ু সব সময় দেহ হইতে দেহসঞ্চিত বিষ বাহির করিয়া দিতে পারে না। দেহসঞ্চিত এই বিষ ও দূষিত বায়ু দেহের অস্থিসন্ধিতে সঞ্চিত হইয়া ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি করে, কখনো বা পেশীগুলিকে আক্রমণ করে। দূষিত বায়ুযুক্ত রোগ-বিষের এই আক্রমণের নামই বাতরোগ। এই বাতরোগ খুব যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি।

দেহসঞ্চিত বিষ দ্বারা পেশীগুলি আক্রান্ত হইলে তাহার নাম **পেশীবাত** (Muscular Rheumatism)। এই বিষ অস্থিসন্ধিস্থানে সঞ্চিত হইলে তাহাকে বলে **সন্ধিবাত** (Gout)। রোগের প্রথম অবস্থায় দেহপ্রকৃতি জ্বর উৎপন্ন করিয়া বাত ব্যাধির মূল কারণ রক্তসঞ্চিত বিষ নষ্ট করিবার চেষ্টা করে—যাহাতে ঐ বিষ কোন স্নায়ু, পেশী প্রভৃতিকে আক্রমণ করিতে না পারে অথবা কোনো অস্থিসন্ধিতে সঞ্চিত হইয়া থাকিতে না পারে। জ্বরযুক্ত বলিয়া ইহার নাম **বাতজ্বর** (Acute Rheumatism)। এই রোগ বিষে কটিদেশ আক্রান্ত হইলে তাহাকে আমরা বলি **কটিবাত বা মাজাব্যথা** (Lumbago)। ঘাড়ের পেশী আক্রান্ত হইলে তাহাকে বলি **স্কন্ধবাত** (Torticollis)। শরীরের পার্শ্বদেশ আক্রান্ত হইলে তাহাকে বলি **পার্শ্ববাত**। আর এক রকম বাতরোগে হাত বা মাথা সর্বদা কম্পিত হয়, আয়ুর্বেদের ভাষায় ইহার নাম **খল্লীবেপথু বাত**। আয়ুর্বেদে পায়ের বাতের নাম **পাদহর্ষ**। হাতের বাতের নাম **বিশ্বচী**। কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের বাতকে বলে **গৃধ্রসী**। বলা বাহুল্য, আয়ুর্বেদের এই নামকরণ বর্তমান যুগে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সন্ধিবাত, কটিবাত প্রভৃতি নতুন নাম প্রচলিত হইয়াছে।

কারণ—আমাদের দেহের রক্ত সমুদ্রজলের মতোই লবণাক্ত; এই লবণাক্ত রক্তের মাঝে কিছু পরিমাণ অম্লরস (Acid) আছে। আহার-বিহারের দোষে যদি রক্তের মাঝে প্রয়োজনাতিরিক্ত অম্লরস সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত অম্লরসে রক্তের ক্ষারভাগ (Alkalinity) হ্রাস পাইয়া রক্ত নিস্তেজ ও অসার হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ অর্থাৎ ক্ষারধর্মী রক্তই দেহের স্নায়ু, তন্তু প্রভৃতিতে পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করে। রক্তে অম্লরসের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উহার বিষে দুর্বল হইয়া দেহযন্ত্রগুলি আর সুচারুরূপে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে না। রক্তের ভিতর হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অম্লরসকে ছাঁকিয়া পৃথক করার প্রধান দায়িত্ব মূত্রগ্রন্থির (Kidney) উপর। যকৃৎ মূত্রগ্রন্থিকে এই কাজে বিশেষ সহায়তা করে। মূত্রগ্রন্থি যে অম্লরসকে রক্ত হইতে পৃথক করিয়া রাখে, বায়ু সেই

অম্লরসকে মল, মূত্র এবং ঘর্মপথে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বায়ুর ক্রিয়া দুর্বল হইলে এই অম্লবিষ দেহ হইতে বাহির হইতে না পারিয়া অস্থিসন্ধি প্রভৃতি স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয়, দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এই অম্লবিষ যাতায়াত আরম্ভ করে। এই বিষ আবার বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়া শোষিত হইয়া পুনরায় রক্তের সহিত আসিয়া মিশ্রিত হয় এবং রক্তকে অধিকতর অম্লধর্মী করিয়া তোলে। ইহার ফলে রক্তে রোগবীজাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা ও দেহযন্ত্রগুলির পুষ্টিসাধনের ক্ষমতা হ্রাস পায়, ক্রমশঃ জঠরাগ্নি দুর্বল হইয়া পড়ে; যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়ায় গোলযোগ উপস্থিত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, পিত্তদোষ প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়। দেহের এই রুগ্ন অবস্থায় দেহসঞ্চিত বিষকে বায়ু আর দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না। দেহস্থ বায়ু দূষিত হইলে তখন বাতরোগ সৃষ্টি হয়। দাঁতে পাইওরিয়াও বাতরোগের একটি প্রধান কারণ।

তৈল, ঘি প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্য ও মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য এবং ভাত, রুটি প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাদ্য অম্লধর্মী অর্থাৎ এইগুলি জীর্ণ হইয়া দেহে অম্লরস সৃষ্টি করে। এই অম্লরস হইতেই অম্লধর্মী রক্ত উৎপন্ন হয়। আমাদের দেহের পক্ষে অম্লধর্মী খাদ্যের চেয়ে ক্ষারধর্মী খাদ্যের প্রয়োজন বেশি। শাক-সব্জী, ফল-মূল, দুধ, ঘোল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্য প্রয়োজনানুরূপ ধাতব লবণ সরবরাহ করিয়া রক্তকে ক্ষারধর্মী রাখে, দেহের স্বাস্থ্য অটুট রাখে। আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য যদি আমরা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করি, তাহা হইলে রক্তেও ক্রমশঃ অম্লরসের আধিক্য ঘটায়, ইউরিক এসিড সঞ্চিত হয় এবং ইহাই বাতরোগ সৃষ্টি করে। অত্যধিক ধূমপান, মদ্যপান, অত্যধিক মৈথুন প্রভৃতির ফলেও রক্তের রোগবিষ ধ্বংস করিবার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে বাতরোগ সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি রক্তশোধনকারী যন্ত্রগুলি দুর্বল হইয়া যখন রক্তের অম্লবিষ আর ছাঁকিয়া রাখিতে পারে না, প্রতিষেধক বিষের সাহায্যে অম্লবিষ নষ্ট করিতে পারে

না, তখন বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় বাতরোগ প্রবল হইতে আরম্ভ করে। এই রোগবিষ প্রবল হইয়া সময় সময় হৃদ্‌পিণ্ডকেও আক্রমণ করে, রোগীর শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন—"Cause of gout is still a mystery" বাত রোগের কারণ রহস্যাবৃত ; অর্থাৎ আমরা এখনো উহার কারণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

চিকিৎসা—(প্রাতে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অনন্তর প্রাতঃকৃত্যাদির পর অগ্নিসার-ধৌতি নং ১, নং ২, যে কোনো একটি সহজ প্রাণায়াম এবং বারিসার ধৌতি বা বমন ধৌতি।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, মকরাসন, উড্ডীয়ান, হলাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ৬, ৯ এবং শীর্ষাসন বা শশাঙ্গাসন।

রোগী খুব বৃদ্ধ হইলে এবং স্বাস্থ্যাসনগুলি অভ্যাসে অক্ষম হইলে সহজ প্রাণায়ামের এবং ভ্রমণ-প্রাণায়ামের মাত্রা সাধ্যানুযায়ী বাড়াইয়া লইবে। রোগের প্রবলতা হ্রাস বা রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ জলপান এবং জলস্নানবিধি পালন করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—বাতের যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে উপবাস দিবে। একাদশী তিথিতে উপবাস এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে নিশিপালন করিবে। উপবাসের সময় ইচ্ছামত প্রচুর জলপান করিবে। এইরূপ প্রচুর স-অম্বু উপবাসে অক্ষম হইলে বৈকালের দিকে একবারমাত্র কিছু ফল-মূল ও দুগ্ধ খাইবে। প্রত্যহ দীর্ঘ ভ্রমণ বা এমন কোনো দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করিবে, যাহাতে দেহ হইতে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হইয়া যায়। স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় শয়ন, রৌদ্রহীন ঠাণ্ডা জায়গায় অবস্থিতি বাতরোগ বৃদ্ধি করে, সুতরাং উহা যথাসাধ্য বর্জন করিয়া চলিবে। সন্ধিস্থানের বেদনা অসহনীয় হইলে কিছু সময় লবণ মিশ্রিত গরম জলের ধারা সন্ধিস্থানে প্রয়োগ করিবে, উহাতে দ্রুত বেদনা হ্রাস পায়।

সায়াটিকার বেদনা এবং মাজাব্যথার বেদনা গরম সেঁকে সাময়িক ভাবে কথঞ্চিৎ হ্রাস পায়। বেদনার স্থান এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব কম্বল বা ফ্লানেল দিয়া ঢাকিয়া উহার উপর গরম জলের বোতল বা হট ওয়াটার ব্যাগ দ্বারা সেঁক দিবে।

দেহে অম্লধর্মী রক্তের আধিক্যই বাতরোগ সৃষ্টি করে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে—সুতরাং বাতরোগী অম্লধর্মী খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ক্ষারধর্মী খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া লইবে। শতকরা ৭৫/৮০ ভাগ খাদ্য ক্ষারধর্মী হইলে দ্রুত রোগারোগ্যে সহায় হয়। টাটকা শাক-সব্জী, দুধ, ঘোল সর্বপ্রকার টক-মিষ্টি ফল প্রভৃতি বাতরোগে হিতকর পথ্য।

বাধক বেদনা
(Dysmenorroea)

লক্ষণ—ঋতুপ্রকাশের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই অথবা কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তলপেটে অসহ্য বেদনার সৃষ্টি হয় ও ঘন ঘন বমি হইতে থাকে। ঋতুর প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের স্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বেদনা অল্পাধিক পরিমাণে থাকে, পরে উহা কমিয়া যায়। কাহারও কাহারও ঋতুর পূর্বে এই বেদনা তলপেট হইতে পদদ্বয় পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়ে, তারপর প্রচুর পরিমাণে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় ও বেদনা বন্ধ হইয়া যায়। ঋতুস্রাবের গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই বেদনা সৃষ্টি করে, এই জন্যই ইহার নাম বাধক বেদনা।

কারণ—জরায়ু বা ডিম্বকোষ বা ডিম্ববহা নালী অথবা জরায়ুর ঝিল্লী যদি রুগ্ন থাকে, তাহা হইলে জরায়ুসঞ্চিত রক্তের চাপ উহারা ধারণ করিতে পারে না। এই কারণেই ডিম্বকোষ ও জরায়ুপ্রদেশে তখন প্রদাহ সৃষ্টি হয়। রোগিণী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

এই রোগটি নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মাঝে বা গরীব ঘরের মেয়েদের মাঝে প্রায়ই দেখা যায় না। শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ মধ্যবিত্ত ঘরের অশান্ত অতৃপ্ত চিত্ত শিক্ষিতা মেয়েদের এবং ধনীগৃহের আরামপ্রিয় অলস-প্রকৃতির মেয়েদের মাঝেই এই রোগের আধিক্য দেখা যায়। উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, মুক্ত আলো-বাতাস বঞ্চিত গৃহবন্দী জীবন, চিত্তের অতৃপ্তি, অশান্তি, আহারে-বিহারে ত্রুটি প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ; এই সব কারণেই উদর ও বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং ইহার ফলে মাতৃগ্রন্থি ও জরায়ু প্রভৃতি জননযন্ত্রের কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলে এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা—ঋতুরোগের অনুরূপ ('ঋতুরোগ চিকিৎসা-প্রণালী' দ্রষ্টব্য)।

নিয়ম ও পথ্য—বেদনা অত্যধিক হইলে একখানা গামছা বা তোয়ালে গরম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইবে এবং ঐ তোয়ালে তলপেটের উপর রাখিবে। তলপেটের তোয়ালের উপর গরম জলের ব্যাগ বা গরম জলের বোতল রাখিবে। পেট খালি থাকিলে এই সময় লেবুর রস ও নুন সহযোগে দুই গ্লাস ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। এইরূপ গরম জল পান দ্রুত ঋতুস্রাবে ও কোষ্ঠ পরিষ্কারে সহায়তা করে। বেদনা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বেদনা উপশম না হইতেই যদি খুব ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহা হইলে শুধু পাতলা দুধ অথবা দুধের সঙ্গে ফলাদি (কলা ব্যতীত) গ্রহণ করিবে। অন্য কোনো খাদ্য স্পর্শ করিবে না।

বিসূচিকা বা সরল ওলাউঠা

লক্ষণ—"সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ। যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে"॥—অজীর্ণ হেতু বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইলে শরীরে সূচিভেদবৎ একটা যন্ত্রণা শুরু হয়, এই জন্যই বৈদ্যগণ ইহাকে

বিসূচি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উদরাময় রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিলে উহাকে সাধারণতঃ বিসূচিকা বা সরল ওলাউঠা বলে। এই বিসূচিকা রোগে উদরাময়ের মতোই প্রথমে পিত্তযুক্ত দাস্ত হয়; নাভির চারিপাশে বেদনা, বমি, পেটে খিল্ ধরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থাতেও রোগী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে না বা অজ্ঞান হয় না।

[প্রকৃত ওলাউঠা বা কলেরা রোগের সহিত বিসূচিকা রোগের পার্থক্য আছে। কলেরা রোগে বিসূচিকার মতো নাভিদেশে বেদনা থাকে না, পিত্তদাস্তের পরিবর্তে চাল-ধোওয়া জলের মতো দাস্ত হইতে থাকে। পেটে খিল্ ধরার পরিবর্তে হাতে-পায়ে খিল্ ধরে, রোগীর শরীর দ্রুত শীতল হইয়া যায় এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগীর প্রস্রাবও সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। **এই কলেরা রোগের উপর আর যৌগিক চিকিৎসা প্রয়োগ করা চলে না।**]

কারণ—"ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ। মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ"॥—আহার সংযম যাহাদের আছে তাহাদের এই রোগ হয় না; খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, ভোজনলোলুপ তাহারাই এই বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে 'কমা' নামক একপ্রকার রোগবীজাণু খাদ্য ও পানীয়ের সহিত উদরে প্রবেশ করিয়া কলেরার সৃষ্টি করে। এই বিসূচিকা রোগও একশ্রেণীর বহিরাগত রোগবীজাণুর সংক্রমণের ফলে উদ্ভূত হয়। বলা বাহুল্য, আয়ুর্বেদাচার্যেরা রোগবীজাণু সংক্রমণ মতবাদকে প্রাধান্য দেন না। দেহ বিশেষভাবে দোষযুক্ত না হইলে, দেহের রোগ বিষ প্রতিরোধ করার শক্তি নষ্ট না হইলে, কোনো রোগবীজাণুরই সাধ্য নাই দেহে রোগ সৃষ্টি করে। অন্ত্র যখন অপরিষ্কৃত মলে পূর্ণ হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে, এই দেহোৎপন্ন বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে যখন দূষিত ও নিস্তেজ করিয়া দেয়, তখন এইসব রোগবীজাণু দেহে উৎপন্ন

হয় অথবা দেহে সংক্রমিত হইয়া রোগ সৃষ্টি করিবার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং মলনাড়ী অপরিষ্কৃত থাকাই এই রোগের প্রধান কারণ। গৌণ কারণ অসময়ে অতিরিক্ত আহার, অজীর্ণে বা অক্ষুধায় আহার, বাসি বা পচা জিনিস ভোজন প্রভৃতি।

চিকিৎসা—সহজ অগ্নিসার ৫০—১০০ বার ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর। বিসূচিকা হ্রাস পাইলে অজীর্ণ রোগের চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে।

আমাদের আবিষ্কৃত এই সহজ অগ্নিসার ক্রিয়াটি যাহারা মাঝে মাঝে অভ্যাস করিবে তাহাদের কখনো কলেরা রোগ আক্রমণ করিতে পারিবে না। সুতরাং কলেরা টীকার পরিবর্তে এই সহজ অগ্নিসার ক্রিয়াটি সর্বসাধারণের মাঝে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বেরিবেরি (Beriberi)

লক্ষণ—এই রোগটি আধুনিক যুগের রোগ। আয়ুর্বেদের গবেষণার যুগে এই রোগটির বোধ হয় অস্তিত্ব ছিল না, অথবা অস্তিত্ব থাকিলেও তাঁহারা হয়তো এই রোগটিকে স্নায়ুরোগ বা শোথরোগের প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইতেন। স্নায়ুরোগ এবং শোথরোগ একাধারে মিলিত হইলেই এই রোগটির সৃষ্টি হয়।

এই রোগে পায়ের স্নায়ু প্রথমে স্ফীত হইয়া উঠে। এই স্নায়ুগুলির স্ফীতির দরুণ রক্তবাহী শিরার ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি হয়। শোথ রোগের মতোই তখন রক্তের জলীয় অংশ বা দূষিত রস সর্বপ্রথমে পায়ে সঞ্চিত হয়। পায়ে সঞ্চিত এই রসে পা ফুলিয়া উঠে। ক্রমশঃ এই রোগ ঊর্ধ্বাঙ্গে বিস্তৃতিলাভ করে অর্থাৎ অন্যান্য অঙ্গেও ক্রমশঃ রস সঞ্চিত হওয়ায় উহা ফুলিয়া উঠে। রক্তবাহী শিরার কার্যকলাপে বিঘ্ন হওয়ায়, রক্তশোধনকারী যন্ত্রগুলি দুর্বল হওয়ায় বিশুদ্ধ রক্তের অভাবে হৃদ্‌পিণ্ডও অতিক্রিয় হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। রোগীর তখন শ্বাসকষ্ট বা হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হয়।

একশ্রেণীর বেরিবেরি রোগে হাত-পা ফোলে না, কিন্তু হাত-পায়ের স্নায়ুগুলি অবশ হইয়া যায়; গাত্রচর্মের কোনো কোনো অংশে স্পর্শানুভূতি থাকে না—অর্থাৎ কতকটা পক্ষাঘাতের মতো অবস্থা হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করে; রোগীর বিভিন্ন অঙ্গে, বিশেষভাবে অস্থিসংযোগ-স্থানগুলিতে অত্যন্ত প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ইহার নাম **শুষ্ক বেরিবেরি** রোগ।

কারণ—আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রমতে দেহে 'বি-১' ভিটামিনের অভাব হইলে এই রোগ সৃষ্টি হয়। চালের খোসায় অর্থাৎ লাল আবরণে ভিটামিন 'বি-১' থাকে। কলে-ছাঁটা চালে ভিটামিন 'বি-১' থাকে না, উহা নষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের ভাতই প্রধান খাদ্য, তাহারা যদি সর্বদা কলে ছাঁটা চাল খায় এবং অন্যান্য যেসব খাদ্যে ভিটামিন 'বি-১' থাকে তাহা যদি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে এই বেরিবেরি রোগ সৃষ্টি হয়।

সরিষার তেলের সহিত নানারকম বাজে তৈলবীজ মিশ্রিত করার ফলে উহা পাকস্থলীর পক্ষে অনিষ্টকর হয়। উহার বিষক্রিয়াতেও বেরিবেরি রোগ সৃষ্টি হয়—ইহা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেরও মত।

বলা বাহুল্য, বেরিবেরি রোগের উল্লিখিত কারণগুলি আমাদের মতে আনুষঙ্গিক কারণ, মূল কারণ নয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরে যেখানে দুধ, রুটি, ছানা ও ফল প্রভৃতি 'বি-১' ভিটামিনযুক্ত খাদ্যের অভাব নাই, সেখানেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য জোটে না তাহাদের চেয়ে যাহাদের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য সুলভ, তাহাদের মাঝেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়।

দেহে যে কোনো কারণেই বিষ সৃষ্টি হউক না কেন, সেই বিষ নষ্ট করা, সেই বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও দেহের মাঝে আছে। বায়ুগ্রন্থি, অগ্নিগ্রন্থি ও বরুণগ্রন্থিগুলি সর্বদাই দেহশোধন, দেহপুষ্টি ও দেহবৃদ্ধির কাজে ব্যাপৃত থাকে। এই গ্রন্থিগুলির ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না হইলে দেহে কোনো রোগ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে

না। ফুসফুস দুর্বল হইলে শ্বাস-প্রশ্বাস যখন ক্ষীণ হয়, তখন নিঃশ্বাসের সহিত দেহবিষ যথেষ্ট পরিমাণে দেহ হইতে বাহির হইতে পারে না; প্রশ্বাসের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ুর ক্রিয়ার এই ত্রুটির জন্য কোষ্ঠবদ্ধতাদি রোগ সৃষ্টি হওয়ায় দেহে বিষ সঞ্চিত হইতে থাকে। যকৃৎ দুর্বল হইলে জঠরাগ্নি দুর্বল হয়। প্লীহা ও মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়াও তখন দুর্বল হইয়া পড়ে। মূত্রগ্রন্থি দেহসঞ্চিত বিষকে তখন আর মল-মূত্রের সহিত বাহির করিয়া দিতে পারে না। এই জন্যই দেহবিষ পায়ে বা অন্য অঙ্গে সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ পায়। যকৃৎ অসুস্থ হইলে আলোচক পিত্ত দুষ্ট হইয়া কিভাবে চক্ষুকে আক্রমণ করিয়া চক্ষু নষ্ট করে, তাহা আমরা 'দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ ভিটামিন 'বি-১' এর অভাব নয়, ইহার মূল কারণ দেহের প্রধান গ্রন্থিগুলির, বিশেষভাবে ফুসফুস, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতির দোষযুক্ত রুগ্ন অবস্থা।

সুতরাং যে কারণে শোথরোগ, বাতরোগ, অজীর্ণ ও অম্লরোগ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, সেই কারণে বেরিবেরি রোগও সৃষ্টি হয়। দেহসঞ্চিত বিষ এইভাবে যে কোনো রোগ অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে।

ছোটো শিশুদেরও বেরিবেরি রোগ হয়। বহু শিশুর এই বেরিবেরি রোগে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। ছোটোদের এই বেরিবেরি রোগের কারণ মাতার স্বাস্থ্যহীনতা, মাতার দুগ্ধে রোগবিষ সঞ্চার। (এই বেরিবেরি রোগ প্রসঙ্গে 'শোথরোগ' এবং 'অম্লরোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি (সহজ বস্তিক্রিয়া উপলক্ষ্যে জলপানে লবণ ব্যবহার করিবে না)। যোগমুদ্রা, জানুশিরাসন; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৮; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২, সহজ অগ্নিসার, বিপরীতকরণী, পবনমুক্তাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি এবং ২নং জলস্নানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—কোনো ঔষধেই এই রোগ আরোগ্য করিতে পারে না। ঔষধবিষে যকৃতের ক্রিয়া আরও খারাপ হওয়ায় রোগীর রোগযন্ত্রণা, রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহা রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটায়। এই রোগ বৃদ্ধির ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগীর আকস্মিক মৃত্যুও ঘটিতে পারে, সুতরাং এই রোগে ঔষধ সেবন সম্বন্ধে ঔষধপ্রিয় ব্যক্তিরা বিশেষ সতর্ক থাকিবে।

এই রোগের প্রবল অবস্থায় ৩/৪ দিন হইতে ৬/৭ দিন পর্যন্ত অর্ধোপবাস হিতকর। অর্ধোপবাসের সময় সুপক্ক রসাল ফল বা ফলের রস, তরিতরকারির ঝোল, অল্প পরিমাণে এক বলকের পাতলা দুধ, অল্প পরিমাণে ছানার জল পথ্যস্বরূপ গ্রহণ করিবে। পানীয় জলের সহিত দৈনিক দুই চামচ মধু গ্রহণ করিবে। জল একেবারে বেশি পরিমাণে না খাইয়া বারে বারে অল্প পরিমাণে খাইবে। এইভাবে ২৪ ঘণ্টার মাঝে শীতকালে ৫ গ্লাস ও গ্রীষ্মকালে ৭ গ্লাস অর্থাৎ ৩॥ সের জল পান করিবে। রোগের প্রবলতা হ্রাস পাইলে শোথরোগ ও অম্লরোগের নিয়ম-পথ্যাদি যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া চলিবে। দিনে ঢেঁকিছাঁটা চাল এবং রাত্রে ভুষিসমেত আটার রুটি খাইবে। যতদিন অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের ক্রিয়া স্বাভাবিক না হয় অর্থাৎ হজমশক্তি বৃদ্ধি না পায়, ততদিন ঘন ডাল না খাইয়া ডালের জুস খাইবে। বিলাতি বেগুন, পুঁই, পালং শাক, কাঁচকলা, ওলকপি, শালগম, কচু প্রভৃতির তরকারি এবং দুধ, ঘোল, সুরসাল টকফল বেরিবেরি রোগে সুপথ্য। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আমিষ খাদ্য গ্রহণ করিবে না। রন্ধনে যথাসাধ্য কম পরিমাণে তৈল, ঘি ও মসল্লাদি ব্যবহার করিবে। ভেজাল সরিষার তৈল বিষবৎ বর্জন করিবে। কাঁচা লবণ ও ঘি-মাখন খাইবে না।

এই রোগটি গরম দেশের রোগ। গরম দেশে গরমের সময় সূর্যের

তাপে দেহ যথেষ্ট পরিমাণে উত্তপ্ত থাকে সুতরাং দেহের তাপরক্ষার্থে এই সময় অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, এইজন্য গরমের সময় অল্প পরিমাণে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক। এই সময় আমিষ খাদ্য এবং অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন করা বিধেয়। ভরা গ্রীষ্মের সময় অধিক আমিষ খাদ্য গ্রহণ করিলে, অধিক চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে, অক্ষুধায় বা অল্পক্ষুধায় খাদ্য গ্রহণ করিলে দেহে অত্যধিক উত্তাপ সঞ্চিত হইয়া দেহের পরিপাকযন্ত্রগুলিকে অসুস্থ করে এবং পরিণামে এই জাতীয় যন্ত্রণাদায়ক রোগ সৃষ্টি করে—এই কথা স্মরণে রাখিয়া গ্রীষ্মের সময় আহারসংযমে বিশেষ সতর্ক হইবে।

রক্ত প্রয়োজনানুরূপ ক্ষারধর্মী থাকিলে কোনো রোগই সৃষ্টি হইতে পারে না। চর্বিজাতীয় খাদ্য দেহের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে, দেহের তাপ রক্ষা করে; সুতরাং এই শ্রেণীর খাদ্য গ্রহণেরও প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু উহার পরিমাণ অতিরিক্ত হইলেই উহা রক্তকে অম্লধর্মী করে। রক্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত অম্লধর্মী হইলেই দেহে রোগ-বিষ সঞ্চিত হয়, দেহ যে কোনো রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

স্বাস্থ্যরক্ষার এই মূল নীতি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া পথ্যাদি নির্ধারিত করিবে। বেরিবেরি রোগে শতকরা ৮০ ভাগ পথ্য হওয়া উচিত ক্ষারধর্মী; বাকি ২০ ভাগ হওয়া উচিত শর্করাজাতীয়, চর্বিজাতীয় অর্থাৎ অম্লধর্মী পথ্য।

বৃহদন্ত্র প্রদাহ

(কোলাইটিস—Colitis)

বৃহদন্ত্রের পাশ্চাত্য নাম কোলন। এই কোলনের স্ফীতি ও প্রদাহের নামই কোলাইটিস। ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হওয়ার পর বৃহদন্ত্রে যে অপ্রয়োজনীয়

আবর্জনা (মল) সঞ্চিত হয় উহা নিষ্কাশন করাই কোলন বা বৃহদন্ত্রের দায়িত্ব। বৃহদন্ত্র যখন সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতে পারে না তখনই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে সঞ্চিত মল বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষাক্ত মলের সংস্পর্শ হেতু বৃহদন্ত্র স্ফীত হয়, বৃহদন্ত্রে বেদনা ও প্রদাহ সৃষ্টি হয়। রোগী তখন কোমরে ও পিঠে যন্ত্রণা বোধ করে।

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র এই বৃহদন্ত্র প্রদাহ রোগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে—মিউকাস কোলাইটিস (Mucus Colitis), ক্যাটারাল কোলাইটিস (Catarrhal Colitis) এবং আল্‌সারেটিভ কোলাইটিস (Ulcerative Colitis)।

মিউকাস কোলাইটিস—গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের মতো বৃহদন্ত্রের রসক্ষরণ ক্ষমতা আছে। বৃহদন্ত্র ক্ষরিত এই রসের নাম মিউকাস (Mucus)। জলস্রোত যেভাবে আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায় এই মিউকাসও তেমনি বৃহদন্ত্রের মল তরল করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। আয়ুর্বেদের ভাষায় এই তরল মলকে বলে উদরাময় বা অতিসার। এইভাবে বৃহদন্ত্র সঞ্চিত মল হইতে মুক্ত হইলে বৃহদন্ত্রের বেদনা ও যন্ত্রণা দূর হয়। রোগী তখন স্বস্তি বোধ করে।

ক্যাটারাল কোলাইটিস—মলবিষে বৃহদন্ত্রের ঝিল্লীও বিষাক্ত হয়। এই বিষাক্ত ঝিল্লীর অত্যধিক প্রদাহে দেহ জ্বরাক্রান্ত হয়। পেটে এবং তলপেটে শূলবেদনার মতো একটা ভয়ানক বেদনার সৃষ্টি হয়। দেহের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের আবির্ভাব হয়। অসহ্য রোগ যন্ত্রণার ফলে রোগীর চেতনাও সময় সময় লোপ পায় ; রোগী হঠাৎ মুর্ছিত হইয়া পড়ে।

আলসারেটিভ কোলাইটিস—বিষাক্ত মল, বিষাক্ত মিউকাস এবং বিষাক্ত আন্ত্রিক এসিডের সংস্পর্শে বৃহদন্ত্রের ঝিল্লীতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। মলের সহিত তখন ক্ষত নিঃসৃত রক্ত, পুঁজ ও মিউকাস প্রভৃতি নির্গত

হয়। এই রোগীর বিষাক্ত মলে এক বিশেষ ধরণের জীবাণু সৃষ্টি হয়। এইজন্য এই রোগটিকে **ব্যাসিলরী ডিসেন্‌ট্রি** নামেও অভিহিত করা হয়। এই ক্যাটারাল বা আলসারেটিভ কোলাইটিস দীর্ঘস্থায়ী হইলে উহা উদরে ক্যানসার রোগ সৃষ্টি করিয়া রোগীকে মৃত্যুর কবলে প্রেরণ করে।

ক্যাটারাল কোলাইটিস ঔষধে আরোগ্য হয় না। বৃহদন্ত্রে ক্ষত বা ক্যানসার হইলে আধুনিক চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ঐ অংশ কাটিয়া বাদ দেন, কিন্তু এই অস্ত্রোপচারে সাময়িক উপশম ছাড়া রোগের মূলোৎপাটন না হওয়ায় পুনরাক্রমণ প্রায়ই ঘটে এবং রোগীকে অকালমৃত্যুই বরণ করিতে হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, যৌগিক পন্থায় এই রোগ নির্দোষভাবে আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা—প্রাতে সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১ এবং আনুষঙ্গিক আসন-মুদ্রাদি ও প্রাতঃকৃত্যাদি, টাব বাথ বা অর্ধ টাববাথ। টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার ৬০ বার। অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। বমন-ধৌতি বা বারিসার ধৌতি সপ্তাহে ২ দিন।

মধ্যাহ্নে—টাব বাথ। টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার ৬০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩—২ মিনিট।

সন্ধ্যায়—বিপরীতকরণী মুদ্রা বা সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট, জানুশিরাসন—৩ বার, সহজ অগ্নিসার ৬০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, ৩, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শশাঙ্গাসন—২ মিনিট।

রাত্রে—নৈশভোজনের পূর্বে সহজ অগ্নিসার ৬০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার।

নিয়ম ও পথ্য—চা, কফি, ধূমপান ও নস্যাদি গ্রহণ সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। মদ্যপানের অভ্যাস থাকিলে উহাও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। তীব্র ক্ষুধা বোধ না হইলে আহার গ্রহণ করিবে না। সপ্তাহে ১ দিন অথবা

মাসে অন্ততঃ ২ দিন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে। সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত সংহত খাদ্য ত্যাগ করিবে। এই রোগে আদর্শ পথ্যবিধি গ্রহণ অবশ্য পালনীয়। [এই প্রসঙ্গে আমাদের **'খাদ্যনীতি ও শিশুপালন বিধি'**-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]

মুখের ব্রণ বা বয়স ফোঁড়া

কারণ—প্রথম যৌবনে শিবসতীগ্রন্থি (Pituitary), ইন্দ্রগ্রন্থি (Thyroid) বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া ছেলে-মেয়েদের ভাবী পিতৃত্ব অর্জন ও মাতৃত্ব অর্জনের অনুকূলে প্রজাপতিগ্রন্থি অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃগ্রন্থি এবং কাম ও রতিগ্রন্থি প্রভৃতি যৌনগ্রন্থিগুলিকে গড়িয়া তুলিতে থাকে। এই সময় যৌনগ্রন্থিগুলিতে অধিক পরিমাণে রক্ত চলাচল করে। এইজন্যই প্রথম যৌবনে ছেলে-মেয়েরা সামান্য কারণে বা অকারণেও যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। এই উত্তেজনার ফলে ছেলেদের পিতৃগ্রন্থি রক্ত মন্থন করিয়া প্রচুর শুক্র উৎপন্ন করে। এই শুক্রের অধিকাংশই ঊর্ধ্বস্থ শুক্রনালীর সাহায্যে রক্তের সহিত পুনরায় মিশিয়া যায়, বাকি অংশ শুক্রথলিতে জমা থাকে। শুক্রথলিতে সঞ্চিত এই শুক্র সাধারণতঃ স্বপ্নাবলম্বনে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

মেয়েদের দেহের শুক্র ছেলেদের অনুরূপ ঘন নয়, লালার মতো পাতলা। যৌন উত্তেজনার সময় মেয়েদের মাতৃগ্রন্থিও শুক্র উৎপন্ন করে। এই শুক্রের অধিকাংশ পুনরায় রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, কিছু অংশ মাতৃগ্রন্থি সংলগ্ন শুক্রকোষে জমা থাকে। সাধারণতঃ এই সঞ্চিত শুক্র মাসিক ঋতুর সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

যে সমস্ত ছেলে-মেয়েদের পিতৃ-মাতৃগ্রন্থি স্বাভাবিক ও সবল যাহারা ইচ্ছাপূর্বক শুক্রক্ষয় করে না, তাহাদের ঐ সঞ্চিত শুক্র স্বপ্নদোষাবলম্বনে

এবং ঋতুস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যাওয়ার সুযোগ পায় না। এইরূপ ছেলে-মেয়েদের কোষ্ঠবদ্ধতা বা পিত্তদোষ থাকিলে এই পিত্তাদি বিষের সংস্পর্শে ঐ সঞ্চিত শুক্রও বিকৃত হয়। এই বিকৃত শুক্র পুনরায় রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে। শরীরের বিষ ধ্বংসকারী জীবাণুগুলি শরীরের এই বিকৃত শুক্রবিষকে মুখের কোমল ত্বকে ব্রণ সৃষ্টি করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে; এইজন্যই মুখে ব্রণের সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি ও স্নান বা অর্ধস্নান। স্নানের সময় টাবে বসিয়া বা জলে দাঁড়াইয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ বার; অতঃপর সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪; অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২।

মধ্যাহ্নে—অবগাহন স্নান বা টাববাথ ১০/১৫ মিনিট; টাবে বসিয়া ভোরের অনুরূপ ক্রিয়াদি।

সন্ধ্যায়—শয়নপশ্চিমোত্তান, অগ্নিসার ধৌতি, মহাবন্ধ মুদ্রা, শীর্ষাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৪, নং ৭ এবং ভ্রমণ প্রাণায়াম।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি ও জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—এই রোগাক্রান্ত ছেলে-মেয়েদের কামোত্তেজনা স্বভাবতঃই একটু বেশি থাকে। সুতরাং উত্তেজনার কারণ হইতে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখিবে। তরুণ যুবকেরা অনাত্মীয় তরুণীদের মুখের দিকে অপ্রয়োজনে তাকাইবে না, অবিবাহিত তরুণীরাও বিনা প্রয়োজনে তরুণদের মুখের দিকে তাকাইবে না। যে সমস্ত থিয়েটার, বায়স্কোপ, যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস যৌন উত্তেজনার সহায়ক, তাহা বর্জন করিয়া চলিবে। উত্তেজনার সময় কুহুনাড়ী পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিলে সহজেই কামোত্তেজনা প্রশমিত হয়।

সাধারণতঃ ইহা অবিবাহিতদের রোগ, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক বিবাহিত তরুণ-তরুণীদের মাঝেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

ইহার কারণ দাম্পত্য ব্যবহারে ত্রুটি এবং কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ ('কোষ্ঠবদ্ধতা চিকিৎসা প্রণালী' দ্রষ্টব্য)।

এই রোগে আমিষ খাদ্য বর্জন করিয়া শাক-সবজি, ফল ও দুগ্ধাদির পরিমাণ বাড়াইয়া লইবে।

মূত্র পাথুরী

লক্ষণ—মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে যেখানে প্লীহা ও যকৃৎ থাকে তাহার অব্যবহিত নিম্নে দুই পার্শ্বে দুইটি মূত্রগ্রন্থি (Kidney) আছে। এই গ্রন্থিটির আকার আমের বীজের (আঁটির) মতো। সাধারণতঃ এই গ্রন্থিটি ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২॥ ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ইঞ্চি পুরু। যকৃৎকে নানাবিধ গুরুতর কাজে লিপ্ত থাকিতে হয়, এইজন্য দেহের সমুদয় রক্তকে শোধন করার অবসর যকৃৎ পায় না। যকৃতের অসমাপ্ত রক্তশোধন কার্যে এই মূত্রগ্রন্থিই প্রধান সহায়।

আমরা রন্ধনের জন্য গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি, ইহার ফলে গৃহ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া মলিনতা প্রাপ্ত হয়, চুল্লীর নীচে ভষ্মাদি আবর্জনা সঞ্চিত হয়। আমাদের পরিপাকযন্ত্রের মাঝেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। আমাদের জঠরাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত রাখিতে গিয়া প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) সর্বদা দগ্ধ হইয়া দূষিত অঙ্গারাম্ল-বায়ুতে পরিণত হইতেছে। পরিপক্ক খাদ্যরসের মাঝেও এমন অনেক জিনিস সঞ্চিত থাকে যাহা দেহের পক্ষে অনিষ্টকর। দেহের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গারাম্ল দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব ফুসফুসের। অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ রক্তের সহিত যাহাতে মিশিতে না পারে, রক্তকে দূষিত করিতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে রক্ত মিশ্রিত দূষিত পদার্থ বা রোগবিষ রক্ত হইতে সর্বদা ছাঁকিয়া রাখিবার বিশেষ দায়িত্ব এই মূত্রগ্রন্থির।

প্রধান রক্তবহা নাড়ী বা বৃহদ্ধমনী হইতে রক্তপ্রবাহ সোজাসুজি মূত্রগ্রন্থিতে যায়। মূত্রগ্রন্থির কোষগুলির আবরণীতে কেশগুচ্ছের চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম তন্তুগুচ্ছ আছে। মূত্রগ্রন্থির প্রাণকোষের প্রভাবে সক্রিয় হইয়া এই তন্তুগুচ্ছগুলি রক্তের অপ্রয়োজনীয় জলীয় ভাগ, অপ্রয়োজনীয় অম্লরস এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ রক্ত হইতে ছাঁকিয়া রাখে। এই দূষিত পদার্থ মিশ্রিত জল একটি ক্ষুদ্র নলের সাহায্যে মূত্রগ্রন্থির অভ্যন্তরস্থ গর্তে গিয়া সঞ্চিত হয়। এই গর্ত হইতে একটি নল নিম্নস্থ মূত্রাশয়ের সহিত গিয়া যুক্ত হইয়াছে। মূত্রগ্রন্থিতে সঞ্চিত দূষিত জল ঐ নলের সাহায্যে মূত্রাশয়ে গিয়া সঞ্চিত হয়। মূত্রাশয় হইতে উহা আবার মূত্রনালীর ভিতর দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং আমরা যেমন জল শোধনের জন্য জলশোধক যন্ত্র তৈয়ারি করি, দেহপ্রকৃতিও তেমনি দেহগঠনের প্রধান উপাদান রক্ত শোধনের জন্য এই মূত্রগ্রন্থিটি সৃষ্টি করিয়াছেন।

কারণ—হৃদ্‌যন্ত্রের যথোচিত চাপ বর্তমান থাকিলে বৃহদ্ধমনী অশোধিত রক্তকে শোধনের জন্য মূত্রগ্রন্থিতে প্রেরণ করে। শরীরে অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে হৃদ্‌যন্ত্রও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র সঠিকভাবে আর রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হইলে শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের সহিত মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়াও দুর্বল হইয়া পড়ে। শরীরে অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় দীর্ঘদিনের কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ এবং অম্ল প্রভৃতি রোগ হেতু। এইসব দূষিত পদার্থের সঞ্চয়ে মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া দেহে বাতরোগ, শোথরোগ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যাহারা অলসপ্রকৃতি, পরিশ্রমবিমুখ, আহারে অসংযমী এবং যাহারা অত্যধিক আমিষভোজী, তাহারা স্বভাবতঃই উক্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, অম্ল প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। ইহার সঙ্গে আবার যদি দাম্পত্য-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যুক্ত হয়, তাহা হইলে রক্ত নিঃসার হইয়া দেহস্থ ক্ষারজাতীয় পদার্থের (Mineral salt, Phosphorus etc.) আনুপাতিক অভাব ঘটে। এইরূপ অবস্থায় মূত্রগ্রন্থি

সঞ্চিত দূষিত জল আর স্বাভাবিক তরল থাকিতে পারে না, উহাতে তলানি পড়িতে আরম্ভ করে। এইভাবে মূত্রপাথুরী রোগের সূচনা হয়। প্রথমে ঐ তলানি দানা বাঁধিয়া বালুকণার মতো বড় হয় এবং ক্রমশঃ উহা আরও জমাট বাঁধিয়া পাথরের মতো শক্ত হইয়া যায়। এই মূত্রগ্রন্থির পাথরও পিত্তথলির পাথরের মতোই বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁসের ডিমের মতো বড়ো হইতে দেখা যায়।

যে কারণে পিত্তপাথুরী রোগ সৃষ্টি হয়, সেই কারণে মূত্রাশয়ে পাথুরী (Stone in the bladder) রোগও সৃষ্টি হইতে পারে। পিত্তপাথুরীর মতো মূত্রাশয়ের মূত্র-তলানিও অনুরূপভাবে প্রস্তরে পরিণত হইতে পারে।

পিত্তপাথুরী রোগীর মতো মূত্রপাথুরী রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যখনই মূত্রনালীপথে পাথর বাহির হইয়া আসিতে চায় তখনই বেদনা আরম্ভ হয়। এই সময় মূত্রত্যাগে অসমর্থ হইলে কোনো কোনো রোগীর মূত্রের পরিবর্তে রক্তস্রাব হয়। পাথর মূত্রনালীপথ হইতে সরিয়া গেলে বেদনার উপশম হয়।

পিত্তপাথুরীর অস্ত্রোপচারের চেয়ে মূত্রপাথুরীর অস্ত্রোপচার কম বিপজ্জনক ; কিন্তু দেহের পক্ষে এইরূপ অত্যাবশ্যক দুইটি মূত্রগ্রন্থির একটি অস্ত্রোপচারের ফলে অপসারিত হইলে অপরটিও অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে আর পালন করিতে পারে না,—অস্ত্রোপচারে রোগারোগ্যের পর রোগী আর পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় না।

বলা বাহুল্য, নিষ্ঠার সহিত যৌগিক চিকিৎসা অবলম্বন করিলে আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না।

চিকিৎসা—এই রোগের চিকিৎসা এবং নিয়ম-পথ্য পিত্তপাথুরী রোগের অনুরূপ। ('পিত্তপাথুরী রোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

মূর্চ্ছা ও হিষ্টিরিয়া

লক্ষণ—আয়ুর্বেদমতে মূর্চ্ছারোগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সাধারণ মূর্চ্ছা, অপস্মার মূর্চ্ছা এবং সান্নিপাতিক মূর্চ্ছা। সাধারণ মূর্চ্ছার প্রাক্কালে রোগী চক্ষুতে অন্ধকার দেখে, রোগীর কপাল ঘর্মাক্ত হয়, রোগী মাথা ঘুরিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে—আবার অল্প সময়ের মাঝেই রোগী চৈতন্য লাভ করে। যে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতে একটু দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়, উহার নামই অপস্মার মূর্চ্ছা। আধুনিক যুগে যাহাকে আমরা **হিষ্টিরিয়া** বলি উহা এই অপস্মার মূর্চ্ছার অন্তর্গত। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার নামই সন্ন্যাস রোগ। (এই প্রসঙ্গে 'সন্ন্যাস ও মৃগীরোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

কারণ—সাধারণ মূর্চ্ছার প্রধান কারণ—স্নায়বিক দুর্বলতা। অনেকক্ষণ উপবিষ্ট অবস্থার পর হঠাৎ দাঁড়াইলে অনেকেরই মাথা ঘোরে এবং কেহ বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দুর্বল স্নায়ু ও ধমনীগুলি দেহের নূতন পরিস্থিতির উপযোগী ক্রিয়াশীল হইতে একটু সময় লাগে। হঠাৎ পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োজনীয় দ্রুততার সহিত উহারা মস্তিষ্কে রক্ত প্রেরণ করিতে পারে না। এইজন্যই অধিকক্ষণ বসার পর একটু নড়াচড়া না করিয়া হঠাৎ দাঁড়াইলে মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তপ্রবাহের অভাবহেতু রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

যাহারা অন্তরে খুব দয়ালু, খুব পরদুঃখকাতর, তাহাদের দেহ খুব সবল না হইলে, পশু বা মানুষের রক্তপাত, মানবদেহের অস্ত্রোপচার প্রভৃতি দর্শনে অত্যন্ত সহানুভূতির আবেগে তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

আঘাত, বেদনা, বিষের জ্বালা, রোগকষ্ট, মানসিক যন্ত্রণা প্রভৃতি সহ্যেরও একটা সীমা আছে। এই সীমা যখন ছাড়াইয়া যায় তখন প্রাকৃতিক বিধানেই দেহ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কোনো দুঃখ, কোনো যন্ত্রণাই আর দেহধারীকে ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং অসহনীয় শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা হইতে জীবকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যই

দুঃখত্রাতা ভগবানের কল্যাণ বিধানে এই মূর্ছার সৃষ্টি হয়। নিদ্রা যেমন আমাদের প্রাত্যহিক শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করিয়া ভাবনা-চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া পরমশান্তি প্রদান করে, মূর্ছাও তেমনি অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট লাঘবের অমৃতোপম শান্তিবারি। বলা বাহুল্য, সবরকম মূর্ছারোগই উৎপন্ন হয় মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তপ্রবাহের অভাবে। দুর্বল স্নায়ু-ধমনীতে অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া সে মূর্ছিত হইয়া পড়ে, দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রোগী মূর্ছিত হইয়া যায়, ফলে শায়িত হইলে মাধ্যাকর্ষণের বাধা মুক্ত হইয়া দুর্বল ধমনীও তখন অতি সহজেই মস্তিষ্কে রক্ত প্রেরণ করিতে পারে—এইজন্যই সাধারণ মূর্ছা রোগী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চেতনা লাভ করে।

হিষ্টিরিয়া—এই রোগটি মানসিক ব্যাধি। সাধারণতঃ ১৪ হইতে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা বা বিধবা মেয়েদের মাঝেই এই রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব। অবিবাহিত পুরুষদের মাঝে এই রোগের প্রকাশ কদাচিৎ দেখা যায়।

অন্তরের দুঃখ, বেদনা, কামনা মেয়েদের মনকে বিশেষভাবেই অভিভূত করে। মনকে স্ববশে রাখা, প্রশান্ত দ্বন্দ্বনির্মুক্ত রাখা অধিকাংশ মেয়েদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অবশ্য শারীরিক দুর্বলতা বা রুগ্নতাও এইজন্য কতকটা দায়ী। আশ্রয়ের অভাব হইলে লতা যেমন এলাইয়া পড়ে, যৌবনে পুরুষের ভালোবাসা, পুরুষের স্নেহ-প্রীতি-সহানুভূতি প্রভৃতি না পাইলে অধিকাংশ মেয়ের মনই একটা অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; মনের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ইহারা হারাইয়া ফেলে। সামান্য দুঃখাবেগও তখন মূর্ছার কারণ হয়।

মেয়েদের এই মূর্ছা বা হিষ্টিরিয়া রোগের একটু বিশেষত্ব আছে। তাহারা যখন নিঃসঙ্গ থাকে তখন এই রোগ প্রকাশ পায় না। বিধবা

হইলে ভাসুর বা দেবরের সামনে, অবিবাহিতা হইলে যে সব আত্মীয় বা অনাত্মীয় পুরুষদের কাছ হইতে তাহারা স্নেহ-প্রীতি ও সহানুভূতির আশা রাখে তাহাদের উপস্থিতিতেই সাধারণতঃ এই রোগ প্রকাশ পায়। রোগিণীর অভিমানাহত ক্ষুব্ধ মন এই সব পুরুষের সান্নিধ্য হেতু আরও অধিকতর ক্ষুব্ধ হয় এবং রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এই অচৈতন্য অবস্থাতেও অন্তরে জ্ঞান থাকে। সুতরাং অজ্ঞান অবস্থাতেও দেহকে আঘাত হইতে, আপদ-বিপদ হইতে ইহারা বাঁচাইয়া চলে।

মৃগী ও সন্ন্যাস রোগের সহিত হিষ্টিরিয়া রোগের পার্থক্যও এইখানে। মৃগী ও সন্ন্যাস রোগে রোগী সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। জলাদি বিপজ্জনক স্থানে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে রোগীর প্রাণনাশ ঘটে। হিষ্টিরিয়া রোগের এইসব আপদ-বিপদের ভয় নাই। অস্থানে বা বিপজ্জনক স্থানে তাহারা মূর্ছিত হয় না, যাহাদের কাছে তাহারা সহানুভূতির প্রত্যাশা রাখে তাহাদের সন্নিকটেই তাহারা মূর্ছিত হয়।

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড সাহেবের মতে অবদমিত এবং অতৃপ্ত কামই এই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ। ফ্রয়েড সাহেবের এই যুক্তিকে আমরা পুরাপুরি সত্য বলিয়া মনে করি না ; আংশিক সত্য বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই অবদমিত এবং অতৃপ্ত কামক্ষুধায় অভিভূত হইয়া এই রোগের অধীন হয়। অধিকাংশ রোগীই যথেষ্ট স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতির অভাবে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পোষা কুকুর স্বভাবতঃ যেমন প্রভুর বশীভূত হয়, চরিত্রবান পুরুষের শুচি-শুদ্ধ স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শ পাইলে মেয়েরাও তেমনি অতি সহজেই কামকে স্ববশে রাখিতে পারে, দেহ-মনে তাহারা বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে। স্বামীর দ্বারা দৈহিক তৃপ্ত বিবাহিতা তরুণী মেয়েদের মাঝেও যথেষ্ট সংখ্যক হিষ্টিরিয়া রোগী আছে। খোঁজ নিলে জানা যাইবে—ইহারা সকলেই মানসিক দুঃখে পীড়িতা। সুতরাং দৈহিক দোষযুক্ত অবস্থার সহিত

মানসিক দুঃখ মিলিত হইয়া এই মূর্ছা বা হিষ্টিরিয়া রোগ সৃষ্টি করে—আয়ুর্বেদাচার্যদের এই মতকেই আমরা এই রোগের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া মনে করি। প্রায়ই দেখা যায়—মূর্ছা রোগীর ঋতুর দোষ আছে, শারীরিক দৌর্বল্য আছে, পরিপাক যন্ত্রের ত্রুটি আছে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর স্নানবিধি নং ১ বা নং ২; অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, ভ্রমণ প্রাণায়াম বা সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

(মধ্যাহ্নে)—স্নানবিধি নং ১ বা নং ২।

(বৈকালে)—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, স্নানবিধি নং ৩।

(সন্ধ্যায়)— সর্বাঙ্গাসন ২ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, নং ২—৪ বার, জানুশিরাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শীর্ষাসন বা শশাঙ্গাসন ৩ মিনিট।

নিয়ম ও পথ্য—রোগী ঘরে মূৰ্ছিত হইলে ঘরের দরজা-জানালা তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। রোগীর হাত-পায়ে খিঁচুনী থাকিলে হাত-পা চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। রোগীর মস্তকে বাতাস এবং শীতল জলধারা প্রয়োগ করিবে। একটু নেকড়া ভিজাইয়া উহা দ্বারা চক্ষু-কর্ণের বহিরাংশ এবং স্কন্ধ সিক্ত করিবে। এই অবস্থায় সাধারণ মূর্ছা ভঙ্গ হইবে। মূর্ছা দীর্ঘস্থায়ী হইলে রোগীকে খাটের উপর শোওয়াইয়া দিবে, রোগীর পায়ের দিকের খাটের পায়া আধহাত বা একহাত উঁচু করিয়া দিবে। এইভাবে রোগীকে ২/১ মিনিট রাখিলে মাথায় রক্ত পৌঁছিয়া রোগীর মূর্ছা ভঙ্গ হইবে। নাক টিপিয়া ধরা কিংবা মুখের উপর সজোরে বরফ জলের ঝাপটা দেওয়া, ২/১ বালতি ঠাণ্ডা জল গায়ের উপর ঢালিয়া দেওয়া—এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে হিষ্টিরিয়ার ফিট সহজেই বন্ধ হয়। অন্যান্য নিয়ম-পথ্য 'রক্তহীনতা' রোগের অনুরূপ।

মেদরোগ বা স্থূলতা

লক্ষণ—শরীরের পক্ষে মেদ অর্থাৎ চর্বি অত্যাবশ্যক। চর্বি আমাদের শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে। চর্বি আছে বলিয়াই দেহ 'তুলতুলে' অর্থাৎ তুলার মতো কোমল। আমাদের পদতলে যদি চর্বি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের চলাফেরা কষ্টসাধ্য হইত। আমাদের নিতম্বে যদি চর্বি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে পিঁড়ি বা চেয়ারে উপবেশন কষ্টসাধ্য হইত। দেহের মাংসপেশীতে, অস্থির সন্ধিস্থান প্রভৃতিতে চর্বি থাকে বলিয়াই ঐ সব যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় থাকিয়া আপন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে। আমাদের যদি খাদ্যাভাব ঘটে, অথবা আমরা স্বেচ্ছায় উপবাস করি, তখন এই সঞ্চিত চর্বি দগ্ধ হইয়াই আমাদের দেহরক্ষা করে, জঠরাগ্নির ক্ষুধা তৃপ্ত রাখে। উল্লিখিত কারণগুলির জন্য এবং খাদ্যাভাবজনিত দুর্ঘটনা হইতে দেহকে কিছুদিন রক্ষা করিবার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদের দেহে পরিমিত চর্বি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয় যখন স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তখনই দেহ মেদবহুল হইয়া উঠে।

পুরুষের চেয়ে নারীদেহে স্বাভাবিক নিয়মেই চর্বি কিছু বেশি থাকে। এইজন্য পুরুষের চেয়ে মেয়েদের দেহ অধিকতর নরম, অধিকতর সুকুমার। উদরে সন্তান পোষণ, সন্তানদেহ গঠন করিতে হইবে বলিয়াই নারীদেহে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চয়ের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। নারীদেহ চর্বিশূন্য হইলে সেই নারীর ক্ষীণকায় সন্তানদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে না, উহারা চির রুগ্ন দেহ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। যৌবনেও স্বাস্থ্যলাভ ইহাদের পক্ষে কঠিন হয়।

প্রয়োজনীয় চর্বি যেমন দেহযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সহায়ক, তেমনি আবার অতিরিক্ত চর্বি দেহযন্ত্র পরিচালনায় বিশেষভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চয়ের জন্য হৃদ্‌যন্ত্রের স্নায়ু-পেশী, ফুসফুসের স্নায়ু-পেশী সঠিকভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে না—এইজন্য মেদবহুল

দেহধারীরা সহজেই রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। স্বাভাবিকভাবে তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জন করিতে পারে না। ইহাদের দেহের রক্তধারাও স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না।

কারণ—'অব্যায়াম দিবাস্বপ্ন-শ্লেষ্মলাহারসেবিনঃ, মধুরোঽন্নরসঃ প্রায়ঃ স্নেহান্মেদো বিবর্ধতে। মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যে ন ধাতবঃ, মেদস্তু চীয়তে তস্মাদশক্তঃ সর্ব্বকর্মসু। মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ, চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারাং শোষয়ত্যপি, তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারমভিকাঙ্খতি।'

—শারীরিক পরিশ্রমবিমুখীনতা, দিবা-নিদ্রা, অতিরিক্ত মাছ-মাংসাদি শ্লেষ্মাজনক খাদ্য গ্রহণ, অতিরিক্ত গব্যাদি মধুরস্বাদবিশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ দ্বারা দেহে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চিত হইয়া দেহ মেদরোগাক্রান্ত হয়। মেদবৃদ্ধির ফলে ধমনী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, বায়ু-রস-রক্তাদির প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। এইজন্যই দেহের অন্য ধাতু যথোচিতভাবে পুষ্ট হইতে পারে না। শুধু মেদধাতু ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া মানুষকে কাজের অযোগ্য করিয়া তোলে। দেহে মেদ সঞ্চয়ের ফলে উদরের বায়ু সঞ্চরণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই ক্ষোভিত বায়ুর প্রভাবে জঠরাগ্নিও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এইজন্য মেদরোগীরা বেশ একটু ভোজনবিলাসী হয়। ইহারা প্রথম যৌবনে বেশ খাইতেও পারে এবং সে খাওয়া হজমও করিতে পারে। মাছ-মাংস, মিষ্টান্ন-মিঠাই প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর প্রতি ইহাদের আসক্তিও বেশ প্রবল থাকে। কিন্তু জঠরাগ্নির অস্বাভাবিক অতিক্রিয়তার ফলে ইহাদের দেহের অন্যান্য গ্রন্থির ক্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে মধ্য বয়সে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতেই ইহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। অটুট স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ, পূর্ণ আয়ু উপভোগ ইহাদের ভাগ্যে আর ঘটে না।

মেদরোগ দুই শ্রেণীর—বংশগত এবং অর্জিত। মেদবহুল পিতা-মাতার সন্তান স্বভাবতঃই স্থূলকায় হয়। স্থূলকায় নর-নারীর মাঝে প্রায় শতকরা

৪০ জন এইরূপ বংশানুক্রমে স্থূলদেহ লাভ করে। পিতার বা মাতার বা উভয়ের গ্রন্থিক্রিয়ার ত্রুটি ইহারা উত্তরাধিকারসূত্রে পায় বলিয়াই ইহাদের দেহ স্থূলকায় হয়। বাকী শতকরা ৬০ জন অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের জন্য, স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের জন্য এই রোগ নিজেই ডাকিয়া আনে, নিজের দোষেই এই রোগে কষ্ট পায়।

যাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের তুলনায় বুদ্ধিজীবীদের অর্থাৎ মস্তিষ্ক-পরিচালকদের কম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। অথচ দেশের অর্থ-সম্পদ সুচতুর বুদ্ধিজীবিদের দ্বারাই অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ; প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদের অধিকারী হওয়ায় প্রত্যহ মাছ, মাংস, দুধ, ঘি প্রভৃতি সুখাদ্য গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা ইহারাই লাভ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহারও ঘটে। সুষম পথ্যের অভাবে এবং যথোচিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে জঠরাগ্নি মন্দীভূত হইয়া মধ্য বয়স হইতেই ইহাদের দেহ মেদবহুল হইয়া উঠিতে থাকে।

সুতরাং এক কথায় বলা যায়—চর্বিজাতীয় খাদ্যের উপযুক্ত দহন ক্রিয়ার অভাবে এই মেদ রোগ সৃষ্টি হয় (এই প্রসঙ্গে 'রক্তচাপবৃদ্ধি' রোগ দ্রষ্টব্য)।

শিব-সতী গ্রন্থি (Pituitary), ইন্দ্রগ্রন্থি (Thyroid) প্রভৃতি দেহের প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলির অন্তঃস্রাবী রস প্লীহা, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি অগ্নিগ্রন্থি অর্থাৎ জঠরাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত রাখিতে সাহায্য করে। আহার-বিহারের দোষে জঠরাগ্নি মন্দীভূত হইয়া পড়িলে, অগ্নিগ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া পড়িলে ঐ সব গ্রন্থি অগ্নিগ্রন্থির সহায়তা করিতে গিয়া নিজেরাও অতিক্রিয় হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। দেহের এই প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়; দেহ তখন সর্ববিধ রোগাক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে। এইজন্য মেদরোগীরা স্বাস্থ্য-সুখ ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে—"Every pound of excess fat may

mean a month less of life"—প্রত্যেক পাউণ্ড অতিরিক্ত চর্বি একমাস আয়ু হরণ করে।

চিকিৎসা—(ভোরে)—সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, নং ২—৪ বার; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—মকরাসন ৪ বার, যোগমুদ্রা ৮ বার, জানুশিরাসন ৪ বার, পশ্চিমোত্তান ৪ বার, সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট, শীর্ষাসন বা শশাঙ্গাসন ৩ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি।

নিয়ম ও পথ্য—মেদরোগীদের আহার সংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। ভোরে ক্ষুধার জোর থাকিলে নিজের রুচিমত অল্প কিছু কাঁচা বা পাকা ফল খাইবে। ফল খাওয়ার পূর্বে এক চামচ মধুসহ আধ গ্লাস বা এক গ্লাস জল খাইবে। ফল দুষ্প্রাপ্য হইলে এক বলকের পাতলা দুধ এক কাপ খাইবে—দুধে চিনি দিবে না। ভোরে অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। চা পানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে না পারিলে ভোরে একবার মাত্র চা খাইবে, অন্য সময় চা পান নিষিদ্ধ।

দ্বিপ্রহরে অল্প ভাতের সঙ্গে শাক-সব্জী যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিবে। ডাল ও মাছ খুব অল্প পরিমাণে খাইবে। **বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে হইলে মাছ-মাংস ত্যাগ করিবে**। পাতে কখনো ঘি-মাখন খাইবে না, রন্ধনে অধিক তৈল-ঘি ও মশলা ব্যবহার করিবে না; সম্ভবপর হইলে দ্বিপ্রহরে ভোজনের সময় এক পোয়া ঘোল খাইবে। বৈকালে আর কোনো কিছুই খাইবে না। ক্ষুধার জোর থাকিলে আনারস, ন্যাশপাতি বা অন্য যে কোনো টক ফল খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। রাত্রে ক্ষুধা অনুযায়ী শাক-সব্জীসহ ২/১ খানা রুটি, এক কাপ পাতলা দুধ এবং সম্ভবপর হইলে কিছু কিসমিস বা নারিকেল প্রভৃতি শুষ্ক ফল খাইবে। বলা বাহুল্য, কিসমিস প্রভৃতি শুষ্ক ফল খাওয়ার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পূর্বে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

মেদরোগের মূলে অজীর্ণ রোগ—সুতরাং অজীর্ণ রোগের নিয়ম-পথ্যাদি যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া চলিবে। একাদশী তিথিতে উপবাস এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় নিশিপালন এই রোগারোগ্যে বিশেষ হিতকারী। মেদরোগীর বহুমূত্র রোগ অথবা রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে 'বহুমূত্র রোগ', 'রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ' দ্রষ্টব্য।

যক্ষ্মারোগ

লক্ষণ—সকালে ও বৈকালে গলা সুড়সুড় করা বা একটু শুষ্ক কাশি এই রোগের আদি লক্ষণ। যে কাশির সঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যায় সেই কাশি অপকারী নয়, উপকারী। শুষ্ক কাশিই দেহের ভাবী বিপদাশঙ্কার সঙ্কেতস্বরূপ। শুষ্ক কাশিই জানাইয়া দেয়—দেহে যক্ষ্মারোগবীজাণুর বংশবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে; যক্ষ্মারোগবীজাণুগুলি ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণের উদ্যোগ করিলে ফুস্‌ফুসের মাঝে আক্ষেপ সৃষ্টি করে। আমাদের গায়ে পিঁপড়া উঠিলে আমরা যেমন ঐগুলিকে দূরে নিক্ষেপের জন্য গায়ে 'ঝাড়া' দিই, ফুস্‌ফুস্‌ও তেমনি ঐ যক্ষ্মারোগবীজাণুগুলিকে দূরে নিক্ষেপের জন্য স্বীয় অঙ্গকে ঝাড়া দেয়। এই 'ঝাড়া দেওয়া' বা আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশই শুষ্ক কাশি।

অকারণে হাত-পা বা মাথা সময় সময় অল্প ঘর্মাক্ত হওয়া বা অতিরিক্ত ঘর্মে সমস্ত শরীর সিক্ত হওয়া যক্ষ্মা রোগাক্রমণের আদি লক্ষণ। এইরূপ বিনা কারণে ঘাম হওয়ার কারণ—ফুস্‌ফুসের দুর্বলতা হেতু দেহে কার্বনিক এসিড গ্যাস সঞ্চিত হওয়া। দেহের পক্ষে ক্ষতিকর এই কার্বনিক এসিড গ্যাস এবং যক্ষ্মাবীজাণুর বিষাক্ত লালা দেহপ্রকৃতি দেহ হইতে বাহির করিয়া দেহকে রোগমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

যক্ষ্মারোগবীজাণু ফুস্‌ফুসের প্রতিরোধশক্তিকে পরাভূত করিয়া ফুস্‌ফুস্‌কে যখন আক্রমণ করে, তখন শুষ্ক কাশির সঙ্গেও মাঝে মাঝে

সামান্য শ্লেষ্মা বাহির হয়। অতঃপর রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মার সহিত রক্তও বাহির হইতে থাকে। রক্ত যখন বাহির হয়, তখন বুঝিতে হইবে— ফুস্‌ফুসের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া যক্ষ্মাবীজাণু দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের মাঝে গর্ত করিয়া উহারা বাসা বাঁধিয়াছে। রোগের এই অবস্থায় রোগী বুকে বেদনা অনুভব করে (এই বেদনার কারণ প্লুরিসি রোগ বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে, 'প্লুরিসি রোগ বিবরণ' দ্রষ্টব্য)। যক্ষ্মাবীজাণুর বিষাক্ত বিষ যে সময় হইতে রক্তের সহিত মিশিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে প্রত্যহই বৈকালে শরীরের তাপ একটু বাড়ে। শরীরের তাপ ৯৮° বা ৯৯° হইতে ১০০° ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে। রোগীর দেহের ওজন হ্রাস পায়, রোগীর শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে। রোগের প্রবল অবস্থায় কাশি, রক্তবমি, জ্বরের প্রকোপ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, রোগী যখন তখন বমি করে। এই সময় নিউমোনিয়া, ডায়েরিয়া, যকৃৎ-যন্ত্রণা প্রভৃতি নানা উপসর্গ আসিয়া রোগীকে গ্রাস করে, রোগীর দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অস্থি-চর্মসার হইতে থাকে। এই রোগহেতু ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত হইলে জিহ্বার রং হয় বেগুনী বর্ণ।

যক্ষ্মারোগবীজাণু কেবল ফুসফুসকেই আক্রমণ করে তাহা নয় অন্ত্র, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা বা দেহের যে কোনো সন্ধিস্থান এই রোগবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। কোমরের অস্থি যক্ষ্মাবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলে রোগীর হাঁটিতে কষ্ট হয়, হাঁটিবার সময় হাঁটুতে টান পড়ে এইজন্য রোগী একটু খোঁড়াইয়া হাঁটে। অল্প পরিশ্রমেই রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করে। মেরুদণ্ডের অস্থি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইলে বুকে সময় সময় যন্ত্রণা অনুভব হয়। ক্ষয় রোগাক্রান্ত স্থানের সম্মুখভাগে একটি স্ফোটকের মতো হয় এবং ভিতরে নালী হইয়া ফাটিয়া যায়। যক্ষ্মারোগবীজাণুর আক্রমণে মেরুদণ্ডের যে পরিমাণ অস্থি ধ্বংস হয় সেই অনুপাতে রোগীও কুব্জ হইতে থাকে। নাভির চারিপাশে বেদনা, মল অপরিষ্কার এবং দারুণ দুর্গন্ধযুক্ত, যখন-তখন ভেদ অর্থাৎ তরল দাস্ত অথবা আমসংযুক্ত দাস্ত, পেটের মাঝে যন্ত্রণাবোধ প্রভৃতি অন্ত্রের যক্ষ্মার লক্ষণ।

কারণ—"**বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ। ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ**"—বেগরোধ, ক্ষয়, হঠকারিতা, বিরুদ্ধ-ভোজন—এই চারিটিই যক্ষ্মারোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। এইসব কারণের ফলে দেহে ত্রিদোষ উৎপন্ন হইলে যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি হয়।

বেগরোধাৎ—দেহের রসধাতুর অর্থাৎ দেহস্থ পঞ্চশ্লেষ্মা ও পঞ্চপিত্তের এবং দেহস্থ পঞ্চবায়ুর ক্রিয়ায় যখন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, উহাদের স্বাভাবিক বেগ, গতি বা ক্রিয়া যখন রুদ্ধ হয়, তখনই দেহ যক্ষ্মারোগোৎপত্তির অনুকূল হইয়া উঠে। প্রকুপিত বায়ু দেহের রসকে শুষ্ক করে—এইজন্য যক্ষ্মারোগীর দেহ ক্রমশঃ নীরস হইতে থাকে।

ক্ষয়াচ্চৈব—শুক্রই রক্তের সার পদার্থ। এই শুক্র অধিক পরিমাণে ক্ষয় করিলে দেহের সমুদয় যন্ত্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে—ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অসংযমী হইয়া, অতিরিক্ত কামপরায়ণ হইয়া যাহারা অধিকতর শুক্র ক্ষয় করে, সেইসব নষ্টশুক্র নর-নারী সহজেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়।

সাহসাৎ—যাহার যতখানি শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে সে যদি সেই অনুপাতে পরিশ্রম না করিয়া হঠকারিতাপূর্বক অত্যধিক পরিশ্রম করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তাহার দেহও এই রোগাক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে।

পরিশ্রম অনুযায়ী শারীরিক ক্ষয় নিবারণের জন্য যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন, হঠকারিতাপূর্বক অথবা দারিদ্রতাহেতু যাহারা সেইরূপ পথ্যবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে তাহাদের দেহও এই রোগাক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে।

বিষমাশনাৎ—বিরুদ্ধ ভোজন অর্থাৎ মাছ-মাংস খাওয়ার অব্যবহিত পরই দুগ্ধাদি ভোজন অথবা সুষম পথ্যের অভাব অর্থাৎ যে খাদ্য যে পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত তাহা না করা, কিংবা রুক্ষ অত্যল্প বা অপরিমিত ভোজন প্রভৃতি এই রোগ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে।

আহার্য যদি সর্বদা রুক্ষ হয়, দুগ্ধাদি স্নেহপদার্থ যদি আহার্যরূপে গ্রহণ করা না হয়, সর্বদা যদি প্রয়োজনের তুলনায় আহার অল্প হয়, অপুষ্টিকর হয়, অথবা অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ হেতু স্থায়ীভাবে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার প্রভৃতি সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও রোগীর দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হওয়ার ফলে এই রোগ হইতে পারে।

জীবনে যাহার কোনো আশা ও আনন্দ নাই, পারিবারিক সুখ-শান্তি নাই, জীবনের উপর যাহাদের বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সমস্ত মনমরা মানুষের দেহ জীবনীশক্তিহীন হইয়া এই রোগে আক্রান্ত হয়।

ক্ষত বা ব্রণাদির অতিরিক্ত রক্তস্রাব হেতু শরীর অতিরিক্ত দুর্বল হইলেও এই রোগ দ্বারা দেহ আক্রান্ত হইতে পারে।

বায়ুই আমাদের প্রধান খাদ্য। বায়ু সমুদ্রের মাঝেই আমরা সর্বদা ডুবিয়া থাকি। বায়ু আহার না করিয়া এক মুহূর্ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। এই বায়ু যদি ধূম ও ধূলি দ্বারা দূষিত হয়, অথবা পচা জিনিষের সংস্পর্শে গিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অধিকাংশ সময় এইরূপ দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্তবায়ু সেবন করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে ফুসফুস দুর্বল হইয়া, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

আয়ুর্বেদের ভাষায় ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকৃতিই এই রোগের মূল কারণ। দেহে ত্রিদোষ সৃষ্টি না হইলে কোনো মারাত্মক রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। বায়ু বিকৃতির জন্য রোগীর স্বরভঙ্গ হয়, দেহের রসধাতু শুষ্ক হইয়া বক্ষদেশে বা রোগাক্রান্ত স্থানে শূলবৎ বেদনার সৃষ্টি করে; পিত্ত-বিকৃতির ফলে জ্বর, দাহ, অতিসার, রক্তবমন প্রভৃতি আরম্ভ হয় ; কফ-বিকৃতির ফলে সর্বদা মাথা ভার, আহারে অরুচি এবং কাশি প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

মলায়ত্তং বলং পুংসাং—মল যদি আয়ত্তে থাকে, মলবেগ যদি স্বাভাবিক থাকে অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠতারল্য না থাকে, তাহা হইলে এই রোগ প্রতিরোধ উপযোগী শক্তিও দেহে অটুট থাকে।

শুক্রায়ত্তং চ জীবিতম্—দেহের সার শুক্রকে যাহারা রক্ষা করিয়া চলে, এই প্রাণঘাতী রোগ তাহাদের দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না।

যক্ষ্মারোগবীজাণু কেবল ফুসফুসকেই আক্রমণ করে তাহা নয়—অন্ত্র, পাকস্থলী, হৃদ্‌পিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা বা দেহের যে কোনো সন্ধিস্থান এই রোগ বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। বন্য পক্ষীদের মাঝে, অরণ্য বা পর্বতবাসী অসভ্য মানবসমাজে এই রোগের প্রাদুর্ভাব নাই। গোরু, ঘোড়া, মোরগ, কবুতর, বরাহ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মাঝে এই রোগ সৃষ্টি হয়; ছাগল, ভেড়া, কুকুর ও বিড়ালের মাঝে এই রোগ প্রায়ই দেখা যায় না। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মোরগ, হাঁস, কবুতর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মাংস ভক্ষণে মানুষের মাঝেও এই রোগবীজ সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরাও এই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ গাভীর দুগ্ধপানে সব শিশুই রোগাক্রান্ত হইবে না। যে সব শিশুর জীবনীশক্তি কম, যাহাদের হজম শক্তির ত্রুটি আছে, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠতারল্য আছে, যাহাদের দেহ দুর্বল ও দোষযুক্ত, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পানে তাহাদের দেহই শুধু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে পারে। অন্য শিশুরা এই দুগ্ধপান সত্ত্বেও স্বীয় জীবনীশক্তির জোরেই রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবে।

শিশুদের বিষয়ে যাহা বলা হইল, বয়স্কদের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। জীবনীশক্তির জোর থাকিলে, দেহ ত্রিদোষমুক্ত থাকিলে মানুষের দেহে রোগবীজাণু প্রবেশ করিয়া দেহকে রোগাক্রান্ত করিতে পারে না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন শতকরা ৭৫টি সুস্থ-সবল যুবক-যুবতীর দেহে যক্ষ্মারোগের বীজাণু রহিয়াছে, অথচ উহা তাহাদের কোনো অনিষ্টসাধন করিতে পারে না।

আমরা মনে করি এইসব প্রাণঘাতী রোগ বুঝি হঠাৎ সংক্রামিত হইয়া রোগীর দেহ আক্রমণ করে। আমাদের এই ধারণা ভুল। ২/৪ বৎসর পূর্ব হইতে রোগের সূচনা হয়। যোগশাস্ত্রের ভাষায় বায়ু, অগ্নি ও বরুণগ্রন্থির দুর্বলতাই এই রোগের মূল কারণ। অগ্নিগ্রন্থি অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়, প্লীহা ও

যকৃতের ক্রিয়া, সহজ ভাষায় জঠরাগ্নির ক্রিয়া যদি জোরালো থাকে, তাহা হইলে বায়ুগ্রন্থি অর্থাৎ ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি দুর্বল হয় না। ফুসফুস দুর্বল না হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ক্ষীণ না হইলে ফুস্‌ফুস্‌কে যক্ষ্মাবীজাণু আক্রমণ করিতে পারে না। ফুস্‌ফুস্‌ দুর্বল হইলে বুঝিতে হইবে—অগ্নিগ্রন্থি অর্থাৎ জঠরাগ্নি পূর্বেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বায়ুগ্রন্থি, অগ্নিগ্রন্থি ও বরুণগ্রন্থির কার্যকারিতা এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে একের দুর্বলতায় অপরেও দুর্বল হইয়া পড়ে। একের সবলতায় অপরেও সবল থাকে। সুতরাং এই ত্রিদেবতার ক্রিয়া যখন দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন রোগীর দেহ স্বভাবতঃই রোগবীজাণু সৃষ্টির অনুকূল হইয়া উঠে। সুতরাং এই রোগবীজাণু কেবল সংক্রামিত হয় না, রোগীর দেহে এই রোগবীজাণু সৃষ্টিও হয়। দুর্বল মূত্রগ্রন্থিপ্রদেশ এই রোগবীজাণু সৃষ্টির একটি নিরাপদ স্থান।

চিকিৎসা—ভোরে ২নং সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী লেবুর রস ও নুন সহ তিনপোয়া বা একসের ঈষৎ গরম জল পান করিবে। জলপানের অব্যবহিত পর—বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট, যোগমুদ্রা ৬ বার, পবনমুক্তাসন ৩ বার, পদহস্তাসন ৪ বার (শরীর খুব দুর্বল থাকিলে পদহস্তাসন বাদ দিবে এবং বিপরীতকরণী মুদ্রার পরিবর্তে সহজ বিপরীতকরণী অভ্যাস করিবে)। অতঃপর দন্তধাবন ও প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং ১০ বার, ভ্রমণ প্রাণায়াম ১০ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭।

দ্বিপ্রহরে—(আতপস্নান গ্রহণের সময়)—সহজ প্রাণায়াম নং ৩—২ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম নং ৯—৪ মিনিট।

সান্ধ্যজ্বর ও রাত্রিঘর্ম বন্ধ হইলে সন্ধ্যাবেলাও যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে এবং সপ্তাহে ২ দিন বমনধৌতি অভ্যাস করিবে।

সন্ধ্যায়—ভ্রমণ-প্রাণায়াম ১০ মিনিট, সর্বাঙ্গাসন ২ মিনিট, যোগমুদ্রা ৬ বার, পশ্চিমোত্তান ৩ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ২—৪ বার, ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি ও জলপানবিধি সাধ্যমত

অনুসরণ করিবে। ভ্রমণ-প্রাণায়ামের ও সহজ প্রাণায়ামের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিবে।

যৌগিক চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসা এই রোগারোগ্যের উপযোগী নয়। তবুও রোগ হইলে তাহার প্রতিকারার্থে কোনোরূপ চিকিৎসা অবলম্বন না করিলে রোগীর মন, রোগীর অভিভাবকের মন স্বস্তি পায় না। এইজন্য রোগের নামমাত্র চিকিৎসাপদ্ধতি ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও আছে, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও আছে। রোগীর জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা রোগীর দেহে ক্যালসিয়াম ইনজেকশন করেন বা যক্ষ্মারোগবীজাণু ধ্বংসের জন্য স্বর্ণঘটিত লবণ ইনজেকশন করেন। বলা বাহুল্য, এইসব চিকিৎসায় কোনো সুফল পাওয়া যায় না। এইসব ঔষধস্থিত ক্যালসিয়াম এবং লবণ রোগীর দেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ফলে উহা মল-মূত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসকেরা স্ট্রেপ্টোমাইসিন নামে একটি ভয়াবহ বিষতুল্য ঔষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করেন। বহু রোগী এই চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে। এইসব ভয়াবহ ঔষধবিষে রোগ বীজাণু সাময়িক ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রক্তের প্রধান উপাদান লাল-রক্তাণু ও দেহরক্ষী শ্বেত রক্তাণুগুলিও বিনষ্ট হয় ; ফলে দেহ রক্তশূন্য হইয়া রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে।

দেহাভ্যন্তরের যেসব স্থানে অস্ত্রোপচার চলে, সেই সব স্থান যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইলে অস্ত্রোপচার দ্বারা ঐ অঙ্গ বাদ দিয়া যক্ষ্মারোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

বলা বাহুল্য, যক্ষ্মারোগ সর্বদৈহিক ব্যাধি। দেহের একস্থানে অস্ত্রোপচার পূর্বক যক্ষ্মারোগবীজাণু দূরীভূত করিলেও দেহের অন্যস্থান আবার যক্ষ্মারোগবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইবে। রোগীর জীবনীশক্তি বৃদ্ধিই যক্ষ্মারোগের একমাত্র প্রতিষেধক। এই জীবনীশক্তি অর্জিত না হইলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রোগীকে বাঁচানো সম্ভবপর হয় না।

ঔষধ সেবনে জীবনীশক্তি অর্জিত হয় না, বরং উহা জীবনীশক্তি হ্রাস করিতেই সাহায্য করে। **একমাত্র যৌগিক পন্থাতেই রোগীর দ্রুত জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেহ দোষমুক্ত হয়।** সুতরাং ঔষধে যক্ষ্মারোগ আরোগ্যের পর যৌগিক পন্থা অবলম্বনই যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করি। অন্যান্য রোগের মতো যক্ষ্মারোগও এই যৌগিক পন্থায় আরোগ্য হয়, কিন্তু উহাতে অধিক সময়ের প্রয়োজন।

নিয়ম ও পথ্য—রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভীত হইবে না। রোগের সূচনায় উল্লিখিত যৌগিক চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করিলে ও নিয়ম-পথ্যাদির নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করিয়া চলিলে অল্পায়াসেই রোগমুক্ত হইতে পারিবে।

রোগ বৃদ্ধি পাইলে সাময়িকভাবে স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগমুক্তির ব্যবস্থা করিবে। অতঃপর যৌগিক পন্থা অবলম্বন করিবে। যে ঘরে রোগী বাস করিবে সে ঘর যেন স্যাঁতস্যেঁতে না হয়, বেশ শুষ্ক খট্‌খটে হয়। ঘরের উপরে এবং ঘরের আশেপাশে রৌদ্র পড়ে, ঘরে আলো-হাওয়া প্রবেশের উপযোগী দরজা-জানালা থাকে—রোগীর জন্য এইরূপ ঘরই নির্বাচিত করিবে। ঘরে বেশ হাওয়া খেলিবে অথচ সেই হাওয়া গায়ে লাগিবে না এইভাবে দরজা জানালা খোলা রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে রোগীর শয্যা রচনা করিবে। ঘরের মধ্যে বা আশেপাশে কখনো কফ বা থুতু ফেলিবে না। কফ বা থুতু ফেলিবার জন্য শয্যার পার্শ্বে একটি মুখ ঢাকা পাত্র রাখিবে। ঐ পাত্রে অল্প জল এবং ঐ জলের মাঝে অল্প পরিমাণ কার্বলিক এসিড ঢালিয়া রাখিবে। এই পাত্রের মাঝেই প্রয়োজন মতো কফ ও থুতু ফেলিবে। দিনান্তে ও নিশান্তে পাত্রটি পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিবে। মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে রক্ত দেখিয়া ভয় পাইবে না, 'আমি অবশ্যই আরোগ্য লাভ করিব' এইরূপ সংকল্প সর্বদা মনে পোষণ করিবে। মনে কোনরূপ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার উদয় হইতে দিবে না, মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করিবে। কোনো সময়েই মুখ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জন করিবে না, সর্বদা নাসিকার

সাহায্যেই প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। অত্যধিক রক্তবমন আরম্ভ হইলে মাথায় জলধারা দিবে এবং বুকের উপর একখানা ভিজা কাপড় বা গামছা রাখিয়া দিবে; সকালে ও দ্বিপ্রহরে দেহ জ্বরমুক্ত থাকিলে যথানিয়মে দ্বিপ্রহরে স্নানাদি করিবে। শীতকালে রৌদ্রতপ্ত জলে স্নান করিবে। যতদিন জ্বর থাকে ততদিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করিবে না, শান্ত মনে স্বগৃহে বিশ্রাম করিবে। জ্বর ত্যাগের পরও রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানসিক পরিশ্রম বন্ধ রাখিবে।

লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য গ্রহণ করিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, জঠরাগ্নি দুর্বল না হইলে এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং রোগীর হজমশক্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রথমে খুব লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। সুপক্ক ফল বা ফলের রস, তরকারির জুস, জল মিশানো ছাগদুগ্ধ, চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগীকে একেবারে অধিক পরিমাণে খাদ্য দিবে না, অল্প পরিমাণে বারে বারে দিবে। জ্বর থাকিলে রাত্রিতে আর রোগীকে কোনো পথ্য দিবে না। রোগী খুব ক্ষুধা বোধ করিলে রাত্রে একবার মাত্র কিছু ফল বা ফলের রস অথবা জল মিশানো পাতলা দুধ খাইতে দিবে। হজমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। রোগীর জ্বর বন্ধ হইলে রোগীর জন্য দুইবেলাই লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে। দিনের বেলা ভাতের সহিত পালংশাক বা যে কোনো শাক, আলু, পেঁপে, চালকুমড়া, লাউ, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির তরকারি, পাতলা মুগ বা মুশুরী ডাল, আমিষভোজী হইলে ক্ষুদ্র টাটকা মাছের ঝোল প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রাত্রির পথ্য—রুটি, তরকারি, দুধ ও ফল। কমলা, পেঁপে, বেদানা, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি রসাল ফল এবং কিস্‌মিস্, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি শুষ্ক ফল রোগীর পক্ষে সুপথ্য। (শুষ্ক ফল খাওয়ার অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পূর্বে ভিজাইয়া রাখিতে হয়)। মাংস, ডিম ও ঘি কোষ্ঠবদ্ধতাকারক গুরুপাক খাদ্য। রোগীকে মাংস, ডিম ও ঘি দিবে না। ঘি-র পরিবর্তে রোগীকে অল্প পরিমাণ জলপাই তৈল দেওয়া যাইতে পারে। পাতলা ডাল এবং

দুধই রোগীর ডিম ও মাংস পথ্যের অভাব পূরণ করিবে। এক বলকের পাতলা দুধ যতটা রোগী হজম করিতে পারে ততটাই দিন-রাত্রে ৩/৪ বার দিবে। প্রত্যহ দুধের সঙ্গে একবার মাত্র দুই চামচ মধু রোগীকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। অক্ষুধায় রোগী যেন কিছু না খায়। ক্ষুধা বৃদ্ধির সহিত রোগীর জলযোগে ভিজানো চীনাবাদাম বা অন্য বাদাম দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। শরীরে একটু রক্ত-মাংস বৃদ্ধি পাইলে, রোগী একটু মোটা হইয়া উঠিলে এই রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়।

বিশেষভাবে মনে রাখিবে, কোনো ঔষধেরই এই রোগারোগ্যের ক্ষমতা নাই। ঔষধ সেবনে রোগীর উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশি। ঔষধ সেবনে রোগীর রোগারোগ্যও বিলম্বিত হয় অথবা রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে।

যে কয়টি যক্ষ্মারোগী সাক্ষাৎভাবে আমাদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত উহা পালন করিয়াছে তাহারা সকলেই ৬ মাস বা ১ বৎসরের মাঝে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত রোগী পূর্বে ২ বৎসর ব্যাপী ডাক্তারী চিকিৎসাতেও কোনো সুফল পায় নাই।

আজকাল যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক হিসাবে বি. সি. জি. টীকার বহুল প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের নির্দেশে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরও বি. সি. জি. টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বি. সি. জি. টীকা গ্রহণের পরও যক্ষ্মা হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু আছে। সুতরাং এই ঔষধটিও নিঃসন্দিগ্ধভাবে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া ঔষধটির অন্য দোষও আছে। এই শক্তিশালী ঔষধটি ভয়াবহভাবে জীবনীশক্তি হ্রাস করে।

আমাদের এই পুস্তকে উল্লিখিত ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়ামাদি যক্ষ্মারোগের বিশেষ প্রতিষেধক। যাহারা এইসব প্রাণায়াম অভ্যাস করে তাহাদের কখনো যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করিতে পারে না—ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত। **ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়াম অভ্যাসে সুস্থ অথবা রোগী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর লোকেরই জীবনীশক্তি উত্তোরোত্তর বর্ধিত হয়।**

আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ জানাইতেছি—তাঁহারা যেন অনিষ্টকারী বি. সি. জি. টীকা গ্রহণের পরিবর্তে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে প্রত্যহ ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়াম অভ্যাসের নির্দেশ দেন। ভ্রমণ-প্রাণায়াম শুধু যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক নয় উহা সর্দি, কাশি, টাইফয়েড, হাঁপানি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক।

রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ

লক্ষণ—রক্তবাহী ধমনীগুলি রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িলে স্বাভাবিকভাবে উহার ভিতর দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না; হৃদ্‌যন্ত্রকে অতিক্রিয় হইয়া, অধিক চাপ সৃষ্টি করিয়া ধমনীতে রক্ত প্রেরণ করিতে হয়। এই অতিরিক্ত রক্তের চাপকেই বলে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ।

রাত্রে সুনিদ্রার অভাব, রাত্রে নিদ্রার সময় একাধিক বার প্রস্রাব, বামপার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিতে অস্বস্তিবোধ, কানের ভিতর একপ্রকার শব্দ শ্রবণ, সময় সময় মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, সময় সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা অনুভব প্রভৃতি রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে রক্তের চাপ যদি ১৫৫ মিলিমিটারের বেশি হয়, তাহা হইলে উহাকে **উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ** (High Blood Pressure) বলে। রক্তের চাপ যদি ১১০ মিলিমিটারের নীচে থাকে, তাহা হইলে উহাকে **নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ** (Low Blood Pressure) বলে। বর্তমান যুগে দেহস্থ রক্তচাপের পরিমাণ নির্ধারক যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার নাম স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer)। ১২০ মিলিমিটারের সহিত বয়সের পঞ্চমাংশ যোগ করিলে যে পরিমাণ হয় উহাই সুস্থ লোকের রক্তচাপের পরিমাণ। অন্য এক শ্রেণী চিকিৎসকদের মতে ১০০ মিলিমিটারের সহিত বয়সের অর্ধেক যোগ করিলে যে পরিমাণ

হয়, উহাই সুস্থ দেহের রক্তচাপের পরিমাণ। এই হিসাবে ৬০ বৎসর বয়স্ক লোকের রক্তচাপের স্বাভাবিক পরিমাণ ১২০ + ১২ = ১৩২ মিলিমিটার। অন্য মতে ১০০ + ৩০ = ১৩০ মিলিমিটার।

কারণ—খাদ্যের প্রোটিন শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে। যাহাদের বয়স ৪০ বৎসরের উর্ধ্বে এবং যৌবনেও যাহাদের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহাদের পক্ষে এই প্রোটিনের প্রয়োজন খুব অল্প। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ বা লোভের বশবর্তী হইয়া পরিশ্রমবিমুখ নর-নারীরা যখন প্রায় প্রত্যহই অধিক পরিমাণে আমিষ ও নিরামিষ প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করে, তখন তাহাদের দেহে অধিক পরিমাণ অম্লবিষ (Urea) সঞ্চিত হয়। দেহের পক্ষে সঞ্চিত প্রোটিনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। এইজন্য মানবদেহে প্রোটিন সঞ্চিত রাখার কোনো ব্যবস্থাও নাই। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিনকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য যকৃৎ এবং অন্যান্য পাচকরস উৎপাদক যন্ত্রগুলিকে বিশেষভাবে অতিক্রিয় হইয়া উঠিতে হয়। প্রোটিন নিঃসারণে এই পাচকরসগুলির প্রাণপণ চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়, তখন এই প্রোটিন দেহের মাঝে পচিয়া দেহে বিষ সৃষ্টি করে। ঐ বিষে দেহের রক্ত দূষিত হয়। মূত্রগ্রন্থি (Kidney), যকৃৎ, ফুসফুস প্রভৃতি রক্তশোধনকারী যন্ত্রগুলিও ঐ বিষে জর্জরিত হইয়া যখন রুগ্ন ও দুর্বল হয়, তখন ঐগুলির আর দূষিত রক্তকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করার সামর্থ্য থাকে না। ঐ দূষিত রক্তের বিষপ্রভাবে ধমনী ও শিরাগুলির কোমলতা ও নমনীয়তা নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐগুলি শক্ত হইয়া উঠে। এই রুগ্ন, দুর্বল ও শক্ত ধমনীগুলির ভিতর দিয়া রক্তস্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না—ফলে হৃদ্‌যন্ত্রকে অতিক্রিয় হইয়া জোরে রক্ত পরিচালনার জন্য অধিক বেগ, অধিক চাপ প্রদান করিতে হয়। এই অধিক বেগ, অধিক চাপ উৎপন্ন করিতে গিয়া হৃদ্‌পিণ্ডকে অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত হইতে হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের এই অতিক্রিয়তা এবং অস্বাভাবিক স্পন্দনই পরিণামে উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ সৃষ্টি করে।

যাহারা প্রত্যহ প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে, অতিরিক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে, তাহারা যদি যথোচিত শারীরিক পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে তাহাদের দেহস্থ সঞ্চিত চর্বি দগ্ধ হইতে পারে না। এইজন্যই দেহের অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চিত হইয়া ইহারা স্থূলকায় হইয়া উঠে। স্থূলকায় ব্যক্তির বৃহদ্ধমনী, ক্ষুদ্রধমনী এবং রক্তবাহী শিরাগুলিতে মেদ সঞ্চিত হয় এবং উহার ফলে ধমনীগুলির রক্তস্রোতপথ সঙ্কুচিত হয়। প্রয়োজনীয় রক্ত এই সঙ্কুচিত পথে স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করিতে পারে না—এইজন্য হৃদ্‌যন্ত্রকেও অধিক বেগ, অধিক চাপ সৃষ্টি করিয়া দ্রুত রক্ত প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং দেহে মেদবৃদ্ধিও রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের একটি প্রধান কারণ।

শরীরে অতিরিক্ত রক্ত সৃষ্টি না হইলে শরীরে মেদবৃদ্ধি হয় না। শরীরের এই অতিরিক্ত রক্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামাদি রিপুকে অধিকতর উগ্র করিয়া তোলে। সুতরাং দেহসঞ্চিত অতিরিক্ত রক্ত, অতিরিক্ত চর্বি শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নয়, উহা মানসিক স্বাস্থ্যেরও প্রতিকূল।

রক্ত উৎপাদক যকৃৎ, রক্তশোধনকারী মূত্রযন্ত্র, প্লীহা, ফুসফুস প্রভৃতি দুর্বল হইয়া পড়িলে প্রয়োজনীয় সুস্থ রক্তের অভাবে দেহ দুর্বল হইয়া **নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি** রোগ সৃষ্টি করে।

দেহে সর্বদা একটা ক্লান্তির ভাব, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা প্রভৃতি নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের **লক্ষণ**। চলার সময় মাথা 'টলে যাওয়া' **উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধির** লক্ষণ।

চিকিৎসা—(ভোরে) ৩ নং সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মে জলপান পূর্বক সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট, পবনমুক্তাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১—২ মিনিট; অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি। তারপর টাববাথ ৫/১০ মিনিট। টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং ৮ বার, ২নং ৪ বার, ভ্রমণ প্রাণায়াম এবং সহজ প্রাণায়াম।

(মধ্যাহ্নে)—টাববাথ ১৫-৩০ মিনিট, টাবে বসিয়া অগ্নিসার ধৌতি

১নং ৮ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭—প্রত্যেকটি ২/৩ মিনিট; সহজ অগ্নিসার ৪০ বার।

(সন্ধ্যার পূর্বে)—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, টাববাথ ৪-৫ মিনিট, টাববাথের পরে বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট।

রক্তের চাপ হ্রাস পাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে। রক্তের চাপ ২২০ মিলিমিটারের অধিক হইলে সহজ প্রাণায়াম, ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার ও অগ্নিসার ধৌতি ছাড়া অন্য কোনো আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিবে না।

নিয়ম ও পথ্য—অতি উত্তেজনার সঞ্চার হইলে মস্তিষ্কের ধমনী ফাটিয়া গিয়া রোগীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং এই রোগে আক্রান্ত হইলে কাম-ক্রোধকে সর্বদা স্ববশে রাখিবে। জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিয়া চলিবে। রোগ আবোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আমিষ খাদ্য, ছানা ও ছানাজাতীয় এবং চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ বন্ধ রাখিবে। ভাত বা রুটি প্রভৃতিও খুব অল্প পরিমাণে খাইবে। ক্ষারধর্মী খাদ্যই এই রোগে সুপথ্য। শাক-সবজি, দুধ-ঘোল ও ফলাদি ক্ষারধর্মী পথ্য। টক ফল, মিষ্টি ফল, রসাল ফল, শুষ্ক ফল প্রভৃতি সব শ্রেণীর ফলই এই রোগে একাধারে পথ্য এবং ঔষধ। শরীরে অতিরিক্ত চর্বি থাকিলে দুধের পরিবর্তে ঘোল খাইবে। পাতে কখনো কাঁচা লবণ খাইবে না। চিনি খাওয়া সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। চিনির পরিবর্তে অতি অল্প পরিমাণে গুড় বা মধু খাইবে। অল্প ক্ষুধায় বা অক্ষুধায় কিছু খাইবে না।

উপবাসে স্বভাবতঃই রক্তচাপ কমিয়া যায়। সুতরাং এই রোগে আক্রান্ত হইলে সপ্তাহে একদিন উপবাস দিবে। প্রতি সপ্তাহে উপবাসে অক্ষম হইলে, প্রতি একাদশী তিথিতে উপবাস এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় নিশিপালন করিবে অর্থাৎ ঐ রাত্রে আর কিছু খাদ্য গ্রহণ করিবে না। শরীরে প্রচুর মাংস ও চর্বি থাকিলে উপবাসের দিন কোনো খাদ্য গ্রহণ না করিয়া শুধু ইচ্ছামত বিশুদ্ধ জল বা লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবে ('উপবাস বিধি' দ্রষ্টব্য)। নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে উপবাসের

সময় দুগ্ধ ও ফলাদি লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে। (এই প্রসঙ্গে 'হৃদ্‌রোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

রক্তের চাপ ১৭০ মিলিমিটারের ঊর্ধ্বে উঠিলে উল্লিখিত টাববাথ বিধি বিশেষভাবে পালন করিবে। এইরূপ স্নান এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিলে রক্তের চাপ নীচে নামিয়া আসিবে।

রক্তপিত্ত ও রক্তবমন

কারণ—যকৃতে উৎপন্ন রঞ্জক-পিত্ত জীর্ণ খাদ্যবস্তু হইতে উৎপন্ন খাদ্যরসকে রক্তে পরিণত করে। দীর্ঘদিন যাবৎ সুষম পথ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়া আহারে-বিহারে অসংযত হইলে, দীর্ঘদিন ধরিয়া ঝাল-মশল্লাদি তীক্ষ্ণবীর্য পদার্থ অতিমাত্রায় সেবন করিলে রঞ্জক-পিত্তের ক্রিয়া বিকৃতি ঘটে। এই বিকৃত পিত্ত কিছু পরিমাণে রক্তকেও দূষিত করে। এই দূষিত রক্ত যকৃৎ দ্বারা শোধিত না হইয়া পাকস্থলীতে ফিরিয়া আসে। পাকস্থলী এই অশোধিত রক্তকে ঊর্ধ্বমার্গ অর্থাৎ মুখ বা নাসিকা দ্বারা অথবা অধোমার্গ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয় বা গুহ্যদেশ দ্বারা বাহির করিয়া দেয়; এই রক্তপিত্তও কফদোষযুক্ত হইলে ঊর্ধ্বমার্গগামী হয়, বাত-দোষযুক্ত হইলে অধোমার্গগামী হয়, বাত-শ্লেষ্মাদোষযুক্ত হইলে উভয় মার্গগামী হয়।

"একমার্গং বলবতো নাতিবেগং নবোত্থিতম্...."—রক্তপিত্ত যদি একমার্গ অর্থাৎ ঊর্ধ্বমার্গগামী হয়, রোগীর শরীরে যদি বল থাকে এবং রোগীর রোগ যদি অল্পবেগ বিশিষ্ট এবং অল্পকালজাত হয়, তাহা হইলে এই রোগ সাধ্য অর্থাৎ উহা আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে। নানা ব্যাধি দ্বারা ক্ষীণদেহ ব্যক্তির, বৃদ্ধ ব্যক্তির, অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তির এই রোগ প্রবল হইলে উহা আরোগ্যের সম্ভাবনা কম—ইহাই আয়ুর্বেদাচার্যদের মত। যৌগিক ক্রিয়া এবং নিয়ম ও পথ্যবিধি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এই দুরারোগ্য ব্যাধি অবশ্যই আরোগ্য হইবে।

শুধু রঞ্জক পিত্তের বিকৃতির ফলেই রক্তবমন হয় না; পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রক্ষত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও রক্তবমন হয়। অতিরিক্ত সর্দি-কাশির জন্য পাকস্থলীর কোনো ধমনী ছিন্ন হইলে যতদিন সেই ছিন্ন ধমনী আবার পূর্ব্ববৎ জোড়া না লাগে ততদিন মাঝে মাঝে রক্তবমি হয়। সর্দি-কাশির জন্য ধমনী ছিন্ন হওয়ার ফলে যে রক্তবমি হয়, অথবা যক্ষ্মারোগে ফুসফুস আক্রান্ত হইলে যে রক্তবমি হয়, ঐ রক্তের রং থাকে টাট্‌কা লাল ; ঐ রক্তের সঙ্গে কিছু শ্লেষ্মা ও ফেনা মিশ্রিত থাকে। পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রক্ষত ও রঞ্জক পিত্তের বিকৃতির জন্য যে রক্তবমন হয়, ঐ রক্তের রং হয় একটু কালো।

যে কারণে পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্ত্রক্ষত রোগ সৃষ্টি হয়, ঠিক সেই কারণেই রক্তপিত্ত রোগও সৃষ্টি হয়। যথেচ্ছভাবে ডিম ও মাংসাদি আমিষ খাদ্য এবং ঘি, মাখন, ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি সংহত খাদ্য গ্রহণই ঐ রোগ সৃষ্টির মূল কারণ।

চিকিৎসা—পাকস্থলী-ক্ষত রোগ চিকিৎসার অনুরূপ ('পাকস্থলীর ক্ষত চিকিৎসা প্রণালী' দ্রষ্টব্য)।

নিয়ম ও পথ্য—রঞ্জক-পিত্তের দোষেই হউক বা পাকস্থলীর ক্ষত বা অন্ত্রক্ষতের জন্যই হউক, রোগীর রক্তবমন আরম্ভ হইলে রোগী বিছানায় চিৎ হইয়া শয়ন করিবে। রোগীর উদরের উপরে একখানা ভিজা গামছা বা তোয়ালে রাখিবে। তোয়ালের উপর মাঝে মাঝে জল ছিটাইয়া উহাকে সিক্ত ও শীতল রাখিবে। হাতের কাছে বরফ থাকিলে ভিজা গামছার পরিবর্তে বরফের থলি উদরের উপরে রাখিবে। সুস্থ বোধ না করা পর্যন্ত এবং যকৃতে বা পাকস্থলীতে বেদনা থাকিলে উহা সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত রোগী শবাসনের মতো স্নায়ু শিথিল করিয়া দিয়া বিছানায় শান্তভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে। পিপাসা বোধ করিলে রোগীকে বরফমিশ্রিত শীতল জল, বরফ অভাবে শুধু শীতল জল পান করিতে দিবে। মাঝে মাঝে রোগীর মাথা শীতল জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিবে।

রক্তবমির পর ২৪ ঘণ্টার মাঝে রোগীকে কোনো পথ্য দিবে না। অতঃপর ক্ষুধা বোধ হইলে এক চামচ মধুর সহিত এক কাপ পাতলা দুধ খাইতে দিবে। একটু ফলের রস এবং তরিতরকারির জুসও এই সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে। ঐ সব তরল খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য রোগীকে দিবে না। যতদিন বুকে চিন্‌চিনে ব্যথা থাকে অথবা যকৃতে বা পাকস্থলীতে বেদনা থাকে, ততদিন রোগীকে কোনো শক্ত খাদ্য খাইতে দিবে না। ঝিঙা, পটল, শশা, আলু, ধুঁধুল, ঢ্যাড়শ, টমেটো, পালংশাক অথবা অন্যান্য শাক-সবজি দ্বারা ইউরোপীয় ধরনে ষ্টু (Stew) রন্ধন করিয়া (ষ্টু রন্ধনে ঈষৎ হলুদ, নুন ও সামান্য আদা ছাড়া অন্য কোনো মশলা ব্যবহার করিবে না) উহার তরকারির অংশ বাদ দিয়া ঝোলটুকু শুধু রোগীকে খাইতে দিবে। এক বলকের এক পোয়া পাতলা দুধে চা-চামচের এক চামচ মধু মিশ্রিত করিয়া (চিনি না দিয়া) রোগীকে দুই বেলা খাইতে দিবে। রক্তবমি ও বেদনা বন্ধ হওয়ার পরও ২/৩ দিন এইরূপ তরল পথ্য রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিবে।

সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে আহারে-বিহারে খুব সতর্ক হইয়া চলিতে·হইবে। ভালো ক্ষুধার জোর না থাকিলে কখনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা বা অজীর্ণ সৃষ্টি হইলে আবার রোগাক্রমণের আশঙ্কা ঘটে। রোগের সময় এবং রোগারোগ্যের পরও ২/১ বৎসর খাদ্যে আদা হলুদ ছাড়া অন্য কোনো মশল্লা ব্যবহার করিবে না। তেলে-ভাজা এবং ঘৃতে-ভাজা কোন জিনিস খাইবে না। পাতে ঘি ও মাখন খাইবে না। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। ঘন ডালের পরিবর্তে ডালের পাতলা জুস খাইবে। রক্ত অতিরিক্ত অম্লধর্মী না হইলে এই রোগ সৃষ্টি হয় না। এইজন্যই আমিষাদি অম্লধর্মী খাদ্য এই রোগে বর্জন করিতে হয়। শাক-সবজি, ফল-মূল, দুধ, ঘোল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী পথ্যই এই রোগে হিতকারী। উপবাসও এই রোগারোগ্যে বিশেষ সহায়ক সুতরাং যাহাদের দেহ ক্ষীণ নয় তাহারা

প্রতি সপ্তাহে একদিন উপবাস দিবে ('উপবাস-বিধি' দ্রষ্টব্য)। যাহারা ক্ষীণদেহী তাহারা একাদশী তিথিতে উপবাস এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিশিপালন করিবে। চা, কফি, সিগারেট, বিড়ি, তামাক, আফিম প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। সন্দেশ, রসগোল্লা, চিনি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য পাকস্থলীকে উত্তেজিত করে সুতরাং এই রোগে মিষ্ট দ্রব্য আহারও ত্যাগ করিবে।

রক্তহীনতা রোগ

লক্ষণ—আমাদের শরীরে রক্তের পরিমাণ কতখানি, এই বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কাহারো মতে আমাদের শরীরের যাহা ওজন তাহার ১৩ ভাগের একভাগ রক্ত; আবার অপরের মতে শরীরের যাহা ওজন তাহার ১০ ভাগের একভাগ রক্ত। আমাদের দেহে যে পরিমাণ রক্তই থাকুক না কেন, দেহে এই প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ যখন হ্রাস পায়, তখন এই রক্তহীনতা রোগ সৃষ্টি হয়।

আয়ুর্বেদাচার্যেরা রক্তহীনতা রোগকে পৃথক রোগ বলিয়া মনে করেন না; অন্যান্য রোগের পরিণতিরূপে অথবা প্লীহা-যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতির ফলে এই রোগ উৎপন্ন হয়; এইজন্যই আয়ুর্বেদগ্রন্থে এই রোগটিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। আধুনিক যুগে এই রোগটির অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হেতু ইহা পৃথক রোগের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই রক্তহীনতা রোগের বাহ্যিক লক্ষণ—শারীরিক দুর্বলতা, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, বমি, গাত্রচর্মের নিষ্প্রভতা, চোখের পাতার ভিতরের দিকের ফ্যাকাশে রং, মূর্ছা ও শোথ প্রভৃতি। এই রোগে জিহ্বার রং হয় মলিন ও সাদা। মুখ হইতে বাহির করিলে জিহ্বা একটু কাঁপে।

কারণ—পরিপক্ক অন্নরস হইতে প্রয়োজনীয় রক্ত উৎপন্ন করে যকৃৎ

ও প্লীহা। এই যকৃৎ ও প্লীহার কার্যকারিতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইলেই দেহে প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব হইয়া রক্তহীনতা রোগ সৃষ্টি হয়, পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মাঝে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। কোষ্ঠবদ্ধতা বা ঋতুদোষের ফলে শরীরে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া অথবা পুনঃ পুনঃ সন্তানধারণের ফলে রক্তশূন্য হইয়া মেয়েরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। ম্যালেরিয়া রোগ, দীর্ঘদিনের আমাশয় রোগ, কামলা রোগ, অজীর্ণ, অম্ল ও গ্যাস প্রভৃতি রোগও শরীরের রক্ত উৎপত্তিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং এই রোগের উদ্ভব হয়। সুতরাং অন্যান্য রোগের মতো এই রোগটিও শরীরে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া উৎপন্ন হয়। দেহে এই দূষিত পদার্থ সঞ্চয়ের জন্যই যকৃৎ ও প্লীহাদির ক্রিয়াও বিকৃত হয়।

অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিশুদ্ধ রক্তের মাঝে দুই রকম দেহরক্ষী জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাদের এক শ্রেণীর রং লাল, অপর শ্রেণীর রং সাদা। লাল রংয়ের জীবাণুগুলির নাম লাল রক্তাণু (Red Corpuscles), সাদা রংয়ের জীবাণুগুলির নাম শ্বেত-রক্তাণু (White Corpuscles)। এই দুই শ্রেণীর রক্ত কণিকার কার্যকারিতাও বিভিন্ন। শ্বেত রক্তাণুগুলি—দেহসাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত সৈনিক। এই বিশ্বস্ত সৈনিকদের জন্যই দেহ সহজে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। দেহে ব্যাধিবীজ উৎপন্ন হইলে বা বাহির হইতে দেহে ব্যাধিবীজ প্রবেশ করিলে, ইহারা এই ব্যাধিবীজগুলিকে অবিলম্বে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হয়। দেহরক্ষাকারী এই শ্বেত-রক্তাণু বা শ্বেত-ফৌজের সহিত ব্যাধি বীজাণুর তখন সংগ্রাম শুরু হয়।

শ্বাসের সহিত ফুসফুসের কোষগুলি যে বায়ু গ্রহণ করে, লাল-রক্তাণুগুলি ঐ বায়ুকোষ হইতে অক্সিজেন বহন করিয়া আনিয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া দিয়া রক্তকে সতেজ বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর উপাদানে পরিণত করে। দেহের গ্রন্থি, পেশী প্রভৃতি সমুদয় যন্ত্রগুলি এই সতেজ রক্ত হইতে, এই বিশুদ্ধ রক্ত হইতে স্বীয় পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন—"In a cubic millimetre

roughly a pinhead ......" একটি আলপিনের অগ্রভাগে যতটুকু রক্ত ধরে ততটুকু রক্তে লাল-রক্তাণুর সংখ্যা থাকে প্রায় ৫০ লক্ষ এবং শ্বেত-রক্তাণুর সংখ্যা থাকে ১০/১২ হাজার। রক্তবাহী শিরাগুলির ভিতরে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলির অন্তঃস্রাবী রসের মধ্যে শ্বেত-রক্তাণুর সৃষ্টি হয়। নভঃগ্রন্থি অর্থাৎ টন্‌সিল প্রভৃতিও শ্বেত-রক্তাণু সৃষ্টি করে। অস্থিমজ্জার ভিতরে লাল-রক্তাণু সৃষ্টি হয়। এই শ্বেত রক্তাণু এবং লাল রক্তাণু সৃষ্টির প্রধান এবং বৃহত্তম কারখানা প্লীহা।

এই শ্বেত ও লাল-রক্তাণু সৃষ্টি করা ছাড়াও প্লীহার অন্য কাজ আছে। প্লীহা রক্ত শোধন করে, সর্বদেহে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। রক্তমধ্যস্থ রোগবীজাণুগুলি রক্ত হইতে ছাঁকিয়া স্বীয় অঙ্গে অবরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে। রক্তে অবস্থিত রুগ্ন, দুর্বল ও মৃত লালরক্তাণুগুলিকে প্লীহা স্বীয় অঙ্গে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া যকৃতে ঐগুলিকে পাঠাইয়া দেয়। যকৃৎ ঐ লাল-রক্তাণুগুলির মৃতদেহ গলাইয়া স্বীয় অন্তঃস্রাবী রসের সহিত মিশাইয়া উহাকে পিত্তরসে পরিণত করে। আয়ুর্বেদমতে খাদ্যরসকে রক্তে পরিণত করার দায়িত্ব শুধু যকৃতের নয়, প্লীহার মাঝেও যকৃতের মতোই রক্ত উৎপন্ন করার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং প্লীহার সহিত যকৃতের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্লীহা যদি রুগ্ন হয়, তাহা হইলে যকৃৎও রুগ্ন হইয়া পড়ে; যকৃৎ রুগ্ন হইলে প্লীহাও রুগ্ন হয়। প্লীহা ও যকৃৎ সর্বদাই পরস্পরকে সাহায্য করে, একের দোষ-ত্রুটি অন্যে সংশোধন করিয়া লয়। এই প্লীহা ও যকৃতের কার্যকারিতার অভাব অন্য কোনো যন্ত্রই পূরণ করিতে পারে না। প্লীহা যখন আর প্রয়োজনীয় শ্বেত-রক্তাণু উৎপন্ন করিতে পারে না, তখন দেহের রোগবীজাণুগুলি প্রবল হইয়া বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায়। শ্বেত-রক্তাণুর প্রতিরোধশক্তি হ্রাস পাইলে রোগবীজাণুগুলি আত্মরক্ষায় অক্ষম লাল-রক্তাণুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হইতে থাকে। লাল রক্তাণুগুলির সংখ্যা হ্রাসের ফলে রক্তও আর সতেজ এবং স্বাস্থ্যকর থাকে না। দুর্বল প্লীহা-যকৃৎ প্রয়োজনীয় রক্তও উৎপন্ন করিতে পারে না, উৎপন্ন রক্তকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারে না—সুতরাং দেহ-যন্ত্রগুলিও আর

প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ রক্তের পরিবেশন পায় না বলিয়া রক্তহীনতা রোগ প্রকাশ পাইতে থাকে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; সহজ প্রাণায়াম নং ৩, নং ৭, নং ৯; অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, নং ২—৪ বার, জলস্নানবিধি নং ১, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার।

(মধ্যাহ্নে)—টাববাথ ১০/১৫ মিনিট অথবা স্নানবিধি নং ১।

(সন্ধ্যায়)—জানুশিরাসন ৩ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২ ; সুপ্তবজ্রাসন ৩ বার, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার। বিপরীতকরণী ৩ মিনিট। সহজ প্রাণায়াম নং ৩, ৭, ৯, ভ্রমণ প্রাণায়াম। শশাঙ্গাসন ২ মিনিট।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নানবিধি, জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—শরীর সবল না হওয়া পর্যন্ত অতি হালকা কাজ ছাড়া কোনো পরিশ্রমের কাজ করিবে না। বিশ্রামের মাত্রা বিশেষভাবে বাড়াইয়া লইবে। প্রত্যহ স্নানের পূর্বে বেশ জোরের সহিত সর্বাঙ্গে সরিষার তৈল মর্দন করিবে। যথাসাধ্য মুক্ত হাওয়ার মাঝে থাকিয়া দিন কাটাইবে। অতিরিক্ত হাওয়া-বাতাস গায়ে লাগাইলে যাহাদের সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ঘটে, তাহারা এমন স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে যেখানে সোজাসুজি গায়ে হাওয়া না লাগে, অথচ চারিদিকে বেশ অবাধ হাওয়ার চলাচল থাকে। রাত্রেও ঘরের দরজা-জানালা এমনভাবে বন্ধ ও খোলা রাখার ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে ঘরে বেশ হাওয়া খেলে, অথচ সে হাওয়া গায়ে না লাগে।

লৌহ ও খনিজ লবণই রক্ত পুষ্টির উপাদান। সবুজ শাকপাতার মাঝে ও তরিতরকারির মধ্যে আমাদের দেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য লৌহ ও খনিজ লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে সুতরাং বিবিধ শাক ও তরিতরকারি হজমশক্তি অনুযায়ী প্রত্যহ গ্রহণ করিবে। সর্বজাতীয় ফল এবং দুগ্ধপথ্য গ্রহণ এই রোগে বিশেষ প্রয়োজন, ইহা স্মরণে রাখিয়া পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে। ডালের পরিবর্তে ডালের জুস খাইবে। যে কোনো ভাজা দ্রব্য,

অধিক তৈল-ঘি মশলা-সংযুক্ত খাদ্য, ঘি, মাখন, ডিম, মাংস প্রভৃতি অম্লধর্মী খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

আমিষভোজীদের পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুর 'মেটে' (যকৃৎ) নিজ রুচিমত মাঝে মাঝে খাওয়ার ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত। কিন্তু আমরা এই ব্যবস্থা নির্ভুল বলিয়া মনে করি না। জীব-জন্তুর যকৃতের মাঝেও রক্ত শোধনের ব্যবস্থা আছে সুতরাং রক্তের অধিকাংশ দূষিত বস্তু যকৃতে সঞ্চিত থাকে। এই যকৃৎ আহার করিলে এই সকল দূষিত বস্তুও দেহে প্রবেশ করিয়া দেহের ক্ষতিসাধন করে।

রক্তহীন রোগীকে আধুনিক যুগের চিকিৎসকরা ডিম পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই রোগীর পক্ষে ডিম সুপথ্য নয়—কুপথ্য। কেন আমরা ইহাকে কুপথ্য বলিতেছি ইহার বিস্তৃত কারণ আমাদের **খাদ্যনীতি** নামক পুস্তকের 'আদর্শ পথ্যবিধি' নামক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। (এই প্রসঙ্গে কামলা রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ, প্লীহা-যকৃৎ রোগ, শোথ রোগ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। যখনই শরীর ক্লান্ত বোধ করিবে, তখনই শবাসনে ১০/১৫ মিনিট বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। **ক্ষুধা জোরালো থাকিলে কখনো রক্তহীনতা রোগ সৃষ্টি হয় না। সুতরাং উপবাস বা অর্ধোপবাসের সাহায্যে সর্বদা ক্ষুধা জাগ্রত রাখিবে। অক্ষুধা বা অল্পক্ষুধায় কিছু খাইবে না।**

শূলব্যাধি

লক্ষণ—শরীরের রক্তে যখন দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেশি হয় তখন রক্তবহা নাড়ীগুলি ঐ বিষে আক্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহারা পাকস্থলীর স্নায়ুকোষে প্রয়োজনীয় রক্ত সব সময় সরবরাহ করিতে পারে না। এই রক্তের অভাবের জন্য অথবা দূষিত রক্তের বিষাক্ত পদার্থের আক্রমণের জন্য পাকস্থলীর স্নায়ুকোষে আক্ষেপ বা প্রদাহ সৃষ্টি হয়, বিশুদ্ধ রক্তের জন্য স্নায়ুগুলি আর্তনাদ আরম্ভ করে; পাকস্থলীর স্নায়ুকোষের এই আক্ষেপ বা আর্তনাদের নামই শূলব্যাধি।

আয়ুর্বেদাচার্যদের মতে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ভেদে শূলব্যাধি আট প্রকার। আয়ুর্বেদের বাতজ শূলকেই আধুনিক যুগে বলা হয় **স্নায়ুশূল**। পিত্তবিকৃতি হেতু পিত্তবিষে ঐ স্নায়ুকোষ আক্রান্ত হইলে উহাকে বলে **পিত্তশূল**। পাকস্থলীর পাচকরস বিকৃতি হেতু শূল উৎপন্ন হইলে উহাকে বলে **অম্লশূল**। অন্ত্রের স্নায়ুকোষের প্রদাহ সৃষ্টি হইলে উহাকে বলে **অন্ত্রশূল**। হৃদ্‌যন্ত্রের স্নায়ুকোষের প্রদাহ হইলে উহাকে বলে **হৃদ্‌শূল**।

কারণ—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতির ফলে দেহের বায়ু প্রকুপিত হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষাক্ত বায়ুর প্রভাবে রক্তবাহী ধমনী অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই রক্তবাহী ধমনীগুলি অবসন্ন হইয়া যখন আর পাকস্থলীর স্নায়ুকোষকে রক্তের সরবরাহ দিতে পারে না, তখন স্নায়ুকোষে আক্ষেপ শুরু হয়, রক্তের জন্য স্নায়ুকোষগুলি আর্তনাদ করে। স্নায়ুকোষের এই আর্তনাদই **স্নায়ুশূল** নামে অভিহিত।

তৈল, ঘি, মাখন প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিবার প্রাথমিক দায়িত্ব যকৃৎ নিঃসৃত পিত্তরসের। এই পিত্তের, যে পরিমাণ চর্বিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার চেয়ে অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় পদার্থ যদি উদরস্থ হয়, তাহা হইলে যকৃৎকে অতিক্রিয় হইয়া অধিকতর পিত্ত উৎপন্ন করিতে হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ যকৃৎ অতিক্রিয় থাকিলে যকৃৎ দুর্বল হইয়া পড়ে। যকৃৎ তখন আর প্রয়োজনীয় পিত্তরস সরবরাহ করিতে পারে না। পিত্তও তখন আর চর্বিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ হইবার উপযোগী তরল করিতে না পারিয়া নিজেই বিকৃত হইতে থাকে। এই বিকৃত পিত্ত অম্লবিষে পরিণত হয়। এই দূষিত পিত্তের অম্লবিষ দ্বারা স্নায়ুকোষ আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে পিত্তেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া ইহাকে **পিত্তশূল** বলে।

জিহ্বার নিম্নস্থ লালাগ্রন্থির মতো পাকস্থলীর ধমনীগুলির পাশে পাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল প্রভৃতি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য পাকস্থলীতে আসিয়া পৌঁছাইলে ঐগুলি হইতে লালার

মতোই অম্লস্বাদবিশিষ্ট পাচক রস নির্গত হয়। এই পাচকরসের দায়িত্ব মাংসাদি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যকে জীর্ণ করা।

আমাদের দেহের রক্তে অম্লরসের (Acid salt) পরিমাণ ক্ষাররসের তুলনায় অনেক কম। আমরা যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিনজাতীয় খাদ্য খাই, তাহা হইলে অম্লরসের ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। প্রয়োজনীয় প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিতে অক্ষম হইলে এই পাচক রসও বিকৃত হইয়া অম্লবিষে পরিণত হয়। এই অম্লবিষে জর্জরিত হইয়া পাকস্থলীর স্নায়ুকোষ যখন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে 'পরিত্রাহি' চীৎকার আরম্ভ করে, তখন এই রোগকে বলা হয় **অম্লশূল**।

অগ্ন্যাশয়ের অগ্নিরস, পাকস্থলীর পিত্তরস ও পাচকরস সম্মিলিত হইয়া ঊর্ধ্ব অন্ত্রের অর্ধজীর্ণ খাদ্যকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করে। এই সম্মিলিত অগ্নিরসাদি অন্ত্রের খাদ্যবস্তুকে যদি জীর্ণ করিতে না পারে, তাহা হইলে উহারাও অজীর্ণ হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই অন্ত্রে সঞ্চিত বিষে অন্ত্রের স্নায়ুগুলি আক্রান্ত হইয়া **অন্ত্রশূল** রোগ সৃষ্টি করে।

আমাদের দেহে দুই শ্রেণীর রক্তবাহী শিরা আছে। এক শ্রেণীর শিরা বা ধমনী দূষিত রক্তকে ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি রক্তশোধক যন্ত্রগুলির কাছে বহন করিয়া লইয়া যায়। অঙ্গারাম্ল প্রভৃতি গ্যাস এই রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহার প্রভাবে এই রক্তবাহী শিরাগুলির রং হয় একটু নীলাভ। এই দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুস্‌ কর্তৃক শোধিত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডে যায়। হৃদ্‌পিণ্ড ঐ বিশুদ্ধ রক্ত সর্বশরীরে পরিবেশন করে। দেহস্থ ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি রক্তশোধক যন্ত্রগুলি যদি দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সমুদয় অবিশুদ্ধ রক্ত আর শোধিত হওয়ার সুযোগ পায় না। অবিশুদ্ধ রক্তের এই বিষাক্ত পদার্থ যখন হৃদ্‌পিণ্ডের পরিচালক স্নায়ুগুলিকে আক্রমণ করে, তখন হৃদ্‌পিণ্ডে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, রোগীর শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যুর উপক্রম হয়—ইহার নাম **হৃদ্‌শূল**।

চিকিৎসা—(ভোরে)—সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি;

সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৬, নং ৮; বারিসার ধৌতি, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২, উড্ডীয়ান, ভ্রমণ-প্রাণায়াম। (সন্ধ্যায়)—ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২, শশাঙ্গাসন ২ মিনিট; সহজ অগ্নিসার ৪০ বার; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৭।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলস্নানবিধি, উপবাসবিধি এবং জলপানবিধি যথাসাধ্য পালন করিয়া চলিবে।

যতদিন রোগের প্রবলতা থাকিবে অম্লশূল রোগী ততদিন শীতল জলের পরিবর্তে গরম জল পান করিবে। একসঙ্গে একগ্লাস জলপান অসুবিধাজনক হইলে আধ গ্লাস জল আধঘণ্টা বা একঘণ্টা অন্তর অন্তর খাইবে। রোগের প্রবলতা হ্রাস পাইলে গরম জলের পরিবর্তে শীতল জল পান করিবে। দ্বিপ্রহরে এবং রাত্রে খাদ্য গ্রহণের পর ন্যূনপক্ষে এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসপ্রবাহ অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। বেদনার সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত থাকে সেই নাসিকার শ্বাস পরিবর্তন করিয়া অপর নাসিকায় প্রবাহিত করিয়া দিতে পারিলে বেদনার বেগ দ্রুত হ্রাস পাইবে। [এই প্রসঙ্গে 'শ্বাস-পরিবর্তন প্রণালী' দ্রষ্টব্য।]

নিয়ম ও পথ্য—শূল রোগীর দিনে ও রাত্রের মাঝে দুই বারের বেশি আহার্য গ্রহণ করা উচিত নয় অর্থাৎ সকাল-বিকালের জলযোগ বাদ দেওয়া উচিত। অম্লশূল রোগীর একটা কৃত্রিম ক্ষুধা থাকে। এই কৃত্রিম ক্ষুধা সম্বন্ধে সচেতন থাকিবে। এই কৃত্রিম ক্ষুধার সময় একগ্লাস জল পান করিলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। রোগের প্রবলতা হ্রাস পাওয়ার পর ভোরে অস্বাভাবিক ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পেঁপে, আনারস, বেদানা, কমলা, আঙ্গুর প্রভৃতি রসাল ফলের মাঝে যে কোনো ফল অল্প পরিমাণে খাইবে এবং এক গ্লাস লেবুর সরবৎ খাইবে।

অম্লবিষ, পিত্তবিষ প্রভৃতিকে তরল করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা লেবুর রসের আছে, এই জন্যই **পাকস্থলীর সমুদয় রোগে লেবুর রস একাধারে ঔষধ ও পথ্য**।

পিত্তশূল ব্যথার সূচনায় অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিলে বেদনা

সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়, কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে খাদ্য গ্রহণে আর ব্যথার নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং যতক্ষণ শূলবেদনা থাকিবে ততক্ষণ পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবে। লেবুর রস সহ জল ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য স্পর্শ করিবে না।

আমাদের দেহের রক্ত ক্ষারধর্মী। এই রক্ত হইতেই দেহের সমুদয় যন্ত্র, সমুদয় গ্রন্থি স্বীয় খাদ্য ও পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করে। এই রক্তই সমুদয় দেহকে পোষণ করে। বিশুদ্ধ রক্তে অম্লরসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং রোগীদের খাদ্য এমনভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিত যাহার অধিকাংশই হয় ক্ষারধর্মী এবং অল্পপরিমাণ হয় অম্লধর্মী। দুধ, ঘোল, সমুদয় শাক-সব্জী ও ফল ক্ষারধর্মী খাদ্য। ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, মাখন প্রভৃতি অম্লধর্মী খাদ্য। শূল রোগীর খাদ্যের ৫ ভাগের ৪ ভাগই যেন ক্ষারধর্মী খাদ্য হয়, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা ইচ্ছাপূর্বক খাদ্যবিষয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই হউক, যাহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত অম্লধর্মী খাদ্য গ্রহণ করে ও যথোচিত শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাহাদের দেহই বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন সধবা মেয়ের সংখ্যা খুব কম। এইসব মেয়েদের বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর নীরোগ হয়। নিরামিষ ভোজন এবং আনুষঙ্গিক উপবাসই এই রোগারোগ্যের হেতু।

রোগের প্রবলতা হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত রোগীকে শক্ত খাদ্য খাইতে দিবে না। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে এক বলকের পাতলা দুধ বা নারিকেল দুধ, ঘোল, মাখনতোলা দধি, তরকারির ঝোল, ফলের রস ও টক ফল প্রভৃতি পথ্য দেবে। রোগারোগ্য ও হজমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে ভাত, রুটি, তরিতরকারি, দুধ প্রভৃতি পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। মাংস, ডিম, ঘি, মাখন, ডাল, মৃত মাছ, অধিক তৈল-ঘি মশলাযুক্ত খাদ্য, চা, সিগারেট, বিড়ি, ছানা বা ছানার তৈরি মিষ্টদ্রব্য, কচুরী, সিঙ্গাড়া এবং তৈলে বা ঘিয়ে ভাজা অন্যান্য দ্রব্য ও চিনি বর্জন করিবে। চিনির পরিবর্তে পরিষ্কার গুড় অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিবে। পাতে কাঁচা লবণ খাইবে না।

শ্বাসনালীর প্রদাহ
ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis)

এই রোগে শ্বাসনালীর প্রদাহ ও স্ফীতি ঘটে। শ্বাসনালীর ইংরেজী নাম ব্রঙ্কি (Bronchi-Plural of 'Bronchus')। এই ব্রঙ্কির স্ফীতির জন্যই ইহার নাম ব্রঙ্কাইটিস। এই রোগটির প্রভুত্ব পৃথিবীর সর্বত্র, তাই এই রোগের ব্রঙ্কাইটিস নামটিও আন্তর্জাতিক নামে পরিণত হইয়াছে।

লক্ষণ—প্রথমতঃ সামান্য সর্দি ও কাশি সহ একটু জ্বর হয়। রোগী কোনো খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে এবং কথাবার্তা বলিতেও গলায় একটু বেদনা বোধ করে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসেও একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বুকে একটু অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয়। অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই এই রোগটির প্রাধান্য বেশি। এই রোগটি বৃদ্ধি পাইলে ইহা টাইফয়েড বা নিউমোনিয়া রোগে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং এই রোগটিও বালক-বালিকা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যাধি। রোগী যদি অত্যধিক অস্বস্তি অনুভব করে, জ্বর যদি ১০৩ ডিগ্রি বা তার চেয়েও বেশি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ব্রঙ্কাইটিস রোগ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া রোগে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

কারণ—দুর্বল ফুস্‌ফুস্, দুর্বল তালুগ্রন্থি (টন্‌সিল্) এই রোগের প্রধান বা প্রত্যক্ষ কারণ। ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শ, শ্বাসের সহিত ধূম, ধূলি ও কুয়াশা প্রভৃতির ফুস্‌ফুসে প্রবেশ এই রোগ সৃষ্টির গৌণ বা পরোক্ষ কারণ।

চিকিৎসা—রোগী জ্বরে শয্যাশায়ী হইলে একমাত্র উপবাসই এই রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা। যতদিন জিহ্বা সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হয়, জিহ্বায় সাদা কোটিং থাকে, ততদিন রোগীকে কোনো খাদ্য দিবে না। রোগীর পিপাসা অনুযায়ী রোগীকে গরম জল বা লেমনেড দিবে। রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার হইলে এবং রোগী খুব ক্ষুধা বোধ করিলে রোগীকে ফলের রস

এবং অর্ধেক জল মিশ্রিত দুধ পথ্য রূপে দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার ও ক্ষুধা বোধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে যদি দুধ, ফলের রস বা ফল খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেই এই ব্রঙ্কাইটিস টাইফয়েড রোগে বা নিউমোনিয়া রোগে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ঘটিবে। রোগী শয্যাশায়ী না হইলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিবে।

শিশুদের—পাশ্চাত্ত্য প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪—ভোরে, দ্বিপ্রহরে, বৈকালে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিভোজনের পূর্বে—এই পাঁচবার প্রত্যহ অভ্যাস করিবে। প্রত্যেকটি অভ্যাসের সময় ২ মিনিট। প্রত্যেকটি প্রাণায়াম অভ্যাসের ২/৪ মিনিট পরে অন্য প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে।

বয়স্কদের—সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৭, ৯ অনুরূপভাবে পাঁচবার ২/৩ মিনিট অন্তর অভ্যাস করিবে। ভ্রমণ-প্রাণায়াম সকালে ও বৈকালে। রোগী সক্ষম হইলে এই সব প্রাণায়ামের সহিত সহজসাধ্য যোগাসনাদি করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—আংশিক উপবাস, আতপস্নান, লঘুপথ্য, বমন-ধৌতি দ্রুত রোগ আরোগ্যে সহায়ক।

শ্বেতকুষ্ঠ

লক্ষণ—আয়ুর্বেদে চর্মরোগের নাম কুষ্ঠ। ১৮ রকমের কুষ্ঠরোগের বর্ণনা আয়ুর্বেদে আছে। ইহার মাঝে ৭ প্রকার মহাকুষ্ঠ এবং ১১ প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। শ্বেতকুষ্ঠের আয়ুর্বেদীয় নাম **শ্বিত্র**। এই শ্বিত্র বা ধবল রোগ ক্ষুদ্রকুষ্ঠের অন্তর্গত। মহাকুষ্ঠব্যাধি রসাদি সপ্তধাতুকেই আক্রমণ করে, কিন্তু শ্বিত্র কেবল রক্ত, মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্যান্য কুষ্ঠরোগে রক্তস্রাব হয়, কিন্তু শ্বিত্র অস্রাবী।

এই রোগে আক্রান্ত স্থান প্রথমে একটু লাল্‌চে হয়, পরে উহা সাদা হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই রোগটি সংক্রামক নয়, তবুও সমুদয়

গাত্রচর্মের বিকৃতির জন্য এইরূপ রোগীকে মানুষ ভয় ও বিতৃষ্ণার চোখে দেখে এবং যথাসাধ্য রোগীর স্পর্শ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে।

কারণ—চর্মের মাঝে যে রোগ প্রতিষেধক শক্তি আছে তাহা বিশেষ ভাবে দুর্বল হইয়া পড়িলেই দেহের চর্ম এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। রক্তে যে পরিমাণ অম্লরসের ভাগ থাকা উচিত তাহার চেয়ে অম্লরসের ভাগ বেশি হইলে ঐ অম্লবিষের প্রভাবে চর্মের রোগ প্রতিষেধক শক্তি নষ্ট হয়। সুতরাং দূষিত রক্তই এই রোগের মূল কারণ। রক্ত দূষিত হইলে যকৃতের ক্রিয়াতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়—ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগও উৎপন্ন হয়। সুতরাং যকৃৎদোষ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিই এই রোগের আনুষঙ্গিক কারণ।

পাইওরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিরা দীর্ঘদিন যাবৎ এই রোগ পোষণ করিলে উহার ফলে শ্বেতী রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। পাইওরিয়ার পুঁজ দেহে সঞ্চিত হইলে এই সঞ্চিত বিষের মাঝে অসংখ্য শ্বেত রোগবীজাণু সৃষ্টি হয়। সুতরাং পাইওরিয়াও শ্বেতী রোগ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ। শ্বেতী রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করিতে গিয়া আমরা আমাদের এই উক্তির প্রমাণ বহুক্ষেত্রে পাইয়াছি। যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এই বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নাই। তবুও **আধুনিক যুগের চিকিৎসকদের আমরা আমাদের এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার অনুরোধ জানাইতেছি। শ্বেতীরোগীর যদি পাইওরিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ রোগারোগ্যের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিতে হইবে।**

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি; অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর অর্ধস্নান বা স্নান। অনন্তর সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৬, নং ৮; অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার, নং ২—৪ বার। সহজ অগ্নিসার ২৫ বার, বারিসার ধৌতি। **বারিসার ধৌতি এই রোগারোগ্যে বিশেষ সহায়ক।**

(সন্ধ্যায়)—উড্ডীয়ান, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার

ধৌতি নং ১, হলাসন, শয়ন পশ্চিমোত্তান, মৎস্যেন্দ্রাসন, শীর্ষাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৬, নং ৭, উষ্ট্রাসন, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

আতপস্নানবিধি, জলপানবিধি, জলস্নানবিধি, উপবাসবিধি এবং ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে। (এই প্রসঙ্গে 'গলিতকুষ্ঠরোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

নিয়ম ও পথ্য—মাছ, মাংস ও ডিম সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। ছানা এবং ছানার তৈরি মিষ্টি-মিঠাই এবং চিনি সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। চা খাওয়া, অতিরিক্ত পান খাওয়া, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। রন্ধনে অধিক তৈল, ঘি ও মশলা ব্যবহৃত না হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। দুধ, শাক-সব্জী, টক ও মিষ্টি ফল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্য এই রোগে সুপথ্য। সম্ভবপর হইলে দিনে ভাত এবং রাত্রে রুটি খাইবে। ঘন ডালের পরিবর্তে পাতলা ডাল বা ডালের যুষ খাইবে। মুড়ি ও চিড়া খাইবে না। যকৃতের দোষ, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অজীর্ণদোষ আরোগ্যের ব্যবস্থা করিবে। ঘি-মাখন বর্জন করিবে।

এই রোগ একবার দেহকে আক্রমণ করিলে সহজে আর আরোগ্য হইতে চায় না। ২/৩ বছর নিষ্ঠার সহিত উল্লিখিত যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করিলে এবং পথ্যাদির নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিলে এই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অল্পদিনের রোগ হইলে খুব তাড়াতাড়ি আরোগ্য হইবে।

আমাদের যৌগিক হাসপাতালে ভর্তি হইয়া অথবা আমাদের নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করিয়া যে সব শ্বেতকুষ্ঠ রোগী যৌগিক ক্রিয়াদি নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহারা সকলেই এই রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছে।

এই রোগ ঔষধে আরোগ্য হয় না, সুতরাং এই রোগাক্রান্ত নর-নারীদের ঔষধের মোহ ত্যাগ করিয়া এই যোগবিদ্যার শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ জানাইতেছি।

শোথ রোগ

লক্ষণ—চোখের পাতা, মুখ, হাত-পা, উদর প্রভৃতি স্ফীত হইয়া উঠা এবং ঐ সব স্ফীত স্থানে আঙ্গুলের চাপ পড়িলে গর্ত হইয়া যাওয়া শোথ রোগের লক্ষণ।

কারণ—"**রক্তপিত্তকফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরাঃ। নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্যাৎ ত্বক-মাংসসংশ্রয়ম্।**"—বায়ু দূষিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহে লইয়া গিয়া নিজে অবরুদ্ধগতি হইয়া ঐ দূষিত পদার্থগুলিকে ত্বক ও মাংসের আশ্রয়ে সঞ্চিত করে—ইহার নাম শোথ রোগ।

ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি শরীরের যে সমস্ত যন্ত্র রক্তে সঞ্চিত পিত্তবিষ, শ্লেষ্মাবিষ প্রভৃতি দূষিত পদার্থকে রক্ত হইতে বাহির করিয়া দেয়, সেইসব যন্ত্রের ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইলে দেহে এই শোথ রোগ উৎপন্ন হয়। দেহপ্রকৃতি কোষ্ঠতারল্য সৃষ্টি করিয়া বিকৃত পিত্ত প্রভৃতিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ দূষিত পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রভৃতি দেহ হইতে যদি বাহির হইতে না পারে, তবে উহাও দূষিত বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শরীরের যে কোনো স্থানে শোথ উৎপন্ন করিতে পারে।

মূত্রগ্রন্থি (Kidney) রক্তকে শোধন করে। রক্তের অপ্রয়োজনীয় জলীয় ভাগ এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ রক্ত হইতে ছাঁকিয়া পৃথক করিয়া মূত্রাশয়ে প্রেরণ করে এবং মূত্রাশয় হইতে উহা মূত্রনালীপথে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, মূত্রগ্রন্থি দুর্বল হইয়া পড়িলে মূত্রগ্রন্থি আর রক্তের অপ্রয়োজনীয় দূষিত জলীয় অংশ মূত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না—ফলে উহা পদদ্বয়ের স্নায়ুতন্তুতে এবং স্নায়ুকোষে আসিয়া সঞ্চিত হয়।

শুধু চোখের পাতায় এবং পদদ্বয়ে জল সঞ্চিত হইয়া স্ফীত হওয়া একমাত্র মূত্রগ্রন্থির রুগ্নাবস্থারই পরিচায়ক।

প্লীহা এবং যকৃতেরও মূত্রযন্ত্রের মতোই রক্তশোধনের দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনে তাহারা যখন অক্ষম হয়, তখন উদরে শোথ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ উহা অন্য অঙ্গেও ছড়াইয়া পড়ে।

কোনো আকস্মিক কারণে (হঠাৎ ভয় পাইয়া আত্মরক্ষার্থে দ্রুতধাবনাদি কারণে) দ্রুত রক্ত পরিচালনার প্রয়োজন হইলে প্লীহা-যকৃৎ প্রভৃতি তখন আর রক্ত শোধনের কাজে মনোযোগ দেওয়ার অবসর পায় না। দুর্বল মূত্রগ্রন্থি ও প্লীহা-যকৃৎ দেহের সমুদয় রক্তকে শোধন করিতে পারে না। প্লীহা, যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থির এই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবার ভার ফুস্‌ফুসের উপর। অবিশুদ্ধ রক্ত আহরণ করিয়া হৃদ্‌যন্ত্র উহা শোধনের জন্য ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করে। ফুস্‌ফুস্‌ ঐ রক্ত হইতে অঙ্গারাম্ল (কার্বন) নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়, রক্তের দূষিত জলও ছাঁকিয়া পৃথক করিয়া রাখে; হৃদ্‌যন্ত্র উহা দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্বল হইলে রক্তের ঐ দূষিত জলীয় ভাগ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না—ফলে উহা মুখে ও নিম্নাঙ্গে সঞ্চিত হইয়া শোথ উৎপন্ন করে। এই হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতার জন্য শোথ রোগ হইলে পদদ্বয় এবং মুখ ছাড়াও পৃষ্ঠদেশেও শোথের প্রকাশ হয় এবং সেই সঙ্গে শ্বাস কৃচ্ছ্রতা ও 'বুক-ধড়ফড়ানি' সৃষ্টি হয় এবং রোগ বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

মেয়েদের ঋতুর গোলমাল হইলে অথবা মেয়েদের সন্তানসম্ভাবিতা-বস্থায় কখনো কখনো শোথ রোগ দেখা দেয়। এই শোথরোগ সাময়িক, স্বাস্থ্যনীতি ও পথ্য সম্বন্ধে একটু সচেতন হইলেই উহা ভালো হইয়া যায়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি, প্রাতঃকৃত্যাদির পর অগ্নিসার ধৌতি ১নং ১০ বার, ২নং ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৮; বারিসার ধৌতি বা বমন ধৌতি।

(সন্ধ্যায়)—সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা বা বিপরীতকরণী মুদ্রা, সহজ শীর্ষাসন, যোগমুদ্রা; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩; অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, স্নানবিধি ও জলপানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে। প্রত্যহ আতপস্নান গ্রহণ করিবে। স্নানের পূর্বে তৈল দ্বারা সর্বশরীর বিশেষভাবে মর্দন করিবে। জল একেবারে এক গ্লাস খাইবে না, অল্প পরিমাণে বারে বারে খাইবে।

নিয়ম ও পথ্য—শোথরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ২/৩ দিন উপবাস দিবে। উপবাসের সময় লেবুর রস মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে খাইবে, অথবা জলের পরিবর্তে ডাবের জল খাইবে। উপবাসের পরও ২/১ দিন পরিমিত মাত্রায় পাতলা দুধ, কমলা, বেদানা বা আঙ্গুর রস অথবা ডাবের জল খাইয়া থাকিবে। অতঃপর ক্ষুধা অনুযায়ী সহজপাচ্য লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে। পুরাতন চালের অন্নের সহিত তরিতরকারীর ঝোল, মুগ বা মুশুরী ডালের জুস, সুপক্ক কলা সহ দুধ বা ঘোল এই রোগে সুপথ্য। এইরূপ পথ্যাদি গ্রহণে শরীর কথঞ্চিৎ সবল হইলে, রোগমুক্ত হইলে ওল, ডুমুর, কাঁচকলা, কচি বেগুন, লাউ, সজিনার ফুল বা ডাঁটা, আদা, পেঁয়াজ, পেঁপে, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা, পলতাপাতা, পাতলা মুশুরী ও মুগডাল, দুধ, ঘোল, সুপক্ক ফলাদি প্রভৃতির ভিতর হইতে নিজের রুচিমত পথ্যাদি নির্বাচন করিয়া লইবে।

পথ্যের সহিত কখনো কাঁচা লবণ খাইবে না। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ঘিয়ে-ভাজা, তেলে-ভাজা খাদ্য খাইবে না। চিড়া-মুড়ি খাইবে না। প্রত্যহ জল বা দুধের সহিত ছোটো চামচের ২/৩ চামচ খাঁটি মধু খাইবে। অতিরিক্ত চা অথবা তামাক-সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

সন্ন্যাস ও মৃগীরোগ

লক্ষণ—আয়ুর্বেদে মৃগীরোগ অপস্মার মূর্ছার অন্তর্গত। সন্ন্যাসরোগ সান্নিপাতিক মূর্ছার অন্তর্গত। এই রোগ আকস্মিকভাবে নিপাত বা মৃত্যু

ঘটায় বলিয়া ইহার নাম সান্নিপাতিক মূর্ছা। মৃগীরোগের নাম **অপস্মার**। সন্ন্যাসরোগ এবং মৃগীরোগের পার্থক্য অতি সামান্যই। এইজন্যই এই দুই রোগের বিবরণ এবং চিকিৎসাপ্রণালী আমরা একসঙ্গেই বর্ণনা করিব।

মূর্ছারোগ শারীরিক দুর্বলতার জন্য উৎপন্ন হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ ভালোও হয়; কিন্তু সন্ন্যাস ও মৃগীরোগ বিপজ্জনক দুরারোগ্য ব্যাধি (এই প্রসঙ্গে মূর্ছা এবং হিস্টিরিয়া রোগ বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

"সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখ-দুঃখ ব্যাপোহকৃৎ"—সংজ্ঞাবহা নাড়ী অর্থাৎ যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে বোধশক্তি পৌঁছাইয়া দেয় এবং যে ধমনীগুলি রক্ত সরবরাহ করে, এই সমস্ত সংজ্ঞাবহা নাড়ী ও অন্তর্বাহী ধমনীগুলি প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন বহির্বাহিনী ও অন্তর্বাহিনী ধমনী ও আজ্ঞাবহা এবং সংজ্ঞাবহা নাড়ী (Efferent & Afferent nerves) নিষ্ক্রিয় হওয়া এবং মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের অভাব ঘটায় রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অজ্ঞান হইয়া পড়িবার সময় রোগী প্রায়ই একরূপ উৎকট চীৎকারধ্বনি করে।

অধিকাংশ রোগীই রোগাক্রমণের পূর্বে রোগাক্রমণের লক্ষণ টের পায়। এই লক্ষণ রোগীবিশেষে নানাবিধ হয়—কাহারো বৃদ্ধাঙ্গুলি বা কবজি বাঁকিতে আরম্ভ করে, কেহ বা শরীরে ছুঁচ ফোটার মতো বেদনা অনুভব করে, কাহারো পাকস্থলী হইতে একটা বেদনা উঠিয়া দ্রুত মস্তিষ্কের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, কেহ বা একটা দুর্গন্ধ অনুভব করে, কাহারও বা মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করে। এইরূপ আক্রমণের লক্ষণ টের পাইলেও রোগীর সাবধান হইবার বা নিরাপদ স্থানে আসিবার সময় থাকে না—রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর সর্বাঙ্গে আক্ষেপ বা খিঁচুনী আরম্ভ হয়, রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, রোগীর মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয়। সময় সময় এই অবস্থায় রোগীর অসাড়ে মূত্র নির্গত হয়। কিছু সময় পরেই রোগীর দেহের খিঁচুনী দূর হয়, জ্ঞান ফিরিয়া আসে, রোগী শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

কারণ—শুধু ২/১টি কারণে নয়, বহু কারণেই এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। শৈশব হইতেই যাহারা আরামপ্রিয় বা মিষ্টি-মিঠাইপ্রিয়, তাহাদের দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব হেতু এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। শৈশবে যাহারা মাতৃদুগ্ধ পায় না, তথাকথিত শিশুখাদ্য (Baby Food, Powder Milk) যাহাদের দেওয়া হয়, তাহারাও এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। যকৃৎ যদি ঠিকভাবে খাদ্যরসকে রক্তে পরিণত করিতে না পারে, অথবা মূত্রগ্রন্থির কার্যকারিতায় যদি কোনো ত্রুটি ঘটে, তাহা হইলেও এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

পিতা-মাতার মধ্যে একজন বা উভয়ে যদি অত্যধিক কাম-ক্রোধপরায়ণ হয় বা স্বাস্থ্যহীন হয় অর্থাৎ হাঁপানি, পিত্তদোষ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ এই রোগে আক্রান্ত হয়। অতিরিক্ত কামুকতাও একটা রোগবিশেষ; অতিরিক্ত কামুকদের দেহস্থ স্নায়ু-ধমনীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, দেহে স্নায়ু-দৌর্বল্য রোগাদি উৎপন্ন হয়। দেহের এই দোষযুক্ত অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সেই সন্তানেরও স্নায়ু-ধমনী দুর্বল হয়। এই দুর্বল ধমনী মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না। এইরূপ সন্তানদের ভিতর একটু বুদ্ধিভ্রংশ বা পাগলামির ভাবও প্রকাশ পায়। স্নায়ু-ধমনীর দুর্বলতা হেতু মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের সাময়িক অভাবের জন্য রোগী মূর্ছিত হইয়া পড়ে।

অতি শৈশব হইতে অথবা ১০ হইতে ২০/২২ বৎসরের মাঝে যাহারা মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদের এই রোগের মূল পূর্বোল্লিখিত যেকোনো কারণ অথবা পিতা-মাতার উল্লিখিত অসংযম এবং স্বাস্থ্যহীনতা। ২৪/২৫ বৎসর বয়সে অথবা তাহার পরে যাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদের এই রোগাক্রমণের মূলে থাকে নিজের ত্রুটি, নিজের পাপ। অতিরিক্ত কামুকতা, অতিরিক্ত চা, তামাক বা মদ্যাদি সেবন, উপদংশ রোগ অথবা অতি পুরাতন ভয়াবহ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে দেহে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং এই সঞ্চিত বিষের আক্রমণে স্নায়ু-ধমনী দুর্বল ও অবসন্ন

হইয়া এই রোগ সৃষ্টি হয়। দুর্বল ধমনীগুলি রক্ত সরবরাহের চাপ সব সময়ে ঠিক রাখিতে পারে না ফলে কখনো কখনো ইহারা আহত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়। ধমনীর এই বিদীর্ণতা যখন মস্তিষ্কে ঘটে, তখন বয়স্কদের দেহে প্রথম মৃগীরোগের মূর্ছা আত্মপ্রকাশ করে।

মৃগীরোগ ও সন্ন্যাসরোগের পার্থক্য এই—মৃগীরোগের খিঁচুনী থাকে, সন্ন্যাসরোগের খিঁচুনী থাকে না। সন্ন্যাসরোগ মৃগীরোগের চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক। সন্ন্যাসরোগে মূর্ছা যে কোনো সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ারোধের ফলে চিরমূর্ছায় পরিণত হইতে পারে। মস্তিষ্কের ধমনী ছিন্ন হইয়া মস্তিষ্কে রক্তস্রাবের ফলে যে মূর্ছা হয়, তাহাই সন্ন্যাসরোগ। মস্তিষ্কে অধিক রক্ত ক্ষরিত হইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য সন্ন্যাসরোগী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃগীরোগী অত্যধিক উত্তেজিত না হইলে বা জলের মাঝে অথবা আগুনের সংস্পর্শে মূর্ছিত হইয়া না পড়িলে সহসা তাহার প্রাণবিয়োগের আশঙ্কা ঘটে না। বলা বাহুল্য, মৃগীরোগে কখনও রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হয় না, সুতরাং মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তস্রাবও ঘটে না। বয়স্কদের নিজের অর্জিত মৃগী ও সন্ন্যাসরোগে মানসিক অবনতি ঘটে না, কিন্তু রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, স্মৃতিশক্তির ক্রমবিলুপ্তি ঘটে ও রোগী ক্রমশঃ জড়স্বভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১ (খ), দন্তধাবন ও প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাববাথ ১০ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৮, নং ৯; অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২ ; সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, বারিসার ধৌতি, ভ্রমণ-প্রাণায়াম। (দ্বিপ্রহরে)—টাববাথ ৩০ মিনিট। সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, সহজ প্রাণায়াম ৩ মিনিট। (বৈকালে)—টাববাথ ৫ মিনিট, ভ্রমণ-প্রাণায়াম। (সন্ধ্যায়) সহজ বিপরীতকরণী, যোগমুদ্রা, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, ২ ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, ৭, ৯, উড্ডীয়ান, সহজ অগ্নিসার ৫০ বার।

আতপস্নানবিধি, জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে। সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়ামের মাত্রা ক্রমশঃ বর্ধিত করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—মূর্ছার সময় সম্ভবপর হইলে রোগীকে ধরিয়া বসাইয়া রাখিবে এবং রোগীর জিহ্বা উভয় দন্তের ফাঁক হইতে সরাইয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিবে এবং ঐ ফাঁকে একখানা ভিজা নেকড়া ভাঁজ করিয়া বসাইয়া দিবে অথবা একটি তুলার প্যাড দিবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দন্ত ঘর্ষণে রোগীর জিহ্বা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। মূর্ছা অন্তে রোগীর তালু, চোখ, মুখ, কান, ঘাড় একটু জলের হাতে ভিজাইয়া দিবে এবং একটি ভিজা গামছা দ্বারা সর্বশরীর মুছাইয়া রোগীকে শয্যায় কাৎ করিয়া শোওয়াইয়া দিবে। এইরূপ শোয়ানোর সময় রোগীর মাথার নীচে কোনো বালিশ বা অন্য কোনো উপাধান দিবে না। রোগীকে নিরুপদ্রবে ঘুমাইবার সুযোগ দিবে।

ধূম ও ধূলি বর্জিত রাস্তায় বা মাঠে রোগী খালি পায়ে প্রত্যহ ভোরে এবং সন্ধ্যায় আধঘণ্টা হইতে একঘণ্টা ভ্রমণ করিবে। বলা বাহুল্য, এই ভ্রমণের সময়ই ভ্রমণ-প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। রোগীকে দিনের বেলায় ঘরে খোলা বারান্দা বা মুক্ত স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগীর যাহাতে সর্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগীকে কখনো একা পুকুরে বা নদীতে স্নান করিতে দিবে না।

যৌগিক চিকিৎসার সময় এই রোগীকে ঘি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম, তেলে-ভাজা, ঘিয়ে-ভাজা পথ্য দেওয়া নিষিদ্ধ। পাতলা ডাল বা ডালের জুস, প্রচুর শাক-সবজি, দুধ, ফল, অল্প পরিমাণে ভাত বা আটার রুটি রোগীর পক্ষে সুপথ্য। ফলের মধ্যে কলা রাত্রে খাওয়া নিষিদ্ধ। কোনো খাদ্যের সঙ্গেই রোগীকে কাঁচা লবণ খাইতে দিবে না।

সর্দিরোগ

লক্ষণ—নাসিকা হইতে জলীয় শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মাথাভার, শারীরিক অসুস্থতা বোধ বা ঈষৎ জ্বরভাব প্রভৃতি সর্দির সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে।

কারণ—খাদ্য ভালো জীর্ণ না হইলে, কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি হইলে, স্যাঁৎস্যেঁতে ঘরে বাস করিলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ধূলিপূর্ণ বায়ু গ্রহণ করিলে, হঠাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগাইলে বা বৃষ্টিতে ভিজিলে সর্দি হয়।

যোগশাস্ত্রের ভাষায়—যাহাদের নভঃগ্রন্থি ও বায়ুগ্রন্থি বা ফুস্‌ফুস্‌, টন্‌সিল প্রভৃতি দুর্বল তাহারা সর্দি দ্বারা আক্রান্ত হয়। আবার যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির পূর্বলক্ষণও এই সর্দি। বলা বাহুল্য, নভঃগ্রন্থি, বায়ুগ্রন্থি প্রভৃতি বিশেষভাবে দুর্বল না হইলে এইসব মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে না।

সর্দি উৎপন্ন হয় রক্তের দূষিত জলীয় অংশ হইতে। রক্তে দূষিত জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি হইলেই শরীর সর্দির বীজাণু এবং অন্যান্য রোগবীজাণু উৎপত্তি ও বৃদ্ধির অনুকূল হইয়া উঠে। দেহপ্রকৃতি তখন সর্দি উৎপন্ন করিয়া দেহকে যথাসাধ্য রোগবিষ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে।

যাহাদের দেহ অগ্নিগ্রন্থি প্রধান অর্থাৎ পিত্তপ্রধান তাহাদের সর্দি খুব কদাচিৎ হয়। যাহাদের পাগল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যাহারা পাগল হইয়াছে তাহাদের কখনো সর্দি হয় না সুতরাং বৎসরে ২/১ বার সর্দি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভালো, উহাতে অন্ততঃ পাগল হওয়ার আশঙ্কা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, ৩, ৭, ৯, অগ্নিসার ধৌতি ১নং; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

(মধ্যাহ্নে)—আতপস্নান। সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭, ৯।

(সন্ধ্যায়)—সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, নং ৭, নং ৯; শীর্ষাসন অথবা শশাঙ্গাসন, উড্ডীয়ান, ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, উষ্ট্রাসন ৩ বার।

নিয়ম ও পথ্য—তরুণ সর্দিতে আংশিক উপবাস দিবে অর্থাৎ এমন লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে যাহা সহজেই জীর্ণ হয় এবং যথাসময়ে খুব ক্ষুধার

উদ্রেক করে। সর্দি হইলে একদিন বা দুইদিন পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ প্রয়োজন। বিশ্রামের সময় লেপ বা কম্বলাদি দ্বারা ঢাকিয়া শরীরকে বেশ গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং আধঘণ্টা বা একঘণ্টা অন্তর অন্তর এক গ্লাস গরম জল পান করিবে। লেপ-কম্বলের নীচে শুইয়া এইরূপ গরম জল পান করিলে শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ ঘর্ম সর্দি আরোগ্যে বিশেষ সহায়ক, ঘর্মের ভিতর দিয়া শরীরের সঞ্চিত বিষ প্রচুর পরিমাণে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

উপযুক্ত গরম জামা-কাপড়ে শরীর আবৃত করিয়া গলাবন্ধ দ্বারা গলদেশ এবং টুপি বা পাগড়ি দ্বারা মস্তক বা কর্ণ ঢাকিয়া মুক্ত হাওয়ার মাঝে সকালে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

শুধু ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ প্রাণায়াম ও আতপস্নান দ্বারাই সাধারণ সর্দি রোগ সহজে আরোগ্য হয়। ভ্রমণ-প্রাণায়াম ভালো আয়ত্ত হইলে শুধু সর্দি নয় ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ দেহকে কখনো আক্রমণ করিতে পারে না।

সুপ্তিস্খলন বা স্বপ্নদোষ রোগ

লক্ষণ—মেয়েদের পক্ষে নিয়মিত মাসিক ঋতু যেমন স্বাভাবিক ব্যাপার, অবিবাহিত যুবকদের পক্ষেও তেমনি মাসে দুইদিন অথবা তিনদিন (খুব জীবনীশক্তিসম্পন্নদের পক্ষে ৪ দিন) সুপ্তিস্খলন স্বাভাবিক ব্যাপার—ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের রায়।

যোগশাস্ত্রমতে **সুপ্তিস্খলন স্বাভাবিক নয়**, উহাও রোগবিশেষ—যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে এই রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করা যায়। [আমরা আমাদের **ব্রহ্মচর্য** ও **ছাত্রজীবন** নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।]

দিনের তন্দ্রা বা নিদ্রার মাঝে সুপ্তিস্খলন, রাত্রে দুইবার সুপ্তিস্খলন অথবা যে রাত্রে সুপ্তিস্খলন হইয়াছে তাহার পরদিন ভোরে যদি শরীর দুর্বল বলিয়া মনে হয় এবং মাথা ঘোরে বা ঝিম্ ঝিম্ করে, সুপ্তিস্খলন মাসে ৫/৬ দিন বা ততোধিক হইতে আরম্ভ করে, অথবা সুপ্তিস্খলনের সময় যদি ঘুম না ভাঙ্গে, সুপ্তিস্খলনে স্নায়ু উত্তেজনায় সুখবোধ যদি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে—সুপ্তিস্খলন রোগ দুরারোগ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

কারণ—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অথবা প্রথম যৌবনে হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ই এই রোগের কারণ। দুধ মন্থনে যেমন মাখন সৃষ্টি হয়, তেমনি রক্ত মন্থনে শুক্র উৎপন্ন হয়। মাখন যেমন দুধের সারাংশ, শুক্রও তেমনি শরীরের সারাংশ। মাখনতোলা দুধ যেমন নিঃসার, তেমনি অত্যধিক শুক্রক্ষয়ে রক্তও নিঃসার হয়। নিঃসার রক্ত শরীরের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিসাধন করিতে পারে না, শরীরকে সুস্থ সবল রাখিতে পারে না।

এইজন্যই শরীর সুগঠিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫ বৎসরের পূর্বে অস্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় যুবকদের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী। কুসঙ্গে পড়িয়া অথবা শুক্রক্ষয়ের অপকারিতা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকায় কিশোর ও তরুণরা হস্তমৈথুনাদি বদভ্যাসে লিপ্ত হয় এবং পরিণামে এইজন্য তাহাদের শাস্তি পাইতে হয় এবং অনুতাপ ভোগ করিতে হয়। বলা বাহুল্য অল্পবয়সে বিবাহিত হইয়া অতিরিক্ত অসংযমী হইলে বিবাহিতদেরও এই রোগ ভোগ করিতে হয়।

যে সমস্ত যুবক জীবনে কখনো স্বাভাবিকভাবে রেতঃপাত করে নাই, যাহাদের কামভাব প্রবল নয়, এইরূপ শুদ্ধচরিত্র নিষ্কলঙ্ক যুবকেরাও সময় সময় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার মূল কারণ—নিজের স্বাস্থ্যহীনতা ও স্নায়ুদৌর্বল্য অথবা পিতা-মাতার স্বাস্থ্যহীনতা এবং তাঁহাদের প্রজাপতিগ্রন্থির অর্থাৎ যৌবনগ্রন্থিগুলির দুর্বলতা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শুক্রধাতু শরীর গঠনের প্রধান উপাদান। এই

শুক্রের সাহায্যে শরীরের যন্ত্রগুলি গঠিত ও পুষ্ট হয়। এই গঠনক্রিয়ার সময় কিছুটা শুক্র অকেজো হইয়া যায়। ইঞ্জিনকে তৈলসিক্ত করিলে খানিকটা তৈল যেমন ইঞ্জিনের গাত্র হইতে ক্ষরিত হইয়া পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে দেহগঠন ক্রিয়ায় সাহায্য করিতে গিয়া খানিকটা শুক্র অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এই অপ্রয়োজনীয় শুক্রই স্বপ্ন অবলম্বনে রাত্রে ক্ষরিত হইয়া যায়।

এই জন্যই মাসে ২/১ দিন সুপ্তিস্খলনে অবিবাহিত যুবকদের শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় না বরং ইহা একশ্রেণীর যুবকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সহায়তাই করে। সঞ্চিত শুক্র এইভাবে দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলে এইসব যুবকদের কামচিন্তা ও কামোত্তেজনার প্রবলতাও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি হইলে বা পেট-গরম হইলে শুক্র ঊর্ধ্বে উঠিয়া রক্তের সহিত মিশিতে পারে না। এইজন্য কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেট-গরম হইলে যুবকদের সুপ্তিস্খলন ঘটে, শুক্রকোষে সঞ্চিত শুক্র অধোগামী হইয়া স্খলিত হইয়া যায়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি; প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাববাথ ৫ মিনিট। টাবে বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা, মহাবন্ধ মুদ্রা, শক্তিচালনী মুদ্রা। সহজ প্রাণায়াম নং ৬, নং ৭, নং ৯ এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

(মধ্যাহ্নে)—টাববাথ ১০-১৫ মিনিট। টাবে বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, শক্তিচালনী মুদ্রা ৪ বার।

(সন্ধ্যায়)—মূলবন্ধ মুদ্রা, মহাবন্ধ মুদ্রা, শক্তিচালনী মুদ্রা। শীর্ষাসন ৩ মিনিট, সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, শয়নপশ্চিমোত্তান, হলাসন, সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট; সহজ প্রাণায়াম নং ৬, ৭, ৯ এবং ভ্রমণ প্রাণায়াম।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নানবিধি এবং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—দিবানিদ্রার অভ্যাস ত্যাগ করিবে। দ্বিপ্রহরের

আহারের পর ক্লান্তি বোধ করিলেও নিদ্রা যাইবে না, কিছু সময় শবাসন অবলম্বনে বিশ্রাম করিয়া শরীরের ক্লান্তি দূর করিয়া লইবে। দিবানিদ্রায় শরীরের রক্ত গরম ও উত্তেজিত হয়—এইজন্য **দিবা-নিদ্রা সুপ্তিস্খলনে সহায়তা করে**। দিবানিদ্রার ফলে রাত্রির ঘুমও খুব গভীর হয় না। ইহাও সুপ্তিস্খলনের অন্যতম কারণ।

শেষরাত্রে বা প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আলস্য ত্যাগ পূর্বক গাত্রোত্থান করিবে। তরুণ বয়সে মন স্বভাবতঃই চঞ্চল থাকে; নিদ্রাভঙ্গের পরও আলস্যবশতঃ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে মনের মাঝে বাজে স্বপ্ন উদিত হইতে থাকে। এই সময় কামোত্তেজক স্বপ্ন মনে জাগিলেই সুপ্তিস্খলন ঘটিবে। এইজন্যই **শেষরাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর আর শয়ন না করিয়া** অধ্যয়ন বা ধ্যান-ধারণা করিবে।

রাত্রির আহারের অন্ততঃ আধঘণ্টা পরে শয়ন করিবে। শয়নের পূর্বে মস্তক ও হস্ত-পদাদি ধৌত করিয়া এক গ্লাস শীতল জল পান করিবে এবং শয়নপূর্বক ভগবানের নাম করিতে করিতে শান্তমনে ঘুমাইয়া পড়িবে।

রাত্রি ৯ টার মধ্যে আহার সমাধা করিবে। অধিক রাত্রে খাদ্যগ্রহণে বাধ্য হইলে বরং উপবাস হিতকর, তবুও খাদ্যগ্রহণ অনুচিত। **কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে প্রায়ই সুপ্তিস্খলন ঘটে**। মাংস, ডিম, খেচরান্ন প্রভৃতি কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি করে। সুপ্তিস্খলন রোগীরা রাত্রে এই সব খাদ্য বর্জন করিবে। অল্প ভাত বা দুই বা চারিখানা রুটি, প্রচুর তরিতরকারি, আধসের অল্প জালের খাঁটি দুধ এই রোগে রাত্রের সু-পথ্য।

স্নায়ুদৌর্বল্য

(Nervous Debility)

লক্ষণ—রাজধানীর সহিত সমুদয় রাজ্যের যোগাযোগ রক্ষার জন্য

আধুনিক সভ্যজাতি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই ব্যবস্থা আমাদের দেহস্থ স্নায়ুমণ্ডলী পরিচালন ব্যবস্থারই অনুরূপ ; মস্তিষ্কই দেহরাজ্যের রাজধানী। দেহের শাসনকর্তার আদেশ-নির্দেশ এই স্নায়ুজালই দেহের সর্বত্র পরিবেশন করে। আর এক শ্রেণীর স্নায়ু দেহের যে কোনো স্থানের বিপদাপদের সংবাদ মুহূর্তের মাঝে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। এই দুই শ্রেণীর স্নায়ুর নাম আজ্ঞাবহা নাড়ী এবং সংজ্ঞাবহা নাড়ী (Efferent & Afferent nerve)। এইগুলি ছাড়া আর এক শ্রেণীর নাড়ী আছে (Sympathetic nerve) ; ইহারা রিজার্ভ সৈন্যের মতো। বিপদের সময় সক্রিয় হইয়া দেহরাজ্যকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে। হঠাৎ একটা পাগলা হাতি যদি আমাদের তাড়াইয়া আসে, তাহা হইলে তখন আমরা আত্মরক্ষার্থে দৌড়াইতে আরম্ভ করি। এইভাবে প্রাণপণে দৌড়াইবার সময় আমাদের দেহের মাংসপেশী, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের উপযোগী দ্রুত শক্তিপ্রবাহ পরিবেশন করার দায়িত্ব এই নাড়ী বা স্নায়ুগুলির উপর। [আয়ুর্বেদে স্নায়ু, শিরা, ধমনী প্রভৃতির সাধারণ নাম নাড়ী।] এই নাড়ীগুলির নিকট হইতে আকস্মিক বিপদ জ্ঞাপক সংবাদ পাইয়া পাকস্থলীর রক্তপ্রবাহ পাকস্থলীর ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়া মাংসপেশী ও হৃদ্‌যন্ত্রে দ্রুত রক্ত পরিবেশন করে। এই স্নায়ুগুলি হৃদযন্ত্রে দ্রুত রক্ত পরিবেশনে সহায়তা করে বলিয়াই আমরা তখন দ্রুত দৌড়াইতে পারি। শব্দবহা, গন্ধবহা, রূপবহা প্রভৃতি আরও বহুবিধ স্নায়ু বা নাড়ী আমাদের দেহে বিদ্যমান থাকিয়া নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতেছে। এই স্নায়ুগুলির বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়াই দেহের সমুদয় যন্ত্র পরিচালিত হয়। এই স্নায়ুগুলি দুর্বল হইলে দেহযন্ত্র আর সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, দেহ দুর্বল হইয়া পড়ে, দেহের কর্ম ক্ষমতা নষ্ট হয়, সামান্য কারণে রোগীর মাথা ঘোরে এবং রোগী মূর্ছিত হইয়া পড়ে।

স্নায়ুরোগের প্রাথমিক লক্ষণ—শরীরের কোনো স্থান হঠাৎ স্পন্দিত হওয়া, হঠাৎ নাচিয়া উঠা এবং সময় সময় ধূলিকণার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ কণা দর্শন।

কারণ—আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিচালনার জন্য স্নায়ুগুলিকে সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকিতে হয়। রাত্রে নিদ্রার সময় স্নায়ুগুলি কর্মব্যস্ততা হইতে ছুটি পাইয়া বিশ্রাম লাভ করে। এই বিশ্রামে উহাদের ক্লান্তি দূর হয় এবং উহারা সতেজ হইয়া উঠে। নিদ্রা অন্তে আবার উহারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করে।

দীর্ঘদিন যাবৎ যদি রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে স্নায়ুগুলি অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

দীর্ঘদিনের অম্ল ও অজীর্ণ রোগে শরীরে বিষ সঞ্চিত হয়, শরীরের রক্ত দূষিত হয়; হৃদ্‌যন্ত্র তখন আর বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না। স্নায়ুগুলি এই দূষিত রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না—এইজন্য উহারা দুর্বল হইয়া পড়ে। রক্তহীনতা রোগ সৃষ্টি হইলেও রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম হইয়া স্নায়ুগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। অবিবাহিত জীবনে অত্যধিক স্বমেহন এবং বিবাহিত জীবনে অতিরিক্ত অসংযমী হইলেও রক্ত নিঃসার হইয়া স্নায়ুরোগ সৃষ্টি করে। কোষ্ঠবদ্ধতা, ম্যালেরিয়া, উপদংশ প্রভৃতি রোগাক্রমণেও স্নায়ুরোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—সুপ্তিস্খলন রোগের অনুরূপ। (‘সুপ্তিস্খলন রোগ’ চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।) শুধু শক্তিচালনী ও মহাবেধ মুদ্রা অভ্যাস এই রোগে নিষ্প্রয়োজন।

নিয়ম ও পথ্য—রক্তহীনতা রোগের অনুরূপ। (‘রক্তহীনতা রোগ’ নিবারণ দ্রষ্টব্য।) স্নায়ুরোগ প্রবল হইয়া স্নায়ুপ্রদাহ সৃষ্টি করিলে উহাকে বলে স্নায়ুশূল রোগ। (এই প্রসঙ্গে ‘শূলরোগ’ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

হাঁপানী বা শ্বাসরোগ

লক্ষণ—“যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্বকঃ বিশ্বগ্‌ ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্‌ করোতি সঃ”—বায়ু কফাশ্রিত হইলে প্রাণনক্রিয়ায়

অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক স্রোতগতিতে বাধা পড়ে। এই কফাশ্রিত বায়ু রুদ্ধগতি হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে, ঠিক পথে এই বায়ু বাহির হইতে পারে না বলিয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি উহা গলনালী পার হইয়া সূক্ষ্ম শ্বাসনালীর ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুসে গিয়া পৌঁছায়। এই সূক্ষ্ম শ্বাসনালী শ্লেষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হইলে সহজভাবে আর শ্বাস ত্যাগ করা যায় না—শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, বুকে হাঁপ ধরিয়া যায়। এইরূপ হাঁপ ধরাকেই হাঁপানী বা শ্বাসরোগ বলে। হাঁপানীরোগ প্রাণহানিকর না হইলেও বড়ো কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ শেষরাত্রে আরম্ভ হয়, রোগীর নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে আক্রমণ প্রবলতর হইয়া উঠে।

কারণ—স্নায়ুর সাহায্যেই সমস্ত দেহযন্ত্রগুলি পরিচালিত হয়। যে সমস্ত স্নায়ুর সাহায্যে ফুস্‌ফুস্ সক্রিয় থাকে সেই স্নায়ুগুলি দুর্বল হইলে ফুস্‌ফুস্ সংলগ্ন সূক্ষ্ম শ্বাসনালীটি আর প্রয়োজনমত স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হইতে পারে না, সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। শ্বাসনালীর এই সঙ্কোচনের জন্যই রোগী শ্বাসকষ্ট অনুভব করে। বলা বাহুল্য, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া দুর্বল না হইলে ফুস্‌ফুস্ পরিচালিত স্নায়ু দুর্বল হয় না, ফুস্‌ফুস্ সংলগ্ন শ্বাসনালীর সঙ্কোচনও ঘটে না। যোগশাস্ত্রমতে ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি বায়ুগ্রন্থি, নভঃগ্রন্থি এবং অগ্নিগ্রন্থির দুর্বলতার ফলেই হাঁপানীরোগ সৃষ্টি হয়। ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া দুর্বল হইলে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসপ্রবাহ ক্ষীণ হয়। ঐ ক্ষীণ নিঃশ্বাস দেহের অঙ্গারাম্ল প্রভৃতি দূষিত বায়ু দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না, দূষিত বায়ু দেহে সঞ্চিত থাকিয়া দেহে রোগবীজাণু সৃষ্টি ও পুষ্টির ব্যবস্থা করে। অগ্নিগ্রন্থির দুর্বলতা হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হইলে দেহে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়, রক্ত দূষিত হয়। এই দূষিত রক্ত কিভাবে দেহের সমুদয় স্নায়বিক ক্রিয়ার বিপর্যয় ঘটায়, তাহা অন্যান্য রোগ প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে (অজীর্ণ, অম্ল, রক্তহীনতা, শূলরোগ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অগ্নিগ্রন্থি অর্থাৎ জঠরাগ্নির দুর্বলতাও এই রোগের অন্যতম কারণ।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি; সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৯ ; অগ্নিসার ধৌতি নং ১, সহজ অগ্নিসার। ভ্রমণ-প্রাণায়াম, বারিসার ধৌতি বা বমন ধৌতি।

(সন্ধ্যায়)—সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৯; পশ্চিমোত্তান, উড্ডীয়ান, যোগমুদ্রা, শশাঙ্গাসন, ভ্রমণ-প্রাণায়াম। ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপস্নান, জলস্নান এবং জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—যেদিন হাঁপানী রোগ আক্রমণ করিবে সেইদিন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে ('উপবাস-বিধি' দ্রষ্টব্য)। উপবাসের সময় শীতল জলের পরিবর্তে লেবুর রস সহ গরম জল পান করিবে। যদি একদিনের উপবাসে হাঁপানীর টান হ্রাস না পায়, তাহা হইলে আর একদিনের উপবাস দিবে। দ্বিতীয় দিনের উপবাসে হাঁপানীর টান অবশ্য হ্রাস পাইবে। হাঁপানীর টান সম্পূর্ণ হ্রাস না পাইলে তৃতীয় দিনে অর্ধোপবাস দিবে। অর্ধোপবাসের দিন দিনের বেলায় ভাত-রুটির পরিবর্তে তরকারীর ঝোল, একবলকের ছাগদুগ্ধ (অভাবে গোদুগ্ধ বা নারিকেল দুগ্ধ), আনারস, পেঁপে, বাতাবীলেবু, কমলা, বেল, আপেল, কিস্‌মিস্‌, বাদাম প্রভৃতি ফল পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিবে (কিস্‌মিস্‌, বাদাম প্রভৃতি শুষ্কফল খাওয়ার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্বে ভিজাইয়া রাখিতে হয়)। রাত্রে শুধু আধসের বা একপোয়া ছাগদুগ্ধ, অভাবে গোদুগ্ধ বা নারিকেল দুগ্ধ পান করিবে। উপবাস এবং অর্ধোপবাসে এইরূপ ২/৩ দিন থাকিলে শ্বাসের টান স্বভাবতঃই হ্রাস পাইবে। উপবাস ভঙ্গের পরও কয়েকদিন খাদ্য গ্রহণে খুব সতর্ক থাকিবে। হাঁপানী রোগীর প্রাতঃভোজন নিষিদ্ধ। দ্বিপ্রহরে আহার ১২টা হইতে ১টার মধ্যে সমাধা করিবে। কিন্তু একেবারে কখনো আকণ্ঠ ভোজন করিবে না। রাত্রির আহার সন্ধ্যার পূর্বে বা রাত্রি আটটার মাঝেই সমাধা করিবে। রাত্রির আহার এইরূপ পরিমাণে গ্রহণ করিবে যাহাতে ভোরবেলা খুব জোরালো ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অক্ষুধা, অজীর্ণ, অবসাদ—এই রোগাক্রমণের পূর্ব লক্ষণ। সুতরাং খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিবে—যাহাতে অক্ষুধা, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতির সৃষ্টি না হয়। হাঁপানী রোগীর খাদ্যের চার ভাগের তিন ভাগই

ক্ষারধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন শাকসব্জী, দুধ, ঘোল, শুষ্ক ফল, মিষ্টি-ফল ও টক-ফল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী পথ্য। ভাত, রুটি, মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি অম্লধর্মী পথ্য। হাঁপানী রোগীর জন্য তরিতরকারী রন্ধনে অতিরিক্ত তৈল, ঘি ও মশলা ব্যবহার করিবে না। সামান্য আদা, হলুদ, লঙ্কা ও তৈল বা ঘি সংযোগে তরকারি প্রভৃতি রন্ধন করিবে। হাঁপানী রোগীর নিরামিষভোজী হওয়া উচিত। মাছ, মাংস, ডিম মানুষের খাদ্য নয়—উহা শিয়াল-বিড়ালের খাদ্য। প্রত্যহ রাত্রে দেড়পোয়া বা আধসের দুধ পান হাঁপানী রোগীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। হাঁপানী রোগীর তামাক, নস্য, দোক্তা, সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন এবং অতিরিক্ত পান খাওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। যাহাদের দৈনিক তিনপোয়া বা একসের দুগ্ধ পানের সামর্থ্য আছে, তাহারা ইচ্ছা হইলে ভোরে একবার মাত্র চা পান করিবে। **দুগ্ধপানের সামর্থ্য যাহাদের নাই, চা তাহাদের পক্ষে বিষতুল্য**—ইহা স্মরণে রাখিয়া চা পানের বদভ্যাস ত্যাগ করিবে। ঘৃতে ভাজা লুচি, কচুরি, নিমকি প্রভৃতি খাদ্য এবং সন্দেশ, রসগোল্লা, লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টি খাদ্যও সর্বদা বর্জন করিবে।

ভ্রমণ-প্রাণায়াম এবং আতপস্নান হাঁপানী রোগ আরোগ্যে বিশেষ সহায়ক। সুতরাং হাঁপানী রোগী প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় যথোপযুক্ত জামা-কাপড় পরিধান করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বা শীত থাকিলে মাথায় টুপি পরিয়া এবং টুপি দ্বারা কান ঢাকিবার ব্যবস্থা করিয়া, গলায় গলাবন্ধ জড়াইয়া মুক্ত হাওয়ায় দীর্ঘ সময় ভ্রমণ-প্রাণায়াম করিবে। ধূম ও ধূলিপূর্ণ রাস্তা বর্জন করিয়া চলিবে।

হাঁপানী রোগীকে যোগীরা সাধারণতঃ বস্ত্রধৌতি এবং কষ্টসাধ্য স্থলবস্তি প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন যৌগিক ক্রিয়া করার নির্দেশ দেন। হাঁপানী রোগের প্রধান কারণ বায়ুগ্রন্থির দুর্বলতা—সুতরাং পাকস্থলী পরিষ্কারের জন্য বস্ত্রধৌতি প্রভৃতি কঠিন ক্রিয়া অভ্যাসের প্রয়োজন করে না। **আমাদের যৌগিক হাসপাতালে যে সমস্ত হাঁপানী রোগী ভর্তি হয়, তাহারা সকলেই রোগমুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।**

হৃদ্‌রোগ

লক্ষণ—হৃদ্‌যন্ত্রের অস্বাভাবিক সশব্দ স্পন্দন, বক্ষের বাম পার্শ্বে বেদনা, শ্বাস পরিত্যাগে কষ্টবোধ প্রভৃতি হৃদ্‌রোগের সাধারণ লক্ষণ।

কারণ—"**দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতা। হৃদি বাধা প্রকুর্বন্তি, হৃদ্‌রোগঃ তং প্রচক্ষতে।।**"—শরীরে দোষ সৃষ্টি হইয়া অর্থাৎ রোগবিষ সঞ্চিত হইয়া রক্তাদি রস ধাতুকে দূষিত করে। এই অনিষ্টকারী দূষিত রক্ত বা রোগবিষ হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে—ইহারই নাম হৃদ্‌রোগ। শরীরে দোষ সৃষ্টি হয়, ত্রিদোষাদি উৎপন্ন হয় দুই একটি কারণে নয়, বহু কারণের ফলে—সুতরাং হৃদ্‌রোগের কারণ ২/১টি নয়, বহু কারণ মিলিত হইয়া হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি হয়।

ক্ষুদ্র ইঞ্জিনের সাহায্যে বৃহৎ কলকারখানা পরিচালিত হয়। ইঞ্জিনের কোনো ত্রুটি ঘটিলে অথবা ইঞ্জিনের সহিত কলকারখানার যোগসূত্রগুলির মাঝে কোনো ত্রুটি বা কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলে কলকারখানা আর ঠিকমত চলে না, ইঞ্জিনের বেগের মাঝে আর সমতা থাকে না—ফলে ইঞ্জিন ও কারখানা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা ঘটে। আমাদের দেহস্থ ৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩॥ ইঞ্চি প্রশস্ত ক্ষুদ্র হৃদ্‌যন্ত্রটি আমাদের ৬৩ ইঞ্চি লম্বা অর্থাৎ ৩॥ হাত দেহ-কারখানা পরিচালনার প্রধান ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের সহিত দেহ-কারখানার সমস্ত কিছুর যোগসূত্র রহিয়াছে। এ যুগের শহরগুলিতে দমকলের সাহায্যে জল তুলিয়া সু-উচ্চ গৃহের ছাদে এবং সমতলভূমিতে যেভাবে জল সরবরাহ করা হয়, আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রটিও অনুরূপভাবে দেহের সর্বোচ্চস্থান মস্তিষ্কপ্রদেশ হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত দেহের সর্বত্র বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। এই রক্তের বেগ-শক্তিতে বেগবান হইয়া এবং রক্ত হইতে পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেহযন্ত্রটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। অবিশুদ্ধ রক্তকে শোধন করিয়া লইবার ব্যবস্থাও এই হৃদ্‌যন্ত্রটির মাঝে আছে। সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্রটি যেন

একাধারে দুইটি দমকলের সমষ্টি। এই জন্যই হৃদ্‌যন্ত্রটি দুইভাগে বিভক্ত। দক্ষিণ পাশের হৃদ্‌যন্ত্রটি শিরা-উপশিরার সাহায্যে দেহের অবিশুদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে এবং উহা ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করে। ফুস্‌ফুস্‌ এই দূষিত রক্তে মিশ্রিত অঙ্গারাম্ল প্রভৃতি দূষিত পদার্থ নিঃশ্বাসের সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং রক্তের দূষিত জলীয় ভাগ ছাঁকিয়া রাখিয়া উহাও দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রতি শ্বাসে সংগৃহীত অক্সিজেন দ্বারা এই শোধিত রক্ত আরও শোধিত হইয়া প্রাণবান ও সুপুষ্ট হয়। শোধিত রক্ত ধমনীর সাহায্যে হৃদ্‌যন্ত্রের বামপার্শ্বে আসিয়া সঞ্চিত হয়। বিশুদ্ধ রক্ত হইতেই দেহযন্ত্রগুলি তাহাদের খাদ্য আহরণ করে। ইহা অন্যান্য রোগপ্রসঙ্গেও বিস্তারিতভাবেই বলা হইয়াছে।

আমাদের কোনো অঙ্গে যদি দীর্ঘ সময় রক্ত পরিচালনার অভাব ঘটে তাহা হইলে সেই অঙ্গ হয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া অসাড় হইয়া যাইবে—নয়ত পচিয়া নষ্ট হইবে। 'ঊর্ধ্ববাহু সাধু' নামে একশ্রেণীর সাধু আছেন যাহারা পুণ্যজনক কঠোর তপস্যার অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়া একটি হাত সর্বদা ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখেন। ঐ ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হস্তে সঠিকভাবে রক্ত পরিচালিত হইতে পারে না বলিয়া উহা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অসাড় হইয়া যায়, চিরজীবনের মত অকর্মণ্য হয়। আমাদের কোনো অঙ্গুলির মূলদেশে যদি আমরা এমন শক্তভাবে বাঁধি যাহার ফলে ঐ অঙ্গুলির রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অঙ্গুলি অল্পদিনের মাঝেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এইসব দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমরা ধারণা করিতে পারি—ক্ষুদ্র হৃদ্‌যন্ত্রটির দায়িত্ব কতখানি এবং সর্বাঙ্গে সব সময় রক্ত পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। সুতরাং এই হৃদ্‌যন্ত্রটির সবলতার উপর আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষভাবেই নির্ভর করে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, উহা জীর্ণ করিবার জন্য পাকস্থলীতে প্রচুর রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন হয়। রক্তের মাঝেও একপ্রকার পাচকরস আছে। সম্ভবতঃ এই পাচকরস গ্রন্থিগুলির অন্তঃস্রাবী রসের মাঝে বিদ্যমান থাকে। এই পাচকরস পাকস্থলীর গাত্র হইতে ক্ষরিত হইয়া খাদ্য জীর্ণ করিতে সহায়তা করে এবং রক্তের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের

সমতা রক্ষা করে। খাদ্য গ্রহণে আমরা যদি অসংযমী হই, আমরা যদি দীর্ঘদিন যাবৎ অতিরিক্ত আমিষ খাদ্য বা চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি অথবা পাকস্থলীকে আমরা যদি অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্বারা দীর্ঘদিন যাবৎ ভারাক্রান্ত করি, তাহা হইলে পাকস্থলীতে দীর্ঘ সময় রক্তপ্রবাহ রাখার জন্যে হৃদ্‌যন্ত্রকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। দিনের পর দিন এই গুরুতর পরিশ্রমে হৃদ্‌যন্ত্র ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। হৃদ্‌যন্ত্রের এই অতিক্রিয়তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হৃদ্‌রোগ।

সাধারণতঃ শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ ভোজনবিলাসীরাই যথোচিত ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও ভোজন করে অথবা যথোচিত ক্ষুধা থাকিলেও ক্ষুধা শান্তির জন্য পরিমিত ভোজন না করিয়া অপরিমিত ভোজন করে। এইজন্যই ইহাদের পাকস্থলীও অতিক্রিয় হইয়া বড়ো হইয়া উঠে। পাকস্থলী ও হৃদ্‌যন্ত্রের মাঝে ব্যবধান মাত্র একটি ক্ষুদ্র মাংসপেশীর। পাকস্থলী অতিক্রিয় হইয়া বড়ো হইয়া উঠিলেই উহা হৃদ্‌যন্ত্রের উপর চাপ দেয়, আয়ুর্বেদের ভাষায় "**হৃদি বাধা প্রকুর্বন্তি**"—হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে, হৃদ্‌যন্ত্র তখন সুষ্ঠুভাবে নিজের কাজ করিতে পারে না। সুতরাং অক্ষুধায় ভোজন এবং অতিরিক্ত ভোজনও হৃদ্‌রোগের একটি কারণ।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অন্ত্রে মল পচিয়া রক্ত দূষিত হয়। এই দূষিত রক্তের বিষাক্ত বীজাণু হৃদ্‌যন্ত্রের কোমল মাংসপেশীকে আক্রমণ করিয়া উহাকে দুর্বল করিয়া দেয়। হৃদ্‌যন্ত্রের ঐ আক্রান্ত অঙ্গ আর যথোচিত ভাবে রক্ত আকর্ষণ এবং বিকিরণ করিতে পারে না ফলে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়; সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতাও হৃদ্‌রোগের একটি কারণ।

ক্রোধের সময় আমাদের শরীরের শক্তি বা উত্তেজনা অসম্ভব রকমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আমাদের চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠে। এই অধিক শক্তি উৎপাদনের জন্য হৃদ্‌পিণ্ডকে অত্যধিক সক্রিয় হইয়া অত্যধিক রক্ত সরবরাহ করিতে হয়। অতএব যাহারা কোপন স্বভাব, সামান্য কারণেই হউক আর বিশেষ কারণেই হউক যখন-তখন যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে,

তাহাদের হৃদ্‌পিণ্ড অতিক্রিয় হইয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং অবশীভূত ক্রোধও হৃদ্‌রোগের একটি কারণ।

ভারতের ন্যায় গরমদেশে সুষম পথ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা প্রায় প্রত্যহই মৎস্যাদি আমিষ খাদ্য এবং ঘি, মাখন, ছানা, সন্দেশ, লুচি, হালুয়া প্রভৃতি সংহত খাদ্য গ্রহণ করে, তাহাদের রক্তের প্রয়োজনীয় ক্ষারভাগ নষ্ট হয় এবং রক্তে অত্যধিক অম্লবিষ সঞ্চিত হইয়া ঐ বিষে রক্তবাহী শিরাগুলি শীর্ণ হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্বল হয়; ফলে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি করে।

শরীরে অতিরিক্ত চর্বি সৃষ্টি হইলে হৃদ্‌যন্ত্র পরিচালক স্নায়ুগুলিতেও ঐ চর্বি সঞ্চিত হয় এবং ইহার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র আর স্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত হইতে পারে না, স্বাভাবিকভাবে দেহের সর্বত্র রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না। সুতরাং দেহে অত্যধিক মেদ সৃষ্টিও হৃদ্‌রোগের একটি কারণ।

অতিরিক্ত পরিমাণে চা, কফি, তামাক, সিগারেট, মদ, আফিম প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করিলে উহার বিষে স্নায়ু, গ্রন্থি, ধমনী প্রভৃতি দেহের সমুদয় যন্ত্র দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে—ফলে হৃদ্‌যন্ত্রেরও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবনও হৃদ্‌রোগের একটি কারণ।

রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, বেরিবেরি, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, উপদংশ, বাত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের ফলেও হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

সুতরাং এককথায় বলা যায়—যাহা স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ, তাহাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হৃদ্‌রোগেরও কারণ।

চিকিৎসা—(ভোরে)—সহজ বস্তিক্রিয়া, (হৃদ্‌রোগীর একসঙ্গে অধিক জলপান নিষিদ্ধ, সুতরাং হৃদ্‌রোগী বস্তিক্রিয়ার সময় একপোয়া, দেড়-পোয়ার বেশি জল খাইবে না; এই জলও ঈষৎ গরম করিয়া লেবুর রস সহযোগে খাইবে); যোগমুদ্রা ৬ বার, সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট, পবনমুক্তাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাববাথ ১০ মিনিট, সহজ অগ্নিসার, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

(মধ্যাহ্নে) টাববাথ ২০-৩০ মিনিট। টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। অগ্নিসার ধৌতি নং ১—১০ বার।

(বৈকালে)—টাববাথ ৫ মিনিট, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

(সন্ধ্যায়)— সহজ বিপরীতকরণী, পবনমুক্তাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩; সহজ অগ্নিসার ৩০ বার ; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

হৃদ্‌রোগ হ্রাস পাইলে ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম অবলম্বন করিবে। বলা বাহুল্য, হৃদ্‌রোগের দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় কোনো চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন নিষিদ্ধ। রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা আবশ্যক।

জলস্নানবিধি (২), আতপস্নান ও জলপান বিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

নিয়ম ও পথ্য—রোগাক্রান্ত অবস্থায় শবাসনের মতো সর্বশরীর এলাইয়া দিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিবে। এই সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে শ্বাস ত্যাগ এবং শ্বাস গ্রহণ ইচ্ছাপূর্বক একটু দীর্ঘ করিবে তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্বাসকষ্টের লাঘব হইবে এবং অপেক্ষাকৃত স্বস্তি অনুভব করিবে। এই শ্বাসকষ্টের সময়ে একখানি ভিজা তোয়ালে বুকের উপর রাখিবে। ১৫/২০ মিনিট অন্তর অন্তর ঐ ভিজা তোয়ালের উপর ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া উহাকে সিক্ত রাখিবে। ভিজা তোয়ালের শীতলতার স্পর্শে হৃদ্‌যন্ত্রের অস্বাভাবিক স্পন্দন দ্রুত হ্রাস পাইবে।

রোগাক্রমণের প্রবলতা হ্রাসের পর বিছানায় বসিয়া থাকিবার ইচ্ছা হইলে বসিয়া থাকিবে অথবা বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া থাকিবে। রুগ্নাবস্থায় মল-মূত্রের বেগ হইলে বাহিরে যাইবে না—বিছানায় থাকিয়া বেডপ্যানের মাঝেই উহা সম্পন্ন করিবে। রোগাক্রমণ হ্রাস পাইয়া হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হওয়ার পরও ২/৪ ঘণ্টা গৃহে শুইয়া-বসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। হৃদ্‌রোগীর পক্ষে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ—সুতরাং লঘু পরিশ্রমের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করিবে না। এইরূপ লঘু পরিশ্রম এবং হাঁটাচলার পরও বিছানায় শরীর এলাইয়া দিয়া শবাসনে কিছু সময় বিশ্রাম করিবে। দিনের মাঝে যতবারই লঘু পরিশ্রমের কাজ করিবে,

যতবারই এদিকে-সেদিকে হাঁটাচলা করিবে ততবারই এইভাবে শবাসনে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে (এই প্রসঙ্গে 'কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ' বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

অতিক্রিয় হইয়া পাকস্থলী একটু বৃহদাকার না হইলে হৃদ্‌রোগ হয় না। এইজন্যই সুস্থ ব্যক্তির মতো হৃদ্‌রোগীর একসঙ্গে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ অনুচিত। হৃদ্‌রোগী দ্বিপ্রহরে প্রধান খাদ্যও অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিবে। বৈকালে ক্ষুধা অনুপাতে একবার বা একাধিকবার রসাল ফলাদি দ্বারা জলযোগ করিবে। রাত্রে দুধ ও ফল ছাড়া (কলা বাদে) অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। দুধ যাহাদের সহ্য হয় না, তাহারা দুধের পরিবর্তে ঘোল খাইবে। ভোরের জলযোগ বন্ধ রাখিবে।

দ্বিপ্রহর এবং রাত্রের খাদ্য গ্রহণের অব্যবহিত পর দক্ষিণ নাসায় যাহাতে একঘণ্টা শ্বাস থাকে সেই ব্যবস্থা করিবে। (শ্বাস পরিবর্তন কৌশল দ্রষ্টব্য)। পূর্বেই বলিয়াছি অজীর্ণ, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি হৃদরোগ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ। হৃদ্‌রোগীর অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের সূচনা হইলেই হৃদ্‌রোগের আক্রমণ আরম্ভ হয়—সুতরাং খাদ্যাদি গ্রহণে এবং অজীর্ণাদি রোগ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। অক্ষুধার লক্ষণ দেখিলেই খাদ্যগ্রহণে বিরত থাকিবে। লোভের বশবর্তী হইয়া আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ-উপরোধে অক্ষুধায় কিছু ভোজন করিবে না। ভোজসভার আমন্ত্রণ সর্বদা বর্জন করিয়া চলিবে। গুরুপাক আহার্য দ্রব্য গ্রহণ, তৈল ও ঘিয়ে ভাজা খাদ্য দ্রব্য, ছানা এবং ছানার তৈয়ারি সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টি খাদ্য এবং আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। ক্ষুধার অনুপাতে শাক-সবজি খাইবে, ভাত ও রুটি কম পরিমাণে খাইবে। **এই রোগে দুধ ও ফলই প্রধান পথ্য**—ইহা সর্বদাই স্মরণে রাখিবে।

হৃদ্‌রোগীর একসঙ্গে অতিরিক্ত জলপান নিষিদ্ধ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অল্প পরিমাণে জল বারে বারে খাইবে। দিনে রাত্রে এইরূপ জলপানের পরিমাণ শীতকালে ২॥ সের এবং গ্রীষ্মকালে ৩॥ সেরের কম যেন না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে

প্রত্যেকবার জলপানের সময় জলের সহিত কিঞ্চিৎ লেবুর রস মিশাইয়া খাইবে। জলের সহিত বা দুধের সহিত দিনের মাঝে ৩/৪ বার ছোটো চামচের এক চামচ মধু গ্রহণ করিবে। কাঁচা লবণ পাতে খাইবে না।

রাত্রি ৮টার মধ্যে আহারাদি সমাধা করিয়া রাত্রি ৯টায় শয্যা গ্রহণ করিবে। হৃদ্‌রোগীর ৮/১০ ঘণ্টা নিদ্রা প্রয়োজন। হৃদ্‌রোগীর উচ্চ দালানের সিঁড়িতে ওঠানামা এবং পর্বতারোহণ সুস্থ অবস্থাতেও বিশেষভাবে নিষিদ্ধ উহা যে কোনো সময় প্রাণঘাতী হইতে পারে। পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি উচ্চস্থানের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প থাকে। এইজন্য সুস্থদেহী পর্বতবাসীকেও ঘন ঘন শ্বাসগ্রহণ করিতে হয়। হৃদ্‌রোগীর পক্ষে এইরূপ ঘন ঘন শ্বাসগ্রহণ বিপজ্জনক। এইজন্যই হৃদ্‌রোগীর উচ্চ পর্বতারোহণ এবং সুউচ্চ পর্বতবাস নিষিদ্ধ।

"সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি লবণ এবং বিবিধ ফলের রস ও গ্লুকোজ প্রভৃতি হৃদ্‌যন্ত্রের সবলতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক"—আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অভিমত আমরা স্বীকার করি। এই রোগে আমাদের নির্দেশিত পথ্যনীতিও এই অভিমতের স্বপক্ষে।

শাক-সবজি ও ফল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্যেই সোডিয়াম অধিক পরিমাণে থাকে। কিন্তু আমিষ খাদ্যে এই লবণটি নাই বলিলেই চলে। ক্যালসিয়াম অনুরূপভাবে শাক-সবজি, ফল ও দুধে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমিষ খাদ্যের মধ্যে মাংস এবং বড়ো মাছে ক্যালসিয়াম নাই, কিন্তু ডিম ও ছোটো মাছে ক্যালসিয়াম থাকে। কিন্তু ডিম ও ছোটো মাছও অন্যান্য আমিষ খাদ্যের ন্যায় দেহে অম্লবিষ (ইউরিক অ্যাসিড) সঞ্চিত করে এবং উহা রোগ বৃদ্ধির সহায়ক। আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে আমিষ খাদ্য মানুষের খাদ্য নয় উহা হিংস্র পশুর খাদ্য।

এইজন্য হৃদ্‌রোগীকে এমন পথ্য দেওয়া দরকার যাহাতে দেহে কোনো দূষিত জিনিস সঞ্চিত না হয়। ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য বর্জনের ব্যবস্থা হৃদ্‌রোগীকে এইজন্যই আমরা দিয়াছি। অনুরূপ কারণে ছানা, সন্দেশাদি সংহত খাদ্য বর্জনের পরামর্শও আমরা হৃদ্‌রোগীকে দিয়াছি।

ভারতের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকরা হৃদ্‌রোগীদের মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি পথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা দেন—ইহা মারাত্মক ভুল। ইহাতে হিতে বিপরীত হয় এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়।

মদনগ্রন্থির বিবৃদ্ধি

(প্রোস্টেট এন্‌লার্জমেন্ট—Prostate enlargement)

এই গ্রন্থিটির ক্রিয়ানুযায়ী আমরা ইহার নাম দিয়াছি মদনগ্রন্থি। আমাদের পুরাণে মদন বা কামদেব সম্বন্ধে সুন্দর উপাখ্যান আছে। ইনি প্রণয়ের দেবতা। ইঁহার পত্নীর নাম রতি (আসক্তি)। পুষ্পধনু বা ফুলশর ইঁহার চিরসঙ্গী। এই পুষ্পধনু হইতে পুষ্পশর নিক্ষেপ করিয়া ইনি তরুণ-তরুণীদের অন্তর বিদ্ধ করেন, তাহাদের অন্তরে আসক্তির মত্ততা জাগাইয়া তোলেন। ইহার জন্যই প্রকৃতিদেবীর সৃষ্টি রূপায়ণে ইনি প্রধান সহায়ক। সাধারণ নর-নারী ইঁহার ফুলশর প্রতিরোধ করিতে পারে না। এই অপরাজিত মদনদেবতাকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা আছে শুধু মহাতপস্বী, মহাযোগী মহেশ্বরের। মহেশ্বর শিবের ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নিতে মদনদেব ভস্মীভূত হন অর্থাৎ এই মরজগতে যাঁহাদের তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া উঠে, একমাত্র তাঁহারাই এই অপরাজেয় দুর্ধর্ষ মদন দেবতাকে পরাভূত ও ভস্মীভূত করিয়া আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন; এই নিম্নতম সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বসৃষ্টির আনন্দধামে বিচরণ করেন। যতদিন মনের উপর মদনদেবতার প্রভুত্ব থাকে ততদিন মনকে যথাযথভাবে একাগ্র করা যায় না, শান্ত করা যায় না, ধ্যানতন্ময় করা যায় না। অতএব মোক্ষকামী মানব জাগতিক আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিবে, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মদনকে ভস্মীভূত করিবে। ইহাই দিব্য জীবন লাভের উপায়, জীবন্মুক্তি লাভের উপায়।

লক্ষণ—এই প্রোস্টেট বা মদনগ্রন্থি কামগ্রন্থির (Sex gland) সহায়কারী। এই গ্রন্থিটি আকারে প্রায় একটি বাদামের সমান। ইহার অবস্থিতি মূত্রাশয়ের পাশে। কামভাব বা কামচিন্তার প্রারম্ভেই এই গ্রন্থিটি সক্রিয় হইয়া উঠে। এই গ্রন্থির রসস্রাব মূত্রনালীকে সিক্ত করে এবং পুংবীজকে ইহার মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। নর-নারীর দৈহিক মিলনের সময় এই গ্রন্থিটির প্রভাবেই মূত্রাশয় হইতে প্রস্রাব নির্গমন বন্ধ থাকে এবং শুক্রনির্গমন পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এই গ্রন্থিটির বিবৃদ্ধি ঘটিলে মূত্রাশয়ের উপর নিয়ত চাপ পড়ে এবং মূত্রত্যাগের বাধা সৃষ্টি হয়। এই অবরুদ্ধ প্রস্রাবের জন্য রোগী দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করে। চিকিৎসক তখন ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রস্রাব নির্গত করাইয়া রোগীর যন্ত্রণা সাময়িকভাবে প্রশমিত করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সব সময় ক্যাথিটার ব্যবহার সম্ভব নয়, তাই অবরুদ্ধ প্রস্রাব পচিয়া দেহে শোথ ও বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই বিষক্রিয়ায় প্রস্টেটগ্রন্থি ও মূত্রাশয় ক্রমশঃ অধিকতর দুর্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে।

কারণ—আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনো এই রোগটির উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা জানি, দেহে দূষিত বস্তু মাত্রাতিরিক্তভাবে সঞ্চিত না হইলে দেহে কোনো কঠিন ব্যাধি সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং দেহে দূষিত বস্তু সঞ্চিত হইলে উহা যে কোনো একটি কঠিন ব্যাধিরূপে অভিব্যক্ত হইবেই। অতএব এই রোগটিরও মুখ্য কারণ—দেহে দূষিত পদার্থের সঞ্চয়। গৌণ কারণ—অলস জীবনযাপন, আহারের অসংযম অথবা মাত্রাধিক যৌন সম্ভোগ।

চিকিৎসা—(ভোরে) ১নং সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাববাথ বা অর্ধ টাববাথ। টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং—১০ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি—সপ্তাহে ২ দিন ; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

(মধ্যাহ্নে)—টাববাথ ৫/১০ মিনিট। টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার ৪০

বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং—১০ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ৩ ও ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

অপরাহ্নে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম এবং টাববাথ ২/১ মিনিট।

(সন্ধ্যায়)—বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকরণী ২ মিনিট। পবনমুক্তাসন ৩ বার, জানুশিরাসন ৩ বার, সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং—১০ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। শশাঙ্গাসন ১ মিনিট। জলপানবিধি ও উপবাসবিধি সাধ্যমত পালন করিবে। এই প্রসঙ্গে ৩য় অধ্যায়ের জলপানবিধি এবং উপবাসবিধি দ্রষ্টব্য।

নিয়ম ও পথ্য—চা-কফি, বিড়ি-সিগারেট, পান, নস্য প্রভৃতি সমুদয় মাদকদ্রব্য সেবন বর্জন করিবে। আমিষ খাদ্য ও নিরামিষ সংহত খাদ্যও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। সপ্তাহে ১ দিন উপবাস দিবে।

এই গ্রন্থিটির স্ফীতি নিবারণ ও সঙ্কোচ সাধনের জন্য চিকিৎসকরা ঔষধ প্রয়োগ করেন, কিন্তু ঔষধ কার্যকরী হয় না, অতএব অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হয়। এই রোগে অস্ত্রোপচার বড় বিপজ্জনক। অস্ত্রোপচারের পরেও যে সব রোগী বাঁচিয়া থাকে তাহারা অতিকষ্টে জীবনধারণ করে। এইরূপ জীবন্মৃত অবস্থা মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। অস্ত্রোপচার কখনো রোগের মূল কারণ দূর করিতে পারে না। একমাত্র যোগপন্থাই এই রোগের মূল কারণ দূর করিয়া রোগীকে নির্দোষভাবে রোগমুক্ত করিতে পারে।

ভগন্দর

(ফিশ্চুলা—Fistula)

লক্ষণ—গুহ্যদেশের নালী ঘাকেই ভগন্দর বলে। প্রথমতঃ গুহ্যদেশে এক বিষাক্ত ফোঁড়া আবির্ভূত হয়। এই ফোঁড়াটি ফাটিয়া নালী-ঘা সৃষ্টি

হয়। এই নালী-ঘা হইতে সর্বদা পুঁজ ও দূষিত রক্তাদি নির্গত হয়। রোগী উপবেশনে অসুবিধা ও কষ্ট বোধ করে; মলত্যাগের সময় জ্বালা-যন্ত্রণা খুব বৃদ্ধি পায়।

কারণ—এই রোগটির প্রাদুর্ভাব বয়স্কদের ভিতরেই বেশি। যাহারা একটু ভোজনবিলাসী, ৫০/৫৫ বৎসরের পরেও যাহারা আমিষ খাদ্য ও নিরামিষ সংহত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস বন্ধ করিতে বা হ্রাস করিতে পারে না, তাহারাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। যে সমস্ত গ্রন্থির ক্রিয়ায় শরীর হইতে দূষিত জিনিস মল-মূত্রের সাহায্যে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, ঐ সব গ্রন্থি প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে স্বভাবতঃই দুর্বল হয় এবং উহারা দেহ সঞ্চিত সমুদয় দূষিত জিনিস বাহির করিয়া দিতে পারে না এই কারণেই এই রোগ সৃষ্টি হয়। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি অস্ত্রোপচারে রোগের মূল কারণ দূর হয় না, উহা হঠাৎ মৃত্যু বা সাময়িকভাবে রোগযন্ত্রণা হইতে রক্ষা করে মাত্র। প্রায়ই দেখা যায়, এই রোগটির অস্ত্রোপচারের পর দেহের অন্যান্য স্থানেও নালী-ঘা সৃষ্টি হয় অথবা গলায় বা ফুসফুসে দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ৩। প্রাতঃকৃত্যাদি, টাববাথ। টাবে বসিয়া অশ্বিনীমুদ্রা ২০ বার, মূলবন্ধ মুদ্রা ১০ বার, সহজ অগ্নিসার ৫০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং—১০ বার, ২নং—৩ বার। বমনধৌতি বা বারিসার ধৌতি সপ্তাহে ২ দিন।

মধ্যাহ্নে—টাবে বসিয়া অশ্বিনীমুদ্রা ২০ বার, মূলবন্ধ মুদ্রা ১০ বার, সহজ অগ্নিসার ৫০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং—১০ বার, ২নং—৩ বার; সহজ প্রাণায়াম নং ৩—২ মিনিট।

অপরাহ্নে—টাববাথ ২/৩ মিনিট। টাবে বসিয়া অশ্বিনীমুদ্রা ২০ বার; সহজ প্রাণায়াম নং ২ ও ৩—প্রত্যেকটি ২ মিনিট। ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট। মৎস্যাসন ১ মিনিট, সহজ অগ্নিসার ৫০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং—১০ বার, ২ নং—৩ বার;

সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২ ও ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট; **শশাঙ্গাসন** ২ মিনিট।

নিয়ম ও পথ্য—ভোরের জলযোগ বন্ধ রাখিবে। দ্বিপ্রহরেও একটু ক্ষুধা রাখিয়া আহার সমাপ্ত করিবে। বৈকালে খুব ক্ষুধা বোধ হইলে ফলের রস বা রসাল ফল দ্বারা জলযোগ করিবে। রাত্রে লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে। মাসে ২ দিন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে। আমিষ খাদ্য ও নিরামিষ সংহত খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

মাথাধরা বা শিরোরোগ

লক্ষণ—মাথাধরা বহু কারণে হয়। এই বহু কারণগুলির মাঝে কয়েকটি প্রধান কারণ নিম্নে উল্লিখিত হইল—

(১) **বাতজ শিরোরোগ**—কোষ্ঠবদ্ধতাদি রোগে বায়ু যথাযথভাবে তলপেট ও বস্তিপ্রদেশে চলাচল করিতে পারে না, মলাদির সহিত দেহবিষ বাহির করিয়া দিতে পারে না। ঐ দেহবিষ ও সঞ্চিত দূষিত মলের সংস্পর্শে দেহস্থ বায়ুও বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষাক্ত বায়ু মস্তিষ্কে গমন করিলে এই দূষিত বায়ুর বিষে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি অবসন্ন হইয়া পীড়িত হইয়া পড়ে—উহারা বিষমুক্ত হওয়ার জন্য, বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য আর্তনাদ করিতে থাকে। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলির এই পীড়া বা আর্তনাদকেই আমরা বলি মাথাধরা। বিষাক্ত বায়ুর জন্য এইরূপ মাথাধরা সৃষ্টি হইলে উহাকে আয়ুর্বেদের ভাষায় বলে বাতজ শিরোরোগ। রাত্রের শীতলতায় বায়ু অধিকতর প্রকুপিত হয় এইজন্য **বাতজ শিরোরোগ রাত্রিকালেই বাড়ে।**

(২) **পিত্তজ শিরোরোগ**—দেহে পিত্তবিষ সঞ্চিত হইয়া ঐ পিত্তবিষ রক্তের সহিত মস্তিষ্কে গমন করিলে ঐ বিষে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তু আক্রান্ত হয়। ঐ আক্রান্ত স্নায়ুতন্তু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, কপালপ্রদেশে

অগ্নিদাহের মত জ্বালা শুরু হয়। এই জ্বালা-যন্ত্রণা চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। শৈত্য পিত্তদোষ নাশ করে, এইজন্য **পিত্তজ মাথাধরা রাত্রিকালে প্রশমিত থাকে**।

(৩) **কফজ শিরোরোগ**—এই রোগে মাথা ভার হয়। দূষিত শ্লেষ্মা ভ্রূমধ্যে উপস্থিত হইয়া বায়ুর ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং সামান্যভাবে মাথায় যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। চোখ, মুখ ও নাক এই দূষিত শ্লেষ্মারসে একটু স্ফীত হইয়া উঠে।

(৪) **ক্ষয়জ শিরোরোগ**—যে সমস্ত নারী-পুরুষের অনিচ্ছায় ধাতুক্ষয় হয় অর্থাৎ যে সমস্ত মেয়ের প্রদর রোগ আছে এবং যে সমস্ত পুরুষের শুক্রমেহ প্রভৃতি রোগ আছে অথবা স্বেচ্ছায় যাহারা অত্যধিক শুক্র ক্ষয় করে, তাহাদের রক্তের সারভাগ অত্যধিক নষ্ট হওয়ার ফলে মস্তিষ্ক রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান পায় না। সতেজ রক্তের জন্য, সৃষ্টির উপাদানের জন্য, মস্তিষ্কের স্নায়ু, তন্তু, গ্রন্থিগুলি অস্থির হইয়া পড়ে। ইহাদের এই খাদ্যাভাবের যন্ত্রণাই ক্ষয়জ শিরোরোগরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষয়জ শিরোরোগীর দেহ সর্বদা দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত থাকে। সময় সময় মস্তিষ্কে রক্তের অভাব ঘটায় রোগী মূর্ছিত হইয়া পড়ে।

(৫) **রক্তজ শিরোরোগ**—অজীর্ণ ও অম্লরোগের বিষ নষ্ট করার জন্য অধিক পরিমাণ রক্তকে যদি অধিক সময় পাকস্থলীতে থাকিতে হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব হওয়ায় মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। অন্ত্রে অধিক মল সঞ্চিত হইয়া দীর্ঘসময় থাকিলে উহা পচিয়া রোগবিষ সৃষ্টি হয়, অন্ত্র মধ্যস্থ ধমনীগুলির ক্রিয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় ধমনীগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় রাখার জন্য এবং রোগবিষ নষ্ট করার জন্য অন্ত্রে অধিক রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন হয়। নিম্নাঙ্গে অত্যধিক রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন হইলে তদনুপাতে মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব হয়। মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব হইলে মস্তকে একপ্রকার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যেমন শিশু

ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদে, মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তের বা বিশুদ্ধ রক্তের অভাব হইলে মস্তিষ্কের যন্ত্রগুলিও তেমনি প্রয়োজনীয় রক্তের জন্য অথবা বিশুদ্ধ রক্তের জন্য শিশুর মতোই কাঁদে। রক্তের জন্য মস্তিষ্ক যন্ত্রগুলির এই ক্রন্দনকেই বলে রক্তজ শিরোরোগ।

(৬) **সূর্যাবর্ত শিরোরোগ**—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কপাল ও চোখ বেদনাযুক্ত হয় এবং সূর্য সতেজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণাও বাড়িতে থাকে; সূর্য নিস্তেজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও কমে।

অত্যধিক রক্তের চাপে মস্তিষ্কের কোনো শিরা ফাটিয়া গেলে কপালের আধখানা জুড়িয়া ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। উহাকে বলে **অর্ধ-বিভেদক ('আধ-কপালে') শিরোরোগ**। দেহে অত্যধিক রোগবীজাণু সৃষ্টি হইলেও ঐ রোগবীজাণুর বিষাক্ত ক্রিয়ায় মাথা ধরে ইহার নাম **ক্রিমিজ শিরোরোগ**। ইহা ছাড়া **অনন্তবাত, শঙ্খবাত ও ত্রিদোষজ** শিরোরোগ প্রভৃতি আরও অনেক রকম শিরোরোগ আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শিরোরোগের মূল কারণ—রক্তের দুর্বলতা, ইন্দ্রগ্রন্থি (Thyroid) প্রভৃতির দুর্বলতা, অথবা রক্তে রোগবিষের সঞ্চার বা দূষিত পিত্তাদির অত্যধিক চাপ। ইহা ছাড়া দাঁতের ব্যথা, অতিরিক্ত ক্ষুধাবোধ, ঋতুবন্ধ প্রভৃতি কারণেও সাময়িক মাথাধরা রোগ সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা—(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি ; সহজ প্রাণায়াম নং ৩, নং ৪, নং ৭, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি সাময়িকভাবে মাথার যন্ত্রণা ভালো করে। যে কারণে মাথায় যন্ত্রণা হয়, সেই কারণের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে মাথার যন্ত্রণাও চিরস্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবে। ক্ষয়জ শিরোরোগে শুক্রক্ষয় নিবারণার্থে 'আংশিক অক্ষমতারোগ' চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে। পিত্তজ শিরোরোগে 'অম্ল ও অজীর্ণ রোগ' চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিবে। এইভাবে রোগের মূল কারণ নির্ধারণ করিয়া সেই রোগের চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বনে শিরোরোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য

করিবার চেষ্টা করিবে। **ভ্রমণ-প্রাণায়াম এবং প্রত্যহ ভোরে নাসাপান** সাধারণ মাথাধরা রোগকে চিরস্থায়ীভাবে আরোগ্য করে।

নিয়ম ও পথ্য—ক্ষয়জ শিরোরোগ ছাড়া অন্য সমস্ত শিরোরোগেই আংশিক উপবাস অথবা পুরোপুরি উপবাস হিতকর। দেহের রোগবিষ ও পিত্তবিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য বমন ধৌতির অভ্যাস এবং জলপানবিধি নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে।

আজকাল বাসের, রেলের যাত্রীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—"এটা একটা হতভাগা স্টেশন, একটু চা পাওয়া যায় না! সময়মত চা না পেলে আমার আবার ভয়ানক মাথা ধরে!" অতিরিক্ত চা পানের বদভ্যাসের জন্য যকৃৎ বিশেষভাবে খারাপ না হইলে চা পানের অভাবে মাথা ধরে না। **চা পানের অভাবে মাথা ধরিলে বুঝিতে হইবে উহা অম্লশূল, পিত্তশূল, পাকস্থলীতে ঘা প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির আক্রমণের পূর্বসূচনা**। সুতরাং সময়মত চা পানের অভাবে যাহাদের মাথা ধরে তাহাদের চা পান বিশেষভাবে বর্জন করাই শ্রেয়স্কর। চা অজীর্ণ রোগ এবং চোখে ছানিপড়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টিরও বিশেষ সহায়ক।

খয়ের ও চূণ সহযোগে অতিরিক্ত পান খাইলেও যকৃৎ খারাপ হইয়া শিরোরোগ সৃষ্টি হয়। দিনের মাঝে মাত্র একবার অথবা স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে দুইবার, প্রধান আহারের পর চূণ ও খয়ের প্রভৃতি বাদ দিয়া পান খাওয়া যাইতে পারে। বারবার চূণ, খয়ের ও দোক্তা প্রভৃতি সহ পান খাইলে চূণ ও খয়েরের বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে না পারিয়া ঐ বিষের প্রভাবে যকৃৎ নিজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং পরিণামে ঐ বিষে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। দোক্তা সেবনও শিরোরোগ সৃষ্টির সহায়ক।

এই রোগে জলপানবিধি এবং জলস্নানবিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রয়োগ-বিধি

আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম

যোগশাস্ত্রে আসন-মুদ্রা সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। সর্বাঙ্গাসন সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসে অজীর্ণ, অম্ল, অর্শরোগ, প্লীহা, কুষ্ঠ, যকৃৎরোগ, হাঁপানী, স্নায়ুরোগ, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্বল্য, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, প্রদর প্রভৃতি দেহের প্রায় সর্বব্যাধিই আরোগ্য হয়। উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রা সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশংসা আছে—এই মুদ্রাটির সর্বব্যাধি আরোগ্যের ক্ষমতা আছে, এই মুদ্রাটি '**মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী**' ইত্যাদি; অন্যান্য আসন-মুদ্রারও অনুরূপ স্তব-স্তুতি এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত আসন-মুদ্রা প্রশংসার অযোগ্য নয়। কিন্তু একথা আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখিতে হইবে—**কোনো একটি আসন বা একটি মুদ্রার অভ্যাসেই কোনো রোগ সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয় না উহা আংশিক আরোগ্যে সাহায্য করে মাত্র।**

দেহের কোনো একটি মাত্র গ্রন্থি দুর্বল হইয়া কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। একটি গ্রন্থি দুর্বল হইলে উহার কার্যকারিতার ন্যূনতা অপর গ্রন্থিগুলি পূরণ করিয়া লয়। সুতরাং দেহের কোনো একটি যন্ত্র বা একটি গ্রন্থি ক্রিয়ার ত্রুটিতেই কোনো রোগ হইতে পারে না; রোগ হয় তখনই, যখন দেহের সমুদয় গ্রন্থি, সমুদয় স্নায়ু-ধমনী অল্পাধিক পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়ে। একের ন্যূনতা যখন আর অন্যে পূরণ করিতে পারে না, এক বা একাধিক গ্রন্থির দুর্বলতা পূরণ করিতে গিয়া সকলের সমবেত শক্তি যখন ব্যর্থ হয়, সকলেই যখন রুগ্ন হইয়া পড়ে তখনই দেহে রোগবিষ সঞ্চিত হয় এবং দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। সুতরাং কোনো রোগই একাঙ্গিক নয়, সমস্ত

রোগই সর্বদৈহিক। এই জন্যই কোনো একটি বিশেষ আসন-মুদ্রায় কোনো রোগ সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয় না। বায়ুগ্রন্থি যদি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করিয়া রক্তকে যথোচিতভাবে শোধন করিয়া রক্তকে পুষ্টির উপাদানে পরিণত করিতে না পারে, তাহা হইলে ইন্দ্রগ্রন্থি বা যৌবনগ্রন্থির (Thyroid) ক্রিয়া স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া পড়িবে। বায়ুগ্রন্থি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করিতে না পারিলে অগ্নিগ্রন্থিগুলিও দুর্বল হয়, জঠরাগ্নি মন্দীভূত হইয়া অজীর্ণ, অম্লরোগ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। অর্থাৎ দেহের প্রত্যেকটি যন্ত্রের সহিত প্রত্যেকটি যন্ত্রের সক্রিয় সহযোগিতা আছে ; সকলেই যখন দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন এই সহযোগিতার অভাব ঘটে। **এইজন্যই প্রত্যেকটি রোগ আরোগ্যে সর্বদৈহিক চিকিৎসা অবলম্বন প্রয়োজন অর্থাৎ দেহের সমুদয় গ্রন্থি, স্নায়ু, ধমনী প্রভৃতি সমুদয় যন্ত্র সবলতর না হইলে রোগ নির্মূলভাবে আরোগ্য হয় না।** মহৎগ্রন্থি, অহংগ্রন্থি, নভঃগ্রন্থি, বায়ুগ্রন্থি, অগ্নিগ্রন্থি, বরুণগ্রন্থি, পৃথ্বিগ্রন্থি—এই সপ্তগ্রন্থির ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকিলে দেহের স্নায়ু-ধমনী-পেশী প্রভৃতি দেহের সমুদয় যন্ত্রগুলির ক্রিয়াই স্বাভাবিক থাকে, দেহ রোগাক্রান্ত হইতে পারে না।

যে সমস্ত যোগক্রিয়ায় এই গ্রন্থিগুলি সবল হইয়া অনায়াসেই দেহকে রোগমুক্ত করে—সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা রোগারোগ্যে বিবিধ আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ধৌতি, বস্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা দিয়াছি।

আমাদের এই বিধি-ব্যবস্থা যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিবে সে অবশ্যই রোগমুক্ত হইয়া অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে, দীর্ঘায়ু হইবে, নীরোগ দেহে শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিবে ইহাতে কোনো সংশয় নাই।

আসন ও মুদ্রা

আসন—আসন দ্বিবিধ—ধ্যানাসন ও স্বাস্থ্যাসন। ধ্যানাসন প্রয়োজন হয় স্থির ও স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া দীর্ঘ সময় ধ্যানাদি অভ্যাসের জন্য। ধ্যানাদির সাহায্যেই মনকে তন্ময় করিলে আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

স্বাস্থ্যাসনের বিশেষ লক্ষ্য—শরীরের স্বাস্থ্য অটুট রাখা, শরীরের রোগ দূর করা। আমাদের এই পুস্তক স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তক। সুতরাং আমাদের এই পুস্তকে মহোপকারী স্বাস্থ্যাসনগুলি বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবে ; তবে স্বাস্থ্যাসন ও প্রাণায়ামাদির অনুকূল পদ্মাসন প্রমুখ দুই-একটি ধ্যানাসনও স্বাস্থ্যাসনের সহিত বর্ণিত হইবে।

মুদ্রা—মুদ্রা স্বাস্থ্যাসনের প্রকারভেদ। স্বাস্থ্যাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য দেহের পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ-সবল করা। মুদ্রার প্রধান কাজ—বহিঃস্রাবী ও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহকে সক্রিয় ও সবল করা। স্বাস্থ্যরক্ষায় পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের চেয়ে গ্রন্থির দায়িত্ব অধিকতর। ইহার মাঝে আবার অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির দায়িত্ব সর্বাধিক। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি যথোচিত রসক্ষরণ না করিলে শরীর স্বভাবতঃই দুর্বল, অকর্মণ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ হইতে ক্ষরিত রসই রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়া রক্তের পুষ্টি বিধান করে। এই সারবান রক্তই দেহরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান। এই সারবান রক্তের সারভাগ গ্রহণ করিয়াই দেহের সমুদয় স্নায়ু-গ্রন্থি সবল থাকে, কর্মক্ষম থাকে। সুতরাং মুদ্রার অনুশীলন স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ অনুকূল।

একমাত্র **যোগমুদ্রা ছাড়া অল্পবয়স্কদের পক্ষে অন্য মুদ্রার অনুশীলন নিষিদ্ধ। মেয়েদের ঋতু প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং ছেলেদের ১২ বৎসর পূর্ণ হইলে অন্য মুদ্রাগুলিও তাহারা অভ্যাস করিবে।**

বৃদ্ধদেরও যদি রক্তের চাপ স্বাভাবিক থাকে, হৃদ্‌রোগাদি না থাকে, তাহা হইলে সাধ্যানুযায়ী আসন-মুদ্রাদি অভ্যাসে তাঁহাদেরও কোনো বাধা নাই।

অর্ধ কূর্মাসন

প্রণালী—বজ্রাসনে উপবিষ্ট হও, হস্তদ্বয় সংযুক্ত করিয়া রাখ।

অতঃপর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ভঙ্গিতে শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া মস্তক মৃত্তিকা সংলগ্ন কর। উদর এবং বক্ষ উরুর সহিত

অর্ধ কূর্মাসন

সংলগ্ন হইবে। পাছা আসনাবদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ গোড়ালীর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এরূপ অবস্থায় ৫/৭ সেকেণ্ড শ্বাস রুদ্ধ করিয়া অবস্থান কর। অতঃপর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে পূর্বাবস্থায় উপনীত হও। অনুরূপভাবে ৫/৭ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে।

উপকারিতা—এই আসনটি জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে, উদরের স্নায়ু পেশী সবল করে, উদরের চর্বি হ্রাস করে; জীবনীশক্তি বর্ধিত করে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা রোগারোগ্যে সহায়তা করে।

অর্ধ চক্রাসন

এই আসনে দেহটি অর্ধ চক্রাকার হয় বলিয়াই ইহার নাম অর্ধ চক্রাসন।

প্রণালী—পদদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়।

অতঃপর পদদ্বয় গুটাইয়া হাঁটু দুইটি ঊর্ধ্বে তোল ; হাতের উপর শরীরের ভর রাখিয়া মস্তক, বুক ও উদরকে ঊর্ধ্বে তোল এবং ঊর্ধ্বোত্থিত মস্তককে যথাসাধ্য পশ্চাদ্দিকে বাঁকাও। হাঁটুদ্বয়কে যথাসাধ্য সটান রাখিয়া পদদ্বয়কে সাধ্যানুযায়ী মস্তক অভিমুখে লইয়া যাও।

অর্ধ চক্রাসন

প্রথম অভ্যাসের সময় শরীর অর্ধ বৃত্তাকার হইবে; ক্রমশঃ অভ্যাসে স্নায়ুতন্তুর জড়তা দূর হইলে শরীরটি প্রায় বৃত্তাকার হইয়া আসিবে। সাধ্যমত ২ সেকেণ্ড হইতে ১০ সেকেণ্ড এই আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আবার মস্তক নামাইয়া শুইয়া পড়। অর্ধ মিনিট বা এক মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসনটি কর। দৈনিক একবেলা তিনবার মাত্র আসনটি করিবে। শীতের ছয় মাস তিন হইতে পাঁচবার পর্যন্ত করা যাইতে পারে।

উপকারিতা—মেরুদণ্ড নমনীয় থাকিলে বৃদ্ধ বয়সেও শরীর জরাগ্রস্ত হয় না, আমরণ শরীরে যৌবনশ্রী অটুট থাকে। মেরুদণ্ডকে নমনীয় রাখিতে
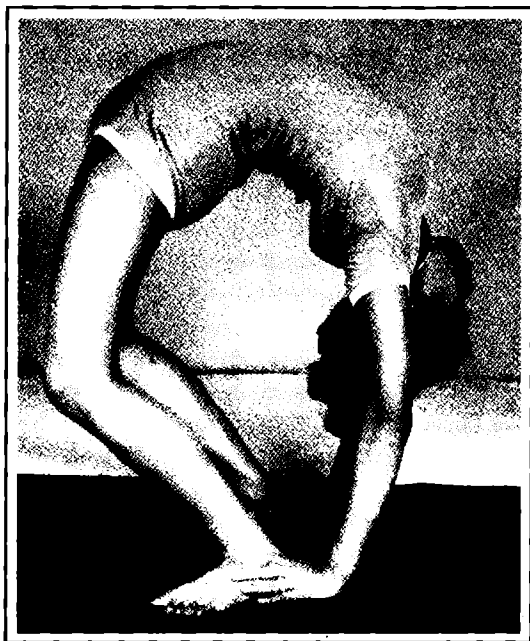
চক্রাসন

এই আসনটি বিশেষ অনুকূল। এই আসনটিতে ধনুরাসন, ভুজঙ্গাসন প্রভৃতির উপকারিতা একসঙ্গে পাওয়া যায়। এই আসনটি অভ্যাসে ছেলে-মেয়েদের ও তরুণ-তরুণীদের বুকের গড়ন সুশ্রী ও সুঠাম হয়, ইহা দেহের অতিরিক্ত মেদ-মাংস হ্রাস করিয়া দেহকে সুগঠিত করে। এই আসনটি অভ্যাস থাকিলে সন্তানের মা হইলেও মেয়েদের বক্ষসৌষ্ঠব অটুট থাকিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, কটিবাত প্রভৃতি রোগারোগ্যে এই আসনটি সহায়তা করে। এই আসন অভ্যাসকারী ছেলে-মেয়েরা কাজকর্মে খুব চট্‌পটে হয়।

অশ্বিনী মুদ্রা

অশ্বিনী মুদ্রা মূলবন্ধ মুদ্রারই প্রকারভেদ। শুধু পার্থক্য এই—মূলবন্ধে শঙ্খিনী নাড়ীকে এমনভাবে আকর্ষণ করিতে হয়, যাহাতে মূলস্থান পর্যন্ত সেই আকর্ষণ পৌঁছায়; মূলস্থানের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার উপরও সেই আকর্ষণের প্রভাব পড়ে। কিন্তু অশ্বিনী মুদ্রায় শঙ্খিনী নাড়ীকে (Anal nerve) খুব বেশী জোরে আকর্ষণ করিতে হয় না—সামান্য আকর্ষণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ শিথিল করিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ অশ্বিনী মুদ্রায় গুহ্যদেশ ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হয়। দুইবেলাই ১০ হইতে ২০ বার এই মুদ্রাটির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

উপকারিতা—অর্শ ও ভগন্দর প্রভৃতি গুহ্যরোগে এবং শুক্রক্ষয়াদি নিবারণে এই মুদ্রাটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রা

প্রণালী—পদদ্বয় একফুট বা দেড়ফুট ফাঁক করিয়া দাঁড়াও। হস্তদ্বয় হাঁটুর অব্যবহিত উপরে স্থাপন কর। মাথা, ঘাড় ও বুক সম্মুখের দিকে কিঞ্চিৎ নত কর। এইবার ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর। এমনভাবে শ্বাস ত্যাগ কর—পেট যেন একেবারে খালি হইয়া যায়। শ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস গ্রহণ বন্ধ রাখিয়া বস্তিপ্রদেশ ও উদরপ্রদেশকে মেরুদণ্ডের দিকে আকর্ষণ কর। এমনভাবে উদর আকর্ষণ করিবে, যাহাতে পেটে-পিঠে প্রায় লাগিয়া যায়। যতক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ রাখিতে পারিবে, ততক্ষণ এইভাবে থাক। যখন আর শ্বাস রুদ্ধ রাখিতে পারিবে না, তখন আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দমভোর শ্বাস টানিয়া লও। উদর আকুঞ্চনের সময় লক্ষ্য রাখিবে—উহার পেশীতে যেন টান না পড়ে, পেশী শিথিল করিয়াই উদরকে মেরুদণ্ডে লাগাইবে। উপবিষ্ট অবস্থাতেও অনুরূপভাবে উড্ডীয়ানবন্ধ অভ্যাস করা যাইতে পারে।

খালিপেটে এই মুদ্রাটি অভ্যাস করিতে হয়। বলা বাহুল্য, **অন্যান্য আসন-মুদ্রাও খালিপেটে করাই নিয়ম**। এই মুদ্রাটি প্রথমতঃ ২/৩ বার
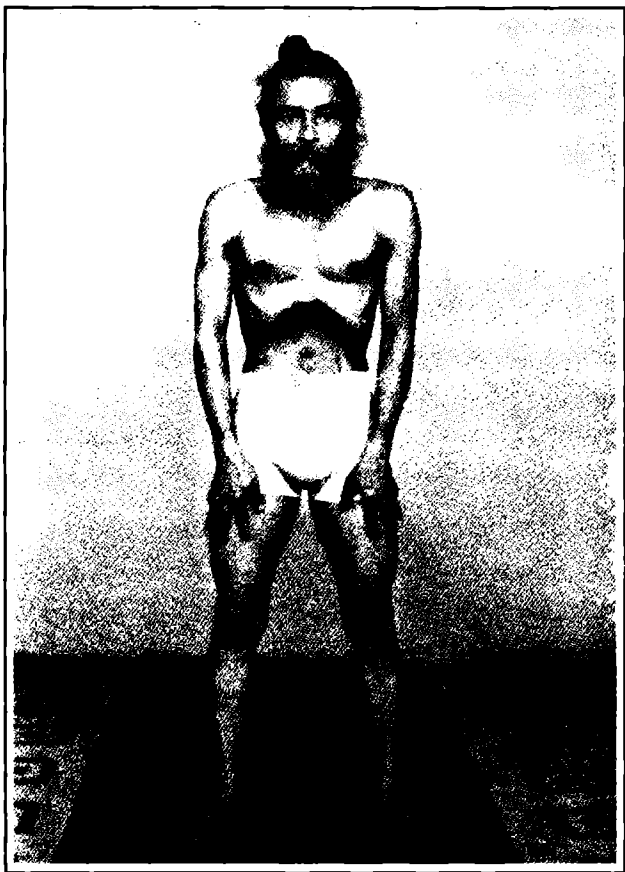
উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রা

করিবে, অতঃপর মাত্রা বাড়াইয়া ৬/৭ বার পর্যন্ত করা যায়।

উপকারিতা—এই মুদ্রাটি অগ্নিগ্রন্থি ও বরুণগ্রন্থিকে সবল করে। সুতরাং, এই মুদ্রাটি কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, পিত্তশূল, অম্লশূল, হার্ণিয়া, এপেণ্ডিসাইটিস, অন্ত্রক্ষত, অন্ত্রে ফোঁড়া, অন্ত্রপাথুরী প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে। মেয়েদের ঋতুর গোলযোগ এবং প্রদরাদি স্ত্রীব্যাধি এবং পুরুষের স্বপ্নদোষ নিবারণে এই মুদ্রাটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই মুদ্রা অভ্যাসে উদরের স্নায়ু-পেশী সবল হয় এবং যকৃৎ সুস্থ-সবল থাকে। এই মুদ্রাটির অভ্যাসে শরীরে সঞ্চিত সমুদয় দূষিত বায়ু দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়; ফলে দেহ দোষমুক্ত হইয়া দ্রুত নীরোগ হইয়া উঠে। এই মুদ্রা অভ্যাসকারীর কখনও কলেরা-বসন্তাদি মারাত্মক রোগ হয় না।

যোগশাস্ত্রে উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে— **"উড্ডীয়ানো হ্যসৌ বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী। অভ্যাসেৎ সততং যস্তু বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥"**—এ মুদ্রাটি মৃত্যুঞ্জয়ী অর্থাৎ অকালমৃত্যুর হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করে। এই মুদ্রাটির সতত অভ্যাস থাকিলে বৃদ্ধবয়সেও দেহের তারুণ্য অটুট থাকে, জরাব্যাধি বিমুক্ত থাকে।

যোগশাস্ত্রের এই প্রশংসা অতিরঞ্জিত নয়। ইহার কারণ এই মুদ্রা অভ্যাসে শুক্রগ্রন্থি (সুপ্রারেণাল), সূর্যগ্রন্থি (প্যাংক্রিয়াস), প্রজাপতিগ্রন্থি প্রভৃতি সবল থাকে। এই গ্রন্থিগুলি সবল থাকিলে মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটিতে পারে না।

উষ্ট্রাসন

এই আসনটি অভ্যাসের সময় দেহের অগ্র ও পশ্চাদভাগ নীচু হইয়া এবং মধ্যভাগ উঁচু হইয়া দেহটি কতকটা উষ্ট্রের আকার ধারণ করে; এইজন্যই ইহার নাম হইয়াছে উষ্ট্রাসন।

প্রণালী—হাঁটু গাড়িয়া অর্ধদণ্ডায়মান অবস্থায় দাঁড়াও। পায়ের পাতা

মুড়িয়া দাও। অতঃপর শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বক্ষদেশ উঁচু করিয়া মস্তক পশ্চাদ্দেশে অবনত কর এবং বামহস্ত দ্বারা বামপদের এবং ডানহস্ত
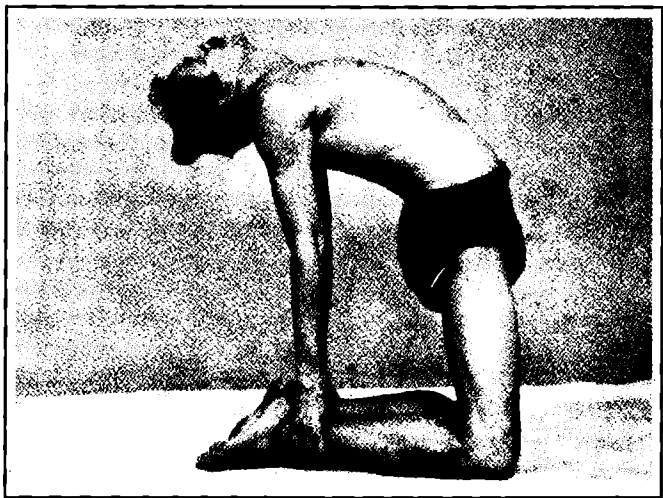
উষ্ট্রাসন

দ্বারা ডানপদের গোড়ালির অব্যবহিত ঊর্ধ্বস্থানের পায়ের নলী ধারণ কর। এইভাবে আসনটি করিতে গেলেই বুক উঁচু হইয়া দেহটি প্রায় অর্ধচক্রাকারে পরিণত হইবে। শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া ১০/১৫ সেকেণ্ড এইরূপ আসনাবদ্ধ অবস্থায় থাক; অতঃপর শ্বাস টানিতে টানিতে পুনরায় শরীর সোজা অবস্থায় উপনীত হও। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম অন্তে পুনরায় ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিয়া অর্ধদণ্ডায়মান হও। অনুরূপভাবে ৩/৪ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে।

উপকারিতা—মেরুদণ্ডকে নমনীয় রাখিতে, মেরুদণ্ডসংলগ্ন স্নায়ু, পেশী, তন্তু প্রভৃতির সবলতা বিধানে এই আসনটি বিশেষভাবেই সাহায্য করে। মেরুদণ্ড নমনীয় থাকিলে বৃদ্ধবয়সেও দেহ বার্ধক্যগ্রস্ত হয় না।

সুতরাং এই আসনটি বার্ধক্যের হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিতে,

দেহকে সবল ও সুস্থ রাখিতে এবং দেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বস্তিস্নায়ু সবল করিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ দূর করিতে এবং ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া ব্রহ্মচর্য রক্ষায় এই আসনটি কতকটা সাহায্য করে। এই আসন অভ্যাসে শীতোষ্ণ সহ্য করার শক্তি বাড়ে।

গোমুখাসন

প্রণালী—দক্ষিণ ঊরু বাম ঊরুর উপর স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পায়ের গোড়ালি বামদিকের পৃষ্ঠপার্শ্বে (পাছার সহিত) সংলগ্ন করিবে এবং বাম পদের গোড়ালি দক্ষিণ পৃষ্ঠপার্শ্বে সংযোজিত করিবে। অতঃপর বামহস্তটি ঘুরাইয়া পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ স্কন্ধাভিমুখে স্থাপন করিবে এবং দক্ষিণ হস্তকে দক্ষিণ স্কন্ধদেশের উপর দিয়া লইয়া গিয়া পৃষ্ঠদেশস্থ বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি ধারণ করিবে।
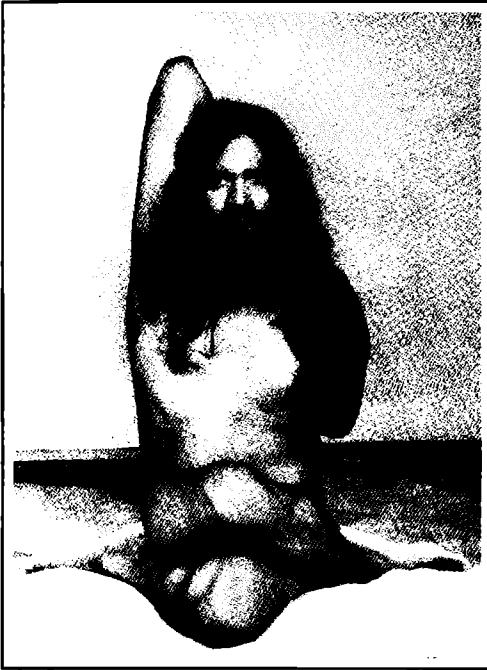
গোমুখাসন

উপকারিতা—এই আসনটি বদ্ধপদ্মাসনের মতো মেরুদণ্ডকে সবল করে। ব্রহ্মচর্য রক্ষার

পক্ষে এই আসনটি বিশেষ উপযোগী। কুচিন্তা কুভাবনার সময় এই আসনটি অভ্যাস করিলে সাময়িকভাবে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। আসনটি পায়ের বাত, সায়াটিকা বাত, অর্শরোগ, মূত্র-প্রদাহ, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগারোগ্যে সহায়তা করে।

জানুশিরাসন

জানু অর্থাৎ হাঁটুর উপর শির (মাথা) স্থাপন করিতে হয়—এইজন্যই ইহার নাম জানুশিরাসন।
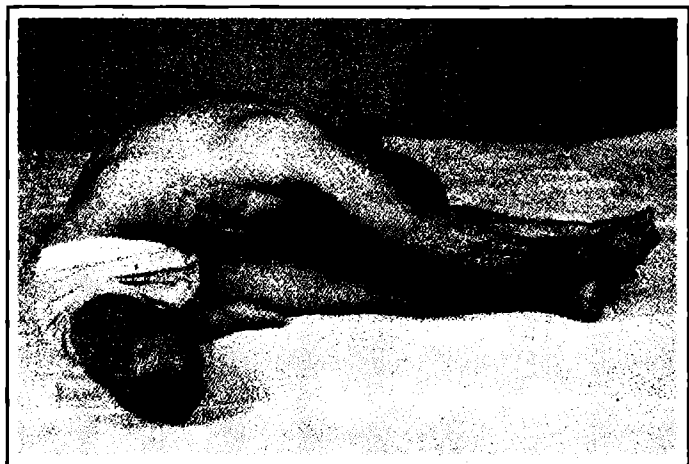
জানুশিরাসন

প্রণালী—বামপদের গোড়ালি যোনিমণ্ডলে (গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকুর নাম **যোনিমণ্ডল**) স্থাপন কর। দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দাও, অতঃপর শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে উভয় হস্ত

দ্বারা প্রসারিত দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি ধারণ কর এবং মস্তকটি হাঁটুর সহিত সংলগ্ন কর। বলা বাহুল্য, হাঁটু যেন মৃত্তিকা সংলগ্ন থাকে (প্রথম অভ্যাসকারীর হাঁটু মৃত্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উঠিলেও ক্ষতি নাই ; ক্রমাভ্যাসে হাঁটু মৃত্তিকা সংলগ্ন হইবে)। ২/৪ সেকেণ্ড বা ৫/৭ সেকেণ্ড শ্বাস বন্ধ করিয়া মস্তক হাঁটু সংলগ্ন করিয়া রাখ; অতঃপর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে পূর্বাবস্থায় উপনীত হও। এইভাবে ৩/৪ বার ক্রিয়াটি অনুষ্ঠানের পর বিপরীতভাবে ক্রিয়াটি অভ্যাস কর অর্থাৎ দক্ষিণপদ যোনিমণ্ডলে স্থাপন পূর্বক বামপদ প্রসারিত করিয়া পূর্ববৎ ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—এই আসনটি জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে, নাভিপ্রদেশের স্নায়ু ও পেশীগুলিকে সবল করে, শারীরিক আলস্য ও জড়তা দূর করে, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশকে নমনীয় করে। সায়াটিকা, অর্শ, কটিবাত প্রভৃতি রোগারোগ্যে সহায়তা করে। অল্পবয়স্কদের দেহের খর্বতা দূর করিয়া দেহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মঙ্গলগ্রন্থির (Thymus gland) দুর্বলতাহেতু, দোষ-ত্রুটিহেতু দেহ খর্ব হয়। মঙ্গলগ্রন্থির এই ত্রুটি দূর করিতে জানুশিরাসন বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ত্রিকোণাসন

এই আসনে শরীরটি ত্রিকোণ অর্থাৎ ত্রিভুজের আকার ধারণ করে। এইজন্যই ইহার নাম ত্রিকোণাসন।

প্রণালী—নিজ নিজ সুবিধামত পদদ্বয় ১॥ ফিট বা ২ ফিট ফাঁক করিয়া দাঁড়াও। অতঃপর হাঁটু সটান রাখিয়া মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া বামহস্ত দ্বারা বামপদ স্পর্শ কর। দক্ষিণহস্ত দক্ষিণ স্কন্ধ বরাবর সটান করিয়া ঊর্ধ্বমুখী রাখ। ঘাড় এমনভাবে বাঁকাও, যাহাতে দৃষ্টি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ অভিমুখে নিবদ্ধ থাকে। ২/১ সেকেণ্ড এইভাবে

থাকিয়া পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াও। অতঃপর ঠিক বিপরীতভাবে
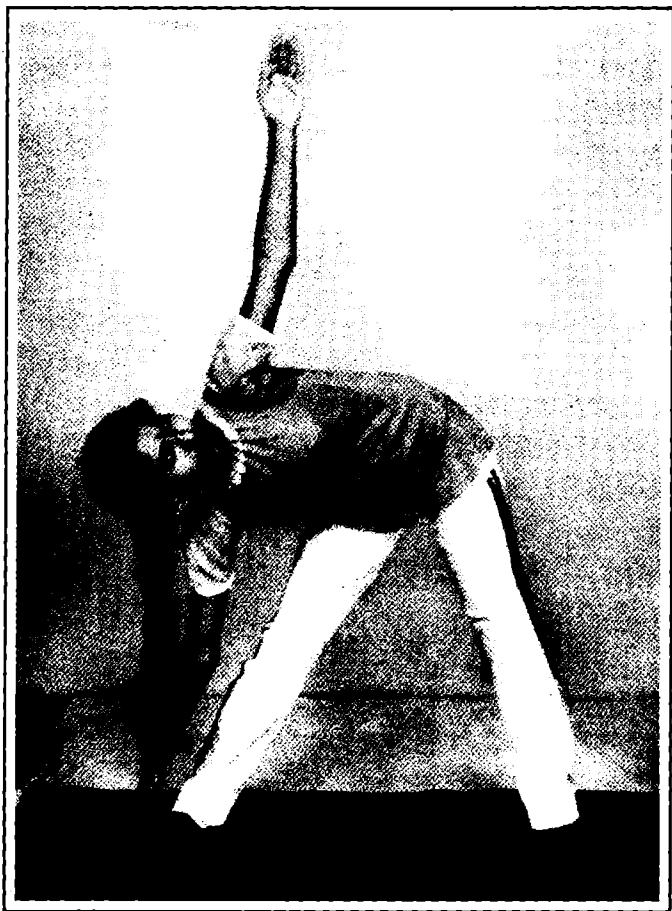
ত্রিকোণাসন

ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ ডান হাত দিয়া ডান পা স্পর্শ কর; বাম

হাত বাম স্কন্ধ বরাবর ঊর্ধ্বে তোল; দৃষ্টি বাম হাতের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগে নিবদ্ধ রাখ। পূর্ববৎ ২/১ সেকেণ্ড এইভাবে থাকিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। দ্রুততালে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠান কর। ভালো অভ্যস্ত হইলে প্রত্যহ একবেলা কমপক্ষে ১০ বার ঊর্ধ্বপক্ষে ২০ বার ক্রিয়াটি অনুরূপভাবে খুব দ্রুততার সহিত অভ্যাস করিবে।

উপকারিতা—এই আসনটিও মেরুদণ্ডকে নমনীয় করিয়া দেহকে যৌবনশক্তিতে পূর্ণ রাখিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই আসন অভ্যাসের সময় মেরুপ্রদেশে প্রচুর রক্ত চলাচল করে এবং তাহার ফলে শুধু পার্শ্ববর্তী স্নায়ু নয়, অন্যান্য স্নায়ুমণ্ডলীও পুষ্টির উপাদান পাইয়া সবলতর হইয়া উঠে। যাহারা অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন করিতে অক্ষম তাহারা অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসনের প্রতিনিধিস্বরূপ এই আসনটি অভ্যাস করিবে।

এই আসনটি অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসনের সমকক্ষ নয়, তবুও অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসনের সুফল খানিকটা এই আসন অভ্যাসে পাওয়া যায়। এই আসনটি অজীর্ণ রোগ দুর করিয়া জঠরাগ্নি বর্ধিত করিতে সহায়তা করে, কোমরের বেদনা দূর করে।

স্নায়ু-পেশী অথবা অস্থিসংগঠনের কোনো ত্রুটির জন্য এক পা যদি আর এক পা হইতে কিঞ্চিৎ খর্ব হয়, তাহা হইলে এই আসন অভ্যাসে তাহা সংশোধিত হয়।

ধনুরাসন

এই আসনে শরীর ধনুর আকার ধারণ করে। হস্তদ্বয়কে মনে হয় যেন ধনুকের জ্যা অর্থাৎ ছিলা। এইজন্যই এই প্রক্রিয়াটির নাম ধনুরাসন।

প্রণালী—শলভাসনের মতোই উপুড় হইয়া শুইয়া পড়। পদদ্বয় হাঁটুর কাছে ভাঙ্গিয়া পশ্চাদ্দিকে বাঁকাও, হস্তদ্বয়কে কাঁধের উপর দিয়া পিছনে লইয়া গিয়া উভয় হাত দিয়া উভয় পদের নলী ধারণ কর। এইবার বুক

ও হাঁটু দুইটিকে সাধ্যমত ঊর্ধ্বে তোল। বুক ও ঘাড়কে ভুজঙ্গাসনের মতো যথাসাধ্য পশ্চাদ্দিকে বাঁকাও। শরীরের ভারকেন্দ্র তলপেটের উপর স্থাপন কর। ৫/৭ সেকেণ্ড এইভাবে আসনাবদ্ধ থাকিয়া হাত-পা নামাইয়া লও। আধ মিনিট বা এক মিনিট বিশ্রাম করিয়া আবার অনুরূপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

ধনুরাসন-১

এই আসনটি ভালো অভ্যস্ত হইলে দুই হাঁটু সংলগ্ন করিয়া আসনটি অভ্যাস করিবে ; এই ক্রিয়াটি কমপক্ষে দুইবার এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ৫ বার অভ্যাস করিবে।

উপকারিতা—ভুজঙ্গাসন, শলভাসন ও ধনুরাসন—এই তিনটি মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আসন। ভুজঙ্গাসনে মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্বাংশ শলভাসনে নিম্নাংশ এবং ধনুরাসনে মধ্যাংশ নমনীয় হইয়া উঠে এবং মেরুদণ্ডসংশ্লিষ্ট স্নায়ু, তন্তু ও পেশীগুলিকে ইহারা সবলতর করে। তলপেটের উপর শরীরের সমস্ত ভার কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া উদরস্থ বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্বলতা এবং প্লীহা-যকৃতের দোষ-ত্রুটি এই ধনুরাসন অভ্যাসে দূর হয়। এই আসন অভ্যাসে অজীর্ণ রোগ, বাত ও বহুমূত্র রোগ নির্মূল হয়। তলপেটের মেদবৃদ্ধিপ্রবণতা নষ্ট হয়।

এই আসনটির অভ্যাসে মনের চঞ্চলতা হ্রাস পায় এবং স্বভাবে স্থৈর্য ও ধৈর্য বৃদ্ধি পায়।
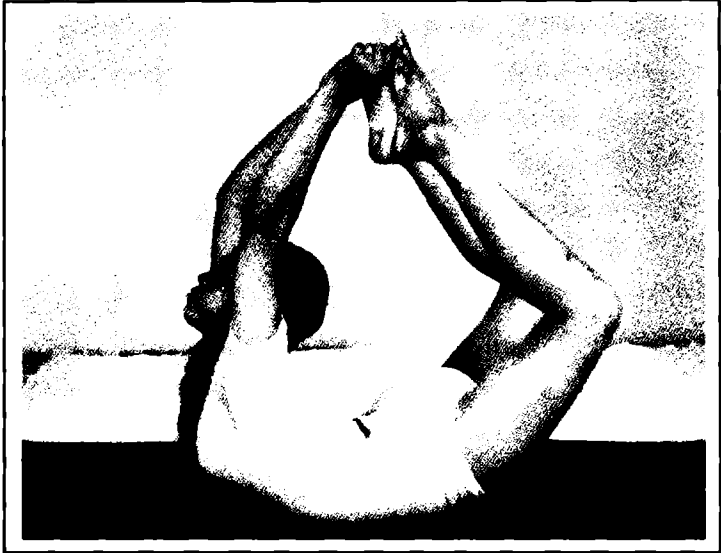
ধনুরাসন-২

পদহস্তাসন

হস্ত ও পদের স্নায়ু-পেশী এই আসন অভ্যাসে বিশেষভাবেই সবলতর হইয়া উঠে—এইজন্যই ইহার নাম পদহস্তাসন।

প্রণালী—হস্তদ্বয়কে ঊরুর সহিত সমান্তরালে রাখিয়া সম্মুখে দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া সরলভাবে দাঁড়াও। পায়ের গোড়ালিদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইবে, কিন্তু উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে এক বিঘত ফাঁক থাকিবে। অতঃপর বামহাত সটান রাখিয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া হাতের কনুই
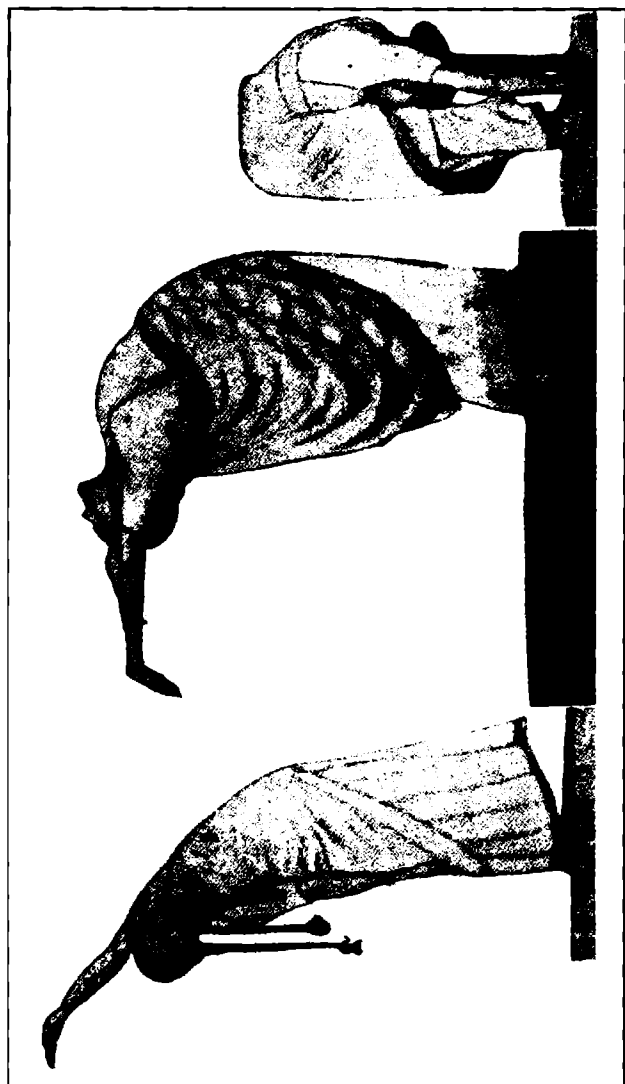
পদহস্তাসন

মস্তকের সহিত সংলগ্ন কর। হস্ত মস্তক সংলগ্ন হইলে ঐ উত্তোলিত হস্তসহ মস্তকটিকে দক্ষিণ স্কন্ধ বরাবর সাধ্যমত নত করিতে থাক। পা একটুও নড়িবে না, হাঁটু একটুও ভাঙ্গিবে না। দক্ষিণ হস্ত পূর্ব্ববৎ সটান থাকিবে এবং মস্তক নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা জঙ্ঘাপ্রদেশে নামিয়া আসিবে। যতদূর মস্তক নত হইতে পারে, ততদূর নত হইয়া কয়েক সেকেণ্ড এই অবস্থায় থাক। হস্তদ্বয়কে পূর্ব্ববৎ রাখিয়া মস্তককে ধীরে ধীরে উত্তোলিত করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। ঐরূপ দণ্ডায়মান অবস্থাতে থাকিয়াই ঊর্দ্ধ্বে উত্তোলিত বাম হস্তকে ক্রমশঃ নামাইয়া আনিয়া পূর্ব্ববৎ বাম ঊরুর সমান্তরালে রাখ। এইবার বিপরীতভাবে পুনরায় ক্রিয়াটির অভ্যাস কর, অর্থাৎ বামহাতের পরিবর্তে এবার ডানহাত ঊর্দ্ধ্বে উঠাও। ডানহাতের কনুইপ্রদেশ মস্তকের সহিত সংলগ্ন কর এবং ঐ হস্তসহ মস্তক বামস্কন্ধ বরাবর নত কর। হাঁটু ভাঙ্গিবে না এবং মাথা নত করার সঙ্গে সঙ্গে বামহাতও জঙ্ঘাপ্রদেশের দিকে নামিতে থাকিবে। হাঁটু না ভাঙ্গিয়া যতদূর নত হইতে পার, ততদূর নত হইয়া কয়েক সেকেণ্ড আসনে প্রতিষ্ঠিত থাক; আবার পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াও। এইবার হস্তদ্বয়কে স্কন্ধ বরাবর সম্মুখের দিকে প্রসারিত কর এবং ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ্বে উঠাইয়া যথাসাধ্য মস্তকের পিছনে লইয়া যাও। বলা বাহুল্য, হাত ওঠানামা করিবার সময় হস্তাঙ্গুলিসহ সমগ্র বাহু সটান রাখিতে হইবে, কনুই প্রদেশে কোনো ভাঁজ পড়িবে না। অতঃপর পশ্চাদ্‌দিকের প্রসারিত হস্তদ্বয়কে সম্মুখে আনিয়া ক্রমশঃ নত হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা উভয় পদের অঙ্গুলি স্পর্শ কর। হস্ত দ্বারা পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিবার সময় হাঁটুও সোজা রাখিতে হইবে। হাঁটুতে যেন ভাঁজ না পড়ে। সক্ষম হইলে কপাল হাঁটুতে সংলগ্ন করিবে, সংলগ্ন করিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই। কয়েক সেকেণ্ড এইভাবে আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হস্তদ্বয়কে ঊর্দ্ধ্বে উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং ঊর্দ্ধ্বোত্তোলিত হস্ত নিম্নে নামাইয়া দাও।

দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে পর্যায়ক্রমে নত হওয়ার এই চারি প্রকার ক্রিয়া মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পদহস্তাসন হয়। এই ক্রিয়াটি

সাধ্যমত ২ বার হইতে আরম্ভ করিয়া ৫/৭ বার পর্যন্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রথম পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে কষ্ট হইলে যতদূর হাত যায় ততদূর পর্যন্ত হাত নামাইয়া ক্রিয়া সমাপ্ত করিবে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে পদ স্পর্শ করা যখন সহজ হইয়া আসিবে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস সহযোগে ক্রিয়াটি অভ্যাস করিবে। হাত উঠাইবার সময় শ্বাস টানিয়া লইবে এবং হাত নামাইবার সময় শ্বাস ছাড়িতে থাকিবে। এইরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে করিতে পারিলে এই আসনে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়।

উপকারিতা—মেরুদণ্ডকে আমরণ যৌবনশক্তিতে পূর্ণ রাখিতে, ঋজু ও নমনীয় রাখিতে এই আসনটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই আসন অভ্যাসে পার্শ্বের, সম্মুখের, পশ্চাতের অর্থাৎ পা হইতে ঘাড় পর্যন্ত সমগ্র দেহের পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যায়াম হয় এবং তাহাদের সজীবতা বাড়ে। এই আসনটির আর একটি বিশেষ গুণ যে সমস্ত কারণে ছেলে-মেয়েরা বেঁটে হয়, সেই সমস্ত কারণের প্রবণতা ইহাতে দূর হয় এবং কেহ কেহ স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য লাভ করে। এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগী অল্পমাত্রায় প্রত্যহ এই আসনটি অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ তাহার দেহে রক্তসঞ্চার হইতে থাকে এবং ধীরে ধীরে দেহের দুর্বলতা এবং অন্যান্য উপসর্গ কমিতে থাকে। এই আসনটি কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, সায়াটিকা, মেদবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ দূর করে, মূত্রযন্ত্রের (কিড্‌নি) দোষ-ত্রুটিও এই আসন অভ্যাসে বিদূরিত হয় এবং যকৃৎ সবলতর হইয়া উঠে। এই আসন অভ্যাসে সর্বশরীরে এবং মস্তিষ্কে যথোচিত রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সর্বশরীরে স্নায়ু ও পেশীর সবলতা বিধানে, সমগ্র শরীরের স্বাস্থ্য বিধানে ইহা বিশেষভাবে সহায়তা করে।

নিষেধ—অত্যধিক রক্তচাপবৃদ্ধি রোগী এবং হৃদ্‌রোগীর এই আসনটি অভ্যাস নিষিদ্ধ।

পদ্মাসন

পদ্মাসন দুই প্রকার—মুক্ত-পদ্মাসন ও বদ্ধ-পদ্মাসন।

প্রণালী—বাম ঊরুর উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ ঊরুর উপর বাম চরণ স্থাপন করিবে। জিহ্বাটি রাজদন্তমূলে সংলগ্ন করিবে; দৃষ্টি নাসাগ্রে নিবদ্ধ রাখিবে। মেরুদণ্ড সটান সরল রাখিয়া বাম হস্ত বাম ঊরুর উপর, ডান হস্ত ডান ঊরুর উপর স্থাপন করিবে এবং সোজা হইয়া বসিবে। ইহাই **মুক্ত-পদ্মাসন**।
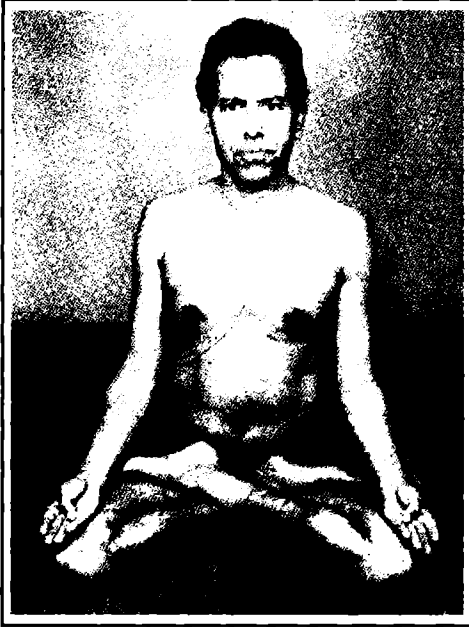
মুক্ত-পদ্মাসন

মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া দক্ষিণ হস্তকে পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া বাম ঊরুর উপর অবস্থিত দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ ধারণ করিবে। অনুরূপভাবে বাম হস্তকেও পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ ঊরুর উপর অবস্থিত বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধারণ করিবে এবং চিবুক কণ্ঠকূপে নিবদ্ধ রাখিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিবে—ইহাই **বদ্ধ-পদ্মাসন**।

উপকারিতা—পায়ের বাতাদি দূর করিয়া শরীরকে সুস্থ-সবল রাখিতে পদ্মাসন বিশেষভাবেই সাহায্য করে। এই পদ্মাসন অবলম্বনেই বিবিধ মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। ধ্যান-ধারণা অভ্যাসের পক্ষেও পদ্মাসন অপরিহার্য। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষেও পদ্মাসন বিশেষভাবে অনুকূল।

বদ্ধ-পদ্মাসন

বদ্ধ পদ্মাসনে বক্র মেরুদণ্ড সরল হয়। বক্র মেরুদণ্ড শুধু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক তাহা নয়, উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এইজন্যই যোগশাস্ত্রে বক্র মেরুদণ্ড সরল করিবার জন্য এই পদ্মাসন এবং অন্যান্য আসনের ব্যবস্থা আছে।
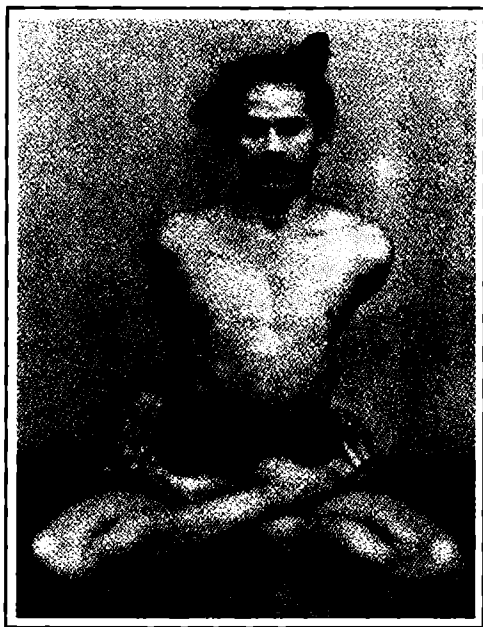
পবনমুক্তাসন

উদরের আবদ্ধ বায়ুকে মুক্ত করে বলিয়া ইহার নাম পবনমুক্তাসন।

প্রণালী—শবাসনে শয়ন কর। অতঃপর দক্ষিণ পদ কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে

তুলিয়া হাঁটুর কাছে ভাঁজ কর, উভয় হস্ত দ্বারা ঐ হাঁটু ধারণ করিয়া দক্ষিণ বক্ষের স্তনের উপর ঐ হাঁটু সজোরে চাপিয়া ধর। ৫/১০ সেকেণ্ড চাপিয়া রাখিয়া হাত আলগা কর এবং পা প্রসারিত করিয়া পূর্বাবস্থায়
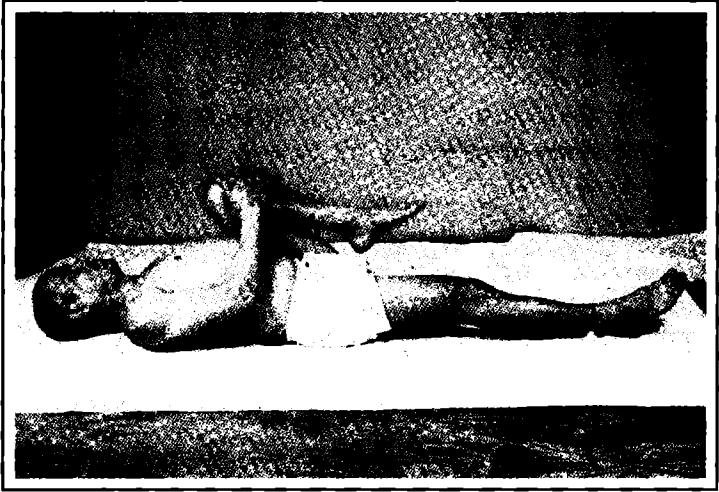
পবনমুক্তাসন

স্থাপন কর। অতঃপর বাম হাঁটুও অনুরূপভাবে বাম স্তনের উপর স্থাপন করিয়া সজোরে ৫/১০ সেকেণ্ড চাপিয়া রাখ এবং বাম পদকেও প্রসারিত করিয়া পূর্বাবস্থায় স্থাপন কর। এইভাবে পর পর বাম ও দক্ষিণ হাঁটু বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। পৃথকভাবে উভয় পদে এইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর উভয় জানুকেই অনুরূপভাবে ভাঁজ করিয়া আনিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিবে। প্রথমে ডান হাঁটু, পরে বাম হাঁটু এবং সর্বশেষে উভয় হাঁটু কিছুক্ষণ বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া পদ সম্প্রসারণ পূর্বক পূর্বাবস্থায় উপনীত হইলে একবার মাত্র ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হইল। অনুরূপভাবে ৪ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে।

যতদিন ক্রিয়াটি ভালো আয়ত্ত না হয়, ততদিন শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি

মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ক্রিয়াটি ভালো আয়ত্ত হইলে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে হাঁটু বক্ষদেশে সংলগ্ন করিবে। যতক্ষণ বুকের উপর হাঁটু চাপা থাকিবে ততক্ষণ শ্বাস বন্ধ রাখিবে, অতঃপর শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পা প্রসারিত করিবে।

উপকারিতা—এই আসনটি অভ্যাসে অজীর্ণ, অম্ল, পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়, উদরের চর্বি হ্রাস করে। উদরের স্নায়ু-পেশীগুলিকে সবলতর করিয়া অগ্নিগ্রন্থিগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় অর্থাৎ জঠরাগ্নি বৃদ্ধিতে এবং কোষ্ঠবদ্ধতাদোষ দূর করিতে এই আসনটি সহায়তা করে।

পশ্চিমোত্তান

যে আসন শরীরের পশ্চিমভাগকে অর্থাৎ নিম্নাঙ্গকে সবল ও সুদৃঢ় করে, তাহারই নাম পশ্চিমোত্তান।

প্রণালী—পদদ্বয়কে সরলভাবে সম্মুখে বিস্তৃত কর। পায়ের অঙ্গুলিগুলি ঊর্ধ্বমুখী থাকিবে। গোড়ালি দুইটি পরস্পর সংলগ্ন হইবে। এইবার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ কর। অতঃপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মস্তকটি ধীরে ধীরে নত করিতে থাক; মস্তক নত হইতে হইতে ললাটদেশ মৃত্তিকাসংলগ্ন হাঁটুর উপর স্থাপিত হইবে। প্রথম অভ্যাসের সময় হাঁটু যদি মৃত্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উঠে, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই। ক্রমাভ্যাসে হাঁটু মৃত্তিকাসংলগ্ন হইবে। শ্বাস বন্ধ করিয়া ললাটদেশ সাধ্যমত ৫ হইতে ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত হাঁটুর সহিত সংলগ্ন রাখ, অনন্তর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে আবার সোজা হইয়া উপবেশন কর; বলা বাহুল্য, শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে সোজা হইবার সময় হস্তকে অঙ্গুলিবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া লইবে।

প্রথম প্রথম প্রত্যহ একবার অথবা দুইবার মাত্র আসনটি অভ্যাস কর।

আসনটি বেশ ভালো অভ্যস্ত হইলে প্রত্যহ ঊর্ধ্বসংখ্যায় ৫/৭ বার মাত্র করিবে।
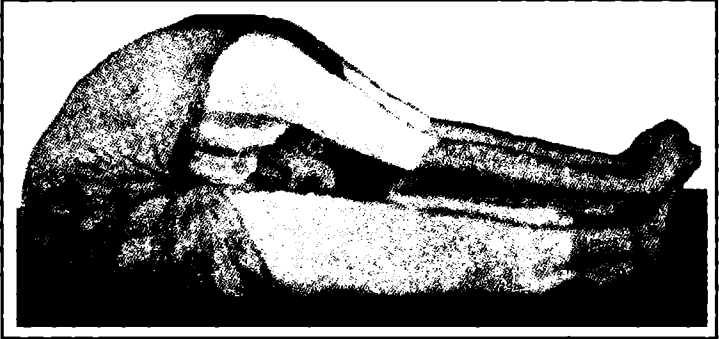
পশ্চিমোত্তান নং ১
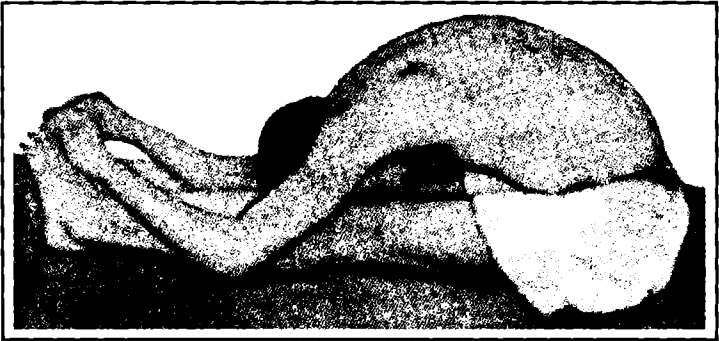
পশ্চিমোত্তান নং ২

ভোরের দিকে স্নায়ুমণ্ডলী স্বভাবতঃই একটু আড়ষ্ট থাকে, সুতরাং এই আসনটি দ্রুত আয়ত্ত করিতে হইলে প্রথম প্রথম বৈকালে অভ্যাস করাই শ্রেয়ঃ। কপাল মৃত্তিকাস্থিত হাঁটুর সহিত সংলগ্ন করা অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়ে ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেই একটু কষ্টসাধ্য হইবে। কিন্তু কোনো যোগপ্রক্রিয়াই শরীরকে অত্যধিক পীড়া দিয়া অভ্যাস করা উচিত

নয়, যতটুকু করিলে শরীরে পীড়া অনুভব না হয়, ততটুকু করিয়াই অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম প্রথম যাহা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইবে, ক্রমশঃ অভ্যাসে তাহা সহজসাধ্য হইয়া আসিবে।

ললাটদেশ হাঁটুর সহিত সংলগ্ন রাখিবার সময় হস্তদ্বয়কে টান করিয়া মস্তকের উপরিভাগেও রাখিতে পার, অথবা হাতের কনুই দুইটি ভাঁজ করিয়া মস্তকের দুই পার্শ্বে নামাইয়া দিতে পার।

উপকারিতা—এই আসনে বক্র মেরুদণ্ড সরল হয়, মেরুদণ্ড নমনীয় হয়। যোগাসনকারীদের মনে রাখিতে হইবে—**মেরুদণ্ড যত নমনীয় থাকিবে যৌবন ততই দীর্ঘস্থায়ী হইবে**। মেরুদণ্ড কঠিন এবং অনমনীয় হইয়া পড়িলে জরা ও বার্ধক্য আসিয়া দেহকে গ্রাস করে। এইজন্যই মেরুদণ্ডকে সরল ও নমনীয় রাখা যোগাসনের প্রধান লক্ষ্য। মেরুদণ্ড নমনীয় থাকিলে দেহস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর এবং গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াও স্বাভাবিক থাকে। দেহ আমরণ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে।

মেরুদণ্ডের অস্থি একটি অখণ্ড অস্থি নয়। ৩৩টি অস্থির সমবায়ে উহা গঠিত। অতি সুদৃঢ় সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা এই অস্থিগুলি পরস্পর সংযুক্ত। এইজন্য মেরুদণ্ডকে সামনে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে বাঁকানো যায়।

এই আসনটি মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগস্থ পেশী, স্নায়ু ও তন্তুগুলিকে সবল ও সুপুষ্ট করিয়া তোলে; হস্ত, পদ ও বস্তিপ্রদেশের পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে। অন্ত্র, মূত্রাশয়, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি উদরপ্রদেশের যন্ত্রগুলির ত্রুটি দূর করে। সায়াটিকা বাত, অর্শ, বহুমূত্র, কোষ্ঠবদ্ধতা, কোষ্ঠতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করিতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। কতকগুলি বিশেষ কারণে বয়সকালে মেয়েদের উদরেও তলপেটে চর্বি সঞ্চিত হইয়া তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া দেয়। এই আসনটিতে অভ্যস্ত হইলে নারী ও পুরুষ উভয়েরই উদর ও বস্তিপ্রদেশের অতিরিক্ত চর্বি নষ্ট হইবে, উদরের নিম্নাংশ অর্থাৎ কোমরটি সরু হইয়া দেহটি সুশ্রী ও সুঠাম হইয়া উঠিবে।

এই আসনটি অভ্যাসে শরীরের অবসাদ ও দুর্বলতা দুর হয়; শরীর কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মক্ষম হয়।

নিষেধ—যাহাদের প্লীহা, যকৃৎ, অন্ত্রোপাঙ্গবৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ (এপেণ্ডিসাইটিস ও হার্ণিয়া) ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাদের এই আসনটি করা নিষিদ্ধ।

বজ্রাসন

এই আসন অভ্যাসে শরীরের নিম্নাঙ্গ বজ্রের মতো সুদৃঢ় হইয়া উঠে, এইজন্যই ইহার নাম বজ্রাসন।

বজ্রাসন

প্রণালী—পা পশ্চাদ্দিকে মুড়িয়া গোড়ালির উপর উপবেশন কর। হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ের উপর সোজাভাবে স্থাপন কর। প্রথম অভ্যাসে পায়ে, হাঁটুতে সামান্য বেদনা বোধ হইবে; কিছুদিন অভ্যাস করার পর আর এইভাবে বসিতে অসুবিধা বোধ হইবে না।

উপকারিতা—এই আসনটি অভ্যস্ত থাকিলে সায়াটিকা বাত, পায়ের বাত প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হইতে পারে না। পায়ের পেশী ও স্নায়ু প্রভৃতি সবল হইয়া উঠে। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রধান আহার্য গ্রহণের অব্যবহিত পর দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহিত রাখিয়া আধঘণ্টা এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিলে খাদ্যবস্তু সহজে জীর্ণ হয়।

প্রথম যৌবন হইতে এইরূপ উপবিষ্ট অবস্থায় থাকিয়া প্রত্যহ চিরুণী দিয়া মাথা আঁচড়াইলে **বৃদ্ধ বয়সেও চুল পাকে না**। পায়ে বাত ধরিলে তাহাও ক্রমশঃ ভালো হয়।

সুপ্ত বজ্রাসন

প্রণালী—বজ্রাসন অবলম্বনে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। দক্ষিণহস্ত দ্বারা
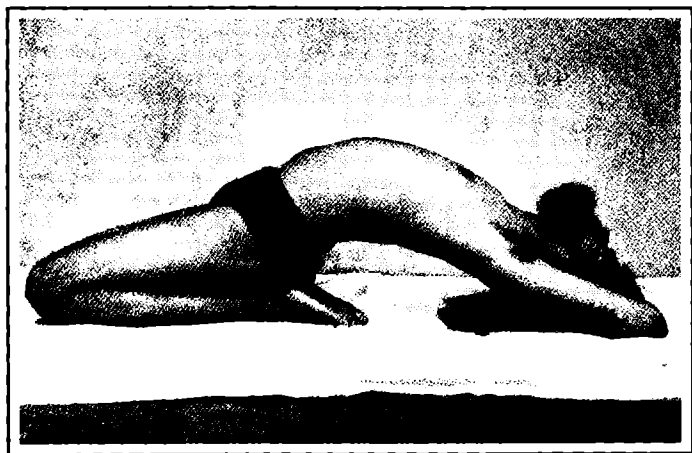
সুপ্ত বজ্রাসন

বাম স্কন্ধ ধারণ কর এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ স্কন্ধ ধারণ কর। অতঃপর

উভয় হস্তের কব্জির সংযোগস্থলের উপর মস্তকটি স্থাপন কর, অথবা মস্তক মৃত্তিকা-সংলগ্ন রাখিয়া বামহস্ত বাম উরুর উপর এবং দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন কর। ২/১ মিনিট এইভাবে আসনে প্রতিষ্ঠিত থাক। অতঃপর উপবিষ্ট অবস্থায় উপনীত হও। ২/৩ বার অনুরূপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—এই আসন অভ্যাসে মেরুদণ্ড নমনীয় হয়, মেরুদণ্ড প্রদেশের স্নায়ু-পেশী, বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু-পেশী সবল হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল, পায়ের বাত প্রভৃতি রোগারোগ্যে এই আসনটি সাহায্য করে।

বিপরীতকরণী মুদ্রা

পদদ্বয়কে ঊর্ধ্বে তুলিয়া শরীরকে বিপরীতভাবে স্থাপন করিবে। যোগীদের ভাষায় "**ঊর্ধ্বে চ নীয়তে সূর্যশ্চন্দ্রশ্চ অধঃ আনয়েৎ**"—সূর্যকে অর্থাৎ অগ্নিগ্রন্থিস্থানকে ঊর্ধ্বে এবং চন্দ্রকে অর্থাৎ সোমগ্রন্থিস্থান বা মস্তককে নিম্নে স্থাপন করিবে ইহাই বিপরীতকরণী মুদ্রা।

প্রণালী—মস্তক মৃত্তিকাসংলগ্ন করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়, (মাথার নীচে বালিশ বা অন্য কিছু রাখিও না)। হস্তদ্বয় উপুড় করিয়া শরীরের পার্শ্বে স্থাপিত কর। পায়ের আঙ্গুলগুলিকে ঊর্ধ্বমুখী রাখিয়া পদদ্বয়কে সরলভাবে বিন্যস্ত কর। এইভাবে থাকিয়া পদদ্বয়কে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠাও। ৩০ ডিগ্রির মতো উঠাইয়া একটু থাম। এখন হাতের কনুই ও কব্জির উপর শরীরের ভর রাখিয়া কোমরসহ পদদ্বয়কে আরও ঊর্ধ্বে তোল। তারপর হাতের কনুই ও কব্জিকে স্তম্ভের আকারে স্থাপিত করিয়া দুই হাতের উপর কোমরের ভর রাখিয়া পদদ্বয়কে ঊর্ধ্বোত্তোলিত কোমরের সমান্তরালে স্থাপন কর। সাধ্যমত কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে পা নামাইয়া শরীরকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন। সম্ভবপর হইলে প্রত্যহ দুইবেলাই কিছু কিছু সময় চেষ্টা করিয়া ক্রিয়াটি আয়ত্ত

কর। ক্রিয়াটি ভালো আয়ত্ত হইলে আর দুইবেলা করিবার প্রয়োজন নাই, শুধু ভোরবেলা করিলেই চলিবে। পা ঊর্ধ্বে তুলিয়া অন্ততঃ ৫ মিনিট সময় স্থির থাকিতে যখন আর কষ্ট হইবে না, তখনই মুদ্রাটি আয়ত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে।

এই মুদ্রাটি অভ্যাসের সময়—৩ মিনিট হইতে ৫ মিনিট।

উপকারিতা—যোগশাস্ত্রমতে এই মুদ্রাটি দেহকে বলি-পলিরহিত করে। ('বলি' অর্থ চর্ম সংকোচন, 'পলি' অর্থ শুভ্রকেশ)। এই আসনটি অভ্যস্ত থাকিলে বৃদ্ধ বয়সেও গাত্রচর্ম সঙ্কুচিত হয় না, চুল পাকে না—আমরণ দেহ যুবকের মতো নিটোল থাকে, যৌবনশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই মুদ্রাটি অভ্যাসে নভঃগ্রন্থি সবল হয়, কোষ্ঠ-কাঠিন্য নিবারিত হয়, অজীর্ণ রোগ নির্মূল হয়, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, রক্তশূন্যতা দূর হয়, শরীর সবলতর হয়। এই মুদ্রাটি দেহের সর্বপ্রকার রোগ বিষ নষ্ট করে।
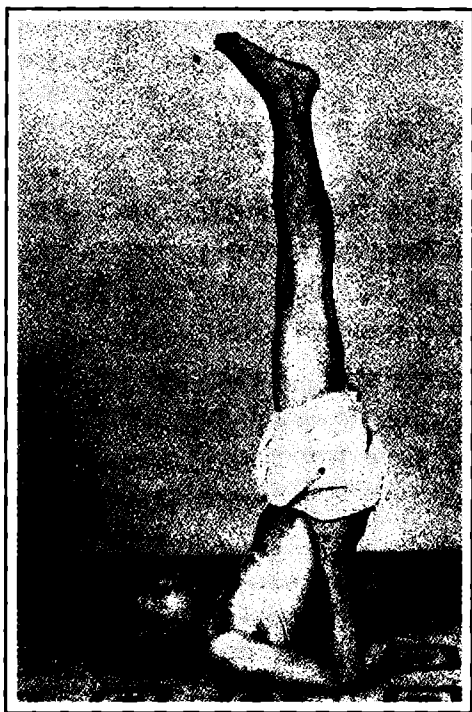
বিপরীতকরণী মুদ্রা

যে সমস্ত রক্তবাহী নাড়ী বা ধমনীর সাহায্যে নিম্নাঙ্গ হইতে ঊর্ধ্বাঙ্গে, মস্তিষ্ক প্রভৃতিতে রক্ত

পরিচালিত হয়, সর্বদা মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয় বলিয়া তাহারা সহজেই ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শক্তিক্ষয়ের যথোচিত পরিপূরণের অভাবে দেহ জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। শারীরিক দুর্বলতাবোধ করা, মাথা ঘোরা, সময় সময় চোখে অন্ধকার দেখা প্রভৃতি অবসাদের মূল কারণ—ঊর্ধ্বাঙ্গে রক্তবাহী নাড়ী বা ধমনীমণ্ডলীর যথোচিত রক্ত পরিচালনে অক্ষমতা। এই অক্ষমতা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়—ধমনীমণ্ডলীকে প্রত্যহ কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আমরা যেমন নিদ্রার পর বা বিশ্রামের পর নূতন কর্মশক্তি লাভ করি, এই সমস্ত ধমনীমণ্ডলীর তেমনি বিশ্রাম দ্বারা নবশক্তি অর্জন করা প্রয়োজন। মস্তিষ্ক নিম্নে স্থাপিত করিয়া পদদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিলে রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী ঊর্ধ্বাঙ্গে রক্ত পরিচালনার গুরুতর শ্রম হইতে সাময়িক অব্যাহতি পায়। প্রতিদিন কিছু সময় এইরূপ বিশ্রাম পাইলে ইহাদের কর্মশক্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, দেহে যৌবনোচিত শক্তিসামর্থ্য অটুট থাকে। ফলে অকালে মানুষকে গলিত অঙ্গ, পলিতমুণ্ড ও দন্তবিহীন হইতে হয় না। এই মুদ্রাটি জরা ও বার্ধক্য হইতে দেহকে রক্ষা করিতে বিশেষভাবেই সহায়তা করে।

যোগীরা বলেন—মস্তকে অবস্থিত এই সোমগ্রন্থিটি দেহস্থ প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থান। এই বিপরীতকরণী মুদ্রাটি অভ্যাস করিলে সোমগ্রন্থি পরিপুষ্ট হয়। এই সোমগ্রন্থি নিঃসৃত অমৃতধারায়, প্রাণধারায় সমগ্র দেহ প্লাবিত হয়। এইজন্যই এই মুদ্রাটি অভ্যাসে দেহ দ্রুত জীবনীশক্তি লাভ করে, দ্রুত সবলতর হয়।

সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা

যে সমস্ত রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তি অথবা অত্যধিক মেদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপরীতকরণী মুদ্রা অভ্যাসে অক্ষম, তাহাদের জন্যই এই সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রার ব্যবস্থা।

প্রণালী—গৃহের দেওয়ালের কাছে গিয়া দেওয়াল সংলগ্ন হইয়া উভয়

পদকে দেওয়ালের উপর তুলিয়া দিয়া দেওয়াল অবলম্বনে বিপরীতকরণী মুদ্রার অনুরূপ দেহটিকে স্থাপন করিবে। ব্যবস্থানুযায়ী ৩/৪ মিনিট ঐভাবে অবস্থান করিবে।

সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা

উপকারিতা—

বিপরীতকরণী মুদ্রার প্রায় অনুরূপ।

ভদ্রাসন

প্রণালী—পায়ের গোড়ালিদ্বয় সীবনীর (মুষ্কাধারের থলীর সেলাইটির নাম সীবনী) নিম্নে স্থাপন করিবে অর্থাৎ গোড়ালী প্রায় যোনিমণ্ডলে স্থাপন করিবে এবং শরীরের মেরুদণ্ডকে সোজা রাখিয়া উপবেশন করিবে। হস্তদ্বয়কে হাঁটুর উপর রাখিবে অথবা উভয় হস্ত দ্বারা উভয় পদের অঙ্গুলিগুলি ধারণ করিবে।

উপকারিতা—এই আসনটি জঠরাগ্নি বর্ধিত করে। বস্তিপ্রদেশ ও হাঁটুর স্নায়ুগুলিকে প্রসারিত করে এবং সবল রাখে, ফলে ব্রহ্মচর্য রক্ষা ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধিতে আসনটি সহায়তা করে। এই আসনটি অভ্যাসে কর্মানুরাগ ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মেয়েদের পক্ষে এই আসনটি

ভদ্রাসন নং-১

ভদ্রাসন নং-২

বিশেষ উপকারী। **মেয়েদের এই আসনটি অভ্যস্ত থাকিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বিশেষ ক্লেশানুভব হয় না।**

ভুজঙ্গাসন

সাপ যখন ফণা ধরে, তখন শরীরের ঊর্ধ্বাংশকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া যেভাবে পশ্চাদ্দিকে বাঁকায়, এই আসনটির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহার নাম ভুজঙ্গাসন হইয়াছে।

প্রণালী—শরীরকে সটান রাখিয়া পদদ্বয়কে একত্র করিয়া উপুড় হইয়া

ভুজঙ্গাসন নং-১

শুইয়া পড়। ললাট যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করে। পায়ের গোড়ালি দুইটি ঊর্ধ্বে রাখিয়া পায়ের পাতা দুইটি মুড়িয়া দাও; উভয় হস্তকে উভয় স্তনের পার্শ্বে স্থাপিত কর। অতঃপর পা হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত মৃত্তিকাসংলগ্ন রাখিয়া মস্তকটিকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠাও। ঘাড় ও

মুখমণ্ডলের সহিত মেরুদণ্ডকে সাধ্যমত পশ্চাতে বাঁকাইয়া উর্ধ্বমুখী হইয়া আকাশ নিরীক্ষণ কর। শরীরের সম্মুখভাগ উর্ধ্বে উঠাইবার সময় হাতে কোনোরূপ জোর পড়িবে না; হাত দুইটি হালকা অবলম্বন রূপে

ভুজঙ্গাসন নং-২

থাকিবে। প্রথম অভ্যাসের সময় হাতে একটু জোর পড়িবে; কিন্তু যতই আসনটি অভ্যস্ত হইয়া আসিবে, ততই হাতে আর কোনোরূপ জোর লাগিবে না। হাতের উপর জোর দিয়া এই আসনটি করিলে আসনের সুফল অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়, মেরুদণ্ডের তন্তু ও পেশীর যতটুকু ব্যায়াম হওয়া উচিত ততটুকু হয় না। আসনটি ভালো অভ্যস্ত হইলে হস্তদ্বয়কে মাটি হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে তুলিয়া আসনটি অভ্যাস করিবে।

এই আসনটি কমপক্ষে ৩ বার এবং উর্ধ্বসংখ্যায় ৫ বার মাত্র করিবে। আসনটি ভালো অভ্যস্ত হওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাস সহকারে আসনটি অভ্যাস করিবে। প্রথমে ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ু টানিতে টানিতে মস্তক উত্তোলন করিতে থাকিবে; মস্তক উত্তোলন শেষ হইলে কয়েক সেকেণ্ড

কুম্ভক করিয়া আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; অতঃপর শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে মস্তক নত করিয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হইবে।

ভুজঙ্গাসন নং-৩

শরীর নামাইবার সময় প্রথমে শরীরের উদরাংশ, তারপর বক্ষঃস্থল, সর্বশেষে ললাট মৃত্তিকাসংলগ্ন হইবে।

উপকারিতা—এই ভুজঙ্গাসনটিও মেরুদণ্ডকে নমনীয় রাখার একটি চমৎকার ব্যায়াম। এই আসনে মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগের বক্রতা দূর হয়, মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগস্থ পেশী ও স্নায়ুগুলি সবলতর হয়। ইহা হৃদ্‌পিণ্ডকে মজবুত করে। হৃদ্‌পিণ্ডসংলগ্ন স্নায়ু-পেশীগুলিকে সবল করে। উদর ও পৃষ্ঠদেশের স্নায়ু ও পেশীগুলিকে সুদৃঢ় করে; তরুণ-তরুণীদের বক্ষঃস্থলকে সুশ্রী ও সুঠাম করিয়া তোলে। নারী-পুরুষ উভয়েরই বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও পেশীগুলি এই আসন অভ্যাসে সবলতর হয়। বায়ুধারণকারী ফুসফুসের কোষগুলি এবং স্নায়ুগুলি এই আসন

অভ্যাসে সুপুষ্ট হয়। মেয়েদের ঋতুরোগ, শ্বেত-প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যাধি আরোগ্যে এই আসনটি সহায়তা করে।

মকরাসন

কুম্ভীর জাতীয় একশ্রেণীর জলচর জীবের নাম মকর। হিন্দু পুরাণ মতে মকর গঙ্গাদেবীর বাহন। এই মকর জাতির অস্তিত্ব সম্ভবতঃ লুপ্ত
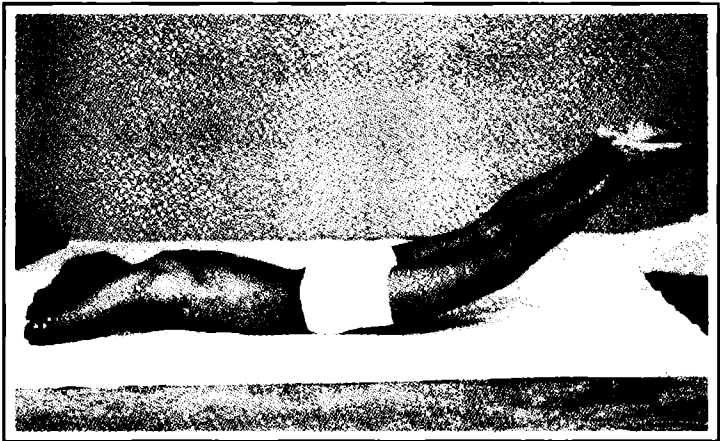
মকরাসন

হইয়াছে। শীতের দিনে নদীর চড়ায় শয়ন করিয়া মকর যেভাবে পুচ্ছ তুলিয়া রৌদ্র সেবন করে, এই আসনটির সহিত সেই শায়িত মকরের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এই আসনটির নাম মকরাসন।

প্রণালী—বক্ষদেশ মৃত্তিকায় স্থাপন করিয়া শয়ন কর। দৃঢ়াবদ্ধ করদণ্ডাভ্যন্তরে মস্তক স্থাপন কর; যথাসাধ্য বিস্ফারিত ও সটান রাখিয়া পদদ্বয়কে সাধ্যমত উর্ধ্বে তোল। আসনটি ভালো অভ্যস্ত হইলে এক

মিনিট আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পদদ্বয় মাটিতে স্থাপন কর এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসনটি অভ্যাস কর। অনুরূপভাবে প্রত্যহ ২/৩ বার আসনটি অভ্যাস করিবে।

উপকারিতা—এই আসনটি অভ্যাসে অজীর্ণ, অম্লরোগ বিদূরিত হইয়া জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়। বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও পেশী এই আসনটি অভ্যাসে সুদৃঢ় হয়। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রহ্মচর্য রক্ষায় এই আসনটি বিশেষভাবে সহায়ক। উদরের স্নায়ু-পেশীও এই আসনটি অভ্যাসে সবলতর হয়, শারীরিক শক্তি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়।

মৎস্যমুদ্রা বা মৎস্যাসন

যোগীরা সময় সময় এই আসনটিতে আবদ্ধ হইয়া কুম্ভক সহযোগে
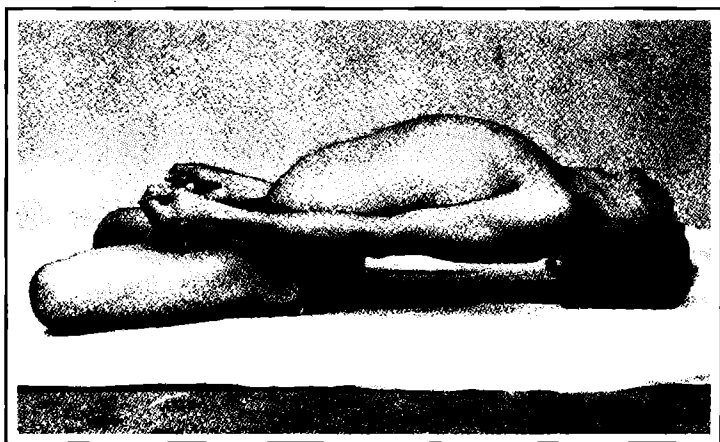
মৎস্যাসন

জলের উপর মাছের মতন ভাসিয়া থাকেন। এইজন্য ইহার নাম মৎস্যাসন হইয়াছে।

প্রণালী—মুক্ত-পদ্মাসন বা নিজের সুবিধামত যে কোনো আসনে বসিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। পদ্মাসনে আবদ্ধ উভয় হাঁটু মৃত্তিকার সমান্তরালে রাখ। কণ্ঠ ও মুখ ঊর্ধ্বে তুলিয়া ঘাড় যথাসাধ্য পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইয়া দাও। কণ্ঠের শিরাগুলি যেন সটান থাকে। মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগ নয়, ব্রহ্মতালু যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করে। ঘাড় পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইবার সময় উদর ও বক্ষঃস্থল ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমস্ত মেরুদণ্ডটি খিলানের মতো বাঁকিয়া যাইবে। এইভাবে হস্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ কর। প্রথম প্রথম আধ মিনিট বা এক মিনিট আসনটি অভ্যাস কর। যখন তিন মিনিট এইভাবে আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে আর কষ্ট হইবে না, তখনই আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে।

এই আসনটি অভ্যাসের সময় কমপক্ষে দুই মিনিট, ঊর্ধ্বপক্ষে পাঁচ মিনিট।

শরীরে অতিরিক্ত চর্বির জন্য যাহাদের বক্ষঃস্থল ঊর্ধ্বে উঠাইতে কষ্ট হইবে, তাহারা পৃষ্ঠতলে একটি বালিশ স্থাপন করিবে, তাহা হইলে আর এই আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে কোনো কষ্ট হইবে না।

উপকারিতা—সর্বাঙ্গাসন বর্ণনার সময় আমরা ইন্দ্রগ্রন্থির কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থির সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি গ্রন্থি আছে, তাহার নাম উপেন্দ্রগ্রন্থি বা উপযৌবনগ্রন্থি (Para-Thyroid)। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রমতে এই গ্রন্থির সংখ্যা চারিটি—কণ্ঠনালীর উভয়পার্শ্বে অবস্থিত ইন্দ্রগ্রন্থির এক এক পার্শ্বে দুইটি করিয়া—একটি ইন্দ্রগ্রন্থির নীচে আর একটি উপরে। উপরের দুইটি ইন্দ্রগ্রন্থির সহিত প্রায় জড়িত, নীচের দুইটি ইন্দ্রগ্রন্থি হইতে তিলপ্রমাণ দূরে অবস্থিত। এই উপেন্দ্রগ্রন্থিকে বেষ্টন করিয়া একটি সূক্ষ্ম আবরণী (capsule) থাকে। আবরণীটি আছে বলিয়াই ইন্দ্রগ্রন্থি হইতে ইহাকে পৃথক বলিয়া চেনা যায়। ইন্দ্রগ্রন্থির অন্তর্মুখী স্রাবের মতোই এই উপেন্দ্রগ্রন্থির অন্তর্মুখী স্রাবও শরীর গঠনের পক্ষে ও স্বাস্থ্য অটুট রাখার পক্ষে অপরিহার্য।

এ যুগে ক্যালসিয়াম (calcium) নামের সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত। অস্থিসংগঠনের জন্য, পরিপাকক্রিয়ার সাহায্যের জন্য, রোগবীজাণু হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্য আমাদের শরীরে চূণজাতীয় একপ্রকার পদার্থের প্রয়োজন হয় ইহাই ক্যালসিয়াম। দুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। ইহা ছাড়া লেবু, কমলা, বাদাম, নারিকেল, পেঁয়াজ প্রভৃতির মাঝেও ক্যালসিয়াম আছে। উপেন্দ্রগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণজাত রস এই ক্যালসিয়াম পরিপোষণে সাহায্য করে এবং ক্যালসিয়ামকে জীর্ণ করিয়া শরীরের কাজে লাগায়। এই গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ কম হইলে ক্যালসিয়াম জীর্ণ হয় না এবং শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম যথোচিতভাবে শরীরে উৎপন্ন হয় না। দুগ্ধাদি খাদ্য প্রচুর গ্রহণ করিলেও অথবা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিলেও তখন আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায় না। উপেন্দ্রগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের প্রয়োজনীয়তাও এইখানে এই গ্রন্থিজাত রসই খাদ্যবস্তু হইতে শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করে।

উপেন্দ্রগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ কম হইলে পরিপাকশক্তি কমিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণরোগ সৃষ্টি হয়। এই অজীর্ণরোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পাকাশয়ে ও অন্ত্রে ক্ষত (Gastric or Duodenal Ulcer) উৎপন্ন হয়, দাঁতের মাড়িতে পুঁজ (Pyorrhoea) ও বিবিধ দন্তরোগ জন্মায়।

হাতের পালিশ নখগুলির উপর টানা-টানা রেখা পড়িলেই বুঝিতে হইবে উপেন্দ্রগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ যথোচিতভাবে হইতেছে না। এই অবস্থায় শরীরে কোনো ক্ষত বা চর্মরোগ উৎপন্ন হইলে তাহা সহজে আরোগ্য হয় না; ক্রমশঃ চর্মরোগের সূচনা হয়। অন্ত্রোপাঙ্গবৃদ্ধি (Appendicitis), অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia), পিত্তস্থলী মধ্যে ফোঁড়া, পিত্তশূল, হস্ত-পদের মাংসপেশীর খিচুনী প্রভৃতি রোগাক্রমণের আশঙ্কা ঘটে।

আবার এই গ্রন্থিটির অন্তঃক্ষরণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে রক্তচাপ বৃদ্ধি (High Blood Pressure) রোগ জন্মে।

সর্বাঙ্গাসনের পরই এই আসনটি করিতে হইবে, তবেই ইন্দ্রগ্রন্থির সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রগ্রন্থিও সুস্থ-সবল হইয়া উঠিবে। সর্বাঙ্গাসনে যৌবন ও উপযৌবনগ্রন্থির সম্মুখ ভাগের উপর চাপ পড়ে ; মৎস্যাসনে গ্রন্থিগুলি বিপরীত দিকে পশ্চাদ্‌ভাগে সম্প্রসারিত হয়। ফলে যৌবন ও উপযৌবনগ্রন্থিসংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্তু প্রভৃতি সতেজ হইয়া উঠে। সুতরাং মৎস্যাসন সর্বাঙ্গাসনেরই অনুপূরক এবং অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ।

অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন

ভারতবিখ্যাত মহাযোগী মীননাথের অপর নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ। মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক এই আসনটি আবিষ্কৃত হয় বলিয়াই ইহার নাম মৎস্যেন্দ্রাসন।

মৎস্যেন্দ্রাসন

প্রণালী—দক্ষিণ পদ বাম ঊরুর উপর দিয়া লইয়া গিয়া বাম ঊরুর পশ্চাদ্ভাগে মৃত্তিকা-সংলগ্ন কর ; বাম পদের গোড়ালি যোনিমণ্ডলে স্থাপন কর। অতঃপর বাম হাতখানা ডান হাঁটুর ডান পার্শ্ব দিয়া লইয়া গিয়া ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধারণ কর এবং ডান হাত পৃষ্ঠ দিয়া ঘুরাইয়া

লইয়া বাম উরুমূল ও তলপেটের সংযোগস্থল স্পর্শ কর। মস্তক ও ঘাড়কে সাধ্যমত বাঁকাইয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠপার্শ্বে অবলোকন কর। সাধ্যমত ৫ সেকেণ্ড হইতে ১৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত এইভাবে আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হস্তবন্ধন খুলিয়া দাও। অতঃপর ঠিক বিপরীতভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। অর্থাৎ বাম পদ দক্ষিণ উরুর উপর দিয়া লইয়া গিয়া দক্ষিণ উরুর পশ্চাদ্ভাগে মৃত্তিকা-সংলগ্ন কর। দক্ষিণ পদের গোড়ালি যোনি-মণ্ডলে স্থাপন কর। অতঃপর ডান হাতখানা বাঁ হাঁটুর বাঁ পাশ দিয়া লইয়া গিয়া বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধারণ কর এবং বাম হাত পৃষ্ঠের উপর দিয়া সরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ উরুমূল ও তলপেটের সংযোগস্থল স্পর্শ কর। মস্তক ও ঘাড় যথাসাধ্য বাঁকাইয়া বাম পৃষ্ঠপার্শ্ব অবলোকন কর। এইরূপে বামপার্শ্ব এবং দক্ষিণ পার্শ্বের ক্রিয়া মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আসন। ইহা গ্রীষ্মকালে মাত্র একবার এবং শীতকালে দুইবার করিয়া করিবে।

অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন

প্রথম প্রথম উপরে লিখিত নিয়মে আসনটি করা কষ্টকর হইলে পায়ের গোড়ালি যোনিমণ্ডলে স্থাপন না করিয়া গোমুখাসনের মতো পৃষ্ঠপার্শ্বে স্থাপন কর। এইভাবে ৮/১০ দিন অভ্যাস করিলেই হাত-পায়ের স্নায়ুমণ্ডলীর আড়ষ্টতা দূর হইবে, তখন পূর্বোক্ত নিয়মে আসনটি অভ্যাস করা সহজ হইয়া আসিবে।

উপকারিতা—এই আসনটিতে দেহের উভয় পার্শ্বের পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলী ও মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বের পেশীর এবং স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের ব্যায়াম সুষ্ঠুভাবে হয় এবং তাহারা সবলতর হইয়া উঠে। ইহার অভ্যাসে মেরুদণ্ডের পার্শ্বভাগও নমনীয় হইয়া উঠে। সুতরাং এই আসনটি "To rejuvenate the spine" অর্থাৎ মেরুদণ্ডকে যৌবনোচিত সবল ও নমনীয় রাখিবার পক্ষে অপরিহার্য। এই আসনটি কটিবাত, পৃষ্ঠবাত, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ রোগ উপশম করিতে, যকৃৎ ও প্লীহার দোষ-ত্রুটি নিবারণ করিতে সহায়তা করে।

ময়ূরাসন

প্রণালী—হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন কর। অতঃপর হাঁটু হইতে নিজ নিজ হাতের এক হাত দূরে হাতের কবজি দুইটি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া স্থাপন কর। হাতের অঙ্গুলিগুলি যেন হাঁটুর দিকে থাকে। অনন্তর উভয় হস্তের কূর্পর (কনুই) নাভিস্থানে স্থাপন পূর্বক পদদ্বয়কে সটান করিয়া
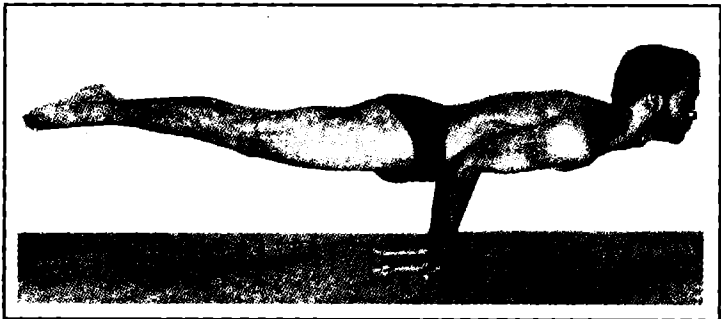
ময়ূরাসন

উর্ধ্বে তুলিবে। মস্তক নাভিদেশের সহিত সমসূত্রে মৃত্তিকার উর্ধ্বে থাকিবে। পদদ্বয় নাভিদেশের সমসূত্রে বা কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে থাকিবে।

এইভাবে শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগ দণ্ডের মতো ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলে শরীর কতকটা ঊর্ধ্ব পুচ্ছ ময়ূরের আকার ধারণ করে। এইজন্যই এই আসনটির নাম দেওয়া হইয়াছে ময়ূরাসন।

এই আসনটি ৩/৪ বার মাত্র অভ্যাস করিবে। প্রত্যেক বার ৪/৫ সেকেণ্ড আসনটিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আসনটি ভালোভাবে আয়ত্ত হইলে শ্বাস বন্ধ রাখিয়া প্রতিবারে ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত আসনটিতে অধিষ্ঠিত থাকা যাইতে পারে।

উপকারিতা—এই আসনটি মহা-উপকারী। এই আসনটি অভ্যাসে অগ্নিগ্রন্থিগুলি যথোচিতভাবে সুস্থ-সবল থাকিয়া, সক্রিয় থাকিয়া নিজ নিজ কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। [অগ্নিগ্রন্থির এবং দেহস্থ অন্যান্য গ্রন্থিগুলির বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বিশদ্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।] বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং উদর ও বস্তিপ্রদেশের যাবতীয় পেশী-স্নায়ুগুলি এই আসনটি অভ্যাসে সবলতর হইয়া উঠে; ফলে পাকস্থলীর যাবতীয় ব্যাধি আরোগ্য করিতে এই আসনটি বিশেষভাবেই সাহায্য করে। এইজন্য যোগশাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন—

'হরতি সকলরোগানাশু গুল্মোদরাদীন্
অভিভবতি চ দোষানাসনং শ্রীময়ূরম্।
বহু কদশনভুক্তং ভস্ম কুর্যাদশেষং
জনয়তি জঠরাগ্নিং জারয়েৎ কালকূটম্॥'

—এই ময়ূরাসনটি অভ্যাস করিলে গুল্ম, জলোদর, প্লীহা প্রভৃতি সর্বপ্রকার উদররোগ আরোগ্য হয়। বাত, পিত্ত ও কফের দোষ বিনষ্ট হয়। শরীরের আলস্য ও জড়তা দূর হয়। যোগশাস্ত্রমতে এই আসনটি অভ্যাসে জঠরাগ্নি এতই বৃদ্ধি পায় যে অতিরিক্ত কদন্ন খাইলেও অথবা বিষের মতো অনিষ্টকারী কোনো খাদ্য গ্রহণ করিলেও তাহা পরিপাক হইয়া যায়, উহা দেহের কোনোরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। এই আসনটি কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, বহুমূত্র ও অর্শ প্রভৃতি রোগারোগ্যে

সহায়তা করে; মূত্রাশয়কে, অন্ত্র এবং অন্ত্রসংলগ্ন স্নায়ু-পেশীকে সবলতর করে।

মস্তক মুদ্রা বা শীর্ষাসন

এই আসনটিতে শীর্ষ বা মস্তকের উপর ভর রাখিয়া সমস্ত শরীরকে দাঁড় করাইতে হয় এইজন্যই ইহার নাম মস্তক মুদ্রা বা শীর্ষাসন।

প্রণালী—হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করার ভঙ্গীতে মস্তকটি মৃত্তিকা সংলগ্ন কর। উভয় হস্তের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর নিবদ্ধ করিয়া উভয় হস্তের তালু মস্তকের তলদেশে ব্রহ্মতালুর অব্যবহিত নিম্নে স্থাপন কর। অতঃপর হাঁটুদ্বয়কে উর্ধ্বে তোল এবং পদদ্বয়কে যথাসাধ্য মস্তকের অভিমুখে আনয়ন কর। এইবার ব্রহ্মতালু ও হাতের কবজির উপর দেহের ভর রাখিয়া হাঁটুভাঙ্গা অবস্থাতেই পদদ্বয়কে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে তোল। সাধ্যমত ৫/১০ সেকেণ্ড পদদ্বয়কে উর্ধ্বে রাখিয়া আবার নামাইয়া লও। প্রত্যহ কয়েক মিনিট এইরূপ অভ্যাস কর। কয়েকদিন অভ্যাস করার পরই এইরূপ হাঁটুভাঙ্গা অবস্থায় পা উর্ধ্বে তুলিয়া শরীরকে স্থির রাখিতে সমর্থ হইবে। কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরকে সটান করিয়া এইভাবে কিছু সময় অবস্থান করিতে যখন আর কষ্ট হইবে না, তখন ভাঙ্গা হাঁটু সোজা করিয়া পদদ্বয় উর্ধ্বে তুলিয়া সমস্ত শরীরকে সোজা করিয়া মাথার উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হও। সমস্ত শরীর তখন ভূমির সহিত সমকোণ সৃষ্টি করিবে।

এই আসনটি প্রথমে আধ মিনিট বা এক মিনিট অভ্যাস করিবে। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অভ্যাসের সময় বাড়াইয়া লইবে। সুস্থ-সবল লোকের পক্ষে এই আসনটি অভ্যাসের সর্বোচ্চ মাত্রা ১০ মিনিট। রোগী ও দুর্বল ব্যক্তির মাত্রা ২ মিনিট হইতে ৩ মিনিট।

ভালো অভ্যস্ত হইলে একবার দণ্ডায়মান থাকিয়াই উপরিলিখিত সময়

পর্যন্ত আসনটির অভ্যাস করা যাইতে পারে। ভালো অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত যতটুকু সময় এই আসনে থাকিলে শরীরে কোনরূপ পীড়া বোধ না হয়,
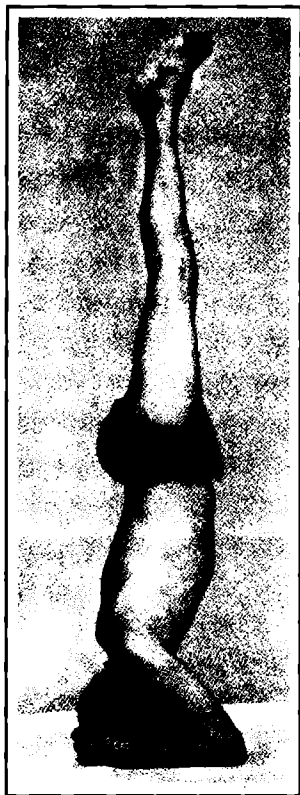
মস্তক মুদ্রা বা শীর্ষাসন নং-১

মস্তক মুদ্রা বা শীর্ষাসন নং-২

ততটুকু সময় থাকিয়া পা নামাইয়া লইবে এবং একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসনটি করিবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে—মস্তকের সম্মুখভাগের উপর যেন শরীরের ভার না পড়ে, ব্রহ্মতালুর উপর শরীরের ভর রাখিতে হইবে।

নিষেধ—যাহাদের হৃদ্‌রোগ, রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ ও কর্ণরোগ আছে তাদের পক্ষে এই আসনটি করা নিষিদ্ধ। যোগের অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিলে তখন এই আসনটি করা যাইতে পারে। যাহাদের পিত্তদোষ আছে বা যাহাদের লিভার খারাপ, তাহারাও বৈকালে বা সন্ধ্যায় এই আসনটি করিবে। ভোরের দিকে এই আসনটি অভ্যাসের কোন প্রয়োজন নাই।

প্রকারভেদ—এই আসনটির প্রকারভেদ আছে। হাত অঙ্গুলিবদ্ধ অবস্থায় মাথার নীচে না রাখিয়া মাথার উভয় পার্শ্বে উভয় হাত রাখিয়া আসনটি করা যাইতে পারে। অথবা মাথা শূন্যে তুলিয়া হাতের উপর সমস্ত শরীরের ভারকেন্দ্র স্থির রাখিয়াও আসনটি করা যায়। তবে এই সব প্রণালী অধিকতর কষ্টসাধ্য এবং সর্বসাধারণের অনুপযোগী। আমরা যে প্রণালীটি এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা অধিকতর সহজসাধ্য এবং আরামপ্রদ। আসনটি ভালো অভ্যস্ত হইলে পদদ্বয় সব সময় সটান ঊর্ধ্বে না রাখিয়া কিছুটা সময় পদ্মাসনেও রাখা যাইতে পারে।

উপকারিতা—মস্তিষ্কই দেহসাম্রাজ্যের রাজধানী। এই মস্তিষ্কই দেহস্থ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি সর্বশক্তির কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্কের কোনো অংশে যদি যথোপযুক্ত রক্ত পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে সমস্ত শরীরযন্ত্রই বিকল হইয়া পড়ে। এই আসন অভ্যাসের সময় শরীরের যাবতীয় রক্ত মস্তকে আসিয়া উপনীত হয়। এই রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান সংগ্রহ করিয়া মস্তিষ্কস্থিত সমুদয় গ্রন্থিগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হইয়া উঠে। ফলে দেহসাম্রাজ্য নির্বিঘ্ন ও নিরাপদে থাকে, স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

মস্তিষ্কই অহংগ্রন্থি ও মহৎগ্রন্থিস্থান। প্রত্যেকটি গ্রন্থিই পাঁচভাগে বিভক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রন্থিরই পাঁচটি প্রধান কর্মকেন্দ্র আছে। সুতরাং যোগশাস্ত্রমতে মস্তিষ্কপ্রদেশে ১০টি গ্রন্থি বিদ্যমান। এই ১০টি প্রধান গ্রন্থির মাঝে আধুনিক যুগের গ্রন্থিতত্ত্ববিদরা মাত্র ২টি গ্রন্থি আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইহাদের নাম—'পিটুইটারী' (শিবসতীগ্রন্থি) এবং 'পিনিয়াল' (বৃহস্পতি গ্রন্থি)। এই শিবসতীগ্রন্থি এবং বৃহস্পতিগ্রন্থির বিস্তৃত বিবরণ আমরা আমাদের **সহজ যৌগিক ব্যায়াম** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নিতান্ত অসংযমী না হইলে শীর্ষাসন অভ্যাসকারীর দেহ রোগাক্রান্ত হয় না। যাহাদের স্নায়ু-দৌর্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, পাইওরিয়া প্রভৃতি দন্তরোগ, মাথাঘোরা, হিষ্টিরিয়া, স্নায়ুশূল, অতিরিক্ত সুপ্তিস্খলন, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, প্লীহা-যকৃতের দোষ প্রভৃতি রোগ আছে তাহারা এই আসনটি অভ্যাসের দ্বারা অল্প সময়ের মাঝে উল্লিখিত ব্যাধিগুলির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে।

যাহাদের দাম্পত্যজীবন অসংযত, এই আসনটি অভ্যাসের সময় তাহারা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে, তাহাদের মাথা ঝিমঝিম করে। বলা বাহুল্য, এই আসন অভ্যাসকারী বিবাহিতদের পক্ষে সংযত দাম্পত্য জীবন যাপন অত্যাবশ্যক। এই প্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়ের '**অসুস্থ যৌন জীবন**' এবং '**আদর্শ দাম্পত্য জীবন**' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মহাবন্ধ মুদ্রা

এই মুদ্রাটি দেহস্থ প্রাণশক্তির প্রতীক শুক্রধাতুর নিম্নগতি অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত ধাতু ক্ষরণ বন্ধ করে। এইজন্যই ইহার নাম মহাবন্ধ মুদ্রা।

প্রণালী—সিদ্ধাসনে অর্থাৎ বাম পায়ের গোড়ালি যোনিস্থানে এবং দক্ষিণ পায়ের গোড়ালি মেঢ্রদেশে (জননেন্দ্রিয়মূলের উপরাংশে) স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হও। অতঃপর শ্বাসের সহিত শাখা-প্রশাখাসহ কুহুনাড়ীকে (Sex nerve) ধীরে ধীরে আকর্ষণ কর। আকর্ষণের ফলে জননেন্দ্রিয়সহ পুরুষের মুষ্ক এবং ডিম্বাধারসহ মেয়েদের জরায়ু আকুঞ্চিত হইয়া কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে উঠিবে। অতঃপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চন শিথিল করিয়া

দাও; ১০ হইতে ২০ বার কুহুনাড়ীকে এইরূপ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত কর। পুনরায় বিপরীতভাবে এই ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ বামপদের পরিবর্তে দক্ষিণপদের গোড়ালি যোনিস্থানে এবং বাম পদের গোড়ালি মেঢ্রদেশে স্থাপন করিয়া পূর্বোক্তভাবে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস সহযোগে কুহুনাড়ীকে সমসংখ্যকবার আকুঞ্চিত ও প্রসারিত কর।

সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হওয়া যাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, তাহারা সিদ্ধাসনের পরিবর্তে পদ্মাসনে বা অন্য যে কোনো ধ্যানাসনে বসিয়া মুদ্রাটি অভ্যাস করিবে।

উপকারিতা—এই মুদ্রাটি প্রজাপতিগ্রন্থিকে অর্থাৎ পুরুষের পিতৃগ্রন্থিকে এবং মেয়েদের মাতৃগ্রন্থিকে সুস্থ-সবল রাখে। পিতৃগ্রন্থি ও মাতৃগ্রন্থি নারী-পুরুষের জীবনীশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রতীক।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পিতৃগ্রন্থিকে (Testes) বলা হইয়াছে বৃষণগ্রন্থি। অনুরূপভাবে স্ত্রীদেহের ডিম্বাধারে রহিয়াছে মাতৃগ্রন্থি (Ovary)। এই প্রজাপতিগ্রন্থির (পুংদেহে পিতৃগ্রন্থির ও স্ত্রীদেহে মাতৃগ্রন্থির) অন্তঃক্ষরণের উপরেই জননযন্ত্রগুলির পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং নারীত্ব ও পুরুষত্ব বিকাশ নির্ভর করে। দেহের 'ক্যালসিয়াম' পোষণেও এই গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ বিশেষভাবে সাহায্য করে। পুরুষের দুই মুষ্কে দুইটি পিতৃগ্রন্থি রহিয়াছে। মেয়েদেরও ডিম্বাধারদ্বয়ের মাতৃগ্রন্থি দুইটি জরায়ুর উভয়পার্শ্বে অবস্থিত। নভঃগ্রন্থির ও অহংগ্রন্থির অন্তর্গত ইন্দ্রগ্রন্থি ও শিবসতী গ্রন্থির সহযোগিতায় এই প্রজাপতি গ্রন্থিই দেহে যৌবনোচিত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য অটুট রাখে। দেহকে সুপুষ্ট, সবল ও লাবণ্যময় করে।

এই গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ যথোচিতভাবে না হইলে—পুরুষের অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ, মানসিক অবসাদ, স্নায়ুদৌর্বল্য, অকালে দাড়ি-গোঁফ পাকা, দেহ অস্থিচর্মসার হওয়া এবং আংশিক অক্ষমতা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। মেয়েদেরও স্নায়ুদৌর্বল্যসহ ঋতুর অনিয়ম ও প্রদরস্রাবাদি বিবিধ রোগ দেখা দেয়। এই গ্রন্থিটি অতিক্রিয় হইলে পুরুষ অত্যন্ত কামুক হয়। সর্বদা

কামচিন্তা ইহাদের মন জুড়িয়া থাকে। স্বাভাবিক পথে কামতৃপ্তির সুযোগ না থাকিলে ইহারা নীতিবহির্ভূত পথে পদার্পণ করে অথবা অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ হস্তমৈথুনাদি বদ অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া শরীরের অধিকতর অনিষ্ট সাধন করে।

মেয়েদের এই গ্রন্থিটি অতি-সক্রিয় হইলে তাহাদের শরীরের রক্তের চাপ স্বাভাবিক হইতে নীচে নামিয়া যায়, অতিরিক্ত মাত্রায় ঋতুস্রাব হয়, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে, বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

মহাবন্ধ মুদ্রার নিয়মিত অনুষ্ঠান পিতৃগ্রন্থি ও মাতৃগ্রন্থি সংক্রান্ত উল্লিখিত যাবতীয় দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক রাখে।

মহাবেধ মুদ্রা

প্রণালী—পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে অথবা নিজের রুচিমত যে কোনো আসনে উপবিষ্ট হও। শ্বাস ত্যাগ করিয়া উদরকে বায়ুশূন্য কর। উদর বায়ুশূন্য হইলে শ্বাস গ্রহণ বন্ধ রাখিয়া শ্বাস গ্রহণের পরিবর্তে শঙ্খিনী ও কুহুনাড়ীকে ১০/১৫ সেকেণ্ড যাবৎ ঊর্ধ্বমুখে আকর্ষণ করিতে থাক। অতঃপর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দাও।

অনুরূপভাবে ১৫/২০ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। বায়ু ধারণাশক্তি অনুযায়ী শঙ্খিনী ও কুহুনাড়ীর আকর্ষণের মাত্রা ক্রমশঃ বর্ধিত করিবে।

সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম ভাল অভ্যস্ত হইলে মহাবেধ মুদ্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার অধিকার জন্মে।

উপকারিতা—দেহের যে অঙ্গ যখন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, তখন সেই অঙ্গে প্রচুর রক্ত চলাচল করে। এই রক্ত হইতে স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলি নিজ নিজ পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। এইজন্যই মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহামুদ্রা, শক্তিচালনী এবং মহাবেধ প্রভৃতি মুদ্রা অভ্যাসে বস্তিপ্রদেশের পিতৃগ্রন্থি (Testes), কামগ্রন্থি (Prostate gland), মদনগ্রন্থি (Cowper's gland),

নারীদেহের মাতৃগ্রন্থি (Ovary), রতিগ্রন্থি (Bartholin's gland), মিথুনগ্রন্থি (Skene's gland) প্রভৃতি সবল ও সতেজ হইয়া উঠে ; এই গ্রন্থিগুলি সবল থাকিলে প্রচুর জীবনীশক্তিতে দেহ পূর্ণ থাকে; সুতরাং এই মহাবেধ মুদ্রা স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্বল্য, প্রদর ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করে এবং ধারণাশক্তিকে বর্ধিত করিয়া দেহকে প্রচুর প্রাণশক্তিতে পূর্ণ করিয়া তোলে।

মহামুদ্রা

যোগশাস্ত্রমতে এই মুদ্রাটি মহা উপকারী, এই মুদ্রাটি দেহের জরা, ব্যাধি বিনষ্ট করিয়া মহাসিদ্ধি প্রদান করে—তাই ইহার নাম মহামুদ্রা।
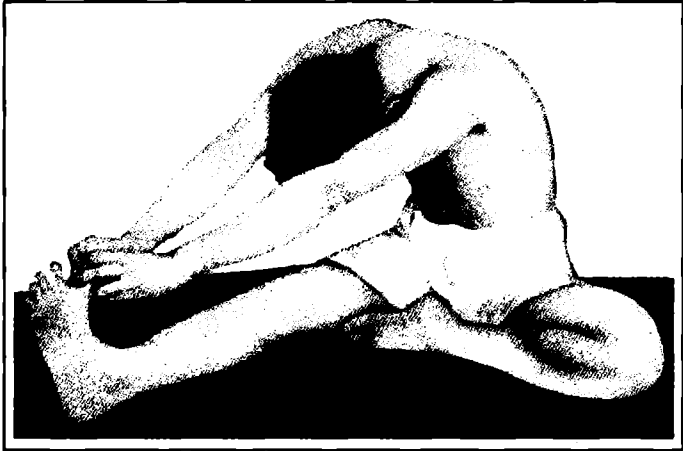
মহামুদ্রা

প্রণালী—বামপায়ের গোড়ালি যোনিমণ্ডলে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন কর। দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দাও। উভয় হস্ত দ্বারা দক্ষিণপদের

অঙ্গুলিগুলি ধারণ কর হাঁটু যেন মৃত্তিকাসংলগ্ন থাকে। চিবুক কণ্ঠকূপে নিবদ্ধ রাখ। অতঃপর মহাবন্ধমুদ্রার অনুরূপ শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কুন্থনাড়ী আকর্ষণ কর। যতক্ষণ ধরিয়া শ্বাস টানিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষণ অব্যাহত রাখ ও তারপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ শিথিল করিয়া দাও। এই নিয়মে ১০ হইতে ২০ বার এই ক্রিয়াটির অভ্যাস কর। পুনরায় বামাঙ্গে এই ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ দক্ষিণপদ যোনিদেশে স্থাপন করিয়া বামপদ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দাও এবং উভয় হস্ত দ্বারা বামপদের অঙ্গুলিগুলি ধারণ করিয়া পূর্বোক্তবৎ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস সহযোগে সমসংখ্যকবার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

মহাবন্ধ ও মহামুদ্রা পরস্পরের অনুপূরক। এই উভয় মুদ্রার অভ্যাসে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রজাপতি গ্রন্থি অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃগ্রন্থির দোষ-ত্রুটি দূর হয়; সুতরাং মহাবন্ধ মুদ্রা অভ্যাসের অব্যবহিত পরেই মহামুদ্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

উপকারিতা—মূলবন্ধ ও মহামুদ্রা যাহারা অভ্যাস করিবে তাহাদের কখনো ভগন্দর, গুল্ম প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না। এই মুদ্রা দুইটি লিভারের দোষ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ দূর করিতে সাহায্য করে; যুবকদের সুপ্তিস্খলন বা স্বপ্নদোষ নিবারণ করে; নারী-পুরুষ উভয়েরই ধারণাশক্তি বর্ধিত করে। এই মুদ্রাটি ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠরোগ আরোগ্যেও সহায়তা করে।

মূলবন্ধ মুদ্রা

মূল অর্থ আদি উৎপত্তিস্থল। মস্তিষ্কের নিম্নাংশ হইতে মেরুদণ্ড উৎপন্ন হইয়া গুহ্যদেশে আসিয়া শেষ হইয়াছে। মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তেই দেহস্থ প্রধান নাড়ীগুলির উৎপত্তিকেন্দ্র। এই কেন্দ্রেই যোগোক্ত 'মূলাধারচক্র' অবস্থিত। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় এই মূলাধার চক্রের নাম Pelvic Plexus of the sympathetic। যে মুদ্রার অনুষ্ঠানে

এই মুলস্থানের গ্রন্থি ও স্নায়ু প্রভৃতি সবলতর হইয়া উঠে, তাহারই নাম মূলবন্ধ মুদ্রা।

এই মূলস্থানে একাধিক গ্রন্থি আছে, ইহাদের নাম কন্দর্পগ্রন্থি ও মদনগ্রন্থি। প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উহার নাম 'প্রোস্টেট্ গ্ল্যাণ্ড' (Prostate gland) এবং 'কাউপারস্ গ্ল্যাণ্ড' (Cowper's gland)। এই গ্রন্থিদ্বয় মূত্রাশয়ের পার্শ্বে অবস্থিত। কামচিন্তা ও কামক্রিয়ার সময় এই গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে। মেয়েদের এই গ্রন্থিগুলি নাই, কিন্তু অনুরূপ গ্রন্থি আছে। মেয়েদের এই গ্রন্থিগুলির নাম রতিগ্রন্থি (Bertholin's gland) এবং মিথুনগ্রন্থি (Skene's gland)। রতিগ্রন্থি ও মিথুনগ্রন্থির ক্রিয়াদিও কন্দর্পগ্রন্থি ও মদনগ্রন্থির অনুরূপ।

এই মুদ্রা অভ্যাসকারীদের বস্তিপ্রদেশের নাড়ীগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মাঝখানে চারি অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থান আছে—ইহার নাম **যোনিস্থান বা যোনিমণ্ডল**। শরীরের প্রধান অবলম্বন মেরুদণ্ড মস্তক হইতে উৎপন্ন হইয়া এই যোনিমণ্ডলে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই যোনিস্থানের কিছু উপরে **কন্দস্থান** অবস্থিত।

"**উর্ধ্বং মেঢ্রাদ্ অধো নাভেঃ কন্দযোনিঃ খগাণ্ডবৎ। ততো নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ॥**"—জননেন্দ্রিয় ও নাভির মাঝখানে পক্ষী-ডিম্বের ন্যায় চক্রাকার কন্দস্থান অবস্থিত। এই কন্দস্থান হইতেই ৭২০০০ নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কন্দস্থানই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, কুহু, শঙ্খিনী প্রভৃতি প্রধান নাড়ীসমূহের উৎপত্তিস্থান। কন্দস্থান হইতে শঙ্খিনী নাড়ী উৎপন্ন হইয়া শাখা-প্রশাখাসহ গুহ্যদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শরীর হইতে মলাদি নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব এই শঙ্খিনী নাড়ীর। কুহু নাড়ী শাখা-প্রশাখা সহ জননেন্দ্রিয়প্রদেশকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। জননেন্দ্রিয়ের সর্ববিধ কর্তব্য এই কুহুনাড়ীর সাহায্যেই সম্পাদিত হয়।

যে নাড়ীটি কন্দস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া মেরুদণ্ডের বামভাগ আশ্রয় করিয়া মেরুদণ্ডের আদি উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত গমন করিয়াছে, তাহার নাম

ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী। যে নাড়ীটি ঐ কন্দস্থান হইতে উঠিয়া মেরুদণ্ডের ডানপাশ আশ্রয় করিয়া উপরের দিকে গিয়াছে, তাহার নাম **পিঙ্গলা বা সূর্যনাড়ী**। যে নাড়ীটি কন্দস্থানের কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ চক্র বা কণ্ঠচক্রে পৌঁছিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আজ্ঞাচক্র ও ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছিয়াছে, তাহার নাম **সুষুম্না**।

মেরুদণ্ড একটি অখণ্ড অস্থি নয়, ইহা ৩৩টি টুকরা টুকরা অস্থির সমবায়ে গঠিত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই অস্থিগুলি অতি সূক্ষ্ম অথচ সুদৃঢ় তন্তু ও পেশী দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এই মেরুদণ্ডাস্থির মধ্য দিয়াই সুষুম্না প্রবাহিত হইয়া মেরুদণ্ডের উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রপ্রদেশ (Plexus of Command) পর্যন্ত গমন করিয়াছে। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ইড়ানাড়ী যখন সক্রিয় থাকে, তখন বাম নাসাপুটে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। পিঙ্গলা নাড়ী সক্রিয় থাকিলে দক্ষিণ নাসাপুটে এবং সুষুম্না নাড়ী সক্রিয় থাকিলে উভয় নাসাপুটে যুগপৎ সমভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়।

প্রণালী—পদ্মাসনে বা যে কোনো ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্খিনী নাড়ীকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিবে। এই আকর্ষণ যেন মূলস্থান পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়। শ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করিলেই শঙ্খিনী নাড়ী আকর্ষিত হইবে। আবার শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য, ধীরে ধীরে শ্বাস টানিবে ও ছাড়িবে।

একই মূলস্থান হইতে শঙ্খিনী ও কুহু নাড়ী বহির্গত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্খিনী নাড়ী (anal nerve) আকর্ষণ করিলে প্রথম প্রথম কুহু নাড়ীও (sex nerve) আকর্ষিত হইবে। কিছুদিন অভ্যাস করার পর কুহু নাড়ী হইতে পৃথক করিয়া শঙ্খিনী নাড়ীকে আকর্ষণ করিবার কৌশল আপনা হইতে আয়ত্ত হইবে।

[মলত্যাগের ইচ্ছা হইলেও জোর করিয়া যদি আমরা মলত্যাগ রোধ করি, তাহা শঙ্খিনী-নাড়ী আকর্ষণ করিয়াই আমাদের করিতে হয়; তেমনি মূত্রবেগ আসিলেও জোর করিয়া যদি মূত্ররোধ করি, তাহা কুহুনাড়ী

আকর্ষণ করিয়াই আমাদের করিতে হয়। শঙ্খিনীনাড়ী ও কুহুনাড়ীর কার্যকারিতার এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিতে হইবে।]

এই মুদ্রাটি সকালে ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুইবার বিধেয়। তিনবার করিতে পারিলে দ্রুত সুফল লাভ হইবে। ইহা প্রথম প্রথম ১০ বার, পরে ২০ বার করিয়া করিবে।

উপকারিতা—পূর্বেই বলিয়াছি, শরীর হইতে মলাদি বাহির করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব এই শঙ্খিনী নাড়ীর। সুতরাং শঙ্খিনী নাড়ী দুর্বল হইয়া পড়িলে যথোচিতভাবে মলাদি অন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত হয় না—ফলে কোষ্ঠবদ্ধতাদি জটিল রোগ সৃষ্টি হইয়া শরীরকে ব্যাধিমন্দির করিয়া তোলে। এই মুদ্রা অভ্যাসে শঙ্খিনী নাড়ীর শক্তি বৃদ্ধি হয় সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ প্রভৃতি রোগের ইহা মহৌষধ। ইন্দ্রিয় সংযম ও বীর্যধারণ বা ব্রহ্মচর্য রক্ষারও ইহা একান্ত সহায়ক। ইহাতে জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়। যোগশাস্ত্রকারেরা বলেন—"**যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ**।" অর্থাৎ মূলবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠানে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় স্বাস্থ্যশক্তি লাভ করে।

মূলস্থানস্থিত কন্দর্পগ্রন্থি বা কামগ্রন্থি প্রভৃতির অন্তঃক্ষরণ কামচিন্তা ও কামোত্তেজনার অনুষঙ্গী। এই কামগ্রন্থির উপরেই ব্যক্তিত্বধর্ম আরোপ করিয়া পুরাণে নর-নারীর মিলনাকাঙ্খার প্রতীক কামদেবকে চিত্রিত করা হইয়াছে। মূলবন্ধ মুদ্রাটির সুষ্ঠু অনুষ্ঠানে পুরুষের কামগ্রন্থি ও মদনগ্রন্থি এবং নারীর রতিগ্রন্থি ও মিথুনগ্রন্থি সংশ্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলীর দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা দূর হইয়া যায়; ধারণাশক্তি বাড়ে, সুস্থ-সবল সন্তান লাভের অন্তরায় দূর হয়। বস্তিপ্রদেশস্থ অন্যান্য নাড়ীও এই মুদ্রার অভ্যাসে উপকৃত হয়।

যোগমুদ্রা

এই মুদ্রাটির অভ্যাসে দেহ যোগসাধনার উপযোগী নীরোগ হইয়া উঠে, এইজন্যই ইহার নাম যোগমুদ্রা।

প্রণালী—পদ্মাসনে উপবেশন কর। যাহারা পদ্মাসনে বসিতে অক্ষম, তাহারা বীরাসনে বা আসনপিঁড়ি হইয়া উপবেশন কর। হাত দুইটি পিছনে

যোগমুদ্রা

নিয়া বাম হাতের দ্বারা ডান হাতের কব্জি ধারণ করিবে। মেয়েরা ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধারণ করিবে। অতঃপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিয়া কপাল মৃত্তিকা সংলগ্ন কর। পাঁচ সেকেণ্ড শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া পুনরায় শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে মস্তক ও দেহকে সরল করিয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হও। একাসনে বসিয়া অন্ততঃ ৭ হইতে ১০ বার মাত্র ক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

প্রথম শিক্ষার্থী দৈনিক ২/৩ বার মাত্র ক্রিয়াটি অভ্যাস করিবে; ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইয়া লইবে।

উপকারিতা—এই মুদ্রাটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা ও যকৃতের রুগ্নাবস্থা দূর

করিয়া উহাদিগকে সুস্থ ও সবল করিতে, স্বাভাবিক আকৃতিতে পরিণত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মুদ্রাটি দেহের স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলিকে কথঞ্চিৎ সবলতর করিয়া রোগারোগ্যে সহায়তা করে।

শক্তিচালনী মুদ্রা

যোগশাস্ত্রে 'শক্তি' শব্দের অর্থ কুণ্ডলিনী। যে মুদ্রায় কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধা হইয়া ঊর্ধ্বে চালিত হয়, তাহারই নাম শক্তিচালনী মুদ্রা।

প্রণালী—পদ্মাসন বা গোমুখাসনে উপবেশন কর। তারপর শ্বাসের সহিত শাখা-প্রশাখাসহ কুহু ও শঙ্খিনী নাড়ী ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিতে থাক। আকর্ষণের ফলে মেঢ্রদেশ, নাভিপ্রদেশ ও উদর কথঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইয়া মেরুদণ্ডের নিকটবর্তী হইবে। এই আকুঞ্চন সাধ্যমত ৫ হইতে ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখিয়া শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দাও।

দশ হইতে কুড়িবার এইরূপ কর। এই মুদ্রা দৈনিক অন্ততঃ দুইবার করিয়া করিতে হয়—প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

উপকারিতা—এই মুদ্রার সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সাধককে কামজয়ী করে। ইহাতে সুপ্তিস্খলন নিরুদ্ধ হয় ও ইহা সাধককে ঊর্ধ্বরেতা হইতে সাহায্য করে।

এই ঊর্ধ্বরেতার সাধনা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলিতে হইলে বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও গ্রন্থি সম্বন্ধে আরও আলোচনা প্রয়োজন। পুরুষের মুষ্কে সর্বদাই রক্ত চলাচল করে। কামচিন্তা না করিলেও যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই মুষ্কের স্বভাব অনুযায়ী রক্তমন্থন করিয়া কিছু কিছু শুক্র সে উৎপন্ন করিবেই। উভয় মুষ্ক হইতে উৎপন্ন শুক্র সঞ্চিত হওয়ার যে থলি আছে, তাহার নাম শুক্রকোষ। মুষ্কও যেমন দুইটি, শুক্রকোষও তেমনি দুইটি। শুক্রকোষদ্বয় মূত্রথলীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। শুক্রকোষের দুইটি করিয়া মুখ; একটি মুখ নীচে মূত্রনালীর সহিত সংযুক্ত, আর একটি ঊর্ধ্বে রক্তবহা

নাড়ীর সহিত যুক্ত। উত্তেজনার চরম মুহূর্তে শুক্রকোষের নীচের মুখটি খুলিয়া যায় এবং মূত্রনালীর পথে শুক্রপ্রবাহ বেগে নির্গত হয়। যাহাদের কামগ্রন্থি এবং কুন্দনাড়ী-সংশ্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলী সুস্থ-সবল ও পিতৃগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ সুনিয়মিত, তাহাদের শুক্রকোষে সঞ্চিত শুক্র ঊর্ধ্বপথে উঠিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়। ইহাদের দেহে শুক্রের অনিচ্ছাকৃত অপচয় ঘটে না, এইজন্য ইহাদের দেহ প্রচুর জীবনীশক্তিসম্পন্ন, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ এবং তেজোবীর্যময় হয়, বৃদ্ধবয়সেও ইহাদের যৌবনোচিত স্বাস্থ্যশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। কুন্দনাড়ী ও তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল হইয়া পড়িলেই শুক্রধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, শুক্রের ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয় ফলে শুক্রকোষের নির্গমনমুখ শিথিল হইয়া যায় এবং তখন উত্তেজনায়, বিনা উত্তেজনায় বা সামান্য কামচিন্তা মাত্রেই প্রস্রাবাদির সহিত শুক্র নির্গত হইয়া থাকে।

কুন্দনাড়ী দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ আছে। অনবরত রোগে ভুগিয়া স্বাস্থ্য খারাপ হইলে বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে।

একরকম রোগ আছে যাহাতে কর্ণমূল ও গাল-গলা ফুলিয়া যায় (ইংরাজীতে যাহাকে বলে mumps)। এই রোগটি পিতৃ-মাতৃগ্রন্থির ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, এমন কি গ্রন্থিটিকে চিরতরে অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারে।

প্রথম যৌবনে অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ হস্তমৈথুনাদিতে অত্যাসক্তির ফলে এবং বিবাহিত জীবনে অতিরিক্ত অসংযমী হইলেও বস্তিপ্রদেশের সমস্ত স্নায়ু-গ্রন্থি দুর্বল হইয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা অতি সংযমী, অর্থাৎ যাঁহারা অধিকাংশ সময় ধ্যান-ধারণায়, দার্শনিক চিন্তায় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ডুবিয়া থাকেন তাঁহাদের রক্ত চলাচল মস্তিষ্কেই হয় বেশী, তাঁহাদের উপস্থপ্রদেশ উপেক্ষিত থাকে; ফলে উপস্থপ্রদেশের স্নায়ুগ্রন্থি দুর্বলতর হইয়া তাঁহাদের দেহেও অকালবার্ধক্য দেখা যায়।

অতএব অসংযম এবং অতিসংযম উভয়ই কুন্দনাড়ী দুর্বল হওয়ার

মূলে ক্রিয়া করে। মেয়েদের মাতৃগ্রন্থি, মিথুনগ্রন্থি, রতিগ্রন্থি ও কুহুনাড়ী প্রভৃতি দুর্বল হইয়া পড়িলেই নানা স্ত্রীব্যাধি দেখা দেয় এবং তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অকালে ঝরিয়া পড়ে।

শক্তিচালনী প্রভৃতি মুদ্রা এই সমস্ত স্ত্রীব্যাধিরও প্রতিষেধক।

শবাসন

এই আসন অভ্যাসকারীর শরীর দৃশ্যতঃ মৃতদেহের মতোই নিস্পন্দ ও জড়বৎ হইয়া পড়ে, তাই ইহার নাম শবাসন বা মৃতাসন।

প্রণালী—পদদ্বয়কে সটান রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। হস্তদ্বয় শরীরের পার্শ্বে স্থাপন কর। এইবার পদদ্বয়ের স্নায়ুগুলিকে শিথিল করিয়া দাও। অতঃপর ক্রমশঃ ঊর্ধ্বাঙ্গের স্নায়ুগুলিকে শিথিল করিতে থাক। দেহস্থ
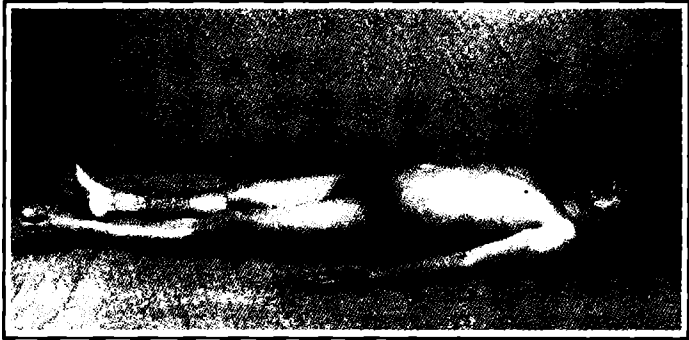
শবাসন

স্নায়ুমণ্ডলীর উপর মৃত ব্যক্তির যেমন কোনো আধিপত্য থাকে না, অর্থাৎ সমগ্র দেহের স্নায়ুমণ্ডলীকে নিজের আধিপত্য হইতে মুক্ত কর, অর্থাৎ সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে শিথিল করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাক। মনকে সম্পূর্ণ

শান্ত ও নিস্তরঙ্গ রাখ। সুষুপ্তির সময় মনে যেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকে না, মনকে সেইরূপ চিন্তা-ভাবনাশূন্য কর। এইভাবে মনকে চিন্তাশূন্য করিয়া, শরীরকে শিথিল করিয়া দিয়া ১৫/২০ মিনিট মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলে আসন-মুদ্রাভ্যাসজনিত যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়।

এই আসনটি আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানের পর সর্বশেষে করিতে হয়। ইহা একাধারে দৈহিক ও মানসিক বিশ্রান্তি।

উপকারিতা—এই আসনটি করার পরই শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া যায়, শরীরে নূতন কর্মশক্তি সঞ্চারিত হয়। শরীর শিথিল করিয়া দিয়া বিশ্রাম করার এই কৌশলটি আয়ত্ত হইলে নিদ্রা জয় করা যায়।

কর্তব্যের দায়ে দীর্ঘদিন নিয়মিত নিদ্রার সুযোগ যাহাদের হয় না, দিনের মাঝে যে-কোনো সময় একবার করিয়া এই আসনটি করিতে পারিলে তাহাদের অনিদ্রাজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না এবং স্বাভাবিক কর্মশক্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে।

যে কোনো কাজের পরই ক্লান্তি বোধ হইলে এই আসনটি করিয়া শরীরের ক্লান্তি দূর করা যায়। ক্লান্তি মানে স্নায়ুমণ্ডলীর বিশ্রামাকাঙ্খা, এই আকাঙ্খিত বিশ্রামটুকু পাইলেই আবার তাহারা স্বাভাবিক কর্মশক্তি লাভ করে।

গরীব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের ভোর হইতেই একটানা পরিশ্রম শুরু হয়। অবিশ্রান্ত 'একঘেয়ে' কাজে তাহাদের শরীর সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ক্লান্তি দূর না করিয়া দিনের পর দিন এই ক্লান্তির জের টানিয়া চলে বলিয়াই এইসব মেয়েদের স্বাস্থ্য যৌবনেই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সুতরাং যখনই ক্লান্তি বোধ হইবে, তখনই সমস্ত কর্ম স্থগিত রাখিয়া শয্যার উপর শরীরকে এলাইয়া দিয়া ১০/১৫ মিনিট এই আসন অবলম্বনে বিশ্রাম করিবে। আসনটি ঠিকঠাকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে দেহ-মনের সমস্ত অবসাদ অচিরে দূর হইয়া যাইবে, নূতন কর্মশক্তি লইয়া পুনরায় কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে ; তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশ্রামের এই কৌশলটুকু আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

ছাত্র-ছাত্রীরা এইভাবে স্নায়ু শিথিল করিয়া বিশ্রাম করার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে পারিলে পরীক্ষার সময় রাত্রিবেলা অল্প সময় ঘুমাইয়া অধিক সময় অধ্যয়নাদি করিতে পারিবে, অথচ তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

যাহারা স্থূলকায়, যাহারা রোগী, দুর্বল বা প্রৌঢ়বয়স্ক, তাহারা পরিশ্রম বোধ করিলেও প্রত্যেকটি আসন-মুদ্রা করার অব্যবহিত পরে, শবাসনে ২/১ মিনিট বিশ্রাম করিয়া পরবর্তী ক্রিয়াগুলি অভ্যাস করিবে।

রক্তচাপবৃদ্ধি রোগী এবং হৃদ্‌রোগীর পক্ষে এই আসনটি মহা উপকারী। সাধকেরা এই আসনটির সাহায্যে যোগ-নিদ্রা আয়ত্ত করিয়া উচ্চস্তরের অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

শয়নপশ্চিমোত্তান

প্রণালী—চিৎ হইয়া শয়ন কর। হস্তদ্বয় মস্তকের ঊর্ধ্বে সটানভাবে
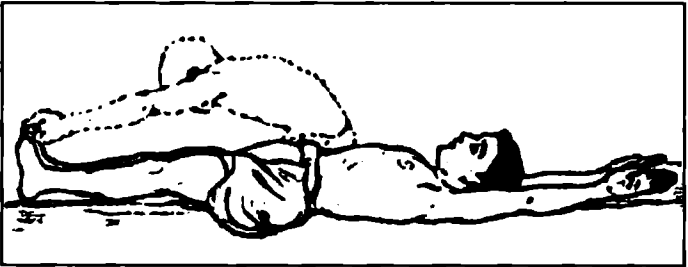
শয়নপশ্চিমোত্তান

বিন্যস্ত কর। পায়ের গোড়ালিদ্বয় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকিবে। অতঃপর গভীরভাবে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পশ্চিমোত্তান আসনের মতই নত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ কর। সম্ভবপর হইলে মস্তক হাঁটুতে সংলগ্ন কর। ২/৪

সেকেণ্ড শ্বাসপ্রবাহ আবদ্ধ রাখিয়া আসনে প্রতিষ্ঠিত থাক। অতঃপর গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ করিতে করিতে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ শয়নাবস্থায় উপনীত হও। এইভাবে ৫/৬ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে।

উপকারিতা—পশ্চিমোত্তান আসনে যে সমস্ত উপকার পাওয়া যায়, এই শয়নপশ্চিমোত্তান আসনে সেই সমস্ত উপকার অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মাঝে লাভ হয়। সুতরাং পশ্চিমোত্তান আসনের চেয়ে এই আসনটি অধিকতর উপকারী (পশ্চিমোত্তান আসনের উপকারিতার বিস্তৃত বিবরণ ৩২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

শলভাসন

'শলভ' শব্দের অর্থ পতঙ্গ। এই আসনটি অভ্যাসের সময় শরীর পতঙ্গাকৃতি ধারণ করে, তাই ইহার নাম রাখা হইয়াছে 'শলভাসন'।

প্রণালী—শরীরকে সরল রাখিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়। চিবুকটি মৃত্তিকা সংলগ্ন কর। হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শরীরের পাশে উরু বরাবর স্থাপন কর। গোড়ালি ঊর্ধ্বে রাখিয়া পদদ্বয় সরল ও সটান ভাবে রাখ। এইবার বাম পদ সরল ও সটান রাখিয়া যতদূর পার ঊর্ধ্বে উঠাও। হাঁটুতে যেন বিন্দুমাত্র ভাঁজ না পড়ে। কয়েক সেকেণ্ড এইভাবে পা রাখিয়া ধীরে ধীরে পা নামাইয়া পূর্ববৎ মৃত্তিকায় স্থাপন কর। আবার ঠিক অনুরূপভাবে ডান পা ঊর্ধ্বে তোল; কয়েক সেকেণ্ড পা ঊর্ধ্বে রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে পা নামাইয়া লও। এইরূপ পৃথক পৃথক ভাবে দুই পা উপর্যুপরি ৩/৪ বার উঠাও এবং নামাও। অতঃপর চিবুক, বক্ষ এবং মুষ্টিবদ্ধ হস্তের উপর শরীরের ভর রাখিয়া পদদ্বয়কে সটান করিয়া একসঙ্গে ঊর্ধ্বে উঠাও। পদদ্বয় কমপক্ষে যেন অর্ধহাত মৃত্তিকা হইতে উপরে উঠে। ক্রমশঃ অভ্যাসে পদদ্বয়কে মৃত্তিকা হইতে এক হাত ঊর্ধ্বে উঠাইতেও কষ্ট হইবে না। প্রথম প্রথম ক্রিয়াটির ২/৩ বার অভ্যাস করিবে। ভালরূপে অভ্যস্ত হইলে ৫/৭ বার করিবে।

প্রথম প্রথম দুই পা তোলা যাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইবে, তাহারা কিছুদিন শুধু পর্যায়ক্রমে বাম পা ও ডান পা তুলিয়া আসনটি করিতে
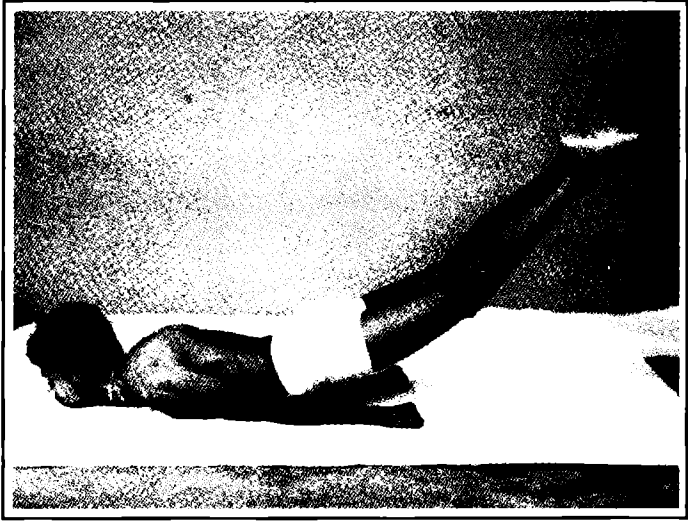
শলভাসন

থাকিবে। ইহাকে **অর্ধ-শলভাসন** বলে। কিছুদিন অর্ধ-শলভাসন করার পর পূর্ণ শলভাসন করা দুঃসাধ্য হইবে না।

উপকারিতা—ভুজঙ্গাসন যেমন শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের ব্যায়াম, শলভাসন তেমনি শরীরের নিম্নাঙ্গের ব্যায়াম। শলভাসন বিশেষ করিয়া কটিবাত অর্থাৎ **'মাজাব্যাথা'**র আশ্চর্য প্রতিষেধক। অল্পদিন অভ্যাসেই মেয়েদের দীর্ঘদিনের ঋতুকালীন **মাজাব্যাথাও** এই আসনটি অভ্যাসে চিরতরে আরোগ্য হয়। হাতের বাত, পায়ের বাত, সায়াটিকার বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা আরোগ্য করিতে এই আসনটি প্রভূত সাহায্য করে।

এই আসনটি অভ্যস্ত থাকিলে পদব্রজে দীর্ঘপথ ভ্রমণ কষ্টকর হয় না। এই আসনটি অভ্যাসে দৈহিক পরিশ্রমের শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। যে

স্নায়ুমণ্ডলী হস্ত ও পদদ্বয়কে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে সাহায্য করে, সেই সমস্ত স্নায়ুপ্রদেশে এই আসনটি অভ্যাসের সময় প্রচুর রক্ত চলাচল করে বলিয়া স্নায়ুমণ্ডলীসহ স্থানীয় পেশীসমূহও সবলতর হইয়া উঠে। এই আসনটি অভ্যস্ত হইলে মাজা ও পাছার অতিরিক্ত চর্বি কমিয়া গিয়া দেহের গড়ন সুন্দর হইয়া উঠে। এই আসনটি অভ্যাসে ফুস্‌ফুস্‌ সংলগ্ন স্নায়ুগুলি এবং ফুস্‌ফুসের বায়ুধারণকারী কোষগুলি সুপুষ্ট ও সবলতর হয়।

নিষেধ—এই আসন অভ্যাসের সময় বুকের উপর, ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের উপর খুব চাপ পড়ে। সুতরাং যাহাদের হৃদ্‌রোগ আছে বা ফুস্‌ফুস্‌ খুব দুর্বল, তাহাদের পক্ষে এই আসনটির অভ্যাস নিষিদ্ধ।

শশাঙ্গাসন

শশক ভয় পাইয়া যেভাবে মুখ লুক্কায়িত করে, এই আসনটির সহিত তাহার কিছুটা সাদৃশ্য আছে, এইজন্য এই আসনটির নাম দেওয়া হইয়াছে শশাঙ্গাসন।

প্রণালী—বজ্রাসনে উপবিষ্ট হও। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পায়ের এবং বাম হস্ত দ্বারা বাম পায়ের গোড়ালি ধারণ কর। অতঃপর পায়ের উপর হইতে পাছা উপরে উঠাইয়া, পৃষ্ঠদেশ বক্র করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মস্তকটি দুই হাঁটুর সম্মুখে মৃত্তিকা সংলগ্ন কর। পৃষ্ঠদেশ এমনভাবে বাঁকাইবে যাহাতে হস্তদ্বয় সটান থাকে। ৫/১০ সেকেণ্ড শ্বাস বন্ধ রাখিয়া মস্তক মৃত্তিকাসংলগ্ন রাখ, অতঃপর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে পূর্বাবস্থায় উপনীত হও। অনুরূপভাবে ৪/৫ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—এই আসনটি মেরুদণ্ডের স্নায়ু ও পেশী সবল করে। জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত রাখে। নভঃগ্রন্থি ও অহংগ্রন্থিগুলির (Thyroid, Tonsil, Pituitary etc.) সবলতা বিধানে সহায়তা করে।

যাহারা শীর্ষাসন করিতে অক্ষম, তাহারা শীর্ষাসনের পরিবর্তে এই

আসনটি অভ্যাস করিবে। এই আসনটি অভ্যাসে শীর্ষাসনের সুফল আংশিকভাবে লাভ হইবে।

শশাঙ্গাসন

সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা বা সর্বাঙ্গাসন

সমগ্র শরীরের উপর এই মুদ্রাটির আশ্চর্য প্রভাব, অর্থাৎ ইহার অভ্যাসে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নীরোগ, সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে বলিয়াই ইহার নাম সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা সংক্ষেপে সর্বাঙ্গাসন।

প্রণালী—বিপরীতকরণীর পূর্ণাঙ্গ রূপই সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা। বিপরীতকরণী ভালো অভ্যস্ত হইলে এই মুদ্রাটির অনুষ্ঠান সহজ হইয়া আসে। বিপরীতকরণী মুদ্রাকে অর্ধ-সর্বাঙ্গাসন বলা যাইতে পারে। বিপরীতকরণীর ঠিক অনুরূপ মস্তক মৃত্তিকাসংলগ্ন করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। বিপরীতকরণীতে কোমরের সমান্তরালে পা উঠাইতে হয়, সর্বাঙ্গাসনে

স্কন্ধের সমান্তরালে পা ঊর্ধ্বে তুলিয়া সমস্ত শরীরকে সোজা-সরল করিতে হইবে। বিপরীতকরণীতে হস্তদ্বয় স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া কোমরের ভাররক্ষার অবলম্বন হয়; কিন্তু সর্বাঙ্গাসনে হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে উঠিয়া আসিবে, সমগ্র শরীরের ভারকেন্দ্র স্কন্ধ ও বাহুমূলের উপর স্থাপিত হইবে। বিপরীতকরণীতে চিবুক মস্তকের সমান্তরালে ঊর্ধ্বমুখী থাকে অর্থাৎ কণ্ঠ ও চিবুকের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। সর্বাঙ্গাসনে চিবুক আসিয়া কণ্ঠকূপে সংলগ্ন হইবে। (বুক ও কণ্ঠের সংযোগস্থলের গর্তটির নাম **কণ্ঠকূপ**)।
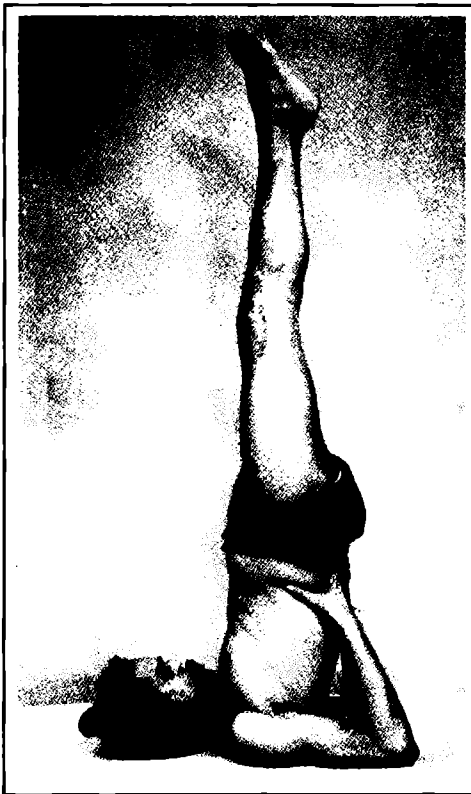
সর্বাঙ্গাসন মুদ্রা নং ১

এই আসনটিরও বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ ধারণ না করিয়া হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের নিম্নভাগে মৃত্তিকার সমান্তরালে রাখা যাইতে পারে অথবা বামহাত দ্বারা ডান হাতের কব্জি ধারণ করিয়া কব্জিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করা যাইতে পারে। এইরূপ কব্জিবদ্ধ হস্তদ্বয় পৃষ্টদেশ ও পদদ্বয়কে সরল রাখিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ৫ মিনিট আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে যখন আর কোনো কষ্ট হইবে না, তখনই বুঝিবে আসনটি আয়ত্ত হইয়াছে। রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তি আধ-মিনিট এক-মিনিট ক্রিয়াটি অভ্যাসের পর একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে; এইভাবে ধীরে ধীরে ক্রিয়াটি আয়ত্ত করিবে। ক্রিয়াটি অনুষ্ঠানের মাত্রা শারীরিক শক্তি অনুযায়ী ২ মিনিট হইতে ১০ মিনিট। এই আসন অভ্যাসে অক্ষম হইলে এই আসনের পরিবর্তে সহজ বিপরীতকরণী বা সহজ শীর্ষাসন অভ্যাস করিবে।
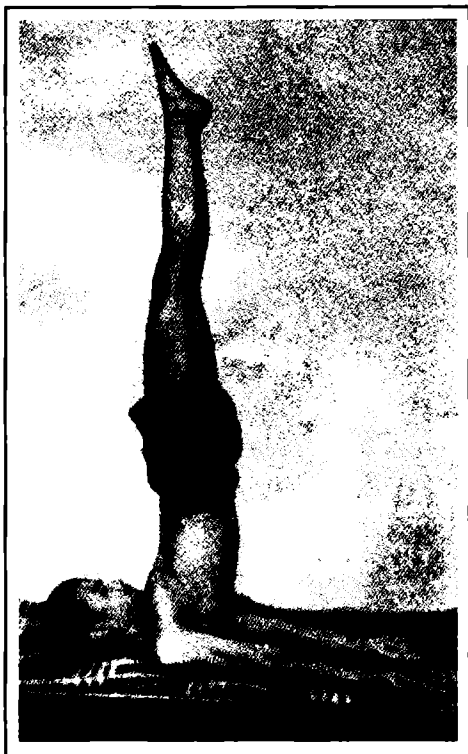
সর্বাঙ্গাসন মুদ্রা নং ২

উপকারিতা—এই সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রাটির অশেষ গুণ। যে এই মুদ্রাটির ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠান করিবে, সে-ই ইহার গুণ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিবে না। এক কথায় বলা যায়—এই মুদ্রাটির সর্বরোগ আরোগ্য করার ক্ষমতা আছে। সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসে ইন্দ্রগ্রন্থি বা যৌবনগ্রন্থি (Thyroid), উপেন্দ্রগ্রন্থি (Para-Thyroid), তালুগ্রন্থি (Tonsil) ও

লালাগ্রন্থি প্রভৃতি অর্থাৎ সমুদয় নভঃগ্রন্থিগুলি সবলতর হয়। এই নভঃগ্রন্থিগুলিই দেহের রোগপ্রতিষেধক গ্রন্থি। এইগুলি সবল থাকিলে কোনো রোগই দেহে প্রবল হইতে পারে না। নভঃতত্ত্ব বা ব্যোমতত্ত্ব যেমন বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্বের জনক, নভঃগ্রন্থি বা ব্যোমগ্রন্থিগুলিও তেমনি দেহের সমুদয় গ্রন্থিগুলির রাজা। এই নভঃগ্রন্থিগুলি সবল থাকিলে দেহের অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থির ক্রিয়াই সবল থাকে। নভঃগ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া পড়িলে দেহের অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থি, দেহের স্নায়ু-তন্তু-পেশী দুর্বল হইয়া পড়ে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—আমাদের দেহের নভঃগ্রন্থিগুলি কণ্ঠপ্রদেশে অবস্থিত। সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসের সময় প্রচুর রক্ত আসিয়া কণ্ঠপ্রদেশে সঞ্চিত হয়। এই রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিয়া নভঃগ্রন্থিগুলি সুস্থ-সবল থাকে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালন করে।

এই নভঃগ্রন্থিগুলির মাঝে ইন্দ্রগ্রন্থিই আবার সর্বপ্রধান। আধুনিক দেহবিজ্ঞানীরা এইসব অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি লইয়া বিশেষভাবে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে—কোনো কারণে যাহাদের ইন্দ্রগ্রন্থি (Thyroid) নষ্ট হইয়াছে বা দুর্বল হইয়াছে অথবা অস্ত্রোপচার দ্বারা অপসারিত করা হইয়াছে, তাহারা সহজেই বিবিধ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে ; সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইহারা প্রায়ই অকালমৃত্যু বরণ করে। গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকেরা এইসব রোগীর দেহে থাইরয়েড রস ইন্‌জেক্‌সন করিয়া আশ্চর্য সুফল পাইয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন থাইরয়েড রস ইন্‌জেক্‌সনের অব্যবহিত পরই রক্তের ভিতরকার লাল-রক্তাণু ও শ্বেত-রক্তাণু সবলতর হইয়া নিজ নিজ কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, দেহে প্রাণকোষগুলিকে সবল করিয়া দেহোৎপন্ন এবং বহিরাগত রোগবীজাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া তাহারা দেহকে সুস্থ-সবল করিয়া তুলিতেছে।

যোগাচার্যদের মত আয়ুর্বেদাচার্যেরাও এই ইন্দ্রগ্রন্থিটি সম্বন্ধে বিশেষ

সচেতন ছিলেন, এইজন্যই তাঁহারা 'সর্বরোগে ধন্বন্তরি' **মকরধ্বজ** ঔষধটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। মকরধ্বজ ঔষধের প্রধান উপাদান **'পারদ'**। পারদ ইন্দ্রগ্রন্থিকে উত্তেজিত করিয়া, সক্রিয় করিয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় অন্তর্মুখী রস উৎপন্ন করিতে সাহায্য করে। এইজন্যই অনুপানভেদে মকরধ্বজ সর্বরোগেই ব্যবহার করা হয়।

আধুনিক গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, ইন্দ্রগ্রন্থির অন্তঃস্রাবী রসের মাঝে 'আইওডিন' (Iodine) থাকে। এই আইওডিন রক্তের একটি বিশিষ্ট উপাদান। রক্তে মিশ্রিত এই আইওডিনই দেহের সমুদয় স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলিকে সবল রাখে। ইন্দ্রগ্রন্থির অন্তঃস্রাবী রস যথোচিতভাবে না পাইলে দেহের রক্ত নিস্তেজ ও নিঃসার হইয়া পড়ে।

এই গ্রন্থিটির আর এক নাম যৌবনগ্রন্থি। এই গ্রন্থিটি বিশেষভাবে সক্রিয় হইতে আরম্ভ করিলেই নর-নারীদেহে যৌবন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এই গ্রন্থিটির ক্রিয়া যখন হ্রাস পাইতে থাকে, তখন জরা ও বার্ধক্য আসিয়া দেহকে আক্রমণ করে। সুতরাং **জরা ও বার্ধক্যও ব্যাধিবিশেষ। এই সমস্ত উপকারী আসন-মুদ্রা দ্বারা জরা ও বার্ধক্য প্রতিরোধ করিয়া আমরণ যৌবনকে অটুট রাখা যায়।**

ম্যাকফার্ডেন প্রমুখ পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানীরা ইন্দ্রগ্রন্থির অসাধারণ ক্ষমতার সন্ধান পাইয়া এই গ্রন্থির পুষ্টির জন্য কয়েকটি ব্যায়াম প্রচলিত করিয়াছেন—যাহা ঘাড় এদিক-ওদিক বাঁকাইয়া করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরণের ব্যায়ামে সর্বাঙ্গাসনের ন্যায় সর্বাঙ্গীণ সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ব্যায়ামে ইন্দ্রগ্রন্থি সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলিই শুধু কিঞ্চিৎ সবলতর হয় মাত্র; ইন্দ্রগ্রন্থির পরিপূর্ণ পুষ্টি ইহা দ্বারা হয় না।

নিয়মিত সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসকারীকে কখনো কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, শূলব্যাধি, কুষ্ঠ প্রভৃতি জীবনসংশয়কারী দুরারোগ্য রোগ আক্রমণ করিয়া মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিতে পারে না। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণরোগ, প্লীহা ও যকৃতের দোষ, এই আসনটি অভ্যস্ত হইলেই

ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে। এই আসনটি মেয়েদের ঋতুর দোষ যাদুমন্ত্রের মতো আরোগ্য করে। ইহার অভ্যাসে স্থানচ্যুত জরায়ু স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত হয়। শারীরিক দুর্বলতা, মাথাঘোরা, অর্শ, হার্নিয়া প্রভৃতি রোগ এই আসনটি অভ্যাসে দূর হইয়া যায়।

সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসে অক্ষম হইলে সর্বাঙ্গাসনের পরিবর্তে সহজ শীর্ষাসন বা বিপরীতকরণী অভ্যাস করিবে।

হলাসন

এই আসন অভ্যাসের সময় দেহটি হল বা লাঙ্গলের আকার ধারণ করে, এইজন্যই ইহার নাম হলাসন।

প্রণালী—চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। হস্তদ্বয় উপুড় করিয়া শরীরের উভয় পার্শ্বে সরলভাবে বিন্যস্ত কর। তারপর ধীরে ধীরে পদদ্বয়কে ঊর্ধ্বে তুলিতে থাক; ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠাইয়া ২/৪ সেকেণ্ড বিশ্রাম কর। অতঃপর ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত পা উঠাইয়া একটু থাম। সর্বশেষে স্কন্ধ ও মস্তক অতিক্রম করাইয়া পদদ্বয়কে মৃত্তিকাসংলগ্ন কর। পায়ের অঙ্গুলিগুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে, ঊরুদেশ ও ললাটের মাঝে চতুরাঙ্গুলি ফাঁক থাকিবে। আসনটি ভালো অভ্যস্ত হইলে ১০ সেকেণ্ড মৃত্তিকাসংলগ্ন রাখিয়া পদদ্বয়কে পুনরায় ঊর্ধ্বে উঠাইয়া ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় উপনীত হইবে।

বেশ ভালোরূপ অভ্যস্ত হইলে তখন শ্বাস-প্রশ্বাস সহযোগে আসনটি করিবে। শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পা উপরে উঠাইবে এবং কয়েক সেকেণ্ড শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া আসনে স্থির থাকিবে। অতঃপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পা নামাইয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হইবে। এই ক্রিয়াটি প্রত্যহ একবেলা কমপক্ষে ৩ বার এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ৫ বার মাত্র করিবে। শীতের ছয় মাস কয়েকবার বেশি করিলেও করা যাইতে পারে।

এই আসনটির বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। ঊরুদ্বয় ও ললাটের মাঝে

চতুরাঙ্গুলি ফাঁক না রাখিয়া ললাটের সহিত উরুদেশকে স্পর্শ করাইয়াও ইহা করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া হাত দুইটি ঘুরাইয়া আনিয়া দুই
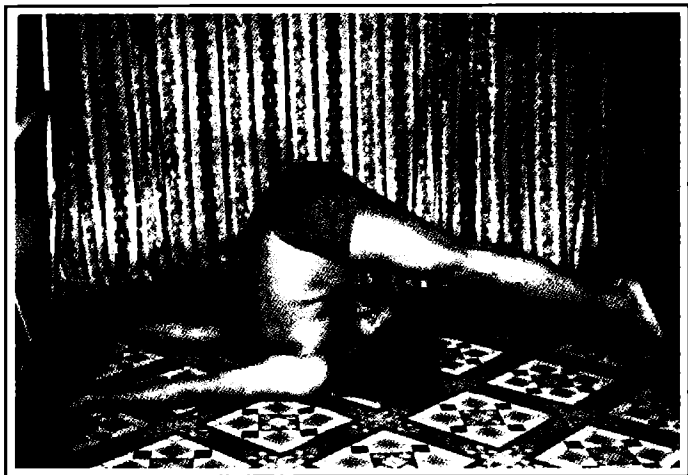
হলাসন

হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া মস্তকের অব্যবহিত নিম্নে মস্তকের অবলম্বনরূপে রাখিয়াও এই আসনটি করা যাইতে পারে।

বিপরীতকরণী মুদ্রা ও সর্বাঙ্গাসন ভালো অভ্যস্ত হওয়ার পর এই আসনটি সহজে আয়ত্ত করা যায়।

প্রথম অভ্যাসের সময় প্রাতে না করিয়া দিনান্তে করিলে এই আসনটি সহজে আয়ত্ত করা যায়।

উপকারিতা—এই আসনটিতে মেরুদণ্ড সম্মুখে বাঁকাইতে হয় বলিয়া সম্মুখস্থ মেরুদণ্ডসংশ্লিষ্ট পেশী ও স্নায়ুকেন্দ্র প্রভৃতির দুর্বলতা ইহার অভ্যাসে দূর হয়। বলা বাহুল্য, মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও দেহকে যৌবনোচিত কর্মক্ষম রাখিতে এই আসনটি বিশেষভাবেই সাহায্য করে।

এই আসনটি অভ্যাসের সময় উরু ও বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু ও পেশীগুলি

সঙ্কুচিত হয়, উদরপ্রদেশের স্নায়ু ও পেশী এবং হৃদ্‌যন্ত্রের স্নায়ু ও পেশীগুলি প্রসারিত হয়। মেরুদণ্ডসংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্নায়ু-তন্তু ও পেশী আকৃষ্ট-বিকৃষ্ট হইয়া সবলতা লাভ করে। ফলে এই আসন অভ্যাসে শরীরের মেদবাহুল্য দুর হয়, যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি নিবারিত হয়, হৃদ্‌যন্ত্র সবল হয়। অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও বহুমূত্র রোগেরও ইহা প্রতিষেধক। নভঃগ্রন্থির সবলতা বিধানেও এই আসনটি সাহায্য করে।

নিষেধ—বারো বৎসর পূর্ণ না হইলে ছেলে-মেয়েদের এই আসনটি করা নিষিদ্ধ।

অতিরিক্ত আসন

দণ্ডায়মান একপদ পৃষ্ঠাসন

কুক্কুটাসন

কূর্মাসন

ঊর্ধ্ব কুক্কুটাসন
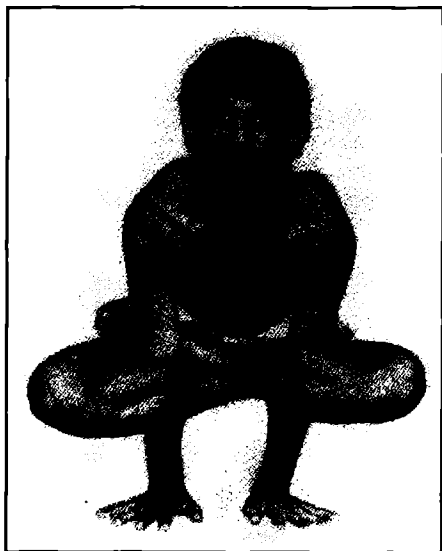
উত্থিত কূর্মাসন
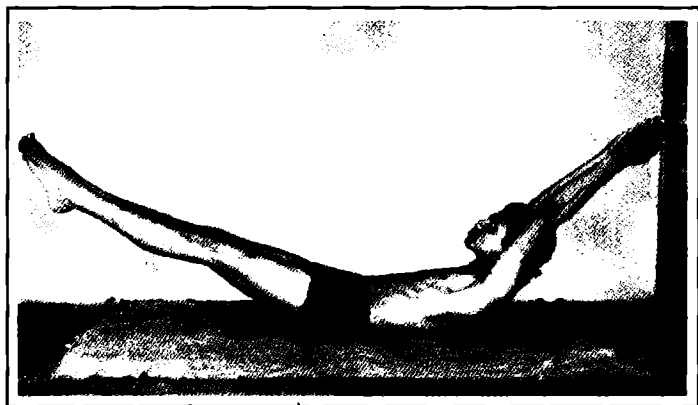
নৌকাসন
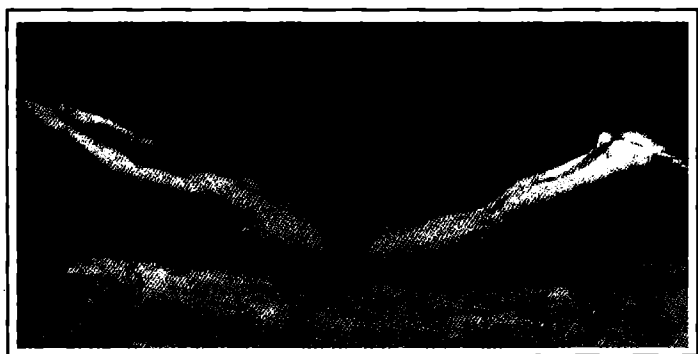
নাভি আসন

সেতুবন্ধনাসন
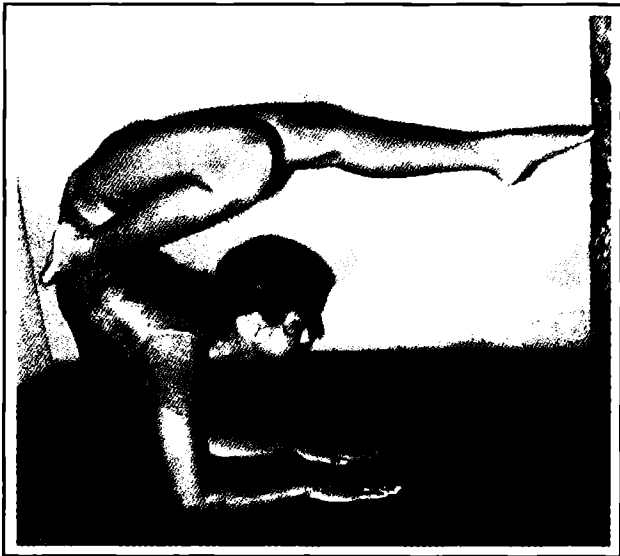
একপদ গোখিলাসনে ব্যঘ্র ৯-কারাসন
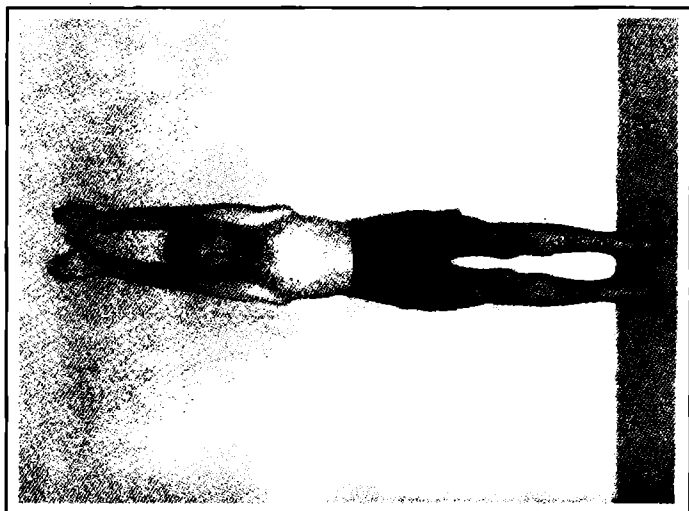
প্রলম্বী আসন
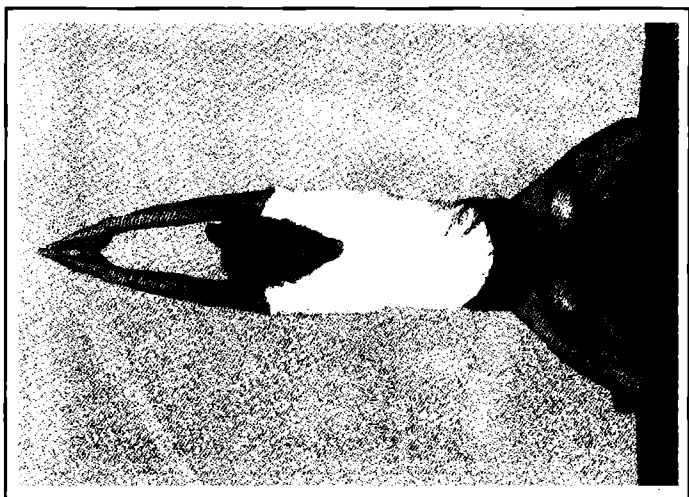
পর্বতাসন

গোখিলাসনে পর্বতাসন
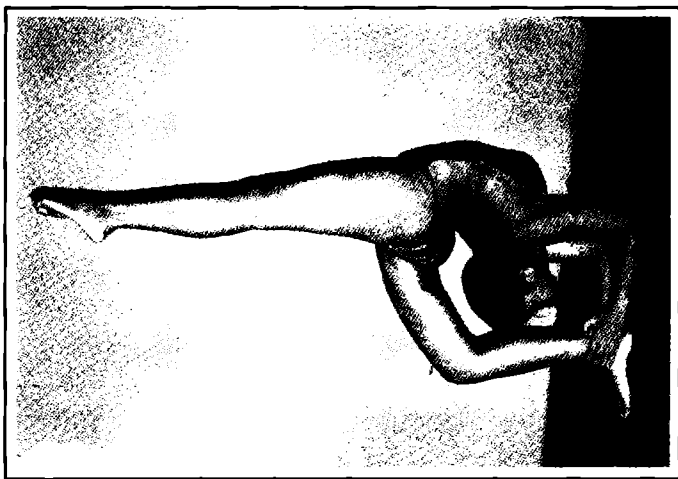
পূর্ণচক্র দণ্ডাসন
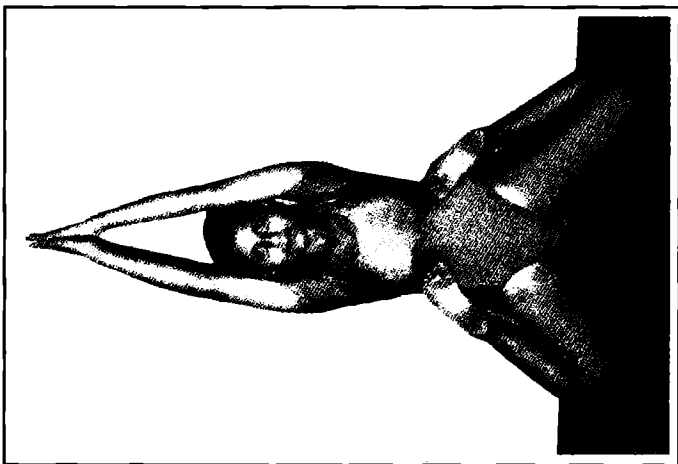
দ্বিপদ সম্প্রসারণাসন
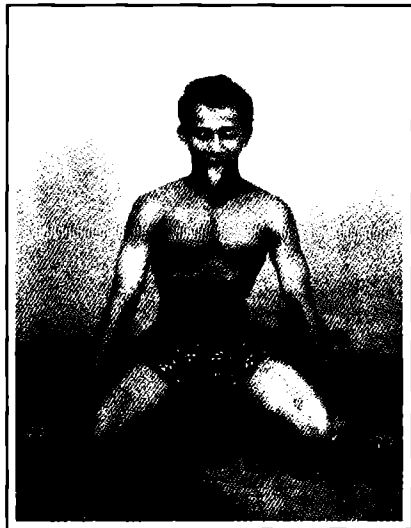
সিংহাসন

গরুড়াসন
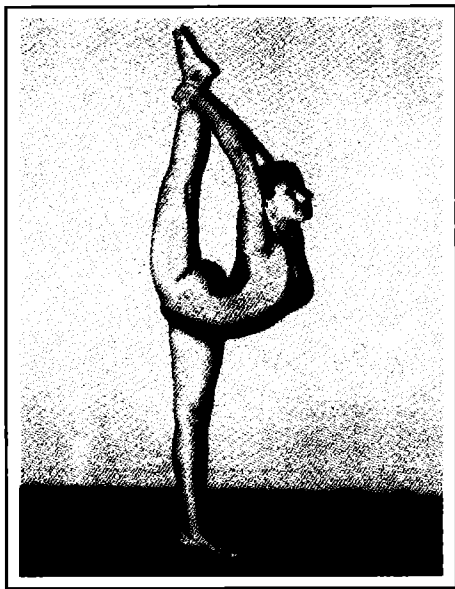
দণ্ডায়মান পূর্ণ ধনুরাসন

মেরুদণ্ডাসন

বামা-নৌলি

নৌলি

পূর্ণ বদ্ধ অষ্ট বক্রাসন
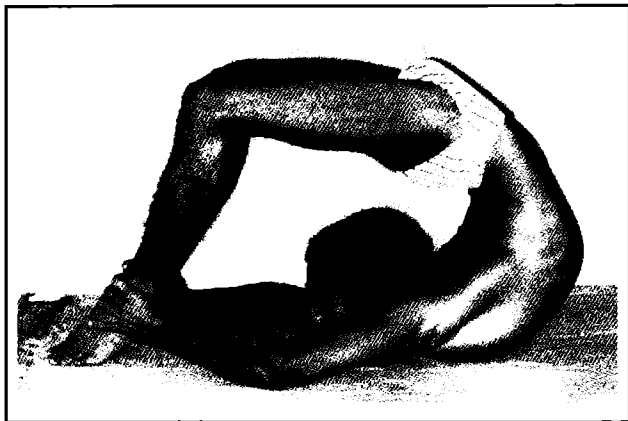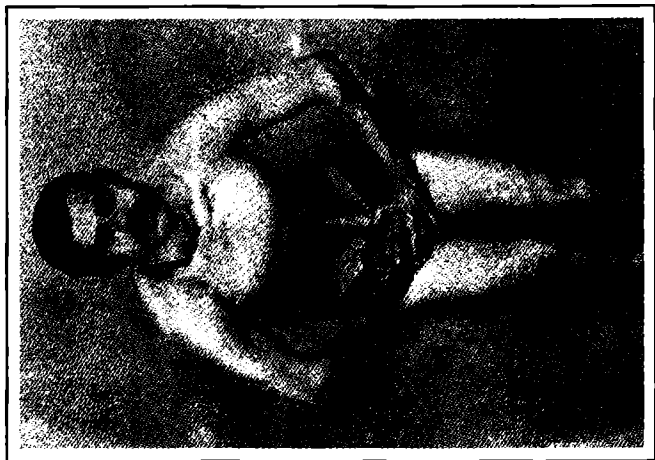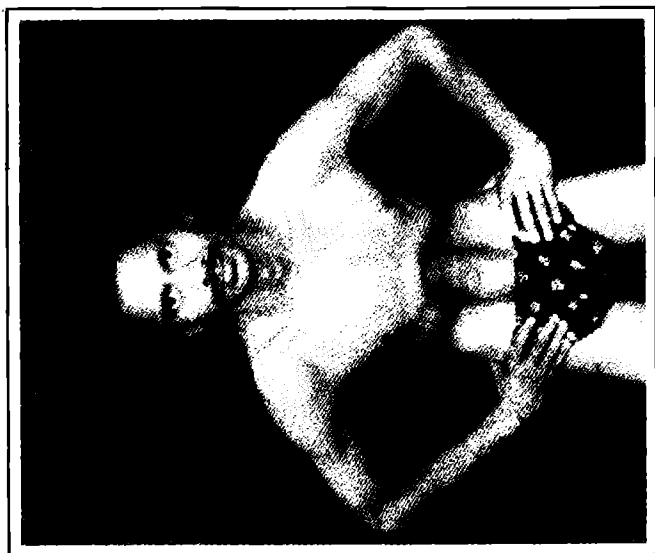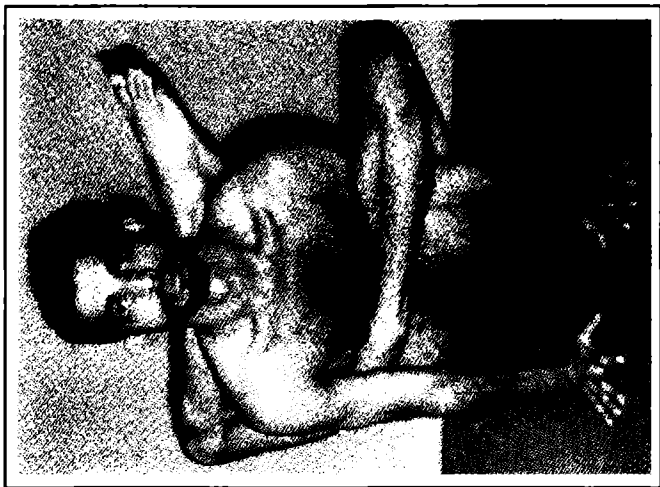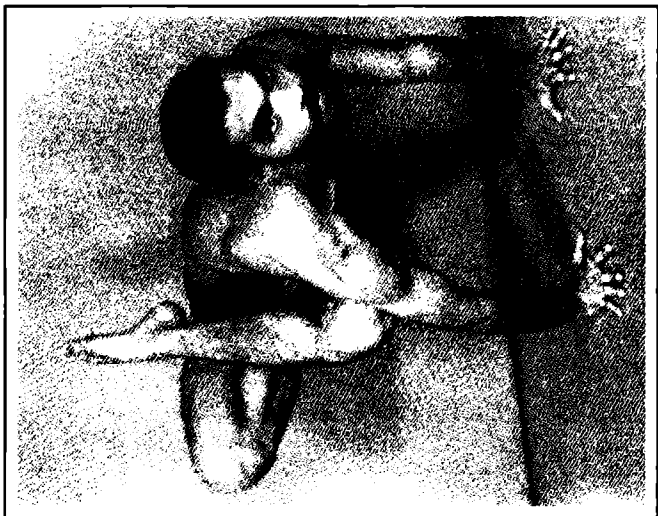
ওঁকারাসন
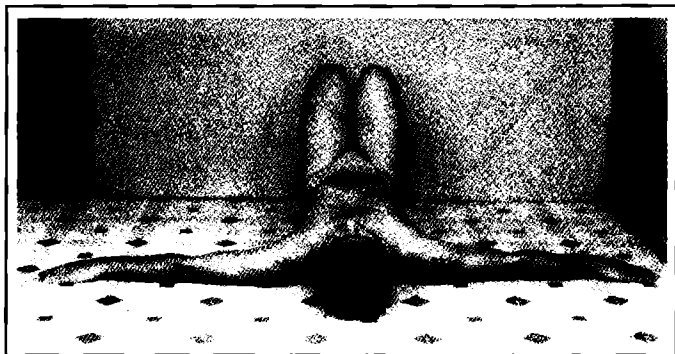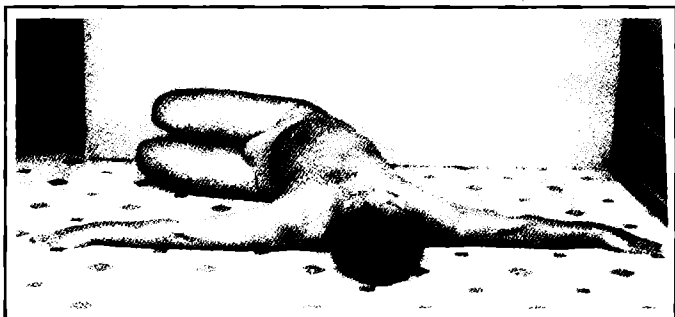
কুম্ভীরাসন

কুম্ভীরাসন নং-১
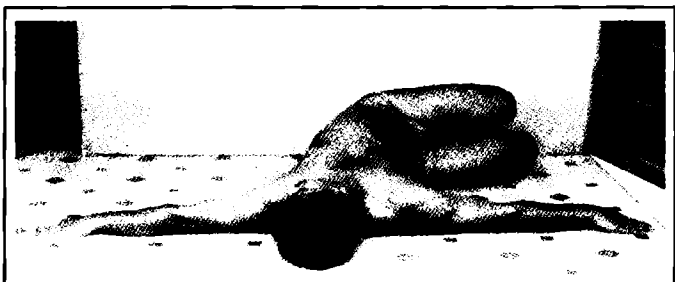
কুম্ভীরাসন নং-২
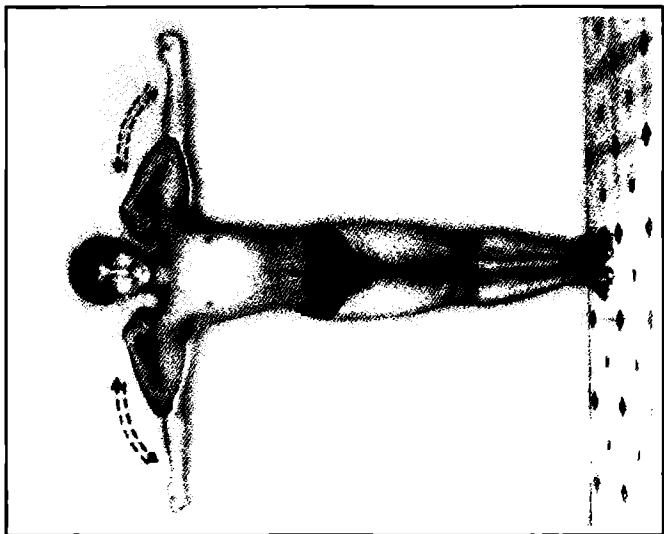
হস্তমুদ্রা নং-২
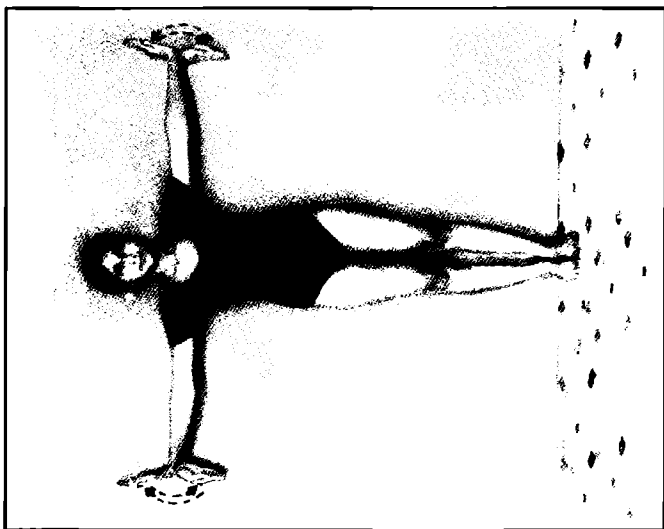
হস্তমুদ্রা নং-১
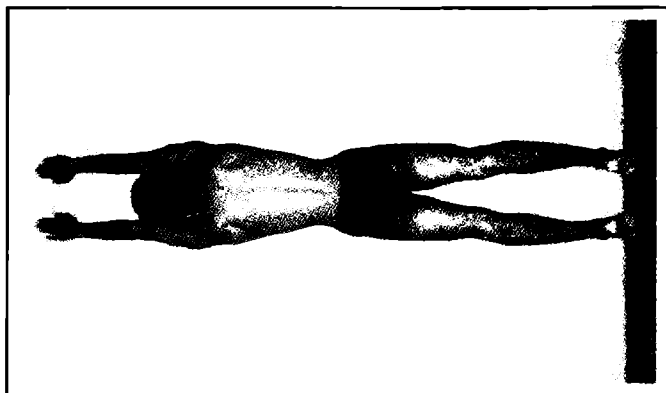
পাদমুদ্রা
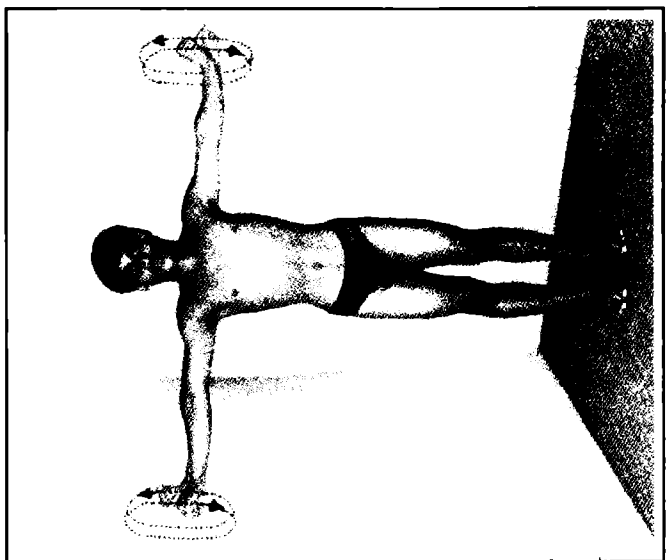
হস্তমুদ্রা নং-১
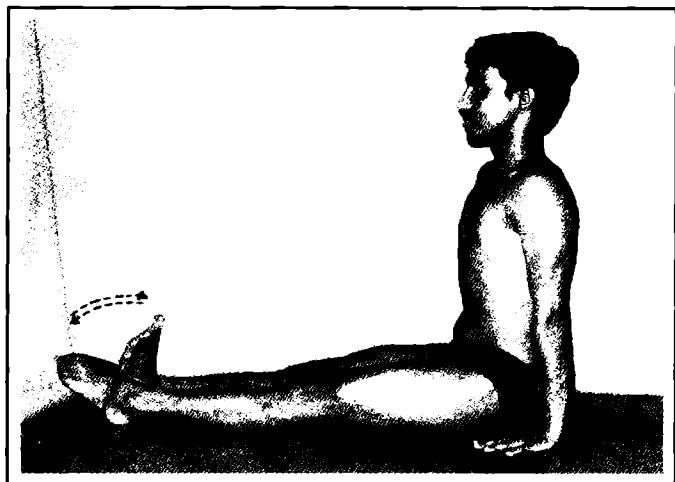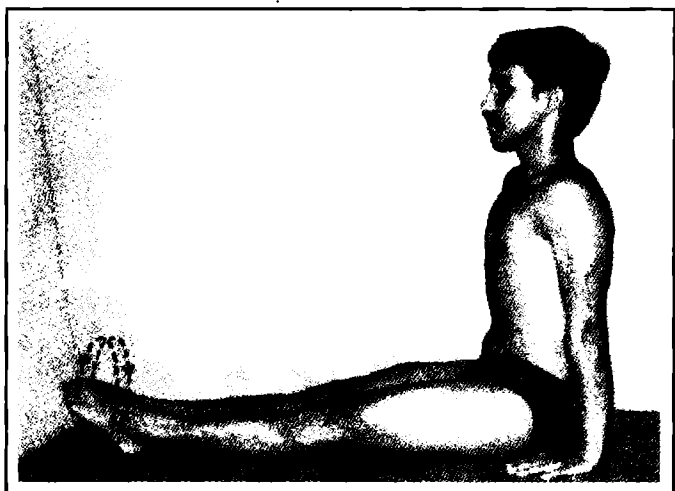
পদমুদ্রা নং-১

পদমুদ্রা নং-২

প্রাণায়াম

প্রাণের আয়াম বা বিস্তারের নামই প্রাণায়াম; যে ক্রিয়ায় দেহের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে ক্রিয়া অভ্যাসের দ্বারা জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জয় করা যায়—উহার নামই প্রাণায়াম।

যোগশাস্ত্রে বহুবিধ উচ্চাঙ্গের প্রাণায়াম আছে। এই বিভিন্ন প্রাণায়ামগুলিকে আমরা লঘু প্রাণায়াম, বৈদিক প্রাণায়াম, রাজযোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছি। এইসব উচ্চাঙ্গ প্রাণায়ামের বিবরণ আমরা আমাদের "**বিবিধ প্রাণায়াম ও নেতি-ধৌতি**" নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছি; এই গ্রন্থে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রোগীদের হিতকারী কয়েকটি সহজ প্রাণায়াম শুধু আমরা এখানে উল্লেখ করিব।

প্রাণায়াম অভ্যাসকারীর বায়ু সম্বন্ধে মোটামুটি একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যোগশাস্ত্রোক্ত প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর বিবরণ আমরা সংক্ষেপে প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। আধুনিক যুগের দেহবিজ্ঞানীরা বায়ু সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উল্লেখ করিব।

বায়ুর উপাদান প্রধানতঃ চারিটি—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বন। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এক কণিকা জলের উপাদান (H_2O) অর্থাৎ হাইড্রোজেন বায়ুর দুইটি পরমাণু এবং অক্সিজেন বায়ুর একটি পরমাণু মিলিত হইলে উহা জলকণায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেহের মেদ-মাংস প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে উহা প্রধানতঃ এই ৪টি বায়ু উপাদান দ্বারা গঠিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এগুলি ছাড়া ফস্‌ফরাস, সালফার, আইওডিন প্রভৃতিও দেহের উপাদানে বর্তমান; কিন্তু উহাও মূলতঃ বায়ুরই পরিণতি।

শ্বাসের সহিত আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি উহার মাঝে দেহ গঠনের

সমুদয় উপাদানই আছে। যদি আমরা এই বায়ুকে দেহের কাজে, দেহের উপাদানে পরিণত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের কোনো খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হইত না। আমরা উহা পারি না বলিয়াই শরীরের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের জন্য আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। চাল, গম, আলু, চিনি প্রভৃতি খাদ্যকে বলে **কার্বোহাইড্রেট খাদ্য।** এই কার্বোহাইড্রেট খাদ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরিমিত মাত্রায় থাকে। চর্বি জাতীয় খাদ্যে কার্বনের মাত্রা সর্বাধিক। এই সব খাদ্য হইতেই আমরা দেহের গ্রহণোপযোগী কার্বন বায়ু পাই। এই কার্বন দেহের প্রাণকোষগুলি নির্মাণ করে, এই কার্বনই দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। এই কার্বন-বায়ু প্রয়োজনাতিরিক্ত শরীরে বিদ্যমান থাকিলে শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে, শরীর রোগাক্রান্ত হয়।

ছানা, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, বাদাম প্রভৃতিই **নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য।** নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্যের নামই **প্রোটিন খাদ্য।** প্রোটিন-খাদ্যেই শুধু নাইট্রোজেন বিদ্যমান। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, সাল্ফার, ফসফরাস্ প্রভৃতিও এই খাদ্যে বিদ্যমান। অন্য কোনো খাদ্যে নাইট্রোজেন থাকে না। নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য বা প্রোটিন-খাদ্যই দেহের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণকোষগুলিকে পুনর্গঠিত করে। নাইট্রোজেনের সাহায্য ছাড়া অক্সিজেন দেহের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না।

শাক-সবজি, রসাল ফল এবং জল ও অন্যান্য পানীয়ই **হাইড্রোজেন-প্রধান খাদ্য।** হাইড্রোজেন-প্রধান খাদ্যের অভাব হইলে দেহযন্ত্র অচল হয়। দেহ-সঞ্চিত বিষ দেহ হইতে বাহির হইতে পারে না।

দেহে অক্সিজেনের প্রয়োজন সর্বাধিক। আধুনিক যুগের দেহবিজ্ঞানীরা বলেন মানবদেহের ৬২ ভাগই অক্সিজেন দ্বারা নির্মিত। অতএব মানবদেহের দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য শতকরা ৬২ ভাগ অক্সিজেন সংগ্রহ করা প্রয়োজন; আমরা শ্বাসের সহিত যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারি, উহা দেহের আংশিক প্রয়োজন মাত্র মিটাইতে পারে।

এইজন্য প্রত্যহ আমাদের খাদ্যগ্রহণ করিতে হয়—অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য। দুধ, শাক-সব্জী ও ফলাদি **অক্সিজেন প্রধান খাদ্য**। অক্সিজেন ব্যতীত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে না, আমাদের জঠরাগ্নিকেও প্রজ্বলিত রাখে এই অক্সিজেন। শ্বাসের সহিত আমরা যে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করি, ঐ বায়ুতে শতকরা ২০ ভাগ থাকে অক্সিজেন। এই ২০ ভাগ অক্সিজেন বায়ুর ৪ ভাগ মাত্র আমাদের দেহ গ্রহণ করিতে পারে ; বাকী ১৬ ভাগ দেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া উহা শ্বাসের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। শ্বাস-বায়ু হইতে এবং খাদ্য হইতে দেহ যতটুকু অক্সিজেন সংগ্রহ করে, উহাই সমস্ত দেহের পুষ্টি বিধান করে, জঠরাগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখে। ফুস্‌ফুসের কোষে সঞ্চিত বায়ু হইতে লাল-রক্তাণুগুলি অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া উহা রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয়। এই অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্তই মাংস, মেদ, মজ্জা ও অস্থি প্রভৃতি গঠন করে। অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্তই স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলিকে খাদ্য সরবরাহ করে, দেহের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি বিধান করে।

যোগশাস্ত্রে আছে—**প্রাণই প্রাণীর খাদ্য। সুতরাং প্রাণায়াম দ্বারা এই প্রাণ সংগ্রহ করিবে**। প্রাণায়াম অভ্যাসে ফুস্‌ফুস্‌, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি বায়ুগ্রন্থিগুলি সবলতর হয়, ফুস্‌ফুসের বায়ুধারণ ক্ষমতা বর্ধিত হয়। সুতরাং লাল-রক্তাণুগুলি অধিক পরিমাণে অক্সিজেন দেহের কাজে লাগাইতে পারে, রক্তকে অধিকতর সতেজ করিয়া তুলিতে পারে।

রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ক্ষীণ থাকে। জঠরাগ্নিতে প্রতিনিয়তই অক্সিজেন দগ্ধ হইয়া কার্বন উৎপন্ন হয়। এই কার্বনের অধিকাংশই দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। কার্বন দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে না পারিলে উহা রক্তকে দূষিত করে, রক্ত মধ্যস্থ রক্তের পুষ্টির উপাদান অক্সিজেন ধ্বংস করে এবং বিবিধ রোগ উৎপন্ন করে। নিঃশ্বাসের সাহায্যেই দেহপ্রকৃতি এই অপ্রয়োজনীয় কার্বন দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। দুর্বল রুগ্ন ব্যক্তির নিঃশ্বাস ক্ষীণ বলিয়া উহা দেহের সমুদয় অপ্রয়োজনীয় কার্বন দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না—এইজন্য

রোগের প্রবলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অপ্রয়োজনীয় কার্বনকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার একমাত্র উপায় **দীর্ঘ সময় ব্যাপী শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস বর্জন** (Deep breathing)। এইরূপ দীর্ঘ সময় ব্যাপী রেচক ও পূরকে দেহসঞ্চিত অপ্রয়োজনীয় কার্বন গভীর নিঃশ্বাসের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের বায়ুতত্ত্বের দ্বারাও প্রমাণিত হয়—**প্রাণায়াম ব্যতীত কোন রোগ নির্মূলভাবে আরোগ্য হইতে পারে না**। এই প্রাণায়ামের ফলেই দেহ কার্বন-বিষ হইতে মুক্ত হয়। প্রচুর অক্সিজেনের সরবরাহ পাইয়া রক্ত সতেজ হয়। এই সতেজ রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহের সমুদয় স্নায়ু-গ্রন্থি সবলতর হইয়া উঠে।

যোগশাস্ত্রে আসন-মুদ্রার যত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই থাকুক না কেন, আসন-মুদ্রার চেয়ে প্রাণায়ামই অধিকতর উপকারী। প্রাণায়ামহীন আসন-মুদ্রা শিবহীন দক্ষযজ্ঞের মতোই নিষ্ফল।

এইজন্যই আমরা আমাদের লিখিত যোগগ্রন্থগুলিতে প্রাণায়াম-যুক্ত **করিয়া অনেকগুলি আসন-মুদ্রা অভ্যাসের ব্যবস্থা দিয়াছি।**

সহজ প্রাণায়াম

যোগশাস্ত্রে রোগীদের রোগারোগ্যের উপযোগী কোন প্রাণায়াম নাই। আমাদের প্রবর্তিত সহজ প্রাণায়াম এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম প্রভৃতিকে হঠযোগোক্ত সূর্যভেদাদি কুম্ভক প্রাণায়ামের এবং কপালভাতি ক্রিয়ার শাখা-প্রশাখা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা যাইতে পারে।

রোগীদের রোগারোগ্যে এই সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ প্রাণায়াম বিশেষ উপযোগী। এই প্রাণায়ামগুলি ঠিকমত অনুষ্ঠিত না হইলেও কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। সুতরাং নির্ভয়ে এই প্রাণায়ামগুলির অনুষ্ঠান করা যায়।

যোগীরা বলেন—প্রাণায়াম অভ্যাসে বিংশতিপ্রকার কফরোগ হইতে

অব্যাহতি পাওয়া যায়। যক্ষ্মা, প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানি, বিবিধ রকমের কাশি ও সর্দি প্রভৃতি এই বিংশতি কফরোগের অন্তর্গত। আমরা আমাদের এই পুস্তকে উল্লিখিত সহজ প্রাণায়াম এবং ভ্রমণ-প্রাণায়ামের সাহায্যে উক্ত বিংশতি প্রকার কফ রোগ নির্মূলভাবে আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছি। **শত শত রোগীর উপর এই সহজ প্রাণায়ামগুলি প্রয়োগ করিয়া প্রাণায়ামের গুণ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি।**

(১)

প্রণালী—(ক) লম্বা হইয়া শুইয়া পড়, পদদ্বয় সংলগ্ন রাখ। হস্তদ্বয় সটানভাবে শরীরের উভয় পার্শ্বে স্থাপন কর এবং শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উভয় হস্তকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে লইয়া যাও এবং মস্তকের সমান্তরালে স্থাপন কর। অতঃপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয়কে পূর্ববৎ শরীরের পার্শ্বে স্থাপন কর।

সাধ্যমত অনুরূপভাবে দুই মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

(খ) অতঃপর হাতকে বিশ্রাম দিয়া পায়ের ক্রিয়া আরম্ভ করিবে। শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডান পা সটান রাখিয়া যথাসাধ্য ঊর্ধ্বে তুলিবে (হাঁটুতে যেন কোনরূপ ভাঁজ না পড়ে); অতঃপর শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পা নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে। পর পর উভয়পদে দুই মিনিট অনুরূপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে।

উপকারিতা—এই প্রাণায়ামটি হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্‌কে যথোচিত সবল করে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হাত ও পায়ের বাত আক্রমণ প্রতিরোধ করে, বালক-বালিকাদের যখন তখন সর্দি-কাশির আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

(২)

প্রণালী—যে কোনো ধ্যানাসনে বস অথবা সোজা হইয়া দাঁড়াও।

আস্তে আস্তে উভয় নাসিকা দ্বারা দমভোর বায়ু আকর্ষণ কর, অতঃপর অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় মুখ দ্বারা বায়ু ত্যাগ কর। মুখ দ্বারা রেচক অর্থাৎ বায়ু ত্যাগ শেষ হইলে পুনরায় উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ কর এবং পূর্ব্ববৎ মুখ দ্বারা বায়ু রেচন কর।

অনুরূপভাবে ৩ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—এই প্রাণায়ামটি ফুস্‌ফুসের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া ফুস্‌ফুসে সঞ্চিত ধূলা-ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফুস্‌ফুস্‌কে এমন সুস্থ-সবল করিয়া রাখে, যাহাতে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগবীজাণু ফুসফুসকে আক্রমণ করিতে পারে না। পাকস্থলী ও যকৃতের দোষ-ত্রুটিও বহুলাংশে এই প্রাণায়ামটি অভ্যাসে দূরীভূত হয়। অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের খোস-পাঁচড়া, ফোঁড়া প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করে এবং নিরাময় করে।

(৩)

প্রণালী—যে কোনো ধ্যানাসনে বা চেয়ারে মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া সোজা হইয়া বস। উভয় নাসিকা দ্বারা পূরক অর্থাৎ সজোরে ও সশব্দে দমভোর বায়ু আকর্ষণ কর; বায়ু আকর্ষণ সমাপ্ত হইলে ধীরে অথচ সজোরে এবং সশব্দে উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন কর। রেচকের সময় চিবুক নত হইয়া কণ্ঠকূপে সংলগ্ন হইবে। পূরকের সময় চিবুক ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইভাবে ৩/৪ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর, পূরকে যতটা সময় লইবে রেচকে তাহা হইতে খানিকটা বেশি সময় ব্যয় করিবে।

উপকারিতা—ইহা সর্দি-কাশি ভালো করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করে। ভারতবর্ষে বহু ছেলে-মেয়ে ও যুবক-যুবতী টাইফয়েড ও নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালমৃত্যু বরণ করে। এই প্রাণায়ামটি অভ্যস্ত থাকিলে উল্লিখিত রোগে কাহারও অকালমৃত্যুর আশঙ্কা ঘটিবে না।

(৪)

প্রণালী—যে কোনো ধ্যানাসনে বসিয়া শ্বাস ত্যাগ করিয়া উদর বায়ুশূন্য কর। শ্বাস ত্যাগ সমাপ্ত হইলে শ্বাস গ্রহণ বন্ধ করিয়া উদর ও নাভিপ্রদেশকে সাধ্যমত পশ্চাদ্দেশে আকুঞ্চন করিতে থাক। আকুঞ্চনের সময় লক্ষ্য রাখিবে—উদরের পেশীতে যেন অস্বাভাবিক টান না পড়ে। অতঃপর শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চনও শিথিল করিয়া দিবে।

এইভাবে ৫/৬ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে।

উপকারিতা—এই প্রাণায়ামটি অজীর্ণরোগ দূর করিয়া হজমশক্তি বাড়াইয়া দেয়, উদরের স্নায়ু ও পেশীগুলিকে সবল করে, উদরের অপ্রয়োজনীয় চর্বি নষ্ট করিয়া দেয়, পিতৃ-মাতৃগ্রন্থিকে সবল করিয়া ঊর্ধ্বরেতা হইতে সাহায্য করে।

(৫)

প্রণালী—শবাসনে শয়ন করিয়া সমস্ত শরীর শ্লথ করিয়া দাও। হস্তদ্বয়কে অঙ্গুলিবদ্ধ অবস্থায় নাভিদেশে স্থাপন কর। অতঃপর উভয় নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে দমভোর বায়ু আকর্ষণ কর। বায়ু আকর্ষণের সময় ভাবনা করিবে বায়ুর মাঝে যে প্রাণশক্তি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে সেই প্রাণশক্তিই দেহাভ্যন্তরে গিয়া সূর্যগ্রন্থিতে (নাভিদেশে) সঞ্চিত হইতেছে। বায়ু আকর্ষণ সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে।

শ্বাস ত্যাগের সময় চিন্তা করিবে সূর্যগ্রন্থি-সঞ্চিত প্রাণশক্তি দেহের প্রতি যন্ত্র, দেহের প্রতি গ্রন্থি, প্রতি স্নায়ু, প্রতি শিরা-উপশিরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র দেহকে প্রাণবান্ করিয়া তুলিতেছে; দেহের দূষিত পদার্থ ও রোগবীজাণু প্রভৃতি যাহা প্রাণপুষ্টির বিরোধী তাহা নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে।

এই ভাবনা সহকারে ৫/৬ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে।

উপকারিতা—প্রাণায়ামের সাধারণ উপকারিতা সহ নীরোগ দেহ এবং

প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলিষ্ঠ মন গঠনে এই প্রাণায়ামটি বিশেষভাবেই সাহায্য করে।

(৬)

প্রণালী—ধ্যানাসনে বসিয়া উভয় নাসিকা দ্বারা দমভোর বায়ু আকর্ষণ কর। অতঃপর অধর এবং ওষ্ঠকে পক্ষীচঞ্চুর মতো সরু করিয়া সজোরে থামিয়া থামিয়া মুখ দ্বারা বায়ু রেচন কর। অর্থাৎ অল্প বায়ু রেচন করিয়া একটু থাম, আবার সজোরে খানিকটা বায়ু রেচন করিয়া পুনরায় একটু থাম। এইভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিতে থাক—যতক্ষণ আকর্ষিত সমুদয় বায়ুর রেচন সমাপ্ত না হয়। এইভাবে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করিয়া ৮/১০ বার প্রাণায়ামটি অভ্যাস করিবে।

উপকারিতা—প্রাণায়ামের অন্যান্য উপকারিতা সহ মুখের পক্ষাঘাত আদি যাবতীয় ব্যাধি নিবারণে এই প্রাণায়ামটি বিশেষভাবে সহায়তা করে। শ্বাসনালীকে সবল করে। মুখ ও কণ্ঠের রোগবীজাণু দূর করে।

(৭)

প্রণালী—যে-কোনো আসনে সোজা হইয়া বস। ডান হস্তাঙ্গুলির মধ্যমা ও তর্জনী ভাঁজ করিয়া হস্ত-তালুর সহিত সংযুক্ত কর। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া বাম নাসাপুটে ধীরে ধীরে দমভোর বায়ু আকর্ষণ কর। বায়ু আকর্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনামিকা এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট বন্ধ করিয়া ডান নাসাপুটে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন কর। রেচক সমাধা হইলে পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ কর। বায়ু আকর্ষণ শেষ হইলে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন কর।

বায়ু রেচনের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে—যতটা সময় ব্যাপিয়া পূরক অনুষ্ঠান করিবে রেচকে তাহা হইতে যেন কিঞ্চিৎ অধিক সময় ব্যয় হয়। বাম নাসিকায় পূরক এবং দক্ষিণ নাসিকায় রেচক, আবার দক্ষিণ

নাসিকায় পূরক এবং বাম নাসিকায় রেচক মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণায়াম হয়। একাসনে বসিয়া এইরূপ ১৫/২০ বার প্রাণায়ামটির অনুষ্ঠান করিবে। বেশি করিলেও লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই।

উপকারিতা—শ্লেষ্মাদোষ দূর করে, সর্দি-কাশি রোগ আরোগ্য করে। দেহকে প্রাণশক্তিসম্পন্ন করে। নাড়ীগুলিকে শোধন করে।

(৮)

প্রণালী—অধর এবং ওষ্ঠের মাঝখান দিয়া জিহ্বাগ্রকে কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া দাও। অতঃপর অধর এবং ওষ্ঠকে পক্ষীচঞ্চুর মতো করিয়া জিহ্বাগ্র দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ কর। বায়ু আকর্ষণ সমাপ্ত হইলে আকর্ষিত বায়ু গলনিম্নে ৫ সেকেণ্ড ধারণ কর। অতঃপর উভয় নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন কর ; একাসনে বসিয়া ন্যূনপক্ষে ৩/৪ মিনিট এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ১০ মিনিট প্রাণায়ামটি অভ্যাস করিবে।

(যোগশাস্ত্রে এই প্রাণায়ামটি '**শীতলী প্রাণায়াম**' নামে প্রসিদ্ধ।)

উপকারিতা—যাহারা পিত্তরোগী, যাহাদের হাতে-পায়ে এবং শরীরে জ্বালাপোড়া হয় তাহাদের পক্ষে এই প্রাণায়ামটি খুব উপকারী। এই প্রাণায়ামটি কিছুদিন অভ্যাস করিলেই শরীরের জ্বালাপোড়া দূর হইয়া যায়। এই প্রাণায়ামটি অভ্যাসে শরীরের রক্ত বিশুদ্ধ হয় ; খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না।

যোগীরা বলেন—এই প্রাণায়ামটি ভালো অভ্যাস থাকিলে রক্ত এত বিশুদ্ধ হয়, রক্তের প্রাণশক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, কোনো বিষাক্ত সর্পে দংশন করিলেও এই প্রাণায়াম অভ্যাসকারীর মৃত্যু হয় না।

নিষেধ—অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ—শীতের এই তিনমাস এই প্রাণায়ামটির অভ্যাস বন্ধ রাখিবে। যাহাদের শ্লেষ্মার ধাত তাহাদের পক্ষে এই প্রাণায়ামটির অভ্যাস নিষিদ্ধ।

(৯)

প্রণালী—সোজা হইয়া দাঁড়াও। বাম স্তনের পার্শ্বে বাম হস্ত, দক্ষিণ স্তনের পার্শ্বে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন কর। অতঃপর উভয় নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে গভীরভাবে দমভোর বায়ু আকর্ষণ কর। যতক্ষণ বায়ু আকর্ষণ করিবে ততক্ষণ কনুই দুইটি যথাসাধ্য পৃষ্ঠাভিমুখে লইয়া যাও। বায়ু আকর্ষণ সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন কর। রেচনের সময় বক্ষ ও হস্তের আকর্ষণ একটু শ্লথ করিয়া দাও। অনুরূপভাবে ৮/১০ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামের অন্যান্য গুণসহ বক্ষপ্রদেশের বিস্তৃতি এবং বক্ষপঞ্জরের স্থিতিস্থাপকতা বিধানে, ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদ্‌যন্ত্রকে সবল করিয়া উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে এই প্রাণায়ামটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(১০)

প্রণালী—সোজা হইয়া দাঁড়াও। হস্ত দুইটি স্কন্ধ বরাবর ঊর্ধ্বে তোল। অতঃপর শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ নত হইয়া হস্ত দ্বারা হাঁটু স্পর্শ কর, শ্বাস ত্যাগ সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে দমভোর বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হও। হাত নামাইয়া অর্ধ মিনিট বিশ্রাম কর; অতঃপর পূর্বানুরূপ ৮/১০ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—যক্ষ্মা, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগের সূচনায় শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত হ্রস্ব হয়। এই প্রাণায়ামটি ফুস্‌ফুসের বায়ু ধারণাশক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করে এবং ঐ রোগগুলির আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

ভ্রমণ প্রাণায়াম

প্রণালী—সকালে এবং সন্ধ্যায় ধূম ও ধূলি-বর্জিত রাস্তায় বা মাঠে

বেড়াইতে বাহির হইবে। যে মেয়েদের ভ্রমণে বাহির হওয়ার সুযোগ নাই, তাহারা নিজ নিজ গৃহের আঙ্গিনায় বা খোলা বারান্দায় বা ছাদে পদচারণা করিতে করিতে এই প্রাণায়ামটি অভ্যাস করিবে। মেরুদণ্ডকে সরল সটান রাখিয়া সোজা হইয়া হাঁটিবে। প্রথমতঃ ৪ বার পদক্ষেপের তালে তালে ১, ২, ৩, ৪ মনে মনে উচ্চারণ করিয়া উচ্চারণের তালে তালে উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে (কাহারও ইচ্ছা হইলে ১, ২, ৩, ৪ উচ্চারণের পরিবর্তে মনে মনে প্রণব উচ্চারণ করিতে পারিবে)। বায়ু আকর্ষণ সমাপ্ত হওয়া মাত্রই আবার পদক্ষেপের তালে তালে শ্বাস ত্যাগ করিবে। প্রথম প্রথম শ্বাস গ্রহণে যতটা সময় লাগে শ্বাস পরিত্যাগেও ততটা সময় অতিবাহিত করিবে অর্থাৎ চার পদক্ষেপে শ্বাস গ্রহণ করিলে চার পদক্ষেপেই শ্বাস ত্যাগ সমাপ্ত করিবে। কয়েক সপ্তাহ এইরূপ অভ্যাসের পর চার পদক্ষেপে শ্বাস গ্রহণ ও ছয় পদক্ষেপে শ্বাস ত্যাগ করিবে। এইভাবে ৪/৬ পদক্ষেপ ভালো অভ্যস্ত হইলে ৬/৮ পদক্ষেপ অভ্যাস করিবে অর্থাৎ ছয় পদক্ষেপে শ্বাস গ্রহণ ও আট পদক্ষেপে শ্বাস ত্যাগ করিবে। সর্বশেষে ৮/১২ পদক্ষেপ আয়ত্ত করিবে।

বিশেষভাবে মনে রাখিবে শ্বাস গ্রহণ-বর্জনের সময় যেন হাঁপাইতে না হয়। মাঝে মাঝে ২/১টি স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম লইবে। এইভাবে ভ্রমণের আদিতে ২ মিনিট, মধ্যে ২ মিনিট ও অন্তে ২ মিনিট—এই মোট (২ × ৩)—৬ মিনিট প্রাণায়ামটি অভ্যাস করিবে। ৬ মিনিট প্রাণায়াম ভালো অভ্যস্ত হইলে (৩ × ৩)—৯ মিনিট প্রাণায়ামটি অভ্যাস করিবে। ৯ মিনিটের পর ১২ মিনিট, তারপর ১৫ মিনিট, ১৮ মিনিট—এই নিয়মে প্রাণায়ামের মাত্রা আধঘণ্টা হইতে একঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। প্রাণায়াম অভ্যাসে কোনোরূপ তাড়াহুড়া করিতে নাই। প্রাণায়াম করিতে গিয়া বায়ুধারণশক্তি যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে সেই অনুপাতে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ সহ পদক্ষেপও বাড়াইয়া লইবে। ৮/১২ ভালো অভ্যস্ত হইলে পদক্ষেপের মাত্রা ১২/১৮ পর্যন্ত বাড়াইয়া লইতে পারিবে। ১২/১৮ এই প্রাণায়ামটির সর্বশেষ মাত্রা।

এই ১২/১৮ মাত্রা আয়ত্ত হইলে আর পদক্ষেপের হিসাব রাখিবার প্রয়োজন নাই। শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে যতবার পদক্ষেপ সম্ভবপর ততবার পদক্ষেপ করিবে। অনুরূপভাবে পদক্ষেপের তালে তালে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে।

২/১ বৎসর নিয়মিত অভ্যাসের পর যতক্ষণ ভ্রমণ করিবে ততক্ষণ ধরিয়া প্রাণায়ামটির অভ্যাস করা যাইতে পারে। অর্থাৎ একঘণ্টা ভ্রমণ করিলে অবিশ্রান্তভাবে একঘণ্টাই এই প্রাণায়ামটি অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে।

উপকারিতা—সাধারণ প্রাণায়ামের যত রকম উপকারিতা আছে তাহার সমস্তই এই প্রাণায়ামটি অভ্যাসে লাভ হয়। অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি দেহরক্ষাকারী যন্ত্রগুলি সবলতর হয়, রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীরের দুর্বলতা দূর হয়। **এই প্রাণায়ামটি অবিশ্রান্তভাবে আধঘণ্টা অনুষ্ঠানের ক্ষমতা আয়ত্ত হইলে টাইফয়েড, যক্ষ্মা, প্লুরিসি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানী প্রভৃতি কোনো রোগ শরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।** রোগারোগ্যের অব্যবহিত পরে হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে, শারীরিক দুর্বলতা দূর করিতেও এই প্রাণায়ামটি খুব উপযোগী। **বিশেষভাবে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পক্ষে এই প্রাণায়ামটি মহোপকারী।**

আসন-মুদ্রা অভ্যাসে যাহাদের অরুচি আছে তাহারা দুই বেলাই নির্মল বায়ুপূর্ণ স্থানে দীর্ঘ সময় ধরিয়া এই প্রাণায়ামটি অভ্যাস করিবে। আহারে-বিহারে সংযত থাকিলে শুধু ভ্রমণ প্রাণায়ামের সাহায্যেই দেহকে রোগমুক্ত রাখা যায়। অবিশ্রান্তভাবে একঘণ্টা এই প্রাণায়াম অনুষ্ঠানের শক্তি অর্জিত হইলে দেহ কখনও জ্বরাক্রান্ত হয় না, মাথা ধরে না, দেহকে সর্বব্যাধি হইতে বিমুক্ত রাখা যায়।

সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম অভ্যাসেও তাড়াহুড়া করিতে নাই; ধীরে ধীরে প্রাণায়াম আয়ত্ত করিবে, ধীরে ধীরে পূরক ও রেচকের সময় ও মাত্রা বাড়াইয়া লইবে। এই সব প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে গিয়া যদি বুকের বামপার্শ্বে একটু 'চিনচিনে' ব্যথার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বুঝিবে

যে মাত্রায় প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত ছিল তাহার চেয়ে মাত্রা কিঞ্চিৎ বেশি হইয়াছে। এইরূপ ঘটিলে প্রাণায়ামের মাত্রা হ্রাস করিবে এবং ব্যথা আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রাণায়াম অভ্যাস বন্ধ রাখিবে। সাধারণতঃ একদিন প্রাণায়াম বন্ধ রাখিলেই বেদনা ভালো হয়।

আজকাল যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের জন্য স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের বি.সি.জি টিকা গ্রহণ করিতে হয়। এই টিকার অপকারিতার বিষয় আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। বি.সি.জি. টিকা দ্বারা যক্ষ্মারোগ নির্মূল করা সম্ভবপর নয়, দেশবাসীর স্বাস্থ্যোদ্ধার সম্ভবপর নয়। ভ্রমণ-প্রাণায়াম আয়ত্ত থাকিলে তাহাকে কখনও যক্ষ্মারোগে আক্রমণ করিতে পারিবে না। সুতরাং দেশ হইতে যক্ষ্মারোগ নির্মূল করিতে হইলে এই ভ্রমণ-প্রাণায়ামটির সহায়তা লইতে হইবে। কাজের সময় নষ্ট না করিয়াও এই প্রাণায়ামটির অনুষ্ঠান সকলের পক্ষেই সাধ্য।

দেশের ছেলে-মেয়েদের অটুট স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিতে হইলে ঔষধ, ইন্‌জেক্‌সন ও টিকাদি বর্জন করিয়া যোগের এইসব আসন-মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসে ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দিতে হইবে।

অল্পবয়স্কদের পাশ্চাত্য প্রাণায়াম

ভারতীয় যোগীদের আবিষ্কৃত প্রাণায়ামের অশেষ গুণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবেই সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতীয় প্রাণায়ামকে তাঁহারা নিজেদের উপযোগী করিয়া পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রাণায়ামগুলির নাম দিয়াছেন—Breathing Exercise। আমরা তাঁহাদের প্রবর্তিত এই Breathing Exercise-এর কয়েকটি এস্থলে "পাশ্চাত্য প্রাণায়াম" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।

এই পাশ্চাত্য প্রাণায়াম অল্পবয়স্কদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এইগুলি প্রত্যহ অভ্যাস করিলে দীর্ঘস্থায়ী সর্দি-কাশি রোগ, টাইফয়েড

ও নিউমোনিয়া রোগ দ্বারা শিশুরা কখনও আক্রান্ত হইবে না। ৪ বৎসর বয়স হইতেই শিশুদের ইহা অভ্যাস করানো যাইতে পারে। ৪ বৎসর বয়স হইতে ১১ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এই প্রাণায়ামগুলি বিশেষ উপযোগী এবং উপকারী।

(১)

প্রণালী—সৈন্যদের মতো প্রস্তুতি অর্থাৎ 'এটেনসন' অবস্থায় দাঁড়াও। শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয়কে ঊর্ধ্বে তোল। হাত এমনভাবে ঊর্ধ্বে তুলিবে যাহাতে কনুইয়ের নিম্নাংশ কর্ণের সহিত আসিয়া ঈষৎ সংলগ্ন হইবে। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয়কে নামাইয়া পূর্বাবস্থায় স্থাপিত কর।

মাত্রা—২/৩ মিনিট অনুরূপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—গভীর শ্বাস ত্যাগের সহিত শরীরের দূষিত অঙ্গারাম্ল (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) বাহির হইয়া যায়। ফুস্‌ফুস্‌ সবলতর হয়। বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণে রক্তে অক্সিজেনের ভাগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেহে রোগাক্রমণের আশঙ্কা হ্রাস পায়। সর্দি-কাশি রোগ নিবারিত হয়।

(২)

প্রণালী—সোজা হইয়া দাঁড়াও। হস্তদ্বয়কে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া স্কন্ধের সমান্তরালে সম্মুখদিকে প্রসারিত কর। অতঃপর গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে স্কন্ধ বরাবর পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাও। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হস্তদ্বয়কে পুনরায় পূর্বস্থানে অর্থাৎ স্কন্ধ বরাবর স্থাপন কর।

মাত্রা—২/৩ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—বক্ষদেশ সুগঠিত হয়। ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদ্‌যন্ত্র সবলতর হয়। এই প্রাণায়াম অভ্যাসকারীকে টাইফয়েড ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

(৩)

প্রণালী—সৈন্যদের মতো প্রস্তুতি অবস্থায় দাঁড়াও। গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে দক্ষিণপদ হাঁটুর কাছে বাঁকাইয়া পশ্চাদ্দিকে লইয়া যাও। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দক্ষিণ পদ যথাস্থানে স্থাপন কর। অতঃপর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে বামপদকেও অনুরূপভাবেই ঊর্ধ্বে তোল এবং শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বামপদকে যথাস্থানে স্থাপন কর।

মাত্রা—খুব দ্রুততার সহিত ২/৩ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—এই প্রাণায়ামটি যাবতীয় শ্লেষ্মাঘটিত পীড়ার আক্রমণ প্রতিহত করে। হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের দোষ-ত্রুটি দূর করে। পদদ্বয়ের স্নায়ু ও পেশী সবল করে।

(৪)

প্রণালী—মাটিতে বা চেয়ারে সোজা হইয়া বস, মেরুদণ্ড সরল রাখ। বাম হস্ত বাম জানুর উপর এবং দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপর স্থাপন কর। অতঃপর উভয় নাসিকার দ্বারা গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ কর। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর।

মাত্রা—৩/৪ মিনিট এইভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—শ্লেষ্মা-দোষ নষ্ট হওয়া, ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদ্‌যন্ত্র সবলতর হওয়া প্রভৃতি প্রাণায়ামের যাবতীয় উপকারিতাই এই প্রাণায়ামটির অনুষ্ঠানে লাভ হয়।

(৫)

প্রণালী—সোজা হইয়া দাঁড়াও। হস্তদ্বয়কে অঙ্গুলিবদ্ধ করিয়া নাভির নীচে স্থাপন কর। অতঃপর গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ কর। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর।

মাত্রা—১০ বার এইভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা—ফুস্‌ফুস্‌ সবল হইয়া সর্দি-কাশি রোগ দূর হয়, দুর্বল ও রুগ্ন টনসিল রোগমুক্ত এবং সবল হয়। প্রাণায়ামের অন্যান্য উপকারিতাও এই প্রাণায়ামটির অনুষ্ঠানে লাভ হয়।

শ্বাস পরিবর্তনের কৌশল

(১) যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই পার্শ্বে 'কাত' হইয়া শয়ন কর অর্থাৎ যদি বাম নাসিকায় তোমার শ্বাস থাকে এবং দক্ষিণ নাসায় শ্বাস পরিবর্তন করিতে চাও, তাহা হইলে বাম 'কাতে' শয়ন করিয়া বাম বগলের নীচে একটি বালিশ রাখ। এইবার বাম নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ কর। বায়ু আকর্ষণ সমাপ্ত হইলে কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন কর। বায়ু রেচন সমাপ্ত হইলে পুনরায় বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় রেচন কর। এইরূপ উপর্যুপরি কয়েক মিনিট করিলেই দক্ষিণ নাসা পরিষ্কার হইয়া শ্বাসপ্রবাহ শুরু হইবে। যখন দেখিবে আর বাম নাসা দ্বারা শ্বাস টানা যাইতেছে না, তখন বুঝিবে ইড়া-নাড়ীর শ্বাস পিঙ্গলা-নাড়ীতে পরিবর্তিত হইতেছে।

যদি আবার পিঙ্গলা নাড়ী হইতে ইড়া নাড়ীতে শ্বাস পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আবার বিপরীতভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ ডান কাত হইয়া ডান বগলের নীচে একটা বালিশ রাখিয়া শয়ন করিবে; অতঃপর ডান নাসিকা দ্বারা শ্বাস আকর্ষণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করিবে। কয়েক মিনিট ধরিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেই ডান নাসিকা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং বাম নাসিকায় স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইবে।

(২) বাম কাতে ৫/৭ মিনিট বা ১০/১২ মিনিট শুইয়া থাকিলেও দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে। আবার ডান কাতে অনুরূপভাবে শুইয়া থাকিলেও বাম নাসায় শ্বাস পরিবর্তিত হইবে।

এইভাবে শ্বাস পরিবর্তন কিছুদিন অভ্যাসের পর আর শ্বাস পরিবর্তনের জন্য কাত হইয়া শয়ন বা বালিশ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। শরীরকে ঈষৎ হেলাইয়া, বাঁকাইয়া অনায়াসে তখন শ্বাস পরিবর্তন করা যায়। কাহারও এমন ক্ষমতা আয়ত্ত হয় যে ইচ্ছামাত্রই তাঁহাদের শ্বাসের গতি এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। **ইচ্ছামত শ্বাস-পরিবর্তন করার ক্ষমতা যাহার আয়ত্ত তিনি ইচ্ছা করিলেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যেই দেহকে অনায়াসে সর্বব্যাধি হইতে মুক্ত রাখিতে পারেন।** আহার্য্য গ্রহণের পর এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহিত থাকিলে আহার্য্য সহজে জীর্ণ হয়।

এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের **'বিবিধ প্রাণায়াম ও নেতি-ধৌতি'**-নামক পুস্তকের 'স্বরোদয় শাস্ত্র' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম

কোন্ আসনে কোন্ অঙ্গের স্নায়ু-পেশী সবল হয়, কোন্ মুদ্রায় কোন্ গ্রন্থি সবল হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লিখিত হইল।

সর্ব দৈহিক স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে এইগুলির প্রত্যেকটির ভিতর নিজের রুচিমত ২/৩টি ক্রিয়া নির্বাচিত করিয়া অভ্যাস করিবে।

দেহের প্রধান গ্রন্থিগুলির এবং সমুদয় অঙ্গের স্নায়ু-পেশীর কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকিলে দেহ কখনও রোগাক্রান্ত হয় না।

নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ কোমর ও পায়ের স্নায়ু-পেশী সবলকারী ব্যায়াম— শলভাসন, পদহস্তাসন, গোমুখাসন, উৎকটাসন, ত্রিকোণাসন, জানুশিরাসন, পদাঙ্গুষ্ঠাসন।

উদরের স্নায়ু-পেশী সবলকারী ব্যায়াম—অর্ধকূর্মাসন, চক্রাসন, ত্রিকোণাসন, পদহস্তাসন, ধনুরাসন, পবনমুক্তাসন, আকর্ণ-ধনুরাসন, মকরাসন, শয়ন-পশ্চিমোত্তানাসন, হলাসন, নৌলি।

দেহের উর্ধ্বাংশের স্নায়ু-পেশী সবলকারী ব্যায়াম—ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, পদহস্তাসন, চক্রাসন, কুক্কুটাসন, উত্থিত পদ্মাসন।

মেরুদণ্ড নমনীয়কারী ব্যায়াম—পশ্চিমোত্তান, ত্রিকোণাসন, পদহস্তাসন, হলাসন, শশাঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, চক্রাসন।

বরুণগ্রন্থি সবলকারী ব্যায়াম—মকরাসন, সঙ্কটাসন, গোমুখাসন, মূলবন্ধ, মহামুদ্রা, অশ্বিনীমুদ্রা, মহাবন্ধ, শক্তিচালনী, মহাবেধ এবং প্রাণায়াম।

[মূত্রগ্রন্থি, পিতৃগ্রন্থি, কন্দর্পগ্রন্থি, মদনগ্রন্থি (Cowpers gland), মাতৃগ্রন্থি, রতিগ্রন্থি, মিথুনগ্রন্থি (Skene's gland) প্রভৃতি নর-নারীদেহের নিম্নাঙ্গের প্রধান পঞ্চগ্রন্থি ও উপগ্রন্থিগুলিকে এককথায় বলা হয় বরুণগ্রন্থি। এই বরুণগ্রন্থি সবল থাকিলে জীবনীশক্তি অটুট থাকে।]

অগ্নিগ্রন্থি সবলকারী ব্যায়াম—যোগমুদ্রা, উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রা, অগ্নিসার ধৌতি, সহজ অগ্নিসার, প্রাণায়াম এবং উদরের স্নায়ু-পেশী সবলকারী ব্যায়ামসমূহ। [প্লীহা, যকৃৎ, সূর্যগ্রন্থি, শুক্রগ্রন্থি প্রভৃতি উদরের প্রধান পাঁচটি গ্রন্থি এবং উহাদের উপগ্রন্থিগুলিকে এককথায় বলা হয় অগ্নিগ্রন্থি।]

বায়ুগ্রন্থি সবলকারী ব্যায়াম—প্রাণায়াম এবং দেহের উর্ধ্বাংশের স্নায়ু-পেশী সবলকারী ব্যায়ামসমূহ। [ফুস্‌ফুস্, হৃদ্‌যন্ত্র, মঙ্গলগ্রন্থি, শনিগ্রন্থি প্রভৃতি বক্ষদেশের প্রধান পাঁচটি গ্রন্থি এবং উপগ্রন্থিগুলিকে এককথায় বলা হয় বায়ুগ্রন্থি।]

ব্যোমগ্রন্থি বা নভঃগ্রন্থি সবলকারী ব্যায়াম—বিপরীতকরণী মুদ্রা, সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা, মৎস্যমুদ্রা, উষ্ট্রাসন এবং প্রাণায়াম। [ইন্দ্রগ্রন্থি, উপেন্দ্রগ্রন্থি, তালুগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি প্রভৃতি কণ্ঠপ্রদেশের পাঁচটি প্রধান গ্রন্থি এবং উপগ্রন্থিগুলিকে এককথায় বলা হয় ব্যোমগ্রন্থি বা নভঃগ্রন্থি।]

অহংগ্রন্থি ও মহৎগ্রন্থি সবলকারী ব্যায়াম—শশাঙ্গাসন, উর্ধ্ব পদ্মাসন, বৃশ্চিকাসন, মস্তকমুদ্রা (শীর্ষাসন) এবং প্রাণায়াম। [শিবসতীগ্রন্থি, বৃহস্পতিগ্রন্থি, সোমগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি প্রভৃতি ললাট ও মস্তিষ্কপ্রদেশের ১০টি প্রধান গ্রন্থি এবং উপগ্রন্থিগুলিকেই অহংগ্রন্থি ও মহৎগ্রন্থি বলে।]

[এই প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ের 'গ্রন্থিপরিচয়' বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রাণায়াম আসন-মুদ্রার চেয়ে অধিকতর উপকারী, অধিকতর ফলদায়ক। প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত না হইলে আসন-মুদ্রার আংশিক সুফল পাওয়া যায়, পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না। প্রাণায়াম অনুষ্ঠানে দেহের স্নায়ু, গ্রন্থি প্রভৃতি সমস্তই সবল হইয়া উঠে, সুতরাং রোগীদের পক্ষে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান অবশ্য প্রয়োজন।

রোগী ও দুর্বল ব্যক্তিরা এই গ্রন্থে উল্লিখিত ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়ামগুলির শুধু অভ্যাস করিবে।

লঘু প্রাণায়াম, বৈদিক প্রাণায়াম, রাজযোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের প্রাণায়াম রোগীদের পক্ষে, কর্মব্যস্ত গৃহস্থদের পক্ষে অনুষ্ঠানযোগ্য নয়। উহা শুধু সাধকদের জন্য।

[এই ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম প্রসঙ্গে যে সমস্ত আসন-মুদ্রার নাম উল্লিখিত হইয়াছে উহার মধ্যে যেগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নাই তাহা আমাদের সহজ যৌগিক ব্যায়াম গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।]

ধৌতি-ক্রিয়া

হঠযোগোক্ত ধৌতির সাহায্যে শরীরকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত রাখা যায়; সদ্য প্রাণঘাতী বিষ ভক্ষণ করিয়াও বাঁচিয়া থাকা যায়। বলা বাহুল্য, রোগীদের পক্ষে, সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে এইরূপ ধৌতি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আমরা ধৌতি-ক্রিয়াগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করিয়াছি যাহাতে উহা সর্বসাধারণের আয়ত্তের উপযোগী হয় এবং সর্বসাধারণ উহা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এইসব ধৌতি-ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগারোগ্যে বিশেষ সহায়ক। রোগের প্রতিষেধক হিসাবেও এই ধৌতি-ক্রিয়া অব্যর্থ ফলপ্রদ।

অগ্নিসার ধৌতি

(১)

প্রণালী—শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে উদরের নিম্নাংশ ও নাভিদেশকে আকুঞ্চিত করিয়া মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিবে। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দিবে। কমপক্ষে ১০/১৫ বার এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ১০০ বার অনুরূপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে।

উপকারিতা—এই ক্রিয়াটির অভ্যাসে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, প্লীহা ও যকৃৎ রোগমুক্ত হইয়া সবলতর হয়। অজীর্ণ রোগাদি ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। পেটের অসুখ, উদরাময় প্রভৃতি রোগারোগ্যে ইহা বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(২)

প্রণালী—**"নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ"**—শ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া কুম্ভকাবলম্বন কর। এইরূপ কুম্ভকাবস্থায় যতবার সম্ভব নাভিগ্রন্থি বা সূর্যগ্রন্থিস্থানকে (নাভিদেশকে) আকুঞ্চিত করিয়া মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিবে। যখন আর শ্বাস বন্ধ রাখা সম্ভবপর হইবে না তখন আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দিয়া প্রাণবায়ু টানিয়া লইবে। অতঃপর শ্বাস ত্যাগ করিয়া কুম্ভক অবলম্বনে পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। এইভাবে কমপক্ষে ১০/১২ বার এবং ঊর্দ্ধ্ব পক্ষে ১০০ বার আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।
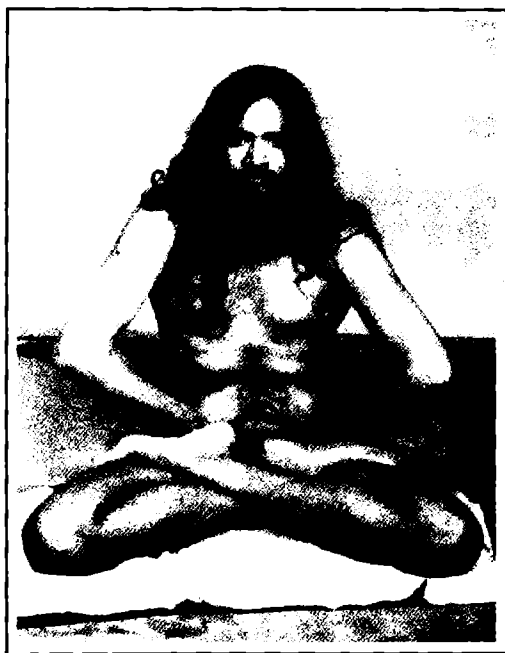
সহজ অগ্নিসার ধৌতি

উপকারিতা—এই ক্রিয়াটি অভ্যাসে অগ্নিগ্রন্থিগুলি সবলতর হয়। প্লীহা, যকৃৎ, সূর্যগ্রন্থি (Pancreas), শুক্রগ্রন্থি (Suprarenal) প্রভৃতি সবল ও সুস্থ হয়। সুতরাং অজীর্ণ, অম্ল প্রভৃতি রোগারোগ্যে অর্থাৎ জঠরাগ্নি বৃদ্ধিতে এই ধৌতিটি বিশেষভাবেই সহায়তা করে।

সহজ অগ্নিসার ধৌতি

প্রণালী—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কোমরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত

খাঁজের ফাঁকে (কটি-অস্থি এবং শেষ বক্ষপঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানটিতে) স্থাপন কর। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি অনুরূপভাবে কোমরের বাম পার্শ্বের অস্থির খাঁজের ফাঁকে স্থাপন কর। উভয় হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি নাভির উপর স্থাপিত হইবে। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়কে স্বস্থানে সুদৃঢ় রাখিয়া সমুদয় অঙ্গুলিগুলি দ্বারা নাভিদেশকে সঙ্কুচিত করিয়া মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন কর। নাভিদেশ মেরুদণ্ডের সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাভির উপর হইতে অঙ্গুলিগুলির চাপ মুক্ত করিয়া দাও। পুনরায় অঙ্গুলিগুলি দ্বারা নাভিদেশকে আবার সঙ্কুচিত করিয়া মেরুদণ্ডে সংলগ্ন কর ; আবার সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গুলের চাপ শিথিল করিয়া দিয়া নাভিদেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দাও।

মাত্রা—কমপক্ষে অনুরূপভাবে ২৫/৩০ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে। ঊর্ধ্বপক্ষে ১০০ বার পর্যন্ত অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রথম নাভিদেশকে হস্তাঙ্গুলির সাহায্যে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিতে একটু বেদনা বোধ হইবে। যে পর্যন্ত নাভিদেশকে সঙ্কুচিত করিতে বিশেষ কষ্টবোধ না হয় সেই পর্যন্ত নাভিদেশকে সঙ্কুচিত করিবে। ক্রমাভ্যাসে নাভিদেশ মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিতে আর বেদনাবোধ হইবে না। যাহাদের তলপেটে অত্যধিক চর্বি আছে তাহাদের নাভি সম্পূর্ণভাবে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইবে না, যতটা সম্ভব ততটা সংলগ্ন করিবে।

উপকারিতা—বস্তিপ্রদেশের যে স্থানে আমাশয় রোগবীজাণু এবং অন্যান্য উদররোগ সৃষ্টিকারী দুষ্টকৃমি সঞ্চিত হইয়া সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে, এই ক্রিয়াটির প্রভাবে বস্তিপ্রদেশে সেই রোগাক্রান্ত স্থানে প্রচুর রক্তপ্রবাহ নামিয়া আসে এবং রোগবীজাণুর ঐ সুদৃঢ় দুর্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। রোগবীজাণুগুলি তখন আশ্রয়চ্যুত হইয়া অসহায়ভাবে রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে, দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুরা তখন মনের আনন্দে এই রোগবীজাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে থাকে। এইজন্যই এই ক্রিয়াটির দ্বারা আমাশয়, কোষ্ঠতারল্য ও উদরাময় প্রভৃতি বস্তিপ্রদেশের যাবতীয় রোগ

দ্রুত আরোগ্য হয়। অজীর্ণ রোগারোগ্যেও এই ক্রিয়াটি সহায়ক। এই ক্রিয়াটি কলেরা রোগেরও প্রতিষেধক।

এই সহজ অগ্নিসার ক্রিয়াটি কোনো যোগশাস্ত্রে নাই; ইহা আমাদের আবিষ্কৃত। অন্য কোনো যোগক্রিয়ার দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী আমাশয় রোগ আরোগ্য করিতে অক্ষম হইয়া আমরা এই ক্রিয়াটি উদ্ভাবন করিয়াছি। এই ক্রিয়াটির আশ্চর্য সুফল দেখিয়া আমরাও বিস্মিত হইয়াছি। অগ্নিসার ক্রিয়ার সহিত এই ক্রিয়াটির সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমরা ইহার নাম দিয়াছি **সহজ অগ্নিসার**।

এই সহজ অগ্নিসার ক্রিয়াটি ২/১ মাসের ছেলে-মেয়েদের উপরও প্রয়োগ করিয়া তাহাদের আমাশয় ও পেটের অসুখ ভালো করা যায়।

নিষেধ—ঋতুমতী ও সন্তানসম্ভাবিতা মেয়েদের পক্ষে এই ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

বমন ধৌতি

প্রণালী—কমপক্ষে ১ ১/২ সের এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ২ ১/২ সের ঈষদুষ্ণ জল পান কর। অতঃপর তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিকে মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া আলজিভকে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে থাক। ইহার ফলে সহজে বমির উদ্রেক হইবে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ মুখে অঙ্গুলি দ্বারা সমুদয় জল উদ্‌গিরণ করিবার ব্যবস্থা করিবে। যাহাদের সহজে বমি হইতে চায় না তাহারা শুধু জলের পরিবর্তে লবণাক্ত জল পান করিবে।

উপকারিতা—পাকস্থলীতে সঞ্চিত দূষিত অম্ল, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা প্রভৃতি এই ধৌতির ফলে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং অজীর্ণ, অম্ল ও সর্দি-কাশি রোগারোগ্যে এই ধৌতিটি বিশেষ সহায়ক।

বলা বাহুল্য, এই বমন ধৌতির চেয়ে বারিসার ধৌতি অধিকতর উপকারী। (এই বমন ধৌতির আর এক নাম **কুঞ্জল-ক্রিয়া**)

বারিসার ধৌতি

প্রণালী—প্রাচীনকালে যোগীরা এই ধৌতিটি অভ্যাসের জন্য কদলীদণ্ড, হলুদদণ্ড এবং বেত্রদণ্ড ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ কলাগাছের অতি সুকোমল জড়ান 'মাইজ-পাতা', হলুদগাছের অভ্যন্তরস্থ অতি সুকোমল ডাঁটা অথবা বেতের অতিকোমল অগ্রভাগ উদরে প্রবেশ করাইয়া উদর পরিষ্কার করিতেন—উদর হইতে শ্লেষ্মা ও পিত্তাদি দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিতেন।

আমাদের এই যুগে রবারের নল আবিষ্কার হওয়ায় ক্লেশদায়ক রম্ভাদণ্ড ও বেত্রদণ্ড ব্যবহারের আর প্রয়োজন নাই। রবারের নল দ্বারা উক্ত বেত্রদণ্ড, হরিদ্রাদণ্ড, রম্ভাদণ্ডের কাজ অক্লেশে সমাধা হইতে পারে।

দুই হাত দীর্ঘ এবং অর্ধ-ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্র সমন্বিত একটি রবারের মোলায়েম নল কিনিয়া আনিবে। ডাক্তারখানায় অনুসন্ধান করিলেই এইরূপ রবারের নল পাওয়া যায়। ব্যবহারের পূর্বে প্রত্যহ এই রবারের নলটিকে রোগসংক্রামক দোষ-মুক্ত (disinfect) করার জন্য গরম জলে ৩/৪ মিনিট ফুটাইয়া লইবে, অতঃপর কমপক্ষে ১১/২ সের এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ২ সের পরিমাণ ঈষদুষ্ণ পরিষ্কার জল পান করিবে। জলপানের পর আর কালবিলম্ব না করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ঈষৎ একটু নত হইয়া ঐ রবারের নলটি মুখের ভিতর দিয়া গলার নীচে খানিকটা নামাইয়া দিবে। নলের বহির্মুখ থাকিবে বাম উরুর কাছাকাছি জায়গায়। কয়েকদিন নল প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জল সজোরে মুখ দিয়া বমি হইয়া যাইবে। ২/৪ দিন অভ্যাসের পর ধীরে ধীরে নলটি গিলিবার চেষ্টা করিবে। প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া গিলিবার মাত্রা বাড়াইবে। ২/৩ সপ্তাহের চেষ্টাতেই সমুদয় নলটি গিলিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, নলের সমুদয় অংশ না গিলিয়া ২ ইঞ্চি নল মুখগহ্বরের বাহিরে রাখিবে ; নল গেলা অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ অভ্যাসে ঐ পীত জল আর মুখ দিয়া বাহির হইবে না, ঐ নলের ভিতর দিয়া অবিরল ধারায় বাহির হইয়া

আসিবে। ঐ জলের সহিত দূষিত পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং অজীর্ণ খাদ্য ও উদরের অন্যান্য যাবতীয় বিষাক্ত জিনিষ নির্গত হইয়া যাইবে। যখন জল নির্গমন শেষ হইবে তখন আরও কিছু সময় ক্রিয়াটির অভ্যাস করিলে তলপেটে অর্থাৎ সূর্যগ্রন্থিপ্রদেশে যে সমস্ত দূষিত পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রোগবীজাণু সঞ্চিত থাকে উহাও নলের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অনন্তর নলটিকে উদর হইতে বাহির করিয়া আনিবে। অতঃপর নলটিকে সাবান জল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ছায়ায় ঝুলাইয়া রাখিয়া শুষ্ক করিবে।

বারিসার ধৌতি

উদর-ধৌতির এই ক্রিয়াটি মোটেই কঠিন নয়। রোগী, অরোগী সকলেই ক্রিয়াটি অভ্যাস করিতে পারে। তবে প্রথমে ২/৪ দিন যোগাচার্যদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া এই ক্রিয়াটি শিক্ষা করা উচিত। যোগাচার্যদের নিকট হইতে স্বচক্ষে ক্রিয়ার প্রণালীটি দেখিয়া লইলে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠানে আর কোনো অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

উপকারিতা—এই ধৌতিক্রিয়াটি অজীর্ণরোগ, পিত্তরোগ, অম্লরোগ,

কোষ্ঠবদ্ধতা, পিত্তশূল, অম্লশূল, স্নায়ুশূল, সর্দি, কাশি, যক্ষ্মা, শ্বেতকুষ্ঠ ও গলিতকুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করে। যাহাদের দেহ এই সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এই ধৌতিক্রিয়াটি তাহাদের রোগারোগ্যের পক্ষে, রোগবৃদ্ধির প্রবণতা প্রতিরোধের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। দেহের অভ্যন্তরভাগকে নির্মল রাখিতে, রোগবীজাণু মুক্ত রাখিতে এই ধৌতি ক্রিয়াটি বিশেষ ভাবেই সাহায্য করে। এই ক্রিয়াটি অনুষ্ঠানের পর আধ ঘণ্টা অতীত না হইলে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবে না।

বমন ধৌতিতে উদর আংশিকভাবে পরিষ্কার হয়। এই বারিসার ধৌতি দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া দেহকে রোগবিষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করে।

রবারের নলটি অল্প-অল্প করিয়া গিলিতে হয়। সহজভাবে নলটি খাদ্য নালীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিম্নে যাইবে। নলটি ভিতরে যাইতেছে না দেখিলে নলটিকে একটু উপরে তুলিয়া পুনরায় গিলিতে থাকিলে উহা সহজভাবে নীচে যাইবে, জোর করিয়া নল ভিতরে ঢোকাইবার চেষ্টা করিলে নলটি খাদ্যনালীর সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে, তখন উহা বাহির করিয়া আনা কষ্টসাধ্য হয় এবং উহার ফলে রক্তপাতের সম্ভাবনা ঘটে; নল নরম থাকিলে উহা ছিড়িয়া যাওয়ার ভয় থাকে। এইজন্যই আমাদের নির্বাচিত রবারের নল ছাড়া অন্যরকম নল কেহ ব্যবহার করিবে না। আশ্রম হইতে নল নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

নেতিক্রিয়া

নাসিকার সাহায্যে এই **নেতিক্রিয়াটি** অনুষ্ঠিত হয়। বস্তিক্রিয়ায় বস্তিপ্রদেশ অর্থাৎ তলপেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, রোগবিষ মুক্ত হয়;

ধৌতিক্রিয়ায় উদর ও বক্ষপ্রদেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় ; নেতিক্রিয়ায় কণ্ঠ ও ললাটপ্রদেশ নির্মল হয়, রোগবিষ মুক্ত হয়।

মৌচাকে প্রাপ্ত মোম দ্বারা মার্জিত সুতার সাহায্যে বা জলের সাহায্যে নেতিক্রিয়ার অনুষ্ঠানবিধি যোগশাস্ত্রে আছে। আমাদের এই যুগে সুতার পরিবর্তে সূক্ষ্ম রবারের নলের (খুব সরু ক্যাথিটার) সাহায্যেও এই নেতিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে। জলের সাহায্যে নেতিক্রিয়ার অনুষ্ঠান যেমন সহজ-সাধ্য, তেমনি উহার উপকারিতাও যথেষ্ট।

সূত্রনেতি

জলের সাহায্যে নেতিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের নামই **নাসাপান**। আমরা রোগীদের পক্ষে মহোপকারী এই নাসাপান প্রণালীই শুধু এইখানে উল্লেখ করিব।

নাসাপান

প্রণালী—বড়ো মুখওয়ালা বাটিতে বা যে-কোনো জলপাত্রে জল পূর্ণ করিয়া লও। অনন্তর ঐ জলপাত্র মুখের কাছে আনিয়া উহার মাঝে মুখ ও নাসাপুট ডুবাইয়া দাও। অতঃপর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে নাসাপুট দ্বারা জল আকর্ষণের চেষ্টা কর ; যতদিন জল আকর্ষণের

কৌশলটি ঠিক ঠিক ভাবে আয়ত্ত না হইবে, ততদিন জল টানিবার সময় নাসিকা একটু জ্বালা করিবে এবং হাঁচি আসিয়া জলপানে বাধার সৃষ্টি করিবে। জল টানিবার ঠিক কৌশলটি ধরিতে পারিলে নাসিকা জ্বালা এবং হাঁচি প্রভৃতির উপদ্রব বন্ধ হইবে। এই ক্রিয়াটি ভালো অভ্যস্ত হইলে আমরা মুখ দ্বারা যেভাবে অনায়াসে জল পান করি, নাসাপুট দ্বারা তেমনি সহজভাবে জলপান করা যায়। প্রত্যহ একপোয়া বা আধসের জল নাসিকা দ্বারা পান করিবে। নাসাপুট দ্বারা যে জল পান করিবে ইচ্ছা হইলে সেই জল গলাধঃকরণ করিবে অথবা মুখ দ্বারা বাহিরে ফেলিয়া দিবে। এই ক্রিয়াটি নিষ্ঠার সহিত ২/৪ মাস অনুষ্ঠান করা উচিত। পরে সপ্তাহে একদিন করিলেই চলে—যদি দেহ রোগমুক্ত থাকে।

উপকারিতা—আমাদের নাসামূলেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নাসামূলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেই ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নার ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় না, প্রায়ই মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। **মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর**—ইহাতে ফুস্‌ফুসে ঠাণ্ডা লাগিয়া শ্লেষ্মাজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। নাসামুলের এই সঞ্চিত শ্লেষ্মার জন্য প্রাণায়াম ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণায়াম অনুষ্ঠানকারীর শ্লেষ্মার উৎপাত রোধ করার জন্য এই 'নেতিক্রিয়া' অভ্যাস করা প্রয়োজন।* এই নেতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। জ্বরাদি রোগে মাথা ধরে না, অন্য কোনো কারণেও মাথা-ধরা ও মাথার যন্ত্রণাদি হয় না। নাসামূলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে সর্দি, কাশি, হাঁপানি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু দেহে প্রবল হইয়া বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায়। নেতিক্রিয়া এবং

---

* (বিশেষভাবে নির্মিত নাসাধৌতির উপযোগী জলপাত্র দ্বারা, আমাদের আশ্রমে অতি সহজেই এই ক্রিয়াটি শিখিয়ে দেওয়া হয়।)

প্রাণায়াম এই সব রোগবীজাণুকে অনায়াসে ধ্বংস করিয়া দেহকে রোগবিমুক্ত রাখে।

বস্তিক্রিয়া

অন্ত্রের সঞ্চিত মল পচিয়া সহজেই দেহ বিষাক্ত হয়, দেহে রোগবীজাণুর সৃষ্টি হয়। সুতরাং অপরিষ্কৃত মলনাড়ীই অধিকাংশ রোগোৎপত্তির মূল কারণ। এই মলনাড়ী পরিষ্কৃত থাকিলে দেহের অন্যান্য স্থানের রোগবীজাণুও প্রবল হইতে পারে না। এইজন্য আয়ুর্বেদ, এলোপ্যাথিক প্রভৃতি সমুদয় চিকিৎসাশাস্ত্রেই রোগ চিকিৎসার প্রারম্ভে কোষ্ঠ পরিষ্কার করার বিধান রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে হরিতকী চূর্ণ, ত্রিফলার জল, গ্লিসারিন প্রভৃতি প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এই সব ঔষধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হয়; গ্লিসারিন এবং অন্যান্য এলোপ্যাথিক রেচক ঔষধ রোগীর পক্ষে যে কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। এই সমস্ত উগ্র কোষ্ঠ-শুদ্ধিকর ঔষধে বস্তিস্নায়ু এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে উহা আর স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না—ফলে চিরস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। ডুস গ্রহণ প্রথা এইসব ঔষধের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো, কিন্তু ডুসপ্রথারও দোষ আছে। ডুস প্রয়োগেও বস্তিস্নায়ুগুলি দুর্বল হয়। এইজন্যই ডুস ব্যবহারকারীদের ডুস ছাড়া আর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ ডুসের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। ডুস শুধু অন্ত্রের নিম্নাংশ অর্থাৎ মলনাড়ীকে পরিষ্কার করিতে পারে। কিন্তু যোগীদের বস্তিক্রিয়ায় শুধু যে মলনাড়ী পরিষ্কৃত হয় তাহা নয়, উহা পাকস্থলীতে সঞ্চিত অপ্রয়োজনীয় পিত্তাদি সমুদয় বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া রোগবিষ ও রোগবীজাণুর প্রভাব হইতে দেহকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখে।

যোগীরা জলবস্তি, স্থলবস্তি, শঙ্খপ্রক্ষালন প্রভৃতি বহুবিধ মহোপকারী বস্তিক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। সাধারণের পক্ষে বা দুর্বল ও রুগ্ন

ব্যক্তির পক্ষে এইগুলি আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয় (এইগুলির মোটামুটি বিবরণ আমাদের **"বিবিধ প্রাণায়াম ও নেতি-ধৌতি"** নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে)। রোগীদের উপযোগী করিয়া আমরা যে সহজ বস্তিক্রিয়া প্রচলন করিয়াছি উহারই বিশদ বিবরণ শুধু এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিব।

সহজ বস্তিক্রিয়া

১ (ক)

সহজ বস্তিক্রিয়া ভোরে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহাদের কঠিন কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ বা দীর্ঘদিনের কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ আছে তাহারা নিয়মিতভাবে এই বস্তিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

একসের ঈষৎ গরম জলের সহিত এক ছটাক লেবুর রস এবং ২ তোলা লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। অতঃপর বিলম্ব না করিয়া ৩/৪ মিনিট **বিপরীতকরণী মুদ্রা** অভ্যাস করিবে। বিপরীতকরণী মুদ্রা অনুষ্ঠানের পর ৪/৫ বার **ময়ূরাসন** অভ্যাস করিবে, অতঃপর ৪/৫ বার **পদহস্তাসন** করিবে। ময়ূরাসন অভ্যাসে অক্ষম হইলে ময়ূরাসনের পরিবর্তে **শলভাসন** ৫/৬ বার করিবে। এই ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠানের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মলবেগ উপস্থিত হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

উপরি উক্ত আসন-মুদ্রায় যাহাদের মলবেগ সৃষ্টি হইবে না, তাহারা ঐগুলির সঙ্গে যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন, অর্ধচক্রাসন ও ধনুরাসন অভ্যাস করিবে।

১ (খ)

যাহাদের দেহ রুগ্ন ও দুর্বল তাহারা শুধু উল্লিখিত নিয়মে জলপানের পর বিপরীতকরণী মুদ্রা বা সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা, পবনমুক্তাসন, যোগমুদ্রা, অর্ধকুর্মাসন ও পদহস্তাসন অভ্যাস করিবে।

জলপানের অব্যবহিত পর বিপরীতকরণী মুদ্রার অনুষ্ঠানের সময় উদরের ঐ জল সমগ্র পাকস্থলীতে, অন্ত্রে পরিভ্রমণ করে। অতঃপর ঐ জল পাকস্থলীর বিকৃত পিত্তরস, বিকৃত অম্লরস, ঊর্ধ্ব অন্ত্রের সমুদয় বিষাক্ত পদার্থ এবং দেহস্থ রোগবিষ প্রভৃতি বিধৌত করিয়া আনিয়া মলনাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মলকে প্রয়োজনানুরূপ তরল করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। এইভাবে দেহকে দোষমুক্ত করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কারের ক্ষমতা কোনো রেচক ঔষধ বা ডুসের নাই।

লেবুর রস রেচক ক্রিয়ায় সাহায্য করে, লেবুর রসে জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়, লেবুর রসে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রধান উপাদান ক্যাল্‌সিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সুতরাং এই বস্তিক্রিয়ায় যে লেবুর রস প্রযুক্ত হয় উহার উপকারিতা ছাড়া কোনো অপকারিতা নাই ; কারণ, লেবুর রস একাধারে ঔষধ ও পথ্য। উল্লিখিত ১নং (ক) বা ১নং (খ) সহজ বস্তিক্রিয়াতেও যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে গ্রহণী নাড়ীতে (ঊর্ধ্ব অন্ত্রে) এখনও অর্ধজীর্ণ খাদ্য বিদ্যমান আছে।

এইরূপ অবস্থায় একদিন বা দুইদিন উপবাস দিলেই (**'উপবাস বিধি'** দ্রষ্টব্য) কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

(২)

ভোরে একসের ঈষৎ গরম জলের সহিত আধ ছটাক লেবুর রস এবং এক তোলা লবণ মিশ্রিত করিবে। অতঃপর এই জলপান করিয়া ১নং বস্তিক্রিয়ার নিয়মে আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিবে।

সাধারণ রোগীরা এই ২নং বস্তিক্রিয়াটিই অভ্যাস করিবে। এই ২নং বস্তিক্রিয়ায় যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে না, তাহারাই শুধু ১নং বস্তিক্রিয়া অবলম্বনে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে।

(৩)

যাহাদের কঠিন কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ নাই অথবা যাহাদের দেহ অত্যধিক দুর্বল ও রুগ্ন নয়, তাহারা লেবুর রস ও লবণ বাদ দিয়া শুধু একসের (দুই

গ্লাস) শীতল জল পান করিয়া উপরি উক্ত নিয়মে আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিয়া প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে।

শুধু শীতের তিনমাস একসের জলের পরিবর্তে তিনপোয়া জল পান করিবে।

(৪)

সহজ বস্তিক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ বিপরীতকরণী মুদ্রা আয়ত্ত করা খুব কঠিন নয়। ২/৪ দিনের অভ্যাসে সকলেই ইহা আয়ত্ত করিতে পারে। বিপরীতকরণী মুদ্রা ও অন্যান্য আসন-মুদ্রা আয়ত্ত করা যাহাদের পক্ষে কোনো কারণেই সম্ভবপর নয়, তাহারা পূর্বোক্ত ১নং বা ২নং সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মে লেবুর রস ও লবণ সহযোগে একসের ঈষৎ গরম জল অথবা একসের শীতল জল পান করিয়া ১০/১২ বার শুধু পবনমুক্তাসন করিবে অথবা ভ্রমণ প্রাণায়াম করিবে।

(৫)

পূর্বোক্ত বস্তিক্রিয়ার নিয়মে লেবুর রস ও লবণ সহ একসের গরম জল পান করিয়া অথবা শুধু শীতলজল একসের পান করিয়া ৯/১০ মিনিট পদচারণা করিবে। অতঃপর "**পীতমূলস্য দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা। যত্নেন ক্ষালয়েৎ গুহ্যং বারিণা চ পুনঃ পুনঃ॥**" হলুদ গাছের 'মাইজ' অর্থাৎ মধ্যবর্তী দণ্ডটিকে তুলিয়া আনিয়া উহার অর্ধহস্ত পরিমিত অংশে মধু, গ্লিসারিণ বা তৈল মর্দন করিবে; হলুদদণ্ড পাওয়া না গেলে বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলিতে অনুরূপভাবে মধু, গ্লিসারিণ বা তৈল মর্দন করিয়া মল ত্যাগ করিতে যাইবে (মধ্যমাঙ্গুলির নখ যেন ভালভাবে কাটা থাকে)। অতঃপর মল ত্যাগের কিঞ্চিৎ বেগ থাকিলে মলত্যাগ সমাপন পূর্বক, মল ত্যাগের বেগ না থাকিলে ঐ হলুদদণ্ড বা মধ্যমাঙ্গুলি আস্তে আস্তে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গুহ্যদ্বার কয়েক বার বিঘটিত করিবে। অতঃপর ঐ হলুদদণ্ড বা মধ্যমাঙ্গুলি গুহ্যদেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া

উহার সংলগ্ন মলকণা জল দ্বারা ধৌত করিয়া পুনরায় ঐ হলুদদণ্ড বা মধ্যমাঙ্গুলিটি গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গুহ্যদেশ পূর্ব্ববৎ বিঘটিত করিবে। এইরূপ উপর্যুপরি কয়েকবার করিলেই রুদ্ধ মল বাহির হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। যোগশাস্ত্রে এই ক্রিয়াটির নাম **গণেশ ক্রিয়া বা সহজ শোধন ক্রিয়া।**

এই সহজ শোধন ক্রিয়াটি এবং ৪নং বস্তিক্রিয়াটি পূর্বোক্ত ৩টি বস্তিক্রিয়ার মতো সুফলদায়ক নয়। কিন্তু এই দুইটিও চিকিৎসকদের জোলাপ প্রয়োগ ও ডুস ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর উপকারী। জোলাপ গ্রহণ ও ডুস ব্যবহারের অনেক অপকারিতা আছে।

বস্তিক্রিয়াদির পরে দন্তধাবনাদি ও অর্ধ-স্নান বা স্নান সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য আসন-মুদ্রার অনুষ্ঠান করিবে।

সর্বদা মনে রাখিবে প্রত্যেকটি রেচক ঔষধ দেহের ভয়ানক ক্ষতি সাধন করে। সুতরাং **রেচক ঔষধ ব্যবহার অর্থাৎ জোলাপ গ্রহণ রোগী ও অরোগী সকলের পক্ষেই অপকারী। জোলাপ পরিপাকযন্ত্র ও বস্তিস্নায়ুকে দুর্বল করে। সর্বদা ডুস ব্যবহারেও বস্তিস্নায়ু খুব দুর্বল হইয়া চিরস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ উৎপন্ন করে।**

কিন্তু এই সহজ বস্তিক্রিয়ায় পরিপাক যন্ত্র ও বস্তিস্নায়ু সবলতর হয়, দেহ রোগজীবাণু মুক্ত হয়। সুতরাং জোলাপ ও ডুস ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সর্বদা এই সহজ বস্তিক্রিয়া অবলম্বনে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে। এই সহজ বস্তিক্রিয়ার উপকারিতা ছাড়া কোনো অপকারিতা নাই।

আতপস্নান বিধি

আয়ুর্বেদে আতপস্নানের নাম **স্বেদক্রিয়া।** এই ক্রিয়ায় প্রচুর স্বেদ বা ঘাম দেহ হইতে নির্গত হয় বলিয়া ইহার নাম স্বেদক্রিয়া। এই স্বেদক্রিয়া বা আতপস্নান বায়ুপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান লোকের পক্ষে অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

শ্লেষ্মা প্রধান, পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রধান এবং বায়ু-শ্লেষ্মা প্রধান নর-নারীর পক্ষে এই স্বেদক্রিয়া বা আতপস্নান বিশেষ হিতকারী।

প্রণালী—শীতকালে আতপস্নানের সময়—**বেলা ৯টা হইতে ১টা পর্যন্ত**; গ্রীষ্মকালে আতপস্নানের সময়—**বেলা ৮টা হইতে বেলা ১১টা পর্যন্ত**। শীতকালে মাথাটি ছায়ায় রাখিয়া উপুড় হইয়া শয়নপূর্বক বস্ত্রাবরণ অপসারণ করিয়া সমগ্র পৃষ্ঠদেশে রৌদ্র লাগাইবে। পৃষ্ঠদেশ বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে বা কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত হইলে, চিৎ হইয়া শয়ন পূর্বক কিছু সময় বুকে, উদরে ও তলপেটে রৌদ্র লাগাইবে।

নির্জনে আতপস্নান সম্ভব হইলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া আতপস্নান গ্রহণ করিবে। নির্জনে আতপস্নান সম্ভবপর না হইলে পুরুষেরা পাতলা অন্তর্বাস পরিধান করিয়া এবং মেয়েরা পৃষ্ঠদেশ ব্যতীত অন্য অঙ্গে পাতলা বস্ত্রাবরণ রাখিয়া আতপস্নান করিবে।

শীতের তিন মাস ব্যতীত অন্য সময় আতপস্নান গ্রহণের সময় ২/৩ ঘটি জল দ্বারা মাথাটি ভালোভাবে ধৌত করিয়া একখানা ভিজা গামছা দ্বারা মাথাটি মুছিয়া ফেলিবে। অতঃপর ঐ ভিজা গামছাখানা দ্বারা মাথা ও কান ঢাকিয়া রৌদ্রে উপবেশন করিবে। পূর্ববৎ প্রথমে পৃষ্ঠদেশে, পরে দেহের সম্মুখভাগে রোদ লাগাইবে। যতটা সময় আতপস্নান গ্রহণ করিবে তাহার চারভাগের তিনভাগ সময়ই পৃষ্ঠদেশ এবং বাকী একভাগ সময় সম্মুখভাগে রোদ লাগাইবে। আতপস্নান অন্তে ছায়ায় আসিয়া মাথার ঐ ভিজা গামছা দ্বারা সর্বশরীর মুছিয়া ফেলিবে।

শয্যাশায়ী রোগীরা শয়নপূর্বক আতপস্নান গ্রহণ করিলেও এইভাবে ভিজা গামছা দ্বারা সর্বশরীর মুছিতে হয় এবং আতপস্নান গ্রহণের প্রারম্ভে পূর্বোক্ত নিয়মে মাথা ধৌত করিতে হয়।

মাত্রা—প্রথমতঃ ৮/১০ মিনিট আতপস্নান গ্রহণ করিবে। ক্রমশঃ সামর্থ্যানুযায়ী আতপস্নানের মাত্রা অল্পে অল্পে বাড়াইবে। শরীর একটু উত্তপ্ত হইলে বা ঘর্মাক্ত হইতে আরম্ভ করিলে আতপস্নান সমাপ্ত করিবে।

আতপস্নানের পর শরীরে বেশ একটু স্নিগ্ধভাব, আরামপ্রদভাবের উদয় হইবে। এইরূপ স্নিগ্ধভাবের পরিবর্তে যদি মাথা গরম হইয়া উঠে বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, তাহা হইলে বুঝিবে সামর্থ্যের অতিরিক্ত আতপস্নান গ্রহণ করা হইয়াছে ; এইরূপ হইলে আতপস্নানের মাত্রা কমাইয়া দিবে। শীতের সময় শরীর উত্তপ্ত হইতে দীর্ঘ সময় লাগে, এইজন্য শীতকালে আতপস্নানের সময়-মাত্রা একটু বর্ধিত করিবে।

উপকারিতা—সর্দি, কাশি, হাঁপানি, যক্ষ্মা, রক্তশূন্যতা, শোথ, স্নায়ুরোগ প্রভৃতি আরোগ্যে আতপস্নান বিশেষভাবে সহায়তা করে।

গাছপালা পাতার সাহায্যে সূর্যরশ্মি হইতে নিজ নিজ দেহপুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। মানুষেরও সূর্যরশ্মি হইতে দেহপুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে। চা-বাগানের মজদুর এবং অন্যান্য যে সমস্ত মজদুরকে ভোরে রৌদ্রে কাজ করিতে হয়, অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সত্ত্বেও তাহাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। প্রভাতের রৌদ্র হইতে ইহারা দেহে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে বলিয়াই ইহাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যরশ্মি হইতে মানবদেহ **'ডি' ভিটামিন** সংগ্রহ করিতে পারে। এই 'ডি' ভিটামিন দেহপুষ্টির একটি প্রধান উপাদান এবং দেহের স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ সহায়ক। মানবদেহের চর্মপ্রদেশে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ আছে, সূর্যরশ্মির উপাদান ঐ তৈলাক্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া 'ডি-ভিটামিন'-এ রূপান্তরিত হয়। 'ডি-ভিটামিন' দেহের ক্যাল্সিয়াম ও ফস্ফরাসের অভাব পূরণ করে। এই ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হইলে দেহ বিবিধ জটিল ও মারাত্মক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং সুস্থ-অসুস্থ সকলের পক্ষেই আতপস্নান হিতকর। আতপস্নান জীবনীশক্তি বর্ধিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, রোগবিষ নাশ করে।

নিষেধ—পূর্বাহ্ণে ও মধ্যাহ্নের (অর্থাৎ বেলা ৮টা হইতে বেলা ১২টার মাঝে) আতপস্নান যেরূপ উপকারী, অপরাহ্ণে আতপস্নান

সেইরূপ উপকারী নয়। উহার অপকারিতাও আছে। সুতরাং অপরাহ্নের আতপস্নান বর্জন করিবে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে ভোর হইতে বেলা ৯টা পর্যন্ত সূর্যরশ্মিতে যথেষ্ট 'আলট্রা-ভায়োলেট রে' থাকে। এই সময়ে রোদ গায়ে লাগানো শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

বলা বাহুল্য, প্রাতঃসূর্যের তাপ আতপস্নান গ্রহণের অনুপযোগী।

উপবাস বিধি

উদরের খাদ্যবস্তু যতক্ষণ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পরিপাকযন্ত্রগুলিকে পাচক রস সরবরাহের জন্য দেহের অধিকাংশ রক্তকেই পাকস্থলীতে উপস্থিত থাকিতে হয়। মাঝে ২/১ দিন খাদ্য গ্রহণ না করিয়া পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিলে পরিপাকযন্ত্রগুলিও বিশ্রাম লাভ করিয়া সবলতর হওয়ার সুযোগ পায়; দেহের রক্তও খাদ্য জীর্ণ করার কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেহস্থ রোগবিষ ও রোগজীবাণু ধ্বংসের কাজে এবং দেহের কল্যাণকর অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর পায়।

সুতরাং শুধু উপবাস দ্বারাই অধিকাংশ নূতন রোগ আরোগ্য করা যায়। এইজন্য রোগী-অরোগী সকলের পক্ষেই মধ্যে মধ্যে উপবাস বিশেষ হিতকর।

উপবাসের দিন অন্য কোনো আহার্য গ্রহণ না করিয়া শুধু পিপাসানুযায়ী প্রচুর জল পান করিবে। উপবাসের সময় এইরূপ জলপান করিলে, দেহ-প্রকৃতি ঐ জলদ্বারা সমুদয় দেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার, দেহ সঞ্চিত রোগবিষ ও রোগবীজাণু দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবার সুযোগ লাভ করে।

এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে প্রত্যেক গৃহস্থ নর-নারীর জন্য একাদশী তিথিতে **উপবাস** এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে **নিশিপালনের** বিধান

রহিয়াছে ; হিন্দুশাস্ত্রের এই বিধানটি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

উপবাস শুধু দৈহিক রোগারোগ্যের সহায়ক নয়, উহা মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সহায়ক। আমাদের দেহের উত্তপ্ত রক্তই কাম-ক্রোধাদি রিপুকে উত্তেজিত করে। উপবাসে দেহের রক্ত শীতল হয়, স্নিগ্ধ হয়। এইজন্য উপবাসে কাম-ক্রোধাদি হ্রাস পায়। এইজন্য পৃথিবীর সমগ্র ধর্মশাস্ত্রেই সাধকদের জন্য উপবাসের বিধান আছে।

বালক-বালিকাদের, দুর্বল ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিদের এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্পূর্ণ উপবাস নিষিদ্ধ। উহাদের পক্ষে উপবাসের দিন একবার মাত্র জলযোগ বিধেয়। একপোয়া বা আধসের দুধ এবং অল্প কিছু ফল-মূলের (কলা বাদে) মাঝেই জলযোগ সীমাবদ্ধ রাখিবে।

ক্ষুধামান্দ্যরোগী, বাতরোগী, অম্ল ও অজীর্ণরোগী, রক্তচাপবৃদ্ধিরোগী সপ্তাহে একদিন নিষ্ঠার সহিত উপবাস দিবে। উহার ফলে রোগ দ্রুত আরোগ্য হইবে।

জলপান বিধি

ভোরে নিদ্রাভঙ্গের পর সাধারণভাবে জল দ্বারা মুখ ধৌত করিয়া দুই গ্লাস শীতল জল পান করিবে। শীতপ্রধান দেশের লোক ঈষৎ গরম জল পান করিবে। ইহার নাম **উষাপান** (রোগীরা **উষাপানের** অব্যবহিত পরেই সহজ বস্তিক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে ; বস্তিক্রিয়া বিবরণ দ্রষ্টব্য)। ঝাড়ুদাররা জলের সাহায্যে প্রত্যহ ভোরে যেভাবে শহরের নর্দমা পরিষ্কার করে, **উষাপানের** ফলে দেহপ্রকৃতিও তেমনি শরীরের অনিষ্টকারী বিষাক্ত পদার্থগুলিকে, অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলিকে মল-মূত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার সুযোগ পায়।

প্রথম প্রথম **উষাপান** অভ্যাসের সময় দুই গ্লাস অর্থাৎ একসের জলপানে অক্ষম হইলে, এক গ্লাস জল পান করিবে এবং অল্প অল্প জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দুই গ্লাসে পরিণত করিবে।

দ্বিপ্রহরে প্রধান আহার্য গ্রহণের আধঘণ্টা/১৫ মিনিট পূর্বে একগ্লাস জল পান করিবে। আহার্য গ্রহণের সময় পিপাসা বোধ করিলে অল্প জল পান করিবে, পিপাসা না থাকিলে জলপান করিবে না। আহারান্তে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা পর পুনরায় একগ্লাস জল পান করিবে। রাত্রির আহারের একঘণ্টা পূর্বে একগ্লাস জল পান করিবে। আহারান্তে একঘণ্টা পর আর এক গ্লাস জল পান করিয়া শয্যাগ্রহণ করিবে। এই নিয়মে খালিপেটে দিনের মাঝে ৫/৬ গ্লাস জল পান করিবে। ইহা ছাড়া পিপাসানুযায়ী অন্য সময়েও জলপান বিধেয়।

আমাদের দেহের প্রধান উপাদান অম্লজান বায়ু (অক্সিজেন) জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। জলের সহিত মিশ্রিত এই অম্লজান বায়ুই জলচর জীবের প্রধান খাদ্য। আমাদের দেহের পক্ষেও জলীয় অম্লজান বায়ুর প্রয়োজনীয়তা আছে, এইজন্য এবং দেহের পরিপাকক্রিয়ার সহায়তার জন্য উল্লিখিত পরিমাণ জলপান আমাদের সকলের পক্ষেই প্রয়োজন।

পিত্তরোগী, অম্ল ও অজীর্ণরোগী জলের সহিত লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া জলপান করিবে। রোগীর শীত-শীত ভাব থাকিলে রোগীকে শীতল জলের পরিবর্তে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। উচ্চ রক্তচাপ রোগীর, হৃদ্‌রোগীর একসঙ্গে অধিক জল পান নিষিদ্ধ। এইসব রোগী ২০/২৫ মিনিট অন্তর অল্প অল্প জল বারে বারে পান করিবে; জলপানের মোট পরিমাণ অন্ততঃ ৫/৬ গ্লাসের কম না হয় সেই বিষয়ে সচেতন থাকিবে। **সুস্থ-অসুস্থ সকলের পক্ষেই এই পরিমাণ জলপান স্বাস্থ্যকর।**

জলস্নান বিধি

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ হইতে জলের উপকারিতা সম্বন্ধীয় ২/১টি মন্ত্র এখানে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

আপ ইদ্ধা উ ভেষজোরাপো অমীব চাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজোস্তাস্তে কৃন্বস্তু ভেষজম্॥

(ঋগ্বেদ, ১০/১৩/৭৬)

—'জলই ঔষধ, জলই ব্যাধিনাশ করিয়া দেহকে প্রাণবান্ রাখে। জল সমস্ত রোগের মহৌষধ। এই মহোপকারী জল তোমার রোগও আরোগ্য করুক।'

অপ্‌সুন্তরমৃতং অপ্‌সু ভেষজম্ অপামুত প্রশস্তয়ে।

(ঋগ্বেদ, ১/২৩/১৯)

—'জল অমৃতরূপী প্রাণে পরিপূর্ণ, উহা দেহকে রক্ষা করে। জলের রোগারোগ্যের বিশেষ ক্ষমতা আছে। জলের এই মহিমার কথা সর্বদা স্মরণে রাখিও।'

জলের এই আরোগ্যকারী গুণ সম্বন্ধে ঋষিরা বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা তরুণ-তরুণী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রভৃতি সকলকেই তিনবার স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ৩ বার স্নান মহোপকারী; শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীর পক্ষে ৩ বারের পরিবর্তে দুইবার স্নান প্রশস্ত। রোগীদের উপযোগী বিভিন্ন স্নান পদ্ধতি নিম্নে উল্লিখিত হইল।

অবগাহন স্নান

অবগাহন স্নানই সর্বাপেক্ষা উপকারী। স্রোতস্বতী নদীর জলই স্নানের পক্ষে প্রশস্ত। নদীর অভাবে পুকুরে স্নান করিবে। প্রথমে কয়েক ঘটি জল দ্বারা তালু ভালোভাবে ভিজাইয়া দিবে, চোখেও জলের ঝাপটা দিবে। অতঃপর নাভি পর্যন্ত ডুবাইয়া কোমরজলে ৫/১০ মিনিট বা ১০/১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং হস্ত দ্বারা মাঝে মাঝে নাভিদেশ ঘর্ষণ করিবে। অতঃপর গাত্রমার্জনাদি করিয়া কয়েক মিনিট সাঁতার কাটিয়া ও কয়েকটি ডুব দিয়া অবগাহন স্নান সমাপ্ত করিবে।

জলপাত্রে স্নান (টাব বাথ)

যাহাদের অবগাহন স্নানের সুবিধা নাই তাহারা জলপাত্রে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। জলপাত্রটি এইরূপ আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহার মাঝে বেশ আরামের সহিত পা ডুবাইয়া উপবেশন করা যায়। এই জলপাত্রে এইরূপ পরিমাণ জল রাখিবে যাহাতে উপবেশন করিলে নাভিদেশ জলে ডুবিয়া যায়।

অনন্তর তালুপ্রদেশ কয়েকবার জলসিক্ত করিয়া, চোখে-মুখে জল সিঞ্চন করিয়া ৫/১০ মিনিট বা ১০/২০ মিনিট ঐ ভাবে উপবেশন করিবে। রোগবিশেষে আধঘণ্টাও টাবে বসিতে হয়। অতঃপর গাত্রমার্জনাদি করিয়া টাট্‌কা শীতল জল সর্বাঙ্গে ঢালিয়া টাব বাথ সমাপন করিবে।

শীতকালে অথবা শীতপ্রধান স্থানে শীতল জলের সহিত এরূপ পরিমাণ গরম জল মিশাইবে যাহাতে ঐ জল শরীরের উত্তাপের চেয়ে ২/১ ডিগ্রী নীচে থাকে। অর্থাৎ শীতল জলও এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহা স্নানের পক্ষে অত্যধিক পীড়াদায়ক বা অত্যধিক শীতল না হয়।

যোগীদের এই টাববাথ প্রণালী জলচিকিৎসকদের টাববাথ প্রণালীর চেয়ে অধিকতর সুফলদায়ক।

বলা বাহুল্য, **গরম জলে স্নান সর্বদাই অপকারী**। তরুণ সর্দিরোগে বা একজাতীয় বাতরোগে ২/১ দিন মাত্র ঈষৎ গরম জলে স্নানের প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া অন্য কোনো রোগে বা অন্য কোনো অবস্থাতেই গরম জলে স্নান হিতকারী নয়। গরম জলে স্নান করিলে দেহের স্নায়ু, গ্রন্থি, পেশী প্রভৃতি সমস্তই দুর্বল হইয়া স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

যাহাদের শীতল জল সহ্য হয়, তাহারা শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি সর্বঋতুতে শীতল জলে স্নান করিবে। শীতকালে রোগী-অরোগী সকলেই প্রয়োজন বোধ করিলে ভোরে জলপাত্রে অর্ধস্নানের সময় বুকে গেঞ্জি বা গরম জামা রাখিয়াও স্নান করিতে পারিবে।

সাধারণ স্নান

যাহাদের অবগাহন স্নান ও জলপাত্রে স্নানের সুবিধা নাই তাহাদের পক্ষে এই সাধারণ স্নান বিধেয়। প্রথমে মস্তকে ২/৩ ঘটি জল ঢালিয়া মস্তকটি ভালোভাবে ধৌত করিবে। অতঃপর নাভি ও বস্তিপ্রদেশে ২/১ মিনিট জল ঢালিবে, অনন্তর নাভির পশ্চাদ্দিকে অর্থাৎ কোমরে অর্ধ-মিনিট জল ঢালিবে। ইহার পর মস্তকে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জল ঢালিয়া, গাত্রমার্জনাদি করিয়া স্নান সমাপন করিবে।

অর্ধস্নান

সাধারণ স্নানের নিয়মানুযায়ী মস্তকটিকে সর্বপ্রথমে ভালোভাবে ধৌত করিয়া শরীরের নিম্নাংশে জল ঢালিবে। এই অর্ধস্নানে বুকে অর্থাৎ শরীরের মধ্য অংশে জল ঢালিতে নাই। ভিজা গামছা দ্বারা বুক, পিঠ ও উদরপ্রদেশ মুছিয়া ফেলিবে। এইরূপ অর্ধস্নানে বুকে ও দেহের অন্যত্র ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকিবে না।

বস্তিপ্রদেশ দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র। এই স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ ও সবল থাকিলে দেহে জীবনীশক্তি অটুট থাকে। প্রত্যহ স্নানের সময় নাভিপ্রদেশে এইভাবে শীতল জল ঢালিলে অথবা দীর্ঘসময় নাভিপ্রদেশ জলে ডুবাইয়া রাখিলে বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু-গ্রন্থি প্রভৃতি সবল হয় এবং উহা দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে সহায়তা করে। সুতরাং রোগী-অরোগী কলের পক্ষেই এইরূপ স্নানবিধি পালন হিতকর।

ব্যবস্থাপত্র

(১)

ভোরে—নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর, দুই গ্লাস জল পান করিয়া—

সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট, পবনমুক্তাসন ৪ বার, যোগমুদ্রা ৬ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১—২ মিনিট, অর্ধশলভাসন ১ মিনিট, অর্ধকুর্মাসন—৩ বার।

প্রাতঃকৃত্যাদি, অর্ধস্নান বা টাব বাথ ২/৩ মিনিট। সহজ প্রাণায়াম নং-২, ৩, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

মধ্যাহ্নে—টাব বাথ ৫/১০ মিনিট, টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং ১০ বার।

অপরাহ্নে—ভ্রমণ প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট, জানুশিরাসন ৩ বার। সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং ১০ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৫, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

(২)

ভোরে—একসের জল পান করিয়া বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট, যোগমুদ্রা ৮ বার, পবনমুক্তাসন ৪ বার, ভুজঙ্গাসন ৩ বার, শলভাসন ৩ বার, অর্ধচক্রাসন ২ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১—২ মিনিট, পদহস্তাসন ৪ বার।

প্রাতঃকৃত্যাদি ; অর্ধস্নান বা টাববাথ।

সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং ৪ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭, ৯— প্রত্যেকটি ২ মিনিট ; ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

বৈকালে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—সর্বাঙ্গাসন ৪ মিনিট, মৎস্যাসন ১ মিনিট, পশ্চিমোত্তান আসন ৪ বার, হলাসন ৪ বার, সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, উড্ডীয়ান ৪ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৭, ৯—প্রত্যেকটি ৩ মিনিট, শশাঙ্গাসন ৩ মিনিট।

(৩)

ভোরে—একসের জল পান করিয়া বিপরীতকরণী মুদ্রা ৫ মিনিট। ময়ূরাসন ৪ বার, ভুজঙ্গাসন ৩ বার, শলভাসন ৪ বার, অর্ধচক্রাসন ২ বার, ধনুরাসন ৩ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৫—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, পদহস্তাসন ৪ বার।

প্রাতঃকৃত্যাদির পর উড্ডীয়ান ৪ বার, ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

বৈকালে—ভ্রমণ-প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়—সর্বাঙ্গাসন ৫ মিনিট, উষ্ট্রাসন ৩ বার, শয়ন-পশ্চিমোত্তান ৫ বার, হলাসন ৫ বার, মৎস্যেন্দ্রাসন ৩ বার, উড্ডীয়ান ৪ বার, সুপ্ত-বজ্রাসন ৩ বার, মকরাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ৩, ৫, ৭—প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শীর্ষাসন ৪ মিনিট ; নৌলী ৩ বার।

(৪)

ভোরে—একগ্লাস জল পান করিয়া যোগমুদ্রা ৬ বার, উত্থিত পদ্মাসন ৩ বার, পদাঙ্গুষ্ঠাসন ৩ বার, মকরাসন ৩ বার, অর্ধচক্রাসন ৩ বার, পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

মধ্যাহ্নে—(স্নানের সময়)—সহজ অগ্নিসার ২৫ বার, পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

সন্ধ্যায়—ত্রিকোণাসন ৩ মিনিট, উষ্ট্রাসন ৩ বার, অঙ্গুষ্ঠাসন ৩ বার, সহজ অগ্নিসার ২৫ বার, পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪—প্রত্যেকটি ২ মিনিট।

চতুর্থ অধ্যায়

ঔষধের অপকারিতা

আমরা প্রসঙ্গক্রমে ঔষধের অপকারিতার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। আধুনিক যুগের যে সমস্ত খ্যাতনামা পাশ্চাত্য চিকিৎসক ঔষধের গুণাগুণ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকটি অভিমত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

Dr. S.S. Weir Mitchell—"Back of disease lies a cause, and that cause no drug can reach."

ডাঃ মিচেল বলেন—"প্রত্যেক রোগেরই একটা অন্তর্নিহিত কারণ আছে, কোন ঔষধই রোগের সেই মূল কারণ বিদূরিত করিতে পারে না ....।"

Elbert Hubbard—"My father practised medicine for 67 years, but he never practised on me."

এলবার্ট হাবার্ড—"আমার পিতা ৬৭ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা-ব্যবসা পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি কখনও আমাকে ঔষধ সেবন করিতে দেন নাই।"

Dr. Oertel—"He who loves his health will avoid the drug-doctors, and make this his capital principle."

ডাক্তার ওয়ার্টেল—"যদি স্বাস্থ্যোন্নতির ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঔষধ এবং ডাক্তার সম্পূর্ণ বর্জন করিবে এবং এই নীতির উপর সুদৃঢ় আস্থা রাখিবে।"

Professor Alonzo Clark, M.D.—"In their zeal to do good, physicians have done much harm. They have hurried many to the grave, who would have recovered, if left to

nature. All our curative agents are poisons, and as a consequence every dose diminishes the patient's vitality. If patients get well in some cases, it is inspite of the medicines..."

প্রফেসার এলেঞ্জো ক্লার্ক, এম. ডি.—"আরোগ্য করার আগ্রহে চিকিৎসকরা রোগীর ভয়ানক সর্বনাশ সাধন করেন। বহু রোগীকে তাঁহারা দ্রুত মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়া দেন। এই সব রোগীর উপর ঔষধ প্রয়োগ না হইলে ইহারা প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ নিজ নিজ জীবনীশক্তির জোরেই আরোগ্য লাভ করিত। রোগারোগ্যের জন্য আমরা যত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি উহার সমস্তই বিষাক্ত পদার্থ। এইজন্যই ঔষধের প্রত্যেকটি মাত্রা রোগীর জীবনীশক্তি হ্রাস করে। ঔষধ সেবনের পরও কতকগুলি রোগী আরোগ্য হয়। এই আরোগ্য লাভ ঔষধের গুণে নয়, উহা ঘটে তাহার জীবনীশক্তির প্রভাবে।"

Dr. Lind–"Almost every virulent poison known to man is found in Allopathic prescription; these poisons have a tendency to accumulate in the system to concentrate in certain parts and organs and then to cause continual irritation and actual destruction of tissues. By far the greatest part of all chronic diseases are created or complicated through the suppression of acute diseases by means of drug-poison, and through the destructive effects of the drugs themselves."

ডাক্তার লিণ্ড—"মানুষ যত রকম ভয়াবহ বিষের সন্ধান পাইয়াছে উহার প্রায় সমস্তই এলোপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে আছে। ঔষধের সহিত এই বিষ দেহে প্রবেশ করিয়া দেহেই সঞ্চিত থাকে। অতঃপর ইহা শরীরের যে কোন অংশে অথবা দেহ-পরিচালক যে কোন যন্ত্রে গিয়া কেন্দ্রীভূত হয়

এবং ঐ স্থানকে অথবা ঐ দেহ-পরিচালক যন্ত্রকে সর্বদা ক্লিষ্ট করিতে থাকে; ঐ অঙ্গের বা যন্ত্রের প্রাণকোষগুলিও ঐ বিষের প্রভাবে ধ্বংস হইতে থাকে। নূতন রোগ আমরা ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করি। বলা বাহুল্য, ইহা আরোগ্য নয়, নূতন রোগকে আমরা ঔষধবিষের দ্বারা চাপা দিই, উহার প্রকাশকে স্তব্ধ রাখি। ঔষধবিষ দ্বারা এইরূপ রোগ চাপা দেওয়ার ফলে ঐ বিষের ধ্বংসক্রিয়ার পরিণামস্বরূপ দেহে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি উৎপন্ন হয় অথবা নানাবিধ জটিল দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়।"

Dr. Noyes—"There is no reason, justice, nor necessity for the use of drugs in diseases. I believe that this profession, this art, this misnamed science, is none other than a practice of fundamental fallacious principles, impotent of good, morally wrong and bodily hurtful."

ডাক্তার নোয়েস—"রোগারোগ্যের জন্য ঔষধ প্রয়োগের কোন যথার্থ কারণ, কোন সদ্‌যুক্তি বা প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, এই চিকিৎসা-ব্যবসা, এই চিকিৎসা-কলা, এই ভুয়ো চিকিৎসা-বিজ্ঞান আগাগোড়া কতগুলি ভুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চিকিৎসা-ব্যবসা মানুষের পক্ষেও হিতকারী নয়; এই ব্যবসা নীতি হিসাবেও অপরাধজনক এবং মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক।"

Dr. Francis Goggswell–"If it (the medical profession) were abolished, mankind would be infinitely the gainer."

ডাক্তার ফ্রান্সিস্ গগ্‌সোয়েল—"এই চিকিৎসা-ব্যবসা যদি আইনের সাহায্যে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে মনুষ্যজাতি বিশেষ ভাবেই ল্যাভবান হইত।"

Sir James Bay, (President of British Medical Association).... "The treatment of disease is not a science nor even a refined art, but a thriving industry."

বৃটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি, স্যার জেম্‌স বে বলেন—"আমাদের রোগচিকিৎসা প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত নয়; ইহা সুন্দর কোন শিল্পও নয়, ইহা শুধু লাভজনক ব্যবসা।"

Dr. Bigelow—"The amount of death and diseases in the world would be less than it is now, if all diseases were to be left to itself."

ডঃ বিগেলো—"ঔষধ বর্জন করিয়া রোগীদিগকে প্রাকৃতিক আরোগ্যবিধানের উপর যদি ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে রোগীর বিপদাপদ ও মৃত্যুর সংখ্যা বিশেষভাবেই হ্রাস পাইত।"

Dr. James Johnson—"I declare as my conscientious conviction founded along with experiences, that if there were not a single physician, surgeon, man-midwife, chemist, druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality than now prevail."

ডাক্তার জেম্‌স্ জন্‌সন্—"নিজের বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমি ঘোষণা করিতেছি—সমস্ত সাধারণ চিকিৎসক, অস্ত্রচিকিৎসক, পুরুষ ও নারী-ধাত্রী, ঔষধ প্রস্তুতকারক, ঔষধ বিক্রেতা এবং ঔষধ পৃথিবীর বক্ষ হইতে যদি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহা হইলে রোগের সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় বহুগুণে হ্রাস পাইত।"

Dr. Magendie of Paris (From a lecture to a Medical Class)—"Medicine is a great humbug. I know, it is called Science. Science indeed! It is nothing like Science, Doctors are merely empirics when they are not charlatans..."

"Let me tell you, gentlemen what I did when I was a physician at the Hotel Dieu. Some three or four thousand patients passed through my hands every year. I divided the patients into three classes. With one I followed the dispensary, and gave the usual medicines, without having the least idea why or wherefore ; to others I gave bread pills and coloured water, without of course, letting them know anything about it. And occassionally I would create a third division, to whom I gave nothing, whatever. These last would fret a great deal. They felt that they were being neglected, unless they were drugged—the imbeciles (and they irritated themselves untill they really got sick). But nature always came to the rescue... and all the third class got well. There was little mortality among those who got the bread pills and coloured water. The mortality was greatest among those drugged according to the dispensary."

ডাক্তার ম্যাগেন্‌ডি—(মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ)—"ঔষধ ব্যবসা একটি মস্ত বড় প্রবঞ্চনা অর্থাৎ উহা মহা অনিষ্টকর। আমরা জানি, ইহাকে বলে চিকিৎসাবিজ্ঞান। বিজ্ঞানই বটে! তবে বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান বা সুপরীক্ষিত জ্ঞান ইহার মাঝে কিছুই নাই। চিকিৎসকেরা প্রবঞ্চক না হইলেও আত্মপ্রতারক অর্থাৎ বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ না করিয়া তাঁহারা গতানুগতিক পথেই চলেন।

আমি যখন হোটেল ডিউ নামক হাসপাতালের পরিচালক ছিলাম, তখন ঔষধের দোষগুণ পরীক্ষার জন্য আমি কি করিয়াছিলাম, তাহা আপনাদের জানাইতেছি। বৎসরে ৩/৪ হাজার রোগীর চিকিৎসা আমাদের করিতে হইত। আমি রোগীদের তিনশ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলাম। এক শ্রেণীকে নির্বিচারে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধাদি

প্রদান করিতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীকে ঔষধের পরিবর্তে খাদ্যবটিকা এবং রং করা জল প্রদান করিতাম। বলা বাহুল্য, রোগীরা যাহাতে আমার এই প্রতারণা ধরিতে না পারে, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিয়াই এইরূপ করিতাম। মাঝে মাঝে আমি তৃতীয় শ্রেণীর সৃষ্টি করিতাম। এই তৃতীয় শ্রেণীর ঔষধের আবেদন নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিতাম। আমার এই প্রত্যাখ্যানে ইহারা বিশেষভাবেই বিরক্ত হইয়া উঠিত। ইহারা ধরিয়া লইত যে ইহাদিগকে ইচ্ছাপূর্বক উপেক্ষা করা হইতেছে। নিজের মনের খুঁতখুঁতির দরুণ এই দুর্বলচিত্ত লোকগুলি সত্য সত্যই অসুস্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু প্রকৃতি ইহাদের রক্ষায় অগ্রসর হইতেন—ফলে এই তৃতীয় শ্রেণীর রোগীরা আপনা হইতেই অল্প সময়ের মাঝে আরোগ্য লাভ করিত। যাহাদের আমি ঔষধের পরিবর্তে খাদ্যবটিকা এবং রং করা জল দিতাম, তাহাদের মাঝেও প্রায় কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের চুলচেরা বিধান অনুযায়ী যাহাদের আমি ঔষধ দিতাম, তাহাদের মাঝেই অনেক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইত।"

Dr. Hastings—After twenty-five years of practice I feel like the disciple of Shakespeare, who said—"Throw physic to the dogs."

ডাঃ হেস্টিংস—২৫ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসা পরিচালনার পর চিকিৎসা সম্বন্ধে আমারও অভিমত দাঁড়াইয়াছে, সেক্সপীয়ারের শিষ্যের অনুরূপ, যিনি বলিয়াছিলেন—"এই চিকিৎসাশাস্ত্রগুলিকে আবর্জনার স্তূপের মাঝে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও।"

Dr. R.H. Bakewell, M.D.M.R.C.S. (formerly Vaccinator-General and Medical Officer of Health, author of *'Pathology and Treatment of Small Pox'*—"I have very little faith in vaccination, even as modifying the disease and none at all, as a protective in epidemics. Personally I

contracted small pox in less than six months after most severe re-vaccination."

ডাক্তার বেকওয়েল, এম. ডি. এম. আর. সি. এস (ভূতপূর্ব টিকাপ্রদান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ, চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যোন্নতির বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বসন্তরোগের নিদান ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা)—"টিকা গ্রহণের সুফল সম্বন্ধে আর আমার কোনো বিশ্বাস নাই। মহামারীর হাত হইতে সাধারণকে রক্ষা করার জন্যই হউক বা রোগ বৃদ্ধি-হ্রাসের জন্যই হউক, টিকার উপর নির্ভর করা চলে না। এ বিষয়ে আমি নিজেও ভুক্তভোগী। বিশেষভাবে দ্বিতীয় বার টিকা লওয়ার পরও ছয় মাসের মধ্যেই আমি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম।"

Dr. J.N. Hurty, (Indian State Board of Health)—"There is not a single medicine in the world that does not carry harm in its molecules."

ডাক্তার হার্টি (ভারত গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যসভার সদস্য)—"পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার মাঝে দেহের পক্ষে ক্ষতিজনক কোন উপাদান নাই।"

Bostwick's *History of Medicine*—"Every dose of medicine is a blind experiment on the vitality of the patient."

বোস্টোয়িক্সের 'হিস্টরী অব মেডিসিন' গ্রন্থে (ঔষধ পাকস্থলীতে গিয়া দেহস্থ যন্ত্রগুলির কতখানি ইষ্ট বা অনিষ্ট করে, এই সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ)—সুতরাং ঔষধের প্রত্যেকটি মাত্রা রোগীর জীবনীশক্তির উপর চিকিৎসাবিজ্ঞানের 'এলোপাথাড়ী' অজ্ঞ গবেষণার মত অনিষ্টদায়ক।

Dr. Woods Hutchinson—"Take away opium and

Alcohol and the backbone of the patent medicine business will be broken in forty-eight hours."

ডাক্তার হ্যাচিন্‌সন্—"ঔষধ প্রস্তুতে আফিম ও মদ্যসার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে ৪৮ ঘণ্টার মাঝে পেটেন্ট ঔষধ ব্যবসার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে, পেটেন্ট ঔষধ ব্যবসা অচল হইয়া পড়িবে।"

[Reference—'Nature cure' by K.L. Sharmah; 'Natural method of healing' by F. E. Bitz.]

আমাদের মন্তব্য

এতদিন মানব সমাজে উদ্ভিজ্জ ঔষধ এবং ধাতব ঔষধই মানুষের রোগারোগ্যে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইত, প্রাণিজ ঔষধ ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাণিজ ঔষধের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। জীবন্ত পশু হত্যা করিয়া উহার গ্রন্থি হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী হয়। উদ্ভিদ্ ও ধাতুর চেয়ে প্রাণীজগৎ মানুষের অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয়, এই জন্যই ধাতব এবং উদ্ভিজ্জ ঔষধের চেয়ে প্রাণিজ ঔষধের কার্যকারিতাও মানবদেহে সমধিক। কিন্তু এই প্রাণিজ ঔষধও রোগীর পক্ষে নিরাপদ নয়। এই ঔষধ কোন্ রোগীর পক্ষে কতটা প্রয়োজন তাহা সঠিক নির্ণয় করার সাধ্য কোনো চিকিৎসকের নাই। এই ঔষধ লইয়াও রোগীর উপর "Blind experiment" অর্থাৎ "এলোপাথারী গবেষণা" চলে। এইজন্যই এইসব ঔষধে কোন রোগীর ভাল হয়, আবার কোন রোগীর হয় না। 'থাইরয়েড' প্রভৃতি প্রাণিজ ঔষধের মাত্রা পরিমাণের চেয়ে বেশী হইলে সমস্ত দেহ বিষাক্ত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং প্রাণিজ ঔষধও নির্ভরযোগ্য নয়। উহা ধাতব-ঔষধ ও উদ্ভিজ্জ ঔষধের মতই অনিষ্টকর। এই ধাতব ঔষধ, উদ্ভিজ্জ ঔষধ ও প্রাণীজ ঔষধ বেপরোয়াভাবে প্রয়োগের ফলে কোন কোন রোগী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অনেক

রোগী সাময়িকভাবে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতিরিক্ত ঔষধ সেবন হেতু এইরূপ উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যা আমাদের দেশে ভয়াবহ। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে এইসব হতভাগ্য ও হতভাগিনীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই।

আজকাল উদ্ভিজ্জ, ধাতুজ ও প্রাণীজ প্রভৃতি ঔষধের পরিবর্তে এন্টিবায়োটিক ঔষধের প্রাধান্য চলিতেছে। নিত্য নতুন শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক ঔষধ (স্ট্রেপ্টোমাইসিন, টেরামাইসিন, সেক্রোমাইসিন প্রভৃতি) আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সব ঔষধের আবিষ্কর্তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা কোন দোষারোপ করিতেছি না; এইসব ঔষধের আবিষ্কর্তারা এবং প্রাচীন ও অর্বাচীন সবরকম ঔষধের আবিষ্কর্তারাই শ্রদ্ধার পাত্র। মানবকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানবের রোগমুক্তি কামনায় বহু পরিশ্রম ও বহু গবেষণার ফলে তাঁহারা এইসব ঔষধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন; এইসব ঔষধের সাহায্যে রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া দেশের সেবা করিতেছেন, দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও এইসব ঔষধ প্রয়োগের পরিণাম কিরূপ, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। দিন দিন যতই অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার হইতেছে ততই মানুষের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতেছে—মানবদেহ রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে, ব্যাধির উৎপাতে গৃহস্থের শান্তিময় সংসার দুঃখ-অশান্তির লীলাভূমি হইয়া উঠিতেছে; অকালমৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহস্থের কষ্টার্জিত আয়ের অধিকাংশই ঔষধবিক্রেতাদের ও চিকিৎসকদের পকেটস্থ হইতেছে। গরীব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ক্রমশঃ অধিকতর নিঃস্ব হইয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে।

সুতরাং ঔষধের আপাত আরোগ্যকারী সুফল দেখিয়া বিমোহিত হইলে চলিবে না। উহার বিষময় পরিণামের কথা স্মরণ করিয়া গৃহস্থদের সাধ্যমত ঔষধ ব্যবহার হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

পেনিসিলিন প্রয়োগে হঠাৎ সবল রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগে রোগীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ ঘটনা; ঔষধ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মনোভাব পোষণ করি, বাঙ্গলা দেশের ডাক্তারদের মাঝেও কেহ কেহ এইরূপ ঔষধ বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা ইহা সুলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছি।

আমাদের এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে ঔষধের অপকারিতা সম্বন্ধে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের ভাষণটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগে বহুসংখ্যক রোগীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, লর্ড হোডার এবং হোরেস্ ইভান্স প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকগণ পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন অর্থাৎ সালফা-ড্রাগস প্রভৃতি এন্টিবায়োটিক (Antibiotic) ঔষধগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি আরও কতকগুলি ঔষধ বাহির হইয়াছে—সিন্কোমাইসেটিন, টেরামাইসিন, নিওমাইসিন, সেক্রোমাইসিন, সেপামাইসিন প্রভৃতি। এই সব ঔষধ প্রস্তুতকারীদের ব্যবসাবুদ্ধি প্রণোদিত বিজ্ঞাপনের মাত্রা পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের মাত্রাকেও হার মানাইয়াছে। এইসব এন্টিবায়োটিক ঔষধ কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া প্রয়োগ করায় **ডাক্তারদের চিন্তাশক্তির লাঘব হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের স্বাস্থ্য ও জীবন লঘু** হইয়া পড়িতেছে। ইহা অতি সত্য যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগের ফলে রক্তের লাল কণিকাগুলি মরিয়া যায়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্বল হয়, কিডনির ক্ষতি সাধিত হয়—রোগী বাঁচিয়া গেলেও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া জীবন যাপন করে। ..... **প্রকৃতিজাত রোগ হইতে ঔষধজাত রোগ অনেক তীব্র ও ভয়ঙ্কর।**"

[উল্লিখিত অংশের লেখকের নামটি কোনো কারণে অস্পষ্ট হওয়ায় লেখকের নামের পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই।]

সুতরাং ঔষধ, ইনজেকসন, টিকা প্রভৃতির সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ করা বা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়, উহা শুধু স্বাস্থ্যের অবনতিতেই সহায়তা করিবে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন—ঔষধ দ্বারা রোগ বন্ধ করিয়া দিলে উহা অন্য রোগে পরিণতি লাভ করে। ঔষধ দ্বারা মেহরোগ বন্ধ করিলে হাইড্রোসিল রোগ হয়। ঔষধ দ্বারা উপদংশ রোগ চাপা দিলে উহা দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগরূপে অথবা কঠিন বাতব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছেলেদের হাম, ডিপথেরিয়া, মেনিন্‌জাইটিস, মাম্‌স প্রভৃতি রোগ ঔষধ দ্বারা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিলে উহা যক্ষ্মারোগ, ক্যান্‌সার রোগ অথবা মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় কঠিন পীড়ার আকারে ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ ঔষধ দ্বারা রোগ চাপা দেওয়ার ফলেই নানা দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আবার দেহ আক্রান্ত হয়।

এন্টিবায়োটিক ঔষধের আবিষ্কারকেরা তাঁদের আবিষ্কৃত ঔষধের অসাধারণ গুণ সম্বন্ধে বর্তমানে যতই দামামাধ্বনি করুন না কেন—চিকিৎসকেরা ইহার গুণ দেখিয়া যতই মুগ্ধ হউন না কেন, এইসব ঔষধের মারাত্মক কুফল সম্বন্ধে মানবসমাজ ক্রমশঃই সচেতন হইয়া উঠিবে। এইসব ঔষধ যেমন রোগজীবাণু নষ্ট করে, তেমনি আবার উহা রক্ত মধ্যস্থ মহোপকারী লাল-রক্তাণুগুলিকেও ধ্বংস করিয়া শরীরের রক্তকে দুর্বল, নিস্তেজ এবং যে কোন মারাত্মক রোগাক্রমণের অনুকূল করিয়া তোলে; মনে রাখিতে হইবে এইসব ভয়াবহ ঔষধবিষ সাময়িকভাবে রোগ চাপা দেয় এবং বিষাক্ত ঔষধ গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপে দেহের জীবনীশক্তি নষ্ট করে; দেহে আবার নূতন নূতন রোগ সৃষ্টি হয় এবং ঐ ঔষধজাত বিষ সন্তানাদিতে সংক্রামিত হয়। এই জন্যই আজকাল নবজাত শিশুদের মাঝেও যকৃতরোগ, স্নায়ুরোগ, চক্ষুরোগ, মৃগীরোগ প্রভৃতির অত্যধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অধিকাংশ বিকলাঙ্গ শিশুর উৎপত্তির মূল কারণও বোধ হয় এই ঔষধবিষ।

স্কুল-কলেজে পাঠরত এমন সব ছেলে-মেয়েরাও আমাদের কাছে

আসে টাইফয়েড রোগে যাহাদের উপর এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইসব এন্টিবায়োটিক ঔষধ গ্রহণের ফলে উক্ত ছেলে-মেয়েদের স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্ক পরিচালনাশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহাদের পড়াশুনাও বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

এইসব ছেলে-মেয়েরা আমাদের নির্দেশমত আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পুনরায় স্কুল-কলেজে গিয়া ভর্তি হইয়াছে। এইসব ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে নামকরা চিকিৎসকদের ছেলে-মেয়েরাও আছে।

ডাক্তাররাও এইরূপ ক্ষেত্রে যৌগিক চিকিৎসার শরণাগত হওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছেন—ইহা শুভ লক্ষণ।

ঔষধের সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা

ঔষধের অপকারিতার বিষয় আমরা বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছি কিন্তু তবুও আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে—মানব কল্যানার্থে মানুষ যত কিছু আবিষ্কার করিয়াছে কোন যুগেই উহার প্রয়োজন একেবারে নিঃশেষ হয় না; উহার মাঝে সব যুগের গ্রহণীয় কিছু না কিছু উপাদান আছে। আমাদের এই যুগে উড়োজাহাজ হইয়াছে, ঘণ্টায় আমরা ৩০০/৪০০ মাইল বেগে আকাশ পথে যাতায়াত করিতে পারি। কিন্তু তবুও প্রাচীন যুগের অতি মন্থরগামী গোযানের প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। দেশব্যাপী দানবাকৃতি চালকলগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের 'সনাতন ঢেঁকি' সগৌরবে নিজের অস্তিত্ব এখনও বজায় রাখিয়াছে।

দেহের কোন স্থান অগ্নিদগ্ধ হইলে অবিলম্বে সেই দগ্ধস্থান শীতল জলের মাঝে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। দহনের অনুপাত অনুযায়ী দগ্ধস্থান জলে ডুবাইয়া রাখার সময়ও একঘণ্টা হইতে ৩/৪ ঘণ্টা বা তদূর্ধ্ব। এইরূপ

চিকিৎসায় দগ্ধস্থানে ফোস্‌কা পড়ে না, দগ্ধস্থানের জ্বালা-যন্ত্রণা সহজেই নিরাময় হয়, দেহে দহনজনিত কোন দাগও পড়ে না। সর্বাঙ্গ ভয়াবহরূপে দগ্ধ হইলেও একমাত্র নাক-মুখ ছাড়া আর সর্বাঙ্গ দরকার মত ২৪ ঘণ্টা হইতে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখার প্রয়োজন হয়। জল চিকিৎসকেরা অগ্নিদহন আরোগ্যে এই যে উপায়টি আবিষ্কার করিয়াছেন অগ্নিদাহে ইহার সমান ফলদায়ক কোন চিকিৎসা-প্রণালী আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ; কোন ঔষধের, কোন যোগক্রিয়ার এমন সাধ্য নাই অগ্নিদগ্ধ রোগীকে এইরূপ সহজে আরোগ্য করে। সুতরাং প্রাচীন এবং আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার এমন কতকগুলি দান আছে, এমন কতকগুলি আবিষ্কার আছে যাহার প্রয়োজন কোন যুগেই নিঃশেষ হইবে না।

আমাদের দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে আমরা বিশল্যকরণী, দূর্বাঘাস, চন্দন, আইওডিন (Iodine) অথবা ব্যাঞ্জোইন (Banzoin) প্রয়োগ করি। ঔষধ প্রয়োগে কর্তিত স্থান বিষাক্ত হইতে পারে না সুতরাং এই ঔষধ কর্তিত স্থানকে দ্রুত আরোগ্যে সহায়তা করে।

চর্মরোগ সৃষ্টি হইলে, দেহের কোন অঙ্গে ক্ষত উৎপন্ন হইলে আমরা মলম ব্যবহার করি। এইসব মলম ক্ষতস্থানের বিষ নষ্ট করিয়া ক্ষতস্থানকে দ্রুত নিরাময় করে। সুতরাং এই শ্রেণীর ঔষধের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

কোন দুর্ঘটনার ফলে বা হঠাৎ কোন ভয়াবহ রোগের আক্রমণের ফলে রোগীর জীবনীশক্তি যখন স্তিমিত হইয়া পড়ে, রোগী মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন চিকিৎসক রোগীর দেহে গ্লুকোজ (Glucose) ইনজেক্‌সন করেন অথবা স্যালাইন (Saline) ইন্‌জেক্‌সন করেন। এই গ্লুকোজ এবং স্যালাইন ঔষধ নয়, ইহা দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য। ফলের রসের মাঝে, বিশেষভাবে আঙ্গুর ফলের রসে যে চিনি পাওয়া যায় ; ঐ চিনির দ্বারা গ্লুকোজ তৈয়ারী হয়। চিনিই আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা করে, দেহের শক্তি অটুট রাখে। তরিতরকারী ও ফল প্রভৃতির মধ্যে যে ধাতব লবণ থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক

উপায়ে সংগ্রহ করিয়াই স্যালাইন তৈয়ারি হয়। এই স্যালাইন ইন্‌জেক্‌সনে রক্তের ক্ষারধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌সনে রোগীর দেহে তাপ এবং শক্তি সঞ্চারিত হয়। সুতরাং গ্লুকোজ এবং স্যালাইন ইন্‌জেক্‌সনের পরেই রোগী খানিকটা সবল হইয়া ওঠে, রোগের প্রবলতা খানিকটা দমিত হয়—রোগীর এই সাময়িক সবলতায় চিকিৎসকেরা রোগীকে যথোচিতভাবে চিকিৎসা করার সময় ও সুযোগ লাভ করেন।

বহুমূত্র রোগের প্রবলতায় ইনসুলিন ইন্‌জেক্‌সন করিয়া চিকিৎসক আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে বহু রোগীকে সাময়িকভাবে রক্ষা করেন—নবীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের এইগুলি উপকারিতার দিক।

কিন্তু ইন্‌জেক্‌সন প্রথা রোগীর দেহে যদি নানাবিধ ঔষধ-বিষ ঢুকাইবার কাজেই প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা মানব সমাজের মহা অনিষ্ট, মহা অকল্যাণই সাধন করিবে।

বলা বাহুল্য, এই অনিষ্টকর কাজেই 'ইন্‌জেক্‌সন' বর্তমান যুগে প্রযুক্ত হইতেছে। সবরকম রোগ চিকিৎসাতেই আজকাল বেপরোয়া ইন্‌জেক্‌সন চলে; **ঔষধ-বিষ দ্বারা রক্তকে দুর্বল করা, নিস্তেজ করার অমোঘ উপায় ইন্‌জেক্‌সন।**

অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বহু রোগীকে চিকিৎসকেরা রক্ষা করেন; আবার বহু রোগীকে তাহারা অকালে যমপুরে প্রেরণ করেন। সুতরাং অস্ত্রোপচার পদ্ধতিরও সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা আছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল মিশাইয়া কালোবাজার সৃষ্টি করিয়া দেশের যে সর্বনাশ সাধন করিতেছে চিকিৎসকেরা সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াও দেশের সেই সর্বনাশই সাধন করিতেছেন।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ভেজাল খাদ্য এবং চিকিৎসকগণ কর্তৃক রোগে বেপরোয়া ঔষধ প্রয়োগ—এই ত্র্যহস্পর্শ সংযোগ আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। দেশের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তির এই ত্র্যহস্পর্শদোষ নিবারণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কোন্ জিনিষ আমাদের উদরস্থ করা উচিত, কোন্ জিনিস আমাদের

উদরস্থ করা উচিত নয়, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য আমাদের দেহপ্রকৃতি রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বাকে সতর্ক প্রহরীরূপে নিযুক্ত রাখিয়াছে। রসনেন্দ্রিয় যে বস্তুগুলিকে উদরস্থ হইতে ছাড়পত্র দেয়, ইহাই শুধু দেহের পক্ষে কল্যাণকর ; রসনেন্দ্রিয় যেগুলিকে উদরস্থ হইতে দিতে অনিচ্ছুক, উহা দেহের পক্ষেও অকল্যাণকর। এই প্রাকৃতিক বিধানকে আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত। এই প্রাকৃতিক বিধানকে লঙ্ঘন করিলে তাহার শাস্তি হইতে কেহই অব্যাহতি পাইবে না।

নিমপাতা ভাজা, নিম-বেগুন ভাজা, করলা বা উচ্ছে ভাজা, পাটপাতা ভাজা প্রভৃতি তিক্ত খাদ্যগ্রহণে আমাদের রসনা আপত্তি করে না, বরং উহা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদের দেহস্থ পিত্তকে সাম্য রাখিবার জন্য এই তিক্ত খাদ্যগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই এইগুলির তিক্ত স্বাদ সত্ত্বেও আমাদের রসনায় উহা সুস্বাদু লাগে; অত্যুগ্র কটু, কষায় বা তিক্ত স্বাদসম্পন্ন ঔষধগুলি আমাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়াই আমাদের রসনা উহা গলাধঃকরণের ছাড়পত্র দিতে চায় না ; কিন্তু তবুও জোর করিয়া এইসব ঔষধ আমরা গলাধঃকরণ করি। এইসব ঔষধবিষে যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি দেহরক্ষাকারী যন্ত্রগুলির কিরূপ ভয়াবহ ক্ষতি হয়, বিভিন্ন রোগবিবরণ প্রসঙ্গে আমরা তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি।

সুতরাং উদ্ভিজ্জ ঔষধ, ধাতুজ ঔষধ, প্রাণিজ ঔষধ প্রভৃতি কোন ঔষধই গলাধঃকরণের যোগ্য নয়। এই ঔষধে উপকার হয় যতটুকু, অপকার হয় তার চেয়ে ঢের বেশী—ইহা স্মরণে রাখিয়া ঔষধ সেবন সর্বদা বর্জন করিয়া চলিবে। ঔষধ বিষ দেহে সঞ্চিত হইয়া দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করে, রোগীর অকালমৃত্যু ঘটায়—ইহা স্মরণে রাখিয়া রোগারোগ্যের জন্য কখনও ঔষধ উদরস্থ করিবে না।

যে সব ঔষধ দেহে বাহ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, মালিশরূপে প্রযুক্ত হয়, শুধু সেইসব ঔষধের ব্যবহার বহিরঙ্গে প্রয়োগের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখিবে।

ইন্‌জেক্‌সন ও অস্ত্রোপচারের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

পঞ্চম অধ্যায়

অসুস্থ যৌন-জীবন

সংযত দাম্পত্য জীবন যাপনের সহিত শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই জন্যই স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে, ভাবী মানব সমাজের কল্যাণার্থে দাম্পত্য-জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় ঋষিদের অভিমত আমরা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

আধুনিক যুগের কামশাস্ত্রে নর-নারীর কামোপাসনার বিধান বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রূপ। কাহারও মতে ২০ হইতে ৩৫ বৎসরের মাঝে দৈনিক তিনবার সহবাস স্বাস্থ্যসম্মত; কেহ বিধান দিয়াছেন দৈনিক দুইবার, কেহ দিয়াছেন দৈনিক একবার, কাহারও মতে সপ্তাহে ৩ দিন, কাহারও মতে সপ্তাহে ২ দিন, কাহারও মতে সপ্তাহে ১ দিন সহবাস স্বাস্থ্যসম্মত। কেহ কেহ দিবসে উপগত হওয়া এবং পূর্ণগর্ভা পত্নীতে উপগত হওয়াও দোষাবহ নয় বলিয়া রায় দিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, বর্তমান যুগে আমাদের দেশীয় কামশাস্ত্র প্রণেতাদের কামোপভোগের এই সমস্ত বিধি-বিধান আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য কামশাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুযায়ীই রচিত। আরও সহজ ভাষায় বলা যায় —উহা পাশ্চাত্য কামশাস্ত্রের অনুবাদ বা অন্ধ অনুকরণ।

যৌবনকালই ভোগের সময়। ব্যষ্টি দেহের যেমন শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য আছে, প্রত্যেক জাতিরও তেমনি শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য অবস্থা আছে। পাশ্চাত্য জাতিগুলির এখনও যৌবন চলিতেছে, তাই উহাদের মধ্যে ভোগের প্রতি অনুরাগ স্বভাবতঃই একটু বেশী। ভারতীয় জাতির যখন যৌবন ছিল তখন তাহাদের অধিকাংশই ভোগাসক্তিতে বর্তমান

যুগের ভোগবাদীদের চেয়ে ন্যূন ছিল না, প্রাচীন কামশাস্ত্রের অঙ্গ কোকশাস্ত্র প্রভৃতিতে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন এই ভারতীয় জাতির মাঝে এখন বার্ধক্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট; তাই তাহার ভোগশক্তিও স্বভাবতঃই ক্ষীণ। সুতরাং দৈহিক ভোগ বিষয়ে ভারতবাসীরা যদি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে, পাশ্চাত্য দেশের কামশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহা হইলে উহা তাহাদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতির কারণ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

শীতকালে পঞ্চপাচকাগ্নি অর্থাৎ জঠরাগ্নি প্রবল থাকে। এইজন্য শীতকালে গুরুপাক খাদ্য গ্রহণে, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণে শরীর অসুস্থ হয় না; গ্রীষ্মকালে শীতকালের অনুরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, দেহ রোগাক্রান্ত হয়। দাম্পত্য ভোগ সম্বন্ধেও অনুরূপ সতর্কতার প্রয়োজন।

শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা, নবযৌবনদৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতির বংশধর যুবক-যুবতীরা ভোগ সম্বন্ধে একটু উচ্ছৃঙ্খল হইলে উহা তাহাদের ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন নাও করিতে পারে। কিন্তু ভারতের মত গরম দেশের অধিবাসীরা, ভারতীয় বৃদ্ধজাতির বংশধর তরুণ-তরুণীরা যদি শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের কামশাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসরণ করে, পাশ্চাত্য যুবক-যুবতীদের ভোগাসক্তির অন্ধ অনুকরণ করে, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশের দম্পতিদের দিকে তাকালেই দেখা যায়, হাজার দম্পতির মাঝে একটি সুস্থ দম্পতিও বিরল। এই দম্পতিদের দেখিলে মনে হয় উহারা যেন অতিকষ্টে দেহের বোঝা বহন করিয়া চলিতেছে; উহাদের হাঁটা-চলায়, উহাদের কাজে-কর্মে যৌবনের তেজ-বীর্যের একটুও আভাস পাওয়া যায় না।

ভোগের পরিমাণ বেশী হইলেই মেয়েদের শরীর দুর্বল হয় এবং প্রদর রোগ ও ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। এই কোষ্ঠবদ্ধতা

রোগকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য রোগ মেয়েদের দেহে বাসা বাঁধিতে থাকে। আর বিবাহিত যুবকদের অবস্থা—একটু রোদ গায়ে লাগিলেই তাদের মাথা ধরে, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাদের সর্দি হয়, এক মাইল হাঁটিতে হইলেই তাহারা হাঁপাইয়া পড়ে। এই দেশের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক যুবক-যুবতীদের শারীরিক অবস্থার ইহাই নমুনা।

উচ্ছৃঙ্খল দাম্পত্য উপভোগে মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরই ক্ষয়-ক্ষতি হয় বেশী। দেহ রক্ষাকারী শুক্রধাতুর অপরিমিত ব্যয়ের ফলে দেহের রোগ প্রতিষেধক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই দাম্পত্য ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খল পুরুষদের অকালমৃত্যু বরণ করিতে হয়।

দাম্পত্য ব্যবহারে অতি উচ্ছৃঙ্খল না হইলে যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে কখনও রোগাক্রমণে পুরুষের মৃত্যু ঘটে না। অসুস্থ দেহে পুনঃ পুনঃ সন্তান ধারণ করিতে হইলে মেয়েদেরও অকালমৃত্যু ঘটে। **স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার যূপকাষ্ঠে বহু নারীকেই এইভাবে আত্মবলী দিতে হয়।**

অতিরিক্ত আমিষ ভোজনের ফলে, অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণের ফলে রক্ত অত্যধিক অম্লধর্মী হইয়া যকৃতের ক্রিয়া খারাপ হইয়া হৃদ্‌রোগ, রক্তচাপবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হইয়াও নর-নারীর অকাল মৃত্যু ঘটাইতে পারে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা হেতু অকালমৃত্যুর তুলনায় এইরূপ আহারে অসংযমীর অকালমৃত্যুর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এই জন্যই দাম্পত্য জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাকেই নর-নারীর অকালমৃত্যুর প্রধান কারণরূপে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্ত্য দেশের মেয়েদের (ডক্টর মেরী স্টোপস) রচিত কামশাস্ত্রে পুরুষদের বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় অভিযোগ আছে—অধিকাংশ পুরুষই স্ত্রীর তৃপ্তিবিধানে অক্ষম; স্ত্রীর তৃপ্তির পূর্বেই তাহাদের রেতঃস্খলন হইয়া যায়। এইরূপ অসম্পূর্ণ সহবাসে নারীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য নারীদের এই অভিযোগের দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে—পাশ্চাত্য দেশবাসীদের মাঝেও অত্যধিক ভোগাসক্তির কুফল ফলিতে

আরম্ভ করিয়াছে। পুরুষেরা ধারণাশক্তিহীন ও নির্বীর্য হইয়া পড়িতেছে।

ধারণাশক্তিক্ষীণ পুরুষের সহবাসেও সন্তানলাভের দায় হইতে নারী অব্যাহতি পায় না, এই ধারণাশক্তিক্ষীণ পুরুষের মাঝেই কামক্ষুধা যখন তখন আত্মপ্রকাশ করে, কামাবেগকে ইহারা ধারণ করিতে পারে না, সংযত করিতে পারে না। তাই সহজলভ্য স্ত্রীর দেহকে তাহারা সময়ে অসময়ে ক্ষোভিত করিয়া তোলে, অথচ স্ত্রীর দৈহিক তৃপ্তিটুকুও দিতে পারে না; এইজন্য নারীও হয় অতৃপ্তকামা—সাধক তুলসীদাসের ভাষায়—'রক্তলোলুপা'। এই দৈহিক অতৃপ্তির সহিত মানসিক অতৃপ্তি আসিয়া যদি যুক্ত হয়, তাহা হইলে বহু নারী দাম্পত্য ব্যবহারে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে, দাম্পত্য জীবন অসুখকর বলিয়া মনে করে।

যে সমস্ত পুরুষের ধারণাশক্তি অটুট তাহারাও সংযমের অভাবে এই ধারণাশক্তির অপব্যবহার করে। স্ত্রীর তৃপ্তির পরও স্ত্রীর উপর তাহারা অত্যাচার চালাইয়া যায়। নিজের ইন্দ্রিয়সুখকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে গিয়া স্ত্রীর সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। নারী-সমাজ যতদিন অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিল, পুরুষের দাম্পত্য ব্যবহারের ত্রুটি এবং অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ্য করিয়াছে। নিজ নিজ সন্তানের আবদার এবং উপদ্রবের মত স্বামীর এই উপদ্রবও তাহারা হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়াছে। নিজেদের স্বাস্থ্যহীনতার জন্য, অসময়ে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য স্বামীকে কখনও দায়ী বলিয়া মনে করে নাই। আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মেয়েদের চোখ-মুখ ফুটিয়াছে, ভালো-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। অতৃপ্ত যৌন-জীবন এবং উচ্ছৃঙ্খল যৌন-জীবন যাপনের অপকারিতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাই বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যাও ঐ দেশে ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের সমাজেও উহার 'ঢেউ' আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আমাদের মনে হয়, শুধু দৈহিক অতৃপ্তির জন্য অর্থাৎ স্বামীর আংশিক অক্ষমতার জন্য বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে এইরূপ অতিকামা নারীর সংখ্যা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সব সমাজেই খুব কম। হৃদয়বান্ ভালবাসাপ্রবণ স্বামীর

আংশিক অক্ষমতার ত্রুটি অধিকাংশ স্ত্রীই সস্নেহে উপেক্ষা করিয়া চলে। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রী বা উভয়ের স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা এবং **আত্মসুখ সর্বস্বতাই অধিকাংশ বিবাহবিচ্ছেদের মূল কারণ**।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজে এক শ্রেণীর অশিক্ষিতা এবং অর্ধশিক্ষিতা মেয়ে আছে ইহারা স্বামীর ঘন ঘন সহবাসকেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠা ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুরাগের নিদর্শন বলিয়া মনে করে। স্বামী দাম্পত্য ব্যবহারে একটু সংযত হইলে স্বামীর অনুরাগ হ্রাসের আশঙ্কা করিয়া অথবা অন্য নারীর প্রতি স্বামীর আসক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইহারা ভীত হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্ববৎ স্বামীকে ঘন ঘন সহবাসে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত হয়। কামক্ষুধার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়াই স্বামীর সহিত ইহারা এইরূপ আচরণ করে তাহা নয়, অর্থনৈতিক পরাধীনতার অসহায় ভাবও ইহাদের মগ্নচৈতন্যে (Subconscious mind) সক্রিয় থাকে, এই ভাবের প্রেরণাতেই দাম্পত্য ব্যবহার লইয়া ইহারা স্বামীর সহিত বিবাদ করে। ঘন ঘন দেহদান করিয়া স্বামীকে নিজের আয়ত্তে রাখিবার জন্য অশোভন আচরণ করে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই শ্রেণীর মেয়েদের অজ্ঞতার জন্যই ইহারা নিজের এবং স্বামীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, সাংসারিক জীবনকে অসুখকর করিয়া তোলে।

আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত উক্তি আছে—**'যেখানেই ভোগ সেইখানেই রোগ'**। পশুজগতে এইসব রোগের প্রাদুর্ভাব নাই। পশুর ভোগপ্রবৃত্তি প্রাকৃতিক বিধি-নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। এইজন্যই বনচর স্বাধীন পশুদের মাঝে রোগের প্রকাশ দেখা যায় না। যথোচিত বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে পিতা-মাতা যেমন ছেলে-মেয়ের নিজের বিবেক-বুদ্ধিমত সংসার পথে চলিবার সুযোগ দেন, প্রকৃতিমাতাও তেমনি, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মনুষ্যসমাজকে নিজের বিবেকবুদ্ধিমত সংসার পথে চলিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার না করিলে পশুদের মতো মানুষও আমরণ নীরোগ জীবন যাপন করিতে পারে।

পরিমিত আহার জীর্ণ হইয়া যেমন দেহের পুষ্টি বিধান করে, দেহকে সুস্থ-সবল রাখে, যৌবনকালে সাধারণ নর-নারীর পরিমিত দাম্পত্য উপভোগও তেমনি দম্পতির দেহ ও মনের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে।

যে সমস্ত নর-নারীর মস্তিষ্ক যত অপরিণত, ভোগাসক্তি ও ভোগক্ষমতা তাহাদের মাঝে সেই অনুপাতে বেশী। পরিণত মস্তিষ্ক সাধারণ নর-নারীর মাঝেও যে সমস্ত নর-নারী কোন উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাবনা করে না, সাংসারিক চিন্তা, বিষয়চিন্তা বা বাজে চিন্তা লইয়া দিন কাটায়, সেইসব নর-নারীর দেহস্থ স্নায়বিক শক্তি এবং ওজঃশক্তি মস্তিষ্কে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায় না। এইজন্য উহা দেহের নিম্নকেন্দ্রে নামিয়া ভয়াবহ কামাবেগরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঘন ঘন কামতৃপ্তির সুযোগ না পাইলে এই শ্রেণীর নর-নারীর মনও অস্থির হইয়া উঠে, অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং **বিষয়চিন্তা হইতে, বাজে চিন্তা হইতে মনকে বিরত করিতে না পারিলে এই কামোত্তেজনার উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।**

দেহে যৌবন আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বংশরক্ষার জন্য নর-নারীর দেহে কিছু অতিরিক্ত শুক্র উৎপন্ন হয়। নারীদেহের এই শুক্র সন্তানদেহ গঠনের জন্য দেহে সঞ্চিত থাকে। পুরুষদেহের এই অতিরিক্ত শুক্র বংশরক্ষার জন্য ব্যয় করাই প্রাকৃতিক বিধান—সুতরাং এই শুক্রের ব্যয়ে দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, বরং উহা নর-নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তাই করে।

সহবাসের পর যদি শরীর বেশ সুস্থ-সবল বোধ হয়, দেহে অটুট স্বাস্থ্যের আরামদায়ক অনুভূতি জাগে, তাহা হইলেই বুঝিবে প্রাকৃতিক নিয়মে যে পরিমাণ শুক্র ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত আছে উহাই শুধু ব্যয় হইয়াছে; দেহ গঠনে ও দেহের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে নিযুক্ত শুক্র ব্যয় হয় নাই। দেহরক্ষী প্রয়োজনীয় শুক্র ব্যয় হইলেই দেহ দুর্বল হইয়া পড়ে, দেহের রোগপ্রতিষেধক শক্তি নষ্ট হয়, দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

দেশের তরুণ-তরুণীদের একথা বিশেষভাবেই মনে রাখিতে হইবে নিজ নিজ সংসারের প্রতি এবং সমাজের প্রতিও তাহাদের দায়িত্ব আছে। অসংযমের জন্য পিতা বা মাতার যদি স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহা হইলে সন্তানও রুগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এইরূপ রুগ্ন সন্তান পারিবারিক উন্নতির পক্ষে, জাতির ও দেশের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে বাধা স্বরূপ। সুতরাং পারিবারিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি ও দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক দম্পতি নিজ নিজ যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে।

কোন্ দম্পতির পক্ষে কি পরিমাণ ভোগ স্বাস্থ্যকর, তাহা অন্যে বলিয়া দিতে পারে না। যে পরিমাণ ভোগ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দৈহিক স্বাস্থ্য ও সবলতা অটুট রাখে, মনকে সুপ্রসন্ন রাখে, উহাকেই বলা যায় পরিমিত ভোগ।

আমরা ভারতীয় কামশাস্ত্রের অঙ্গস্বরূপ 'কোকশাস্ত্রের' বিষয় প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। সমাজের নিম্নস্তরের ভোগীদের ভোগবাসনার ক্লেদাক্ত রূপ আমরা এইসব গ্রন্থের মাঝে চিত্রিত দেখিতে পাই। আধুনিক যুগের অধিকাংশ কামশাস্ত্র এক শ্রেণীর ভোগপ্রবণ চিত্তের লেখনীপ্রসূত। কামোপভোগকেই ইহারা জীবনের একমাত্র সুখোপকরণ, একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মনে করে। ইহাদের লেখনীও তাই কামদেবতার বিচিত্র উপাসনা বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। এইদিক দিয়া আধুনিক কামশাস্ত্রের সহিত প্রাচীন কোকশাস্ত্রের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। ভোগের উৎকট চিত্র বর্ণনায় উভয়েই সমান সুদক্ষ।

কোকশাস্ত্র প্রভৃতি নিম্নস্তরের কামশাস্ত্র ছাড়াও প্রাচীন ভারতে আর এক শ্রেণীর কামশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। এই কামশাস্ত্রগুলি শুদ্ধ-সংযত ঋষিদের লেখনী প্রসূত। এই কামশাস্ত্রগুলি সর্ব-দেশের এবং সর্ব-যুগের দম্পতিদের দেহ-মনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচিত হইয়াছে।

কামশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদের মতে—সাধারণ পুরুষের তুলনায় মেয়েরা

...। নারী-পশুর মাঝে যেমন একটা স্বভাব সংযম আছে, ...বার মাঝেও ঠিক তেমনি একটা স্বভাব সংযম আছে। যখন তখন সহবাসের প্রতি, ঘন ঘন সহবাসের প্রতি তাহাদের একটা অরুচি আছে। এইজন্যই অসংযমী স্বামীরা স্ত্রীর দেহকে সব সময়ে তৈয়ারী পায় না। অনেকক্ষণ যাবৎ নানা উপায়ে স্ত্রীর দেহকে উত্তেজিত করিয়া সহবাসের উপযোগী করিয়া তুলিতে তাহারা বাধ্য হয়।

আধুনিক কামশাস্ত্রে এই অপ্রস্তুতিকে 'slowness' বলিয়া কটাক্ষ করা হইয়াছে। নারীর এই 'slowness' বিদূরিত করিবার জন্য আধুনিক যুগের কামশাস্ত্র প্রণেতারা মহোৎসাহে নিজ নিজ গ্রন্থে বহুবিধ উপায়ের বর্ণনা দিয়াছেন।

ঋষিদের মতে—নারীর এই অপ্রস্তুতি বা 'slowness' তাহার স্বভাব সংযমেরই অঙ্গস্বরূপ। নারীর এই স্বভাব সংযম সম্বন্ধে ঋষিরা সচেতন ছিলেন বলিয়াই নারীর সংযম, নারীর ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তাহারা কোনো বিধি-বিধান রচনা করেন নাই। স্বামী সংযত হইলে স্ত্রীর ভিতর স্বভাব সংযম আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তাই পুরুষের সংযমের উপর ঋষিরা জোর দিয়াছেন ; ছাত্রজীবনে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনের জন্য, ভাবী সংযত দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্যের বিধি-বিধান রচনা করিয়াছেন।

এই বিধি-বিধানের অনুশাসনে অটুট চরিত্র গঠন করিয়া, চিত্তজয় করিয়া যুবকেরা মদনকে ভস্ম করিতে পারিলে ঘরে ঘরে তপস্বিনী উমারও সাক্ষাৎ মিলিবে। ঘরে ঘরে তখন অসুর নিধনকারী কার্তিকের আবির্ভাব হইয়া সমাজের অশুভ-অমঙ্গল বিদূরিত করিবে ; তখন নরপশু সৃষ্টি না হইয়া গৃহে গৃহে দেবশিশুর আবির্ভাব ঘটিবে ; ইহাদের আবির্ভাবে আসুরিক ভাবাপন্ন মানবসমাজ দেবসমাজে রূপায়িত হইয়া উঠিবে। এই দেব সমাজ প্রতিষ্ঠাই দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য।

দম্পতির শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঋষিরা

বিধান দিয়াছেন—অকামা স্ত্রীতে
**অকামা স্ত্রীর দেহ ক্ষোভিত করা
ব্যাভিচারের মতই মহাপাপ। "ভার্যাং গচ্ছন্
দ্বিজঃ"**—মাসে একদিন মাত্র স্ত্রীর সহিত সহবাস
করিবে। যে স্বামী এই সংযত দাম্পত্যজীবন যাপন করেন,
ব্রহ্মচারী।

ঋষিদের এই উক্তির প্রতিধ্বনি বাংলা প্রবাদের মাঝেও প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই—

'মাসে এক, বছরে বারো; তার চেয়ে কম যত পারো।'

সন্তানসম্ভাবিতা হওয়ার পর হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং যতদিন সন্তান মাতৃস্তন্য ত্যাগ না করে ততদিন স্ত্রী-পশু পুরুষ-পশুকে কাছে আসিতে দেয় না, ফলে সন্তান এবং সন্তানের মায়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সভ্যতাভিমানী মানব-দম্পতিরা এই স্বাস্থ্যকর নিয়মটি লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করে।

স্তন্যদুগ্ধ যতদিন শিশুর একমাত্র পথ্য ততদিনের মধ্যে মাতা সহবাসে আসক্ত হইলে, কামোত্তেজনায় অভিভূত হইলে মাতৃদুগ্ধের স্বাভাবিক গুণের বিপর্যয় ঘটে। মাতৃদুগ্ধ বিষতুল্য হয়, বিকৃত হয়। এইরূপ কামাসক্ত মাতার বিকৃত দুগ্ধপানে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, শিশুর সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। এই জন্য গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যপানের অবস্থায় সহবাস ঋষিদের মতে নিষিদ্ধ।

সুস্থ সন্তান, কামজয়ী প্রতিভাবান সন্তান, দেবোপম সন্তান লাভের কামনা যে সব দম্পতির মাঝে আছে, এই ঋষি-নির্দিষ্ট পন্থায় দাম্পত্য জীবন যাপন তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

ঋষিদের এই বিধানের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে অতি নীতিবাগীশ মনে করিয়া আধুনিক কামশাস্ত্রপ্রণেতাদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে। ইহাদের নাসিকা-কুঞ্চনকে অগ্রাহ্য করিয়া ঋষিদের সুরে সুর মিলাইয়া

আমরাও বলিতেছি—এই বিধি-বিধানের মূলে আছে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নে ঋষিদের দূরদৃষ্টি এবং নারীদেহের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও নারীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ঋষিদের সুগভীর জ্ঞান। সুদৃঢ় ধারণাশক্তিসম্পন্ন সংযমী পুরুষ মাসে একদিন স্ত্রীর ঋতুরক্ষা করিলে স্ত্রীর পরিপূর্ণ দৈহিক তৃপ্তি সাধিত হয়। এই দৈহিক পরিতৃপ্তির হিল্লোলে পুনরায় ঋতুর আগমন না হওয়া পর্যন্ত নারী দেহের কামক্ষুধা শান্ত থাকে। পুরুষেরও এই সংযত ভোগে একটা স্নিগ্ধ শান্ত পরিতৃপ্তি একমাস যাবৎ দেহের স্নায়ুগ্রন্থিগুলিকে, দেহের সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত রাখে।

আধুনিক যুগের পুরুষদের এই অটুট ধারণাশক্তি নাই। যকৃৎরোগী যেমন কারণে অকারণে ক্রুদ্ধ হয়, ধারণাশক্তিক্ষীণ পুরুষও তেমনি যখন তখন কামার্ত হইয়া ওঠে।

পুরুষের শরীরে যে অতিরিক্ত শুক্র সঞ্চিত হয় তাহা শুধু মাসে একদিন ব্যয়ের উপযোগী। প্রত্যহ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহে অতিরিক্ত শুক্র সৃষ্টি করা যায়। এই অতিরিক্ত শুক্রও অপব্যয় না করিলে দেহপ্রকৃতি উহা মস্তিষ্ক গঠনের কার্যে নিয়োজিত করে—মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বা প্রতিভা গঠন করে।

সুতরাং দম্পতির এই সংযম শুধু নিজেদের কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন তাহা নয়, উহা ভাবী মানবসমাজের কল্যাণের পক্ষেও প্রয়োজন। মানব সমাজে মহাপ্রতিভা সৃষ্টির, মহামানব বা দেবমানব সৃষ্টির উহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়ক।

সাধারণ পুরুষের তুলনায় সাধারণ নারী অধিকতর সংযমী ইহা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। ২/১টি সন্তান লাভের পর নারীর কামক্ষুধা স্বভাবতঃই শান্ত হইয়া আসে। সুতরাং ঘন ঘন কামচর্চা নারীর প্রীতিপ্রদ নয়। কামুক স্বামীকে স্ত্রী কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, সমগ্র হৃদয় লুটাইয়া দিয়া তাহাকে ভালোবাসিতে পারে না। ভালবাসার অযোগ্য স্বামীকে লইয়া সারাজীবন তাহার ঘর করিতে হয়। অধিকাংশ নারীর

মনোজগতের নাট্যশালায় আমরণ এই বিয়োগান্ত নাটকেরই অভিনয় চলে। অযোগ্য স্বামীর প্রতি উদ্বেলিত ভালবাসা বাৎসল্যে রূপান্তরিত হইয়া স্বামীর পরিবর্তে সন্তানের উপর ঝরিয়া পড়ে; সন্তান-বাৎসল্য তখন নারীর অন্তরের একমাত্র সান্ত্বনা ও অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়।

'মিথো লীলাবিলাসেন হি যৎ সুখং, ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ।' সুরসিক ও সংযমী স্বামী বিশেষভাবেই জানেন—'সম্প্রয়োগ' অর্থাৎ সহবাসের চেয়ে নারীর অধিকতর প্রিয় 'লীলাবিলাস' অর্থাৎ আদর-সোহাগ। দেহ-মনে বলিষ্ঠ স্বামীর প্রীতি-পরশের জন্য স্ত্রীর দেহ-মন লালায়িত হইয়া ওঠে। শুদ্ধ সংযত স্বামীর আদর-সোহাগে স্ত্রীর হৃদয় তৃপ্তিতে ও আনন্দে ভরিয়া থাকে। নারীর এই আনন্দে সংসারও আনন্দনিকেতনে পরিণত হয়।

"যত্র নার্যস্তু নন্দন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ"—যে সংসারে নারী নীরোগ দেহে ও মনের আনন্দে বাস করে, সেই সংসার দেবতার দ্বারা অভিনন্দিত হয়—দেবতার কৃপা সেই সংসারে বর্ষিত হয়। এইরূপ সংসারেই সুখ ও শান্তি চির বিরাজিত থাকে।

মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতায় সমগ্র জাতিরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মেয়েদের মানসিক অতৃপ্তিতে সংসারের সুখ-শান্তি ধ্বংস হইয়া যায়—সংসার অলক্ষ্মীর আগার, নিরানন্দের আগার হইয়া উঠে। প্রত্যেক স্বামীই ইহা স্মরণে রাখিয়া অস্বাস্থ্যকর দাম্পত্য ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবে। **আদর্শ দাম্পত্য-জীবন যাপনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে।**

যখন-তখন কামক্ষুধায় অভিভূত হওয়াও রোগবিশেষ। সহজসাধ্য যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে ধারণাশক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া নর-নারী সহজেই কামক্ষুধা রোগ জয় করিতে পারে, স্বর্গীয় প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় অবগাহন করিতে পারে।

যোগবিদ্যার এই মহৎ কল্যাণপ্রদ ক্ষমতার প্রতি আমরা ভারতের এবং সমগ্র জগতের তরুণ-তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আদর্শ দাম্পত্য-জীবন

বিবাহ দুইটি নর-নারীর মিলন—মিলন দেহে, প্রাণে, মনে, আত্মায়। এই মিলনের মূলে আছে জীবনধর্মের তাগিদ। মিলনের একটা উদ্দেশ্য দেখি আমরা পশুর জীবনে—বংশবিস্তারের। মানুষও পশুজগতের অন্তর্গত, সুতরাং বংশ বিস্তারের প্রেরণা তাহার মাঝেও স্বাভাবিক। কিন্তু বংশ-বিস্তার প্রাণের ধর্ম; তাহার মনের লক্ষ্য কি?

পশুজগতের লক্ষ্য—একটা জাতিরূপকে (Type) বাঁচাইয়া রাখা। শুধু বাঁচাইয়া রাখা নয়, তাহার উৎকর্ষ সাধন করা। কিসের উৎকর্ষ?—দেহের উৎকর্ষ, প্রাণের উৎকর্ষ। পশুর মধ্যে মন অস্ফুট—একদিক দিয়া তাহার প্রগতিও সীমাবদ্ধ; তাই পশুমনের উৎকর্ষ লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না। যাঁহারা পশু-পালন করেন, সুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্যে পশুর মধ্যে উৎকৃষ্ট পাশব গুণকে ক্রমে ফোটাইয়া তোলার মধ্যেই তাঁহাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকে।

সুতরাং মূল বিষয় তাহা হইলে এই—রূপের ভিতর দিয়া ফুটিতেছে গুণ, দেহকে আশ্রয় করিয়া ফুটিতেছে চেতনার ঐশ্বর্য—দেহ-প্রাণ-মনের নানা গুণের ক্রমিক উৎকর্ষের ছন্দে। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে বলেন—প্রকৃতি পরিণাম বা ইভলিউশন (Evolution)। চেতনার সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইবে আধারে—ধীরে ধীরে দীর্ঘযুগের সাধনায় পশুমানব রূপান্তরিত হইবে দেবমানবে। এই সুদূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রকৃতি, প্রাণের মূলে নিহিত করিয়াছেন 'পুত্রৈষণা'-র অর্থাৎ সন্তানকামনার তাগিদ। স্ত্রী-পুরুষের মিলন প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।

মানুষ কেবল পশু নয়, পশুর গুণ তাহার মাঝে আছে, কিন্তু তাহার পরেও তাহার মন। এই মন দিয়াই মানুষ বহির্জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। বহির্জগৎকেই সে শুধু এইভাবে মনের মত করিয়া নূতন

করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া লয় তাহাই নয়, তাহার চেয়েও বড়ো কথা—মানুষ সৃষ্টি করে একটা অন্তর্জগৎ, একটা ভাবনার জগৎ, একটা স্বপ্নের জগৎ। পশু শুধু ইন্দ্রিয়বোধ লইয়াই তৃপ্ত, তাহার মধ্যে কল্পনা নাই, নাই রসবোধ। মন দিয়া কোন কিছু সে সৃষ্টি করিতে পারে না, প্রকৃতির রূপ-রস তাহার মধ্যে কোনও সৌন্দর্যের সংবেদন জাগায় না। ভালবাসা তাহার মধ্যে আছে—পশুমাতার সন্তানবাৎসল্য, কোথাও কোথাও দাম্পত্য-নিষ্ঠাজনিত ভালবাসা, কোথাও বা একটু অস্ফুট স্বাজাত্যবোধ। ইহার প্রত্যেকটিই হৃদয়ের উৎকর্ষের ফল। কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে মন দীপ্ত নয় বলিয়া পশুচরিত্রের এই উৎকর্ষ ক্রমিক উন্নতির পথে চলে না— একটা আবর্তের মধ্যে, একটা স্বভাব ধর্মের মধ্যে পাক খাইয়া মরে শুধু। মানুষের মাঝে মনের মুক্তিতে হৃদয়ের এই দৈবীসম্পদগুলি পায় একটা অভূতপূর্ব উৎকর্ষের সুযোগ।

মানুষের মনের উৎকর্ষ তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে জ্ঞানের চরম শিখরে, তাহার হৃদয়ের উৎকর্ষ তাহাকে লইয়া যাইবে রস ও প্রেমের বৈকুণ্ঠধামে—এই তাহার আশা। ইহা তাহার প্রাণধর্মের তাগিদ নয় শুধু, ইহা তাহার মনোধর্মের তাগিদ।

মনই মানুষ। এই মন যেমন পুরুষের আছে, তেমনি আছে নারীর। ঋষিরা বলেন—পুরুষের মাঝে আছে চিৎশক্তির প্রাধান্য, আর নারীর মাঝে আনন্দশক্তির। সন্তানের মাঝে পিতা-মাতার ভাব ও শক্তি আছে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া—সুতরাং কোনো পুরুষই পুরাপুরি পুরুষ নয়, নারীও পুরাপুরি নারী নয়; উভয়ের মধ্যে আছেন অর্ধনারীশ্বর। এই ওতপ্রোত সম্বন্ধ হইতেই নর-নারীর মিলন আকাঙ্ক্ষা জৈবস্তর হইতে উন্নীত হয় অধ্যাত্মস্তরে।

পুরুষ নারীর মধ্যে খোঁজে রস, খোঁজে আনন্দ, খোঁজে মাধুর্য। নারী পুরুষের মধ্যে দেখিতে চায় একটা পৌরুষের দীপ্তি, একটা মহিমা, একটা ঐশ্বর্য। পরস্পরের অধ্যাত্ম স্বভাবের প্রতি এই যে গভীর আকুতি ইহারই নাম প্রেম। নর-নারীর আদর্শ মিলনের মূলে এই প্রেমের প্রেরণা।

প্রেম পরস্পরের কাছে দাবী করে দুইটি জিনিস—নিজেকে জান এবং অপরকেও বোঝ। নিজেকে জানা এবং পরস্পরকে বোঝা—এই হইল যথার্থ মিলনের মূলসূত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষ একা পূর্ণ নয়—নারীও নয়। পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলিয়া একটি অখণ্ড সত্তা। পরস্পরের মধ্যে যে বস্তুটির অভাব, অপরের নিকট হইতে শ্রদ্ধায়, আনন্দে তাহাকে গ্রহণ করা—মিলনের স্বার্থকতা এইখানেই। স্থূলদৃষ্টিতে পুরুষের মধ্যে দেখি বুদ্ধির উৎকর্ষ, কিন্তু হৃদয়ের নয়; নারীর মধ্যে হৃদয়ের উৎকর্ষ, কিন্তু বুদ্ধির নয়। উভয়েরই ন্যূনতাটুকু আপূরণ করিতে হইবে পরস্পরের কাছে ভালবাসায় নিজেকে লুটাইয়া দিয়া। অর্ধনারীশ্বর বিকলাঙ্গ হইয়া আছেন প্রত্যেক দম্পতির মধ্যে, তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য সেইদিনই সার্থক হইবে, **যেদিন পুরুষের হৃদয়ধর্ম সমস্ত বিশ্বকে আপন করিয়া লইবে, আর নারীর প্রবুদ্ধবুদ্ধিধর্ম তাহাকে বাস্তবিকই 'পূজার্হা গৃহদীপ্তি' করিয়া তুলিবে।**

আমাদের দেশে দাম্পত্য জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটাকে একটা সুস্পষ্ট দার্শনিক রূপ দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি নর-নারীর সম্মিলিত জীবনের আদর্শের মূলে। পুরুষের বৈরাগ্য আর প্রকৃতির পারার্থ্য—উভয়ের অধ্যাত্মজীবনের ইহাই মর্মকথা। দুইটি আদর্শ যুগল আমাদের সামনে আছে হর-গৌরী আর রাধা-কৃষ্ণ। হর-গৌরী পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের আদর্শ, রাধা-কৃষ্ণ নর-নারীর প্রণয়ের আদর্শ। হর-গৌরীর আদর্শে, স্বভাবতঃই জোর দেওয়া হইয়াছে পুরুষের শিব স্বভাব বা চিন্ময় স্বভাবের উপর ; রাধা-কৃষ্ণের আদর্শ তেমনি নারীর প্রেম স্বভাব বা আনন্দময় স্বভাবের উপর। যুগলের পাত্র-পাত্রী পরস্পরের প্রতিপূরক। পুরুষের শিব-স্বভাব প্রতিফলিত হইবে নারীর উপরে ; তেমনি নারীর প্রেম-স্বভাব প্রতিফলিত হইবে পুরুষের মাঝে। শিব-স্বভাব আর প্রেম-স্বভাব একই অদ্বয় স্বভাবের 'এপিঠ-ওপিঠ'।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে—চিৎ আর আনন্দ, জ্ঞান আর প্রেম, বৈরাগ্যের অটলস্থিতি এবং সেবাজ্ঞানে কর্ম—দুই-ই শুদ্ধ চিত্তের সহজ ধর্ম। নর-নারীর অধ্যাত্ম স্বভাবে তাই একটা সাম্য আছে; বৈষম্য আছে যতটুকু তাহা পরস্পরকে আকর্ষণই করে, বিকর্ষণ করে না।

বলা বাহুল্য, এই অধ্যাত্মস্বভাবের মূল কথা—ভোগ নয়, ত্যাগ। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, তাই তিনি গোপীর হৃদয়ে রমণোল্লাস অর্থাৎ মিলনের আনন্দ জাগাইয়া তোলেন—ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত। লৌকিক জীবনে এই সত্যের প্রয়োগ হইবে—এইভাবে **পুরুষ আত্মস্থ থাকিয়া নারীকে ভালবাসিবে, নারী তাহার কামনার বস্তু হইবে না। নারী-প্রেমের আদর্শও গোপী-প্রেমের মতো আত্মহারা তন্ময়তা।** উভয়ের অন্তরের উল্লাস ত্যাগে, নিঃস্পৃহতায়—আত্মসুখ কামনায় নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠায় পুরুষের অন্তরে যে সুখানুভূতি জাগে, আত্ম বিসর্জনে নারীর ভিতরে সেই সুখানুভূতি জাগে। ইহাই নর-নারীর আন্তরিক মিলনের মূল সূত্র।

পরিবারে ও জগতে এই মিলনের ছবি দেখি হর-গৌরীর আদর্শের মধ্যে—'**জগতঃ পিতরৌ**' বলিয়া কালিদাস যাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন।

বিবাহিত জীবনের একটা সামাজিক দিক আছে, তাহা সার্থক হয় পিতৃত্বে বা মাতৃত্বে। সন্তান পিতা-মাতাকে শিব-শক্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে—এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া দাম্পত্য জীবন গড়িয়া তোলার চেষ্টা, প্রেমকে এইরূপ একটা সুগভীর মহিমা দেওয়া—ইহাই নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য।

এই সামাজিকতার আর একটা দিকও আছে। নববধূ শুধু স্বামীর সহধর্মিণী নয়, কুলের সে কুলবধূ। '**কুলবধূ**' এই সংজ্ঞাটির মাঝে বধূজীবনের একটা ব্যাপ্তির ইঙ্গিত আছে, যাহা জননীত্বের গৌরবের চেয়েও অধিকতর গৌরবের। কুলবধূ শুধু সন্তান-জননী নয়, পারিবারিক সংস্কৃতিরও সে বাহন। সমাজের মূলে যে স্থিতিশক্তির ক্রিয়া, নারী তাহার আধার অর্থাৎ বংশানুক্রমিক অর্জিত ভাব ও সদাচারকে সংসারক্ষেত্রে

বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নারীর ; পুরুষের দায় সমাজের গতিশক্তিকে মুক্তি দিয়া তাহাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া, নূতন নূতন ভাব ও জ্ঞানকে আহরণ করা।

নারী-পুরুষের এই কর্মদায়ের ভাগাভাগি আজও অটুট আছে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তাহার পরিধি হইয়াছে প্রসারিত। পরিবার আজ আপন আবহকালের সংকীর্ণ গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ নাই। বিশ্বজগৎ সহসা ঘরের আঙ্গিনায় আসিয়া হাজির হইয়াছে ; তাহার ফলে মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে—বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ হইলেও জীবনের শিক্ষা তাহার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

সংস্কৃতি বস্তুটা এখন আর একটা অচল উত্তরাধিকার নয়—একটি সচল সৃষ্টির অঙ্গ। ঘরের কাজ সহজে ফুরাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু মনের কাজ তো ফুরায় না। অনেক সমস্যা মনের অঙ্গনে আসিয়া ভীড় করে নারী-পুরুষ উভয়েরই। সমস্যা সমাধানের ভার এখন আর একা পুরুষের দায় নয়, মেয়েদেরও দিনে দিনে তাহার সমান ভাগ লইতে হইবে। নারী আজ শুধু পুরুষের পারলৌকিক সাধনায় সহধর্মিনী নয়, তাহার ঐহিক সাধনায় জীবনসঙ্গিনীও বটে।

"স্ত্রী কখনও স্বাতন্ত্র্য পাইতে পারে না"—স্মৃতিশাস্ত্রের এই অনুশাসন এখন অচল। **যে জাতির মাঝে নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা যত গণ্ডীবদ্ধ সেই জাতির পুরুষের মাঝে বর্বরতা, নারীমাংসলোলুপতা তত বেশী; মানব-সভ্যতার জয়যাত্রায় সেই জাতি তত অধিক পিছনে পড়িয়া আছে।** সুতরাং নারী ও পুরুষ সমাজের এই দুই অঙ্গের ভারকেন্দ্র সমান রাখিতে হইলে নারী-পুরুষের সমান সংস্কৃতি, সমান স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই সমান সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা মানবসমাজকে কল্যাণের পথেই পরিচালিত করিবে। এইরূপ উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন দম্পতির গৃহে পশু-মানব আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, প্রতিভাহীন মূর্খের আবির্ভাব হয় না, বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মে না। বিশ্বের দরবারে এখন পুরুষের পাশে আসিয়া নারীকে

দাঁড়াইতে হইবে বা হইতেছে; এইরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের হৃদয়ের সম্পর্কের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসিবে নিশ্চয়। **নারী-পুরুষের মনের সচেতনতা প্রেমকে জৈবধর্মের প্ররোচনা হইতে উত্তীর্ণ করিবে বুদ্ধির প্রদীপ্তলোকে।**

কালিদাসের ভাষায় স্ত্রী হইবে সখী বা সচিব;—জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তাহার অধিকার প্রসারিত হইতে চলিতেছে। আমাদের দেশে আজও এতটা দৃষ্টির প্রসার ঘটে নাই ; কিন্তু ইহাকে ঠেকাইয়া রাখিবারও আর উপায় নাই। বিশ্বের সঙ্গে সমানে তাল ফেলিয়া আমাদেরও চলিতে হইবে, নতুবা জাতির মৃত্যু অনিবার্য।

গৃহের গণ্ডীর এই সম্প্রসারণ নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনিবে এবং তাহার ফলে দাম্পত্য-জীবনের প্রচলিত আদর্শও পরিবর্তিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া মনে হয়—**নারীর স্বরাজ্য লাভ, সমাজের সর্বস্তরে নারীর কর্তৃত্ব সামাজিক প্রগতির একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রূপে দেখা দিবে।** আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য নারীশক্তিকে যেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলা যাইতে পারে, এই স্বরাজ্য দাম্পত্য-জীবনের জৈব দিকটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবে—ইহা অতি সত্য। সুতরাং প্রাচীন কালে যে জীবন-দর্শনের উপরে দাম্পত্য-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, তাহার প্রকাশ ভবিষ্যতে যে আরও পূর্ণায়ত ও নির্মুক্ত হইবে, তাহা আশা করা অন্যায় হইবে না।

কালচক্র আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমাদের নাই। আমাদের কর্তব্য শুধু পিতৃপুরুষের অর্জিত ভাবের শক্তিকে বর্তমানের জীবনপ্রবাহে মুক্তি দেওয়া। জীবন যদি কুরুক্ষেত্র রূপেই দেখা দিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যাসের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের যে বলিষ্ঠ আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাহাকে রূপায়িত করা ছাড়া উপায় নাই।

ব্যাস নারীকে চিত্রিত করিয়াছেন ক্ষত্রিয়ের জীবনসঙ্গিনীরূপে। কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, দময়ন্তী—প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয়ের ঘরণী। ইহাদের জীবনে দুর্বিপাকের অন্ত ছিল না, কিন্তু কোথাও তাঁহারা পুরুষের ঘাড়ে বোঝা হইয়া চাপিয়া ছিলেন না। শক্তির জীবন্ত প্রতীকরূপে ইহারা পুরুষের ভিতর পৌরুষ জাগাইয়াছেন। দুর্যোধন-দুঃশাসনের যে উদ্ধত অন্যায় নারীমর্যাদাকে আহত করিয়াছে, ভারতের পৌরুষ শক্তি যতদিন সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে না পারিবে ততদিন "এই বেণী আর বাঁধিব না"—দ্রৌপদীর এই দৃপ্ত বাণী, দ্রৌপদীর এই দৃপ্ত তেজ পঞ্চপাণ্ডবের অন্তরে ও পাণ্ডববাহিনীতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। গান্ধারীকে ঘর ছাড়িতে হয় নাই; ঘরে থাকিয়াই পত্নীরূপে, মাতারূপে তিনি যে বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফলে নারীত্বের মর্যাদা মনুষ্যত্বের গৌরবে উজ্জ্বল হইয়াছে। শকুন্তলা আশ্রম পালিতা; কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা নয় সে, ব্যাসের শকুন্তলা—বীর্যময়ী, শক্তিময়ী। সাবিত্রী রাজদুহিতা, আশ্রম-বধূ; তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, কুমারী জীবনেও নিষ্ঠা ও সংকল্পের তেজ অতুলনীয়। তেমনি চিত্রাঙ্গদা ও বিদুলা। সুতরাং ব্যাসের সৃষ্ট নারীরা **মেয়ে এবং মানুষ** আধুনিক যুগের 'মেয়ে-মানুষ' নয়। বর্তমান ভারতের জীবন-সমস্যা কুরুক্ষেত্র রূপে দেখা দিয়াছে। ক্ষাত্রবীর্য ছাড়া বাঁচিবার উপায় নাই। তাই নারীকে দেখিতে চাই **বীর-বালা, বীর-জায়া এবং বীর-জননীরূপে**। ব্যাসের 'মহাভারতের' স্বপ্ন স্বাধীন ভারতে সার্থক হইয়া উঠুক।

অতএব পুনরায় বলি, দাম্পত্য মিলন বা বিবাহ শুধু নিজের সুখের জন্য নয়—এমন কি অতি নিষ্কলুষ অধ্যাত্ম আত্মরতির জন্যও নয়; অন্তরের মধুকে বাইরে ছড়াইতে হইবে। দায় আছে সমাজের প্রতি, দায় আছে বিশ্বজগতের প্রতি। সুসন্তানের জন্ম দেওয়া এই দেশে গৃহীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। সুসন্তান সৃষ্টি করিতে হইলে নর-নারীর প্রেমকে তুলিতে হইবে শিব-শক্তির সাম্যরসের পর্যায়ে। **এখানেও তপস্যা প্রয়োজন, প্রয়োজন সংযমের।**

যথার্থ প্রেমের লক্ষণই পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কাম-কামনাহীন সুগভীর অনুরাগ, সুগভীর ভালবাসা। এইদিক দিয়া পুরুষের শৈথিল্য দেখা দেয় জৈব কারণে। আবার জৈব কারণেই নারীতে সতীত্বের বিকাশ স্বাভাবিক। **সতীত্ব জাতীয় সংস্কৃতির একটি অমূল্য সম্পদ।**

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—নারীর সতীত্ব এবং পুরুষের শিবত্ব এই দুয়ের মাঝে একটা সমানুপাত আছে। **যে দেশে সতীত্বের মর্যাদা যত বেশী সেই দেশে তত মহাপুরুষের জন্ম হয়।**

সুতরাং স্বামীর আদর্শ হইবে মদন দহন করিয়া মদনমোহনের অপ্রাকৃত প্রেমে অধিষ্ঠিত হওয়া—যে প্রেমের আকর্ষণে 'যমুনাও উজান বয়'—সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈষম্য দূর হইয়া যায়; স্ত্রীর হৃদয় স্বামীর হৃদয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। আর তপঃশুদ্ধা উমার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অবিচলিত প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্ত্রীর আদর্শ। এইরূপ দম্পতির গৃহেই মহামানব আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এইরূপ মহামানবের জন্ম দেওয়াতেই দাম্পত্য-জীবনের সার্থকতা, সমাজজীবনের সার্থকতা।

যোগবিদ্যার বিজয় অভিযান

প্রাচীন বৈদিক সভ্যতায় যে উচ্চ সংস্কৃতি, উচ্চভাব ও চিন্তাধারা আছে, মনে হয় উহাই মানব সভ্যতার লক্ষের দিশারী। কোন একটি জাতি শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর হইলেই সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হয় না। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার প্রয়োজন। এই ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির আরও প্রসারের জন্যই বোধহয় প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির নিয়মে ইস্‌লামের ভারত প্রবেশ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই ইস্‌লামধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় ভাবধারা ব্যাপকভাবে

সুদূর ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়ে। ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীরা ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, উপনিষদ ও যোগ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ-শাস্ত্র, আরবী ও পার্শী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইস্‌লাম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইউরোপে ছড়াইয়া দেন। ভারতীয় বৈদিক ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া ইস্‌লামধর্ম কয়েকধাপ উঁচুতে উঠিয়া যায়। ইহার ফলে আকবরের মতো পরধর্মসহিষ্ণু উদার শাসনকর্তার অভ্যুত্থান ভারতীয় ইস্‌লাম রাষ্ট্রে সম্ভবপর হইয়াছে। বেদের অন্তর্গত উপনিষদই জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, যোগপথ, তন্ত্রপথ প্রভৃতি সমুদয় ধর্মীয় মত ও পথের উৎপত্তিস্থল। এই আকবরের যুগেই আল্লোপনিষদ রচনার মধ্য দিয়া বৈদিক ধর্মের সহিত ইস্‌লামধর্মকেও যুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছিল।

অন্যদিকে সুফীধর্মেরও এই সময় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুফীধর্মের আদি উৎপত্তি তৃতীয় শতাব্দীতে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থানে। ভারতীয় বেদান্ত ও যোগধর্মই সুফীধর্মের ভিত্তি। ইস্‌লাম ধর্মের প্লাবনে ঐ দেশের সুফীধর্ম বিলুপ্ত হয় নাই। ইস্‌লামধর্মের সহিত একটা রফা করিয়া এই সুফীধর্ম আত্মরক্ষা করে। এই সুফী ধর্মের বাণী ভারতীয় জ্ঞানধর্ম, বেদান্তধর্মের অনুরূপ। আমাদের বেদান্তবাণী—'**অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম**'—দেহ আমি নই, মন-বুদ্ধি-অহংকার আমি নই, দেহ মনের দাসত্ব হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে। দেহাতীত, মনের অতীত যে চিন্ময় সত্তা উহাই আমার সত্যিকার স্বরূপ, সুতরাং আমিই তিনি, তিনিই আমি। সুফীধর্মের বাণীও ঠিক অনুরূপ,—"**অনল হক্**"—আমিই সত্যস্বরূপ, আমিই তিনি, আমার অন্তরাত্মাই ভগবান্। তদানীন্তন মুসলমান সমাজ সুফী ধর্মের এই ভাবধারা বা জ্ঞানপথ গ্রহণের উপযোগী হয় নাই, তাই যীশুখৃষ্টের মত সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্তকদেরও নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়া নিজ নিজ সত্যানুভূতির মর্যাদা রক্ষা করিতে হইয়াছে। এই মতবাদের দরুণ গোঁড়া মুসলমানদের হাতে প্রথম বলি হইয়াছেন পারস্যের সুফী সাধক শ্যামসুর। জীবিত অবস্থায় তাঁহার গাত্রের চর্ম উৎপাটন করা হইয়াছে। শুধু শ্যামসুর একা নন, শ্যামসুরের পরে আরও

অনেক সুফী সাধককে এইরূপ শাস্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড রচনা করিয়া তিলে তিলে ইহাদের দগ্ধও করা হইয়াছে। এইরূপ নির্মম শাস্তি সত্ত্বেও মৃত্যুভয়ে ইহারা একটুও কাতরোক্তি করেন নাই, মৃত্যুভয়ে নিজেদের মতবাদ পরিত্যাগ করেন নাই; নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়া ইহারা সুফীধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সুফীধর্মের সাধনায় যোগেরই প্রাধান্য বেশী। আজ সুফী মতবাদ্ ইস্‌লামের একটা গৌরবের বস্তু, ইস্‌লামধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইসলামধর্ম ভক্তিধর্ম, এই ভক্তিধর্মকে জ্ঞানধর্মের আলোতে, যোগধর্মের আলোতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন সুফীধর্মের সাধকেরা।

ইস্‌লামধর্মাবলম্বী জ্ঞানী-গুণীরা সুফীধর্মের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিয়া উহাকেও পরবর্তী যুগে কোরাণের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। বর্তমান কোরাণে ভক্তিধর্ম ও জ্ঞানধর্মের সমন্বয় করা হইয়াছে। মূল কোরাণের যে সাধনা উহাকে বলে **সরিয়ৎ**। পাঁচবার নিয়মিত সময়ে নামাজাদি করা, প্রার্থনাদি করা—ইহা সরিয়তের অঙ্গ; আর সুফীদের প্রভাবে যে জ্ঞানধর্ম ও যোগধর্ম কোরাণে যুক্ত হইয়াছে উহার নাম '**হকিকৎ**'। হকিকৎ অর্থ অন্তর্মুখী সাধনা, সত্যের সাধনা। সুফীরা কুণ্ডলিনী-যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া যোগের ধ্যান, জপ প্রভৃতি সমুদয় সাধনাই গ্রহণ করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রের নির্দেশ—"**তদ্‌জপঃ তদর্থভাবনম্**" —তাঁহার নাম জপ করিবে এবং তাঁহার অনন্ত স্বরূপ ভাবনা করিবে। প্রণব ও 'সোঽহং' মন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসে শ্বাসে জপ ও ধ্যান আমাদের দেশের যোগ-সাধনার অঙ্গ। সুফীরাও এই জপ সাধনাকে হকিকতের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। 'লা-ইলাহা' উচ্চারণের সময় তাঁহারা শ্বাস ত্যাগ করেন এবং 'ইল্লাল্লাহা' উচ্চারণের সময় ইহারা শ্বাস উর্ধ্বমুখী আকর্ষণ করেন। সুফী সাধকেরা যোগানুভূতির বিভিন্ন স্তর বুঝাইবার জন্য হাল, ফনা, মোকাম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। ভারতে আকবরের সময় যোগসিদ্ধ সুফী সাধক সেলিম চিস্তি মোগলসম্রাটের দরবারে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার আশীর্বাদে পুত্রহীন

আকবর পুত্রসন্তান লাভ করেন। তাই তিনি পুত্রের নামও রাখিয়াছিলেন সেলিম। আমাদের এই পূর্ব ভারতের পূর্ববঙ্গে যোগসিদ্ধ সুফী সাধক জামাল শাহ্ বাস করিতেন। বাংলার নবাব দরবারে তাঁহারও প্রাধান্য ছিল। হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদের দেশে ভক্তদের মাঝে 'ভজন-প্রথা' ছিল। অর্থাৎ একসঙ্গে বসিয়া সকলে ভগবানের নাম করিতেন। কিন্তু নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন এবং উদ্দণ্ড নৃত্যের কীর্তন আমাদের দেশে ছিল না। খুব সম্ভব পারস্যের সুফীরাই এইরূপ কীর্তন আমাদের দেশে প্রচলিত করেন। পূর্বভারতের শ্রী গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের মাঝে এই কীর্তন-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত।

ভারতীয় জ্ঞানধর্ম ও যোগধর্ম এইভাবে ইসলামধর্মকে শোধন করিয়াছে, পরিপুষ্ট করিয়াছে। আকবরের গুণগ্রাহিতা, উদারভাব এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টার আদর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া আওরঙ্গজেবের উগ্র সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়া আনিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নবজাগ্রত ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিনিধি ইংরাজের ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন। ইস্‌লামের অসম্পূর্ণ কাজ ইংরাজেরা সম্পূর্ণ করিয়া তোলেন। বৈদিক সাহিত্যের ভাবধারা, জ্ঞানধারা সাধ্যমত সর্বমানব-সমাজের মাঝে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন এই ইংরেজরাই। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, গীতা, সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল-যোগদর্শন প্রভৃতি সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রই ইহারা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানস্পৃহা মিটাইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে বর্তমান যুগে যোগবিদ্যার অনুরাগী নারী-পুরুষের সংখ্যা অসংখ্য। ইহারা যোগসাধনার দ্বারা উপকৃত হইয়া, উচ্চাবস্থা লাভ করিয়া এবং যোগ সম্বন্ধে পুস্তকাদিও রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি উড্‌রফ সাহেব এই খ্যাতিসম্পন্ন মানবদের মাঝে একজন। তাঁহার যোগ ও তন্ত্রের গ্রন্থগুলি পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদৃত। তিনি নিষ্ঠার সহিত যোগক্রিয়াদি অভ্যাস করিতেন। এমনিভাবেই, পূর্ব-পৃথিবীর জ্ঞান-সূর্য পশ্চিম-পৃথিবীতে জ্ঞানের আলোক

বিকিরণ করিতেছে। ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রভাবে পাশ্চাত্যদর্শন ও সাহিত্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সাধনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন ঘটাইয়া এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে। পাশ্চাত্যবাসীর বিজ্ঞান সাধনা পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতির মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। দেশ ও কালের ব্যবধান দূর হইয়া গিয়াছে। আজ উড়োজাহাজের কল্যাণে ইউরোপ, আমেরিকা মহাদেশ এশিয়ার দূর প্রতিবেশী নয়।

বিজ্ঞানের একটি ভয়াবহ আবিষ্কার এটমবোমা ও হাইড্রোজেন বোমা। এই দানবীয় মারণাস্ত্রের সাহায্যে মানুষ আজ পৃথিবী ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। পৃথিবী হইতে সমগ্র মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা বৃহৎ রাষ্ট্রের নায়কদের আয়ত্তাধীন। এই ভয়াবহ এটমবোমাই কিন্তু পরোক্ষভাবে আমাদের ভয় দূর করিয়া দিতেছে। এই এটমবোমার আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধকামীদের যুদ্ধলিপ্সা হ্রাস পাইতেছে। এটমবোমার ভয়াবহ ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কেরা বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে আর সাহসী হইতেছেন না। এতদিন মানুষ পরস্পর হানাহানি করিয়া, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া যে হিংস্র পাশবিকতার পরিচয় দিয়াছে আজ তাহা চিরতরে অবসান হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে—এই এটমবোমা আবিষ্কারের ফলে। এই যে চিরস্থায়ী যুদ্ধাবসানের লক্ষণ, এই যে দেশ ও কালের ব্যবধান দূর হইয়া বিভিন্ন মানবজাতির অবাধ মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে, ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য কি?

প্রত্যেক পিতা-মাতাই সুসন্তানলাভের কামনা পোষণ করেন। অনুরূপভাবে বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতিমাতাও জ্ঞানী-গুণী সন্তান, দেব-সন্তান লাভের প্রয়াসী। কতকগুলি স্বার্থপর অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিবাদপরায়ণ যুদ্ধ লিপ্সু পশুমানব সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিমাতা তৃপ্ত হইতে পারেন না। তাই তিনি ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন—যাহাতে এই পশুমানব দেব-মানবে রূপায়িত হয়; এই জন্যই প্রকৃতির বৃহৎ যুদ্ধ বন্ধের আয়োজন, সমুদয়

মানবজাতির অবাধ মিলনের আয়োজন। প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া যে রাষ্ট্রনেতা বা যে সমাজ সাম্প্রদায়িকতার হিংসা-দ্বেষকে প্রশ্রয় দিবে, যুদ্ধকে প্রশ্রয় দিবে, ভবিষ্যতের ইতিহাসের পাতায় তাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন নর-পশুরূপে, দানবরূপে চিত্রিত হইবে। প্রকৃতিমাতাও ইহাদের ক্ষমা করিবে না। অন্যায়কারী ত্যাজ্য পুত্রের মতো ইহাদেরও কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—ইহাই প্রাকৃতিক বিধান, ভাগবত বিধান।

বিভিন্ন রকম ফুলের সমাবেশে ফুলের মালাটি যেমন সুন্দর হয় তেমনি পৃথিবীর সমুদয় জাতির বন্ধুত্বপূর্ণ মিলনে মানব-সভ্যতাও সুন্দর হইবে, সমৃদ্ধিলাভ করিবে। প্রত্যেক জাতির মাঝেই এমন কিছু ভাল আছে যাহা মানব সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক। এই ভাল জিনিষটুকুরই আদান-প্রদান করিয়া মানব-সভ্যতার অগ্রাভিযানকে আমাদের সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। মানব-সভ্যতাকে দেব-সভ্যতায় রূপায়িত করিতে হইবে—ইহাই আমাদের কাম্য। আমাদের ভারতের গৌরবের বস্তু—আমাদের অধ্যাত্ম সাহিত্য, অধ্যাত্ম দর্শন এবং যোগবিদ্যা। আমাদের এই ভারতীয় সম্পদকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিবার জন্য প্রকৃতিমাতা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি।

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন আমাদের এই বৈদিক ধর্ম, একাধারে জ্ঞানধর্ম ও ভক্তিধর্ম। যোগও এই জ্ঞানধর্মের অন্তর্গত। খৃষ্টধর্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম মূলতঃ ভক্তিধর্ম। বৈদিক ধর্মে ভক্তিধর্মের যে দার্শনিকতা আছে, যে রস-মাধুর্য আছে, উহার আস্বাদ যখন খৃষ্টধর্মী ও ইস্‌লামধর্মীরা পাইবেন, তখন তাঁহাদের ভক্তিধর্মও পূর্ণতা লাভ করিবে। বৈদিক ধর্ম কোন ধর্মকে লুপ্ত করে না, গ্রাস করে না, উহাকে পূর্ণতা প্রদান করে। সর্বপ্রাচীন বৈদিক ধর্ম যেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। খৃষ্টধর্ম ও ইস্‌লামধর্ম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত অধ্যাত্মভাবে ভাবিত হইবে, অধ্যাত্মজ্ঞানে সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, তখন পৃথিবী হইতে ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার

পাপ অন্তর্হিত হইবে। সবার উপরে মানুষ সত্য, সবার উপরে মানুষের অন্তর্নিহিত অদ্বয় অখণ্ড সর্বব্যাপী পরমাত্মচেতনাই সত্য—এই মহাসত্য লাভই মানুষের কাম্য। **মানুষে মানুষে ভেদ নাই, ভেদ নাই ; এক সত্য, এক ভগবান। খণ্ডের মাঝে তিনি আছেন অখণ্ডরূপে। দ্বৈতের মাঝে তিনি আছেন অদ্বৈতরূপে, সর্বজীবের মাঝে আছেন তিনি পরমাত্মা রূপে, এই বৈদিক জ্ঞানের প্রভায় সমুদয় মানবজাতি প্রভাস্বর হইয়া উঠুক।**

সময় সময় আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বর্তমান যুগের যবনিকা সরিয়া যায় ফুটিয়া ওঠে ভাবীকালের অপরূপ দৃশ্য—এই মৃন্ময়ী পৃথিবীর চিন্ময়ী রূপ, প্রকৃতিমাতার চিন্ময়ীরূপ। দিব্যদৃষ্টিতে যেন দেখিতে পাই—যোগবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া এই পশুমানবের লীলাভূমি জগৎ দেবমানবের লীলাভূমিতে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই দেবভূমিতে জরা নাই, ব্যাধি নাই, অকালমৃত্যু নাই, দারিদ্র্য নাই, দুঃখ নাই, হিংসা-দ্বেষ নাই, স্বার্থপরতা নাই, কাম-ক্রোধাদি রিপুর প্রাধান্য নাই। এ জগতের মানুষ যেন জ্ঞানে মহৎ, প্রেমে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই জগতের মানুষ যেন জ্ঞান, প্রেম ও অহিংসার জীবন্ত প্রতীক ; দেব-ভাব ও ভাগবত-ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। এ যেন কোটি কোটি বুদ্ধ, খৃষ্ট, কোটি কোটি শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একত্র সমাবেশ।

সর্বান্তঃকরণে অনুভব করি—এই দেবসৃষ্টি রূপায়ণই প্রকৃতির লক্ষ্য। প্রকৃতির এই দেবসৃষ্টি রূপায়ণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তার জন্যই পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্ম। আমাদের জীবন-যজ্ঞের সমুদয় আহুতি সার্থক হইবে যদি আমরা আমাদের এই উদ্দেশ্যকে, লক্ষ্যকে রূপায়িত করিতে পারি। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যই দরকার আমাদের নীরোগ দেহ, শুদ্ধ দেহ এবং শুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল মন। এই জ্ঞানোজ্জ্বল মনই মনোরাজ্য অতিক্রম করিয়া আত্মস্বরূপের অমৃত আস্বাদন করে। এই অমৃতস্পর্শে মানুষ হয় দিব্যজ্ঞানের, দিব্যপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ।

এই আত্মোন্নতি ও আত্মানুভবের যত রকম পথ আছে যোগ তাহার

মাঝে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যোগের আসন-মুদ্রাদি শরীরকে নীরোগ করে ; মনকে রোগমুক্ত করিয়া সবল, শুদ্ধ ও নির্মল করে। যোগের ধ্যানাদির সাহায্যে আমরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে গমন করিয়া পরমাত্মা বা ভগবানের সহিত যুক্ত হই। এই ভাবে এক সঙ্গে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ উন্নতির ব্যবস্থা ভক্তিপথেও নাই, জ্ঞানপথে বা অন্য কোন পথেও নাই—আছে শুধু যোগপথে।

যোগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সাধনায় নানারকম বিভূতি লাভ হয়। নানারকম অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। আমাদের পাতঞ্জল যোগদর্শনে 'বিভূতিপাদ' নামে একটি পৃথক অধ্যায় আছে। যোগসাধনার দ্বারা মানুষ কতরকম অলৌকিক শক্তি অর্জন করিতে পারে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাই আমরা এই অধ্যায়ে।

আমাদের প্রাচীন যোগশাস্ত্রও আছে, কিন্তু যোগের বাস্তব প্রয়োগ-প্রণালী (practical side) বহুলাংশে লুপ্ত হইয়াছে। আমরা এই যুগের যোগাচার্যেরা এই লুপ্ত যোগবিদ্যার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছি। কিছু কিছু নূতন যোগক্রিয়া আমরা উদ্ভাবনও করিয়াছি। আজ আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিতে পারি—সাধারণ মানুষ জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জয় করিয়া শতায়ু লাভ করিতে পারিবে—আমরা এ যুগের যোগাচার্যেরা উহার সহজসাধ্য যৌগিকপন্থা আবিষ্কার করিয়াছি। যৌগিক ক্রিয়া শুধু দৈহিক স্বাস্থ্য লাভেরই অনুকূল নয়, উহা মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সহায়ক। এই ভারতীয় যোগবিদ্যার দ্বারা পৃথিবীর সমুদয় মানুষ উপকৃত হউক, সমুদয় মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক—ইহাই আমাদের কাম্য।

যোগের শেষ ধাপ—কৈবল্য লাভ। 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া, দেহ-মন-বুদ্ধির রাজ্য অতিক্রম করা। আমরা দেহের দাসত্ব, মনের দাসত্ব করিয়া জীবন কাটাইতেছি। মনের প্রভু হওয়ার চেষ্টা করি না। মনের পরপারে কি বস্তু আছে তাহা জানিবার

চেষ্টা করি না। পশু নিজেকে পরম সুখী মনে করে যদি তার আহার্যের অভাব না থাকে এবং দৈহিক আরাম ও সুখের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। সাধারণ মানুষ দৈহিক সুখের সঙ্গে মানসিক সুখেরও প্রার্থী। যথার্থ মানসিক সুখ, মানসিক আনন্দ পাইলে দৈহিক সুখ মানুষের কাছে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। মানসিক সুখ-শান্তির অভাব নাই, পার্থিব ধন ও ঐশ্বর্যেরও অভাব নাই, তবুও মানুষের মাঝে একটা অভাববোধ থাকে। এই অভাববোধ মানুষের দূর হয় যদি মনকে জয় করিয়া মানুষ আত্মস্বরূপে অবগাহন করিতে পারে, আত্মস্বরূপের অমৃত আস্বাদন করিতে পারে। 'কৈবল্য' শব্দের আর একটি অর্থ—এই আত্মস্বরূপে অবগাহন। **'কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি'**—আমাদের আত্মস্বরূপে, চিন্ময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম 'কৈবল্য'।

মনকে লয় করার নাম সমাধি। সুতরাং সমাধি অবস্থা কৈবল্য অবস্থা নয়। মনকে লয় করার পরও সাধকদের আরও দুইটি ভূমি পার হইতে হয়। মনের অব্যক্তভূমি, প্রকৃতির অব্যক্তভূমি—এই দুইটি ভূমি অতিক্রম করার জন্য সাধকদের প্রয়োজন হয় গুরুশক্তির ও ভাগবতশক্তির সহায়তা। এই গুরুশক্তি ও ভাগবতশক্তির সহায়তায় সাধক সৃষ্টির এই অব্যক্তভূমি পার হইয়া অদ্বয়, অনন্ত পরমাত্মস্বরূপে অবগাহন করেন—ইহাই যোগশাস্ত্রের কেবলী অবস্থা। এই অবস্থা লাভের নামই কৈবল্য।

মনকে একটু নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই অপার্থিব সুখ, অপার্থিব আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। সে আনন্দের কাছে পার্থিব সুখ, ইন্দ্রিয়জগতের সুখ অতি তুচ্ছ। নদী যেভাবে সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়, নিরুদ্ধ মনও সেইভাবে যখন পরমাত্ম-চেতনার মাঝে বিলীন হইয়া যায়, তখন সাধক যে আনন্দের স্বাদ পায় উহার নাম ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ যে কি জিনিস তাহা কেহ কখনও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। এই ব্রহ্মানন্দ লাভ, এই ব্রহ্মত্ব লাভ বা কৈবল্য লাভই আমাদের মানব জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের অভিমুখেই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে;

সমগ্র মানবজাতিকেও অগ্রসর হইতে হইবে। সমুদ্র যেভাবে কোটি কোটি তরঙ্গকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে, মনোরাজ্যকেও তেমনি ধারণ করিয়া আছে অনন্ত চেতনার বারিধি। এই চেতনার বারিধিই আমাদের চির-সুখের বাসস্থান। ইহাই আমাদের নিজ-নিকেতন।

এক মিনিটও যদি মনোভূমির উর্ধ্বে উঠিয়া এই অমৃত চেতনার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার দেহ-মনেরও রূপান্তর ঘটিবে। আমার পার্থিব মন দিব্য মনে, চিন্ময় মনে রূপান্তরিত হইবে, মন আর কোনদিন নীচের স্তরে নামিতে পারিবে না। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, তেমনি ভাগবত চেতনার স্পর্শে মানুষও দেবতা হয়। শিশু যেমন ব্যভিচার করিতে পারে না, কুকাজ করিতে পারে না, দেব-মানবও তেমনি কোন কুকাজ করিতে পারে না। পরমাত্ম-চেতনার স্পর্শে দেবতা হইয়া দেবমানবরূপে এই জগতে মানুষ বিচরণ করিবে, দেবভাব সর্বমানুষের ভিতরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে—ইহাই প্রকৃতির লক্ষ্য, ইহাই মানবজীবনের লক্ষ্য, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। এই লক্ষ্যের অভিমুখে যাহাতে মানবজাতি দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই ঋষিরা যোগবিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যোগবিদ্যা সর্বমানবের কল্যাণবিধান করুক।

পৃথিবীতে চিরশান্তি অব্যাহত রাখার জন্য, মানবসভ্যতার বাধাহীন অগ্রগতির জন্য এই যুগেই আমাদের মাঝে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কামনা জাগিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই কামনাও একদিন বাস্তবে রূপায়িত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। **বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্বধর্মেরও প্রয়োজন হইবে। কোরাণ, বাইবেল সর্বশ্রেণীর মানুষের অধ্যাত্মক্ষুধা মিটাইতে পারিবে না, সে ক্ষুধা শান্তির ক্ষমতা আছে বেদোক্ত জ্ঞানধর্ম, যোগধর্ম ও ভক্তিধর্মের।** যোগবিদ্যা আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটাইতেছে। পাশ্চাত্যবাসীর যোগশিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই।

বেদের ঋষিরা নিজেদের ধর্মকে বলেন সনাতন ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম।

এই ধর্ম কোন মতবাদ নয়। ইহা সত্যানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম কোন সম্প্রদায় বা জাতির ধর্ম নয়, ইহা সার্বভৌম ধর্ম, সমগ্র মানবজাতির ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের সত্যানুভূতি অমৃতকে নিজে আস্বাদন করিয়া বিশ্ববাসী সকলে যাহাতে এই অমৃত আস্বাদনের অধিকারী হয়—সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করাই আমাদের ব্রত হউক। মানুষ দেবত্ব লাভের প্রয়াসী, স্বীয় অন্তরের দেবতার স্পর্শে মানুষও দেবতা হইয়া উঠিবে—এই দেবত্ব লাভের পথ মসৃণ করা, সুগম করার দায় আমাদের সকলের। পরমাত্মার কৃপায় আমাদের এই চেষ্টা সার্থক হউক। খাদ্যই জীবনীশক্তি, খাদ্যই প্রাণশক্তি। খাদ্যই মানুষের দেহ-মন গড়িয়া তোলে। মানুষ সুখাদ্য গ্রহণ করিয়া যাহাতে দেবমনের অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য প্রকৃতি উদ্ভিদ্‌জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, ফল-মূল ও শস্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে। এই ফল-মূল ও ডাল প্রভৃতি শস্যকেই বলে সাত্ত্বিক খাদ্য বা সুখাদ্য। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষখাদ্য, ঘি, মাখন, মিষ্টি-মিঠাই প্রভৃতি সংহত খাদ্যই অসাত্ত্বিক খাদ্য। এই সব অসাত্ত্বিক খাদ্যই দেহে ব্যাধি সৃষ্টি করে, অকাল মৃত্যু ডাকিয়া আনে। এইসব অসাত্ত্বিক খাদ্যই মানসিক অবনতিরও মূল কারণ। এই জন্যই যোগশাস্ত্রে সাত্ত্বিক খাদ্যের উপর জোর দিয়াছে। অসাত্ত্বিক খাদ্যসেবীর যোগানুশীলন সফল হয় না। মানুষ হিংস্রপশুর খাদ্য গ্রহণ করে বলিয়াই হিংস্র পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধাদি দানবীয় কার্যে লিপ্ত হয়। মানুষের এই অন্যায়ের জন্য ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, যানবাহন দুর্ঘটনা প্রভৃতির কবলে পড়িয়া মানুষকে এই পাপের শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। সাত্ত্বিক খাদ্যসেবী হইয়া, অহিংসক হইয়া মানুষ যোগানুশীলন করিলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ হইতে মানবসমাজ মুক্তিলাভ করিবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগও তখন দূর হইবে। মানব সভ্যতার অগ্রাভিযান, যোগবিদ্যার অগ্রাভিযান জয়যুক্ত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

আশ্রম সংবাদ

যোগবিদ্যাকে জনসাধারণের কল্যাণার্থে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় এই উদ্দেশ্যে আমাদের সংঘগুরু বিশ্ববরেণ্য যোগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ যোগবিদ্যা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণা ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা সমাদৃত হইয়াছে। এই গবেষণার ফলে আমরা নানা কঠিন রোগ নিরাময়কারী কতকগুলি নূতন যৌগিক ক্রিয়ার উদ্ভাবনও করিয়াছি। আমাদের যোগ সম্পর্কীয় পুস্তকগুলি সর্বভারতে এবং ভারতের বাহিরেও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। আমাদের প্রচলিত এই সহজ যৌগিক চিকিৎসার সহায়তায় শত শত কঠিন রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে। বলাবাহুল্য সমূহ রোগীই বিনামূল্যে আমাদের নিকট হইতে যৌগিক চিকিৎসা লাভ করেন।

আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কঠিন রোগীদের যৌগিক চিকিৎসার জন্য আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় আশ্রমে ৫০টি এবং কলিকাতা আশ্রমে ২৫টি বেড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছি। অজীর্ণ, অম্ল, আমাশয়, অর্শ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টন্‌সিল, রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, হৃদ্‌রোগ, হাঁপানী, থ্রম্বসিস্ প্রভৃতি মারাত্মক রোগে এবং অন্যান্য কঠিন রোগে আমরা আমাদের যৌগিক ক্রিয়াদি প্রয়োগ করিয়া রোগীদের আরোগ্য করিতেছি। সুতরাং বেড খালি থাকিলে আবেদনানুযায়ী কঠিন রোগীদের আমরা আশ্রমের চিকিৎসা বিভাগে স্থান দিই। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি সংক্রামক রোগীদের যদিও আমরা আশ্রমে স্থান দিতে পারি না, বলা বাহুল্য, আমাদের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে এই শ্রেণীর বহু রোগী আরোগ্য হইতেছে।

যোগবিদ্যা শিক্ষার জন্য বা জ্ঞান লাভার্থ বা সাধুসঙ্গ করা প্রভৃতি যে উদ্দেশ্য লইয়াই অভ্যাগতেরা আশ্রমে বাস করুক না কেন **সকলকেই নিজ নিজ আহার্য ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নিজেদের বহন করিতে হইবে।**

অভ্যাগতেরা আশ্রমে আসিবার পূর্বে আশ্রমাধ্যক্ষের/সম্পাদকের অনুমতি লইয়া আশ্রমে আসিবেন। নতুবা আশ্রমে আসিয়া স্থানাভাবে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

আশ্রম অভ্যাগতেরা একাকী বা সপরিবারে আশ্রম অধ্যক্ষের/সম্পাদকের অনুমত্যানুসারে যতদিন প্রয়োজন ততদিন আশ্রমে থাকিতে পারিবেন।

রিপ্লাই কার্ড বা স্ট্যাম্পসহ চিঠি দিলে, চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া হয়।

আমাদের আশ্রমে বহু চিঠিপত্র আসে। অন্য কোন কাজ না করিয়া সারা বৎসর উদয়াস্ত চিঠিপত্রের জবাব লিখিলেও সব চিঠির জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। এত চিঠির প্রাচুর্য সত্ত্বেও আমরা যত্নের সহিত সকলের চিঠিপত্রের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি।

যোগবিদ্যা ও যোগ চিকিৎসা প্রচারের জন্য যখন আমরা বাহিরে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের পক্ষে সময়মত চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া সম্ভবপর হয় না। এইরূপ অবস্থায় চিঠিপত্রের জবাব পাইতে ২/১ মাস বিলম্বও হইতে পারে।

আমাদের যোগাশ্রমের প্রধান কেন্দ্র আসামের কামাখ্যা পাহাড়ে অবস্থিত। আমাদের প্রতিষ্ঠান **শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘ** নামে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক রেজিষ্ট্রী-ভুক্ত।

আমাদের মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য প্রধানতঃ এই—

(১) যোগবিদ্যা সম্বন্ধে আরও গভীর গবেষণা, সর্বসাধারণের মাঝে যোগবিদ্যার প্রচার, ৩-১০ দিনের যোগ চিকিৎসা ও যোগ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা, দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং বিনামূল্যে যৌগিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(২) ভারতীয় আদর্শে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

(৩) বেদ, উপনিষদ, যোগ, তন্ত্র, পুরাণ, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের যুগোপযোগী সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘের শাখা কার্যালয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় গ্রাম—তাপিন্দা, পোঃ উত্তর বিশ্বনাথপুরে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর টাউনে নাজেরগঞ্জ, পাটনা বাজারে স্থাপিত হইয়াছে (এখানে যোগ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে)।

শিবানন্দ যোগাশ্রম, গ্রাম-মশাগ্রাম, পোঃ-দুড়িয়া, মেদিনীপুরেও আমরা একটি যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

পথ-নির্দেশ

শিবানন্দ মঠে (উমাচল যোগাশ্রম, উমাচল যৌগিক হাসপাতাল ও উমাচল যোগ মহাবিদ্যালয়-এ) আসিতে হইলে গৌহাটি অথবা কামাখ্যা স্টেশনে নামিয়া বাস, রিক্সা, ট্যাক্সি, অটো প্রভৃতি যে কোন যানে করিয়া আসাম ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া কালীপুর বাস স্টপেজে নামিতে হইবে। বাস স্টপেজে গ্রাগু অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর পার্শ্বে আশ্রমের সাইনবোর্ড দেওয়া আছে। সাইনবোর্ডের নিকট হইতে কালীপুর গেট দিয়া ১০/১৫ মিনিট পাহাড়ের উপরে উঠিয়া আসিলে আমাদের সংঘের প্রধান কার্যালয় দেখা যাইবে।

সংঘের শাখা-আশ্রম শিবানন্দ যোগাশ্রম ও যৌগিক হাসপাতাল, ৪৭১, নেতাজী কলোনী, কলিকাতা-৯০-এ আসিতে হইলে হাওড়া স্টেশন হইতে ১১ নং বাস, এস-৩২; রথতলা, বেলঘরিয়াগামী মিনিবাস, শিয়ালদহ স্টেশন হইতে ১১, ২৩০, ২৩৪, ৩৪বি/১, ৩৪-সি, এস-৯ এবং শ্যামবাজার হইতে ৭৮, ৭৮এ, এল-২০, এল-৯এ (ডানলপগামী) বাসে করিয়া বি. টি. রোড, পালপাড়া বাস স্টপেজে নামিতে হইবে। পালপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির (বর্তমানে বরানগর থানা) দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা দিয়া সোজা পূর্ব দিকে ৫/১০ মিনিট হাঁটিয়া আসিলে Central Wireless কার্যালয়ের পাশে **শিবানন্দ যোগাশ্রম** দেখা যাইবে। নাজেরগঞ্জ আশ্রমে যেতে হলে মেদিনীপুর রেল স্টেশনে নেমে রিক্সা করে আশ্রমে যাওয়া যাবে।

যৌগিক হাসপাতাল

যৌগিক ক্রিয়ায় রোগারোগ্যের অত্যাশ্চর্য সাফল্য দেখিয়া আমাদের মনে আশা জাগিতেছে—অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বত্র যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বর্তমানে প্রচলিত ব্যয়-বহুল এ্যালোপ্যাথিক ঔষধরূপ বিষ গলাধঃকরণ এবং বিষাক্ত ঔষধ ইনজেক্‌সনের হাত হইতে মানবজাতি চিরকালের জন্য অব্যাহতি পাইবে। তাই পথপ্রদর্শক হিসাবে আমরাও আমাদের কামাখ্যায় অবস্থিত **উমাচল যোগাশ্রমে** যৌগিক হাসপাতাল ও যোগশিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং কলকাতার বরানগরে **শিবানন্দ যোগাশ্রমে** যোগ শিক্ষাকেন্দ্র ও ২৫ বেডের যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। মেদিনীপুর শহরে নজরগঞ্জ শাখাতেও একটি ২৫ বেডের যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সংঘের পরিচালিত হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা ও সংঘের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত দানের সহায়তায় আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালনা করিতেছি। উক্ত সেবামূলক কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি করিতে আমরা বিশেষভাবে ইচ্ছুক। সংঘের এই পরিকল্পিত কাজকে পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত করিতে ও সংঘের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জমি ও অর্থের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির জন্য দেশের সহৃদয় ব্যক্তিদের নিকট উক্ত সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। আশাকরি আমরা প্রয়োজনীয় সাহায্য অনায়াসেই জনসাধারণের নিকট হইতে পাইব। আমাদের প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা ; আমাদের এখানে যে কোন আর্থিক সাহায্য ৮০জি ধারায় আয়কর মুক্ত।

যাঁহারা আমাদের এই কাজে আর্থিক সাহায্য করিবেন তাহাদের কোন আপত্তি না থাকিলে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা আমাদের যোগশিক্ষা মন্দিরে এবং যৌগিক হাসপাতালে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইবে।

ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকলের নিকটেই আমরা সাহায্য প্রার্থী। সাধ্যমত যিনি যাহা সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং

আমাদের কেন্দ্রীয় মঠ ও শাখা আশ্রম হইতে প্রত্যেক দাতার কাছেই দানের প্রাপ্তি সংবাদ প্রেরণ করা হইবে।

আমাদের যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পায়ে কাঁটা ফুটিলে যেমন আরেকটি কাঁটার দ্বারা আমরা সেই কাঁটা তুলিয়া ফেলি এবং সর্বশেষে উভয় কাঁটাই বর্জন করি, তেমনি যৌগিক হাসপাতাল প্রচলন করিয়া ব্যয়বহুল এবং ক্ষতিকারক মেডিকেল হাসপাতালের বিকল্প উন্নততর যোগ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলন করা প্রয়োজন। এইজন্যই যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দরকার হইয়াছে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং খাদ্যনীতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। তাই মানুষকে অসুস্থ হইয়া হাসপাতালের আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং হাসপাতাল মনুষ্যসমাজের পক্ষে অগৌরবের। মানুষের স্বাস্থ্যনীতির অজ্ঞতারূপ পাপের উহা প্রায়শ্চিত্ত ভবন। আমাদের প্রচারিত যোগবিদ্যা ও খাদ্যনীতি সম্বন্ধে মানবসমাজ সচেতন হইলে আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিলে মানুষকে আর হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না ; স্বগৃহে থাকিয়া মানুষ চিরজীবন নিজেকে রোগমুক্ত রাখিতে পারিবে। আমাদের প্রচারিত সহজ যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে সমুদয় দুরারোগ্য রোগ যথা হাঁপানি, হৃদরোগ, রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, ক্রনিক আমাশয় রোগ, গ্যাসট্রিক আলসার রোগ, পক্ষাঘাত রোগ, শ্বেতী রোগ প্রভৃতি বিনা ঔষধে নির্দোষভাবে আরোগ্যলাভ করিতেছে। একমাত্র দুর্ঘটনার চিকিৎসা ছাড়া মেডিকেল হাসপাতালের কোন প্রয়োজন হইবে না—এইরূপ সুদিন মনুষ্যসমাজে আসুক—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। এই সুদিন দ্রুত আসুক—এই উদ্দেশ্যেই আমরা যোগবিদ্যা প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।

বহির্বিভাগে রোগী দেখা ও রোগপ্রশমক যৌগিকক্রিয়াদি প্রশিক্ষণের সময়—প্রতি বৃহস্পতিবার, শনিবার ও রবিবার সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত।

আমাদের কেন্দ্রীয় মঠ উমাচল যোগাশ্রম ও যৌগিক হাসপাতাল, কামাখ্যায় ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রীয় যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা অনুসন্ধান পরিষদ-এর সহায়তায় গত ১৯৭২ সাল হইতে

বিভিন্ন রোগারোগ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক যোগ গবেষণা চলিতেছে। অনুরূপভাবে কলকাতার শিবানন্দ যৌগিক হাসপাতালও যোগ গবেষণা কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠিত যোগাশ্রম ও যৌগিক হাসপাতালে রোগীদের, এই সহজ যৌগিক চিকিৎসায় আরোগ্যলাভের আহ্বান জানাইতেছি।

UMACHAL YOGA MAHAVIDYALAYA (YOGIC COLLEGE)

YOGA TRAINING COURSE

1.	Yoga Therapy Course	—	4½	Years
2.	Yoga Diploma Course	—	15	Months
3.	Yoga Certificate Course	—	6	Months
4.	Yoga Certificate Course	—	1	Month

RULES OF ADMISSION

Yoga Therapy Course—Minimum qualification for admission will be Higher Secondary or passing an equivalent examination with ability to follow lectures in English. Yoga Diploma holders, Medical Students, Madhyama Certificate holders (Sanskrit) and graduates of a recognised University will be given preference in admission. Academic qualification is relaxable in special cases.

15 Months Yoga Diploma Course—Minimum qualification for admission will be Higher Secondary or passing an equivalent examination. Academic qualification is relaxable in special cases.

6 Months Yoga Certificate Course—Madhyamik, H.S.L.C. passed candidates are eligible for admission.

1 Month Yoga Certificate Course—Anyone capable of reading and writing is allowed for admission. Admission to this course is open at any time throughout the year.

Students may ask for '**Prospectus**' with Rs. 15.00 Postage Stamp or money order.

OUR PUBLICATION

Works by : -

His Divinity SRIMAT SWAMI SHIVANANDA SARASWATI MAHARAJ

(ENGLISH)

1. **Yogic Therapy—To cure all diseases by Yoga** (9th Ed.)

Processes of radical cure of all common and deadly diseases by simple Yoga system, will be found in this book. Those who wish to have a disease-free body for life should have a copy of this book.

9th Edition Price 200.00 only, Foreign Ed. 12 dollars.

2. **Brahmacharya for Boys & Girls** (3rd Edition)

This book is a real guide to the student and very helpful for character building. Rs. 20.00. Foreign Ed. 1 dollar only.

3. **Yogic Byayam for Students (2nd Ed.)** Rs. 40.00

4. **Arrange Right Diet for Human Beings** Rs. 10.00

5. **Yoga Science (1st Ed.)** Rs. 10.00
6. **Build New India and a New World** Rs. 25.00

This book will be real guide to elevate human society by removing the root cause of physical and mental degeneration. Rs. 5.00. Foreign Ed. 1 dollar only.

7. **Principle of Diet (1st Ed.)** Rs. 20.00
8. **Yoga Se Rog Nivaran** (Hindi 6th Ed.) Rs. 150.00
9. **Khadyaniti Aur Shishupalan Bidhi** (Hindi) Rs. 20.00
10. **Sadguru Swami Shivananda** (Hindi) Rs. 25.00

—Smt. Arati Bhowmik.

আমাদের প্রকাশিত

অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি

(বাংলা)

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত ঃ

১। যোগবলে রোগ আরোগ্য (৩৪তম সংস্করণ)

হৃদরোগ, রক্তচাপবৃদ্ধি, করোণারী থ্রম্বোসিস্, শূলরোগ, হার্ণিয়া, অজীর্ণ, অম্ল, আমাশয়, শ্বেতকুষ্ঠ, গোদ, অর্শ, পক্ষাঘাত,যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পাইওরিয়া, টন্‌সিল, বিবিধ স্ত্রীরোগ প্রভৃতি ৮৫টি মারাত্মক রোগের কারণ, উহার যৌগিক চিকিৎসা প্রণালী, নিয়ম, পথ্য প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই সহজসাধ্য যৌগিক আরোগ্য প্রণালী শয্যাশায়ী রোগীর পক্ষেও অনুষ্ঠানযোগ্য। যৌগিক প্রণালীতে রোগ আরোগ্য হইলে রোগের পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না।

এইসব রোগারোগ্য প্রণালী ছাড়াও দেহতত্ত্ব, গ্রন্থিতত্ত্ব, ঔষধের

অপকারিতা, আদর্শ দাম্পত্যজীবন প্রভৃতি প্রবন্ধসম্ভারে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। "প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে এই পুস্তকখানি অমূল্য সম্পদস্বরূপ।"

৮০ প্রকার আসন-মুদ্রার হাফটোন ছবিসহ এই পঞ্চশতাধিক পৃষ্ঠার বিরাট বইখানির মূল্য—১৭০.০০ টাকা মাত্র।

২। ঈশোপনিষদ (ষষ্ঠ সংস্করণ)

গ্রন্থকার কর্তৃক ঈশোপনিষদের বৈদিক ধারায় নূতন ভাষ্য রচিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে শাঙ্কর-ভাষ্য, রামানুজ-ভাষ্য ও মাধ্ব-ভাষ্য প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যকারদের ভাষ্যের সহজবোধ্য বাংলা অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। ভগবদতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই নূতন উপনিষদ ভাষ্যে বিবৃত হইয়াছে। শাস্ত্রানুরাগী ও শাস্ত্রবিদ্বেষী উভয়ের কাছেই পুস্তকখানি সমভাবে উপাদেয় বিবেচিত হইবে। মূল্য—২৫.০০ টাকা মাত্র।

৩। খাদ্যনীতি (২০শ সংস্করণ)

(খাদ্যের সাহায্যে নীরোগ দেহ ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায়)

প্রথম অধ্যায়—দেহের উপাদান, দেহস্থ অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির কার্যকারিতার বর্ণনা।

লবণ (Mineral Salts)—ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রণ, আইওডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার (তাম্র), সালফার (গন্ধক), ফ্লোরিন, ক্লোরিন, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট প্রভৃতি লবণের কার্যকারিতা এবং উক্ত লবণ সমৃদ্ধ খাদ্যের বর্ণনা।

খাদ্যের উপাদান—প্রোটিন খাদ্য, চর্বিজাতীয় খাদ্য, শর্করাজাতীয় খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন—ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই, এইচ, কে প্রভৃতির কার্যকারিতা এবং ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্যের বর্ণনা। খাদ্যোপাদান বিশ্লেষণসহ প্রধান প্রধান খাদ্যাদির তালিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—সুষম পথ্যবিধি; মানুষ নিরামিষভোজী না আমিষভোজী? দীর্ঘদেহ লাভের উপায়; মদ্যপানাসক্তি ও যুদ্ধোন্মাদনা প্রতিরোধের উপায়; অকালমৃত্যু প্রতিরোধের উপায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে—আদর্শ পথবিধি, সাত্ত্বিক খাদ্য, রাজসিক খাদ্য ও তামসিক খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা। মাছ, মাংস ও ডালের পুষ্টিকর উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা। ডিমের দোষ ও গুণ এবং গুঁড়াদুধের দোষ-গুণের বর্ণনা। প্রতিভাবর্ধক নারিকেল ফলের উপকারিতার বর্ণনা, ভারতীয় পথ্যবিধির সারসংক্ষেপ। খাদ্যের নৈতিক আদর্শ (হিংসা-অহিংসা)। ছাত্র-ছাত্রীদের জলযোগ।

চতুর্থ অধ্যায়ে—শিশুর পথ্যবিধি, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুর অকালমৃত্যু প্রতিরোধের উপায়, মাতার স্বাস্থ্য, মাতার পথ্য ইত্যাদি। মূল্য—৪৫.০০ টাকা মাত্র।

৪। সহজ যৌগিক ব্যায়াম (১৯শ সংস্করণ)

প্রথম অধ্যায়ে—পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, প্রভৃতি ৭টি ধ্যানাসনের বর্ণনা। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে**—ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, অর্ধচক্রাসন প্রভৃতি ৮৫টি স্বাস্থ্যাসনের বর্ণনা। **তৃতীয় অধ্যায়ে**—যোগমুদ্রা, বিপরীতকরণী মুদ্রা, সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা, উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রা প্রভৃতি ১২টি মহোপকারী মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ। **চতুর্থ অধ্যায়ে**—গ্রন্থিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, আকৃতি ও স্বভাবের উপর গ্রন্থিক্রিয়ার প্রভাব। **পঞ্চম অধ্যায়ে**—স্বাস্থ্যলাভার্থে সাধারণ নির্দেশ, পথ্যাপথ্যের বিবরণ। আর্টপেপারে মুদ্রিত আসন-মুদ্রার সুদৃশ্য ১৩৫টি ছবিসহ—মূল্য—৭০.০০ টাকা মাত্র।

(পুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী)

৫। বিবিধ প্রাণায়াম ও নেতি-ধৌতি (১৭শ সংস্করণ)

প্রথম অধ্যায়ে—বায়ু বা প্রাণতত্ত্ব, হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুসের বিবরণ। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে**—লঘু প্রাণায়ামের বিবরণ। **তৃতীয় অধ্যায়ে**—সহজ

প্রাণায়ামের বিবরণ। **চতুর্থ অধ্যায়ে**—বৈদিক প্রাণায়াম ও সব্যাহৃতি গায়ত্রীতত্ত্ব ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে ব্রহ্মাতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব প্রভৃতি হিন্দুধর্মের ত্রিতত্ত্বের ব্যাখ্যা সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে**—রাজযোগ প্রাণায়াম। **ষষ্ঠ অধ্যায়ে**—পাশ্চাত্য প্রাণায়াম। **সপ্তম অধ্যায়ে**—প্রাণায়াম সম্বন্ধে বিধিনিষেধ। **অষ্টম অধ্যায়ে**—ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলি, কপালভাতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম। **নবম অধ্যায়ে**—যৌগিক স্বরশাস্ত্রানুযায়ী যাত্রার শুভ সময় নির্ধারণ, তত্ত্ব লক্ষণ; শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে রোগারোগ্যের কৌশল ; গুণবান গুণবতী পুত্র-কন্যা লাভের উপায় ; পূর্বেই মৃত্যু জানিবার উপায় প্রভৃতি। মূল্য—৪৫.০০ টাকা মাত্র।

৬। ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন (১৫শ সংস্করণ)

প্রথম অধ্যায়ে—ছেলেদের ব্রহ্মচর্য (শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক), আদর্শ দেহ গঠনের উপায় ; **দ্বিতীয় অধ্যায়ে**—মেয়েদের ব্রহ্মচর্য (শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক), **তৃতীয় অধ্যায়ে**—কামোত্তেজনা প্রশমনের উপায়, সুপ্তিস্খলন রোগ আরোগ্যের উপায়, ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীদের অভিমত। **চতুর্থ অধ্যায়ে**—সদাচার বিধি ও শিষ্টাচার বিধি। বিড়ি, সিগারেট ও চা সেবনের অপকারিতা প্রভৃতি। **পঞ্চম অধ্যায়ে**—চরিত্র-গঠন, সুরুচি, কর্তব্যপরায়ণতা, স্বাবলম্বন, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রীতি। মূল্য— ৫০.০০ টাকা মাত্র।

৭। ধ্যানযোগ (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ)

এই ধ্যানযোগ নামক পুস্তকে ধ্যানের বিষয় ও প্রণালী সবিস্তারে ও অতি সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সকলের কাছেই এই পুস্তকখানি মহা আদরণীয় হইবে। মূল্য—২০.০০ টাকা মাত্র।

৮। যোগীরাই মানব সমাজের হিতকারী বন্ধু ও পরিত্রাতা

বিভিন্ন যুগের ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যোগীদের প্রভাব কিরূপ ছিল। তাঁহারা ভারতীয় সম্রাটদের রাজ্য পরিচালনায় কিভাবে সহায়তা করিতেন,

তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা এবং যোগীরাই যে সমাজের সত্যিকারের পথপ্রদর্শক, সমাজের পরিচালক এই মহাসত্যই গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে এই পুস্তকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মূল্য ১০.০০ টাকা মাত্র।

৯। পত্রাবলী (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ)

পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ তাঁর ভক্ত-শিষ্য ও অনুরাগীদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন ভাবে চিঠিপত্রের মাধ্যমে উপদেশ দিয়াছেন, এই গ্রন্থে স্বামীজী মহারাজের স্বহস্তে লিখিত ১০৪ খানি চিঠি আছে। এই গ্রন্থ থেকে অনেকেই তাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন। সকলকেই আমরা এই গ্রন্থখানি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। মূল্য ১০.০০ টাকা মাত্র।

১০। **পত্রাবলী** (২য় খণ্ড, ১ম সং) মূল্য ১০.০০ টাকা

১১। **দেবীতত্ত্ব** (১ম সংস্করণ) মূল্য ১০.০০ টাকা

[শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব, কালীতত্ত্ব, দুর্গাতত্ত্ব, জগদ্ধাত্রীতত্ত্ব ও অন্নপূর্ণা তত্ত্বের প্রাঞ্জল বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে।]

১২। **উপনিষদ রহস্য (কঠ)** (২য় সং) মূল্য ৪০.০০ টাকা

১৩। **উপনিষদ রহস্য (মুণ্ডক)** (১ম সং) মূল্য ১৫.০০ টাকা

১৪। **উপনিষদ রহস্য (প্রশ্ন)** (১ম সং) মূল্য ১৫.০০ টাকা

১৫। **উপনিষদ রহস্য (কেন)** (১ম সং) মূল্য ২০.০০ টাকা

এই উপনিষদগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ আধুনিক যুগের উপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি থেকে সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে অনুধাবন করিতে পারিবেন।

১৬। **বিচিত্রা** (১ম সং) মূল্য ১০.০০ টাকা

১৭। **স্তোত্রমালা** (২য় সং) মূল্য ৫.০০ টাকা

১৮। **সচিত্র আসন তালিকা** মূল্য ৩০.০০ টাকা

১৯। **যোগেশ্বর**—যোগ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘের মুখপত্র। বেদ, উপনিষদ, যোগ, শিক্ষা, দর্শন ও অন্যান্য মূল্যবান প্রবন্ধসম্ভারে পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত/সম্পাদিত ঃ

২০। **ধ্যানকল্পায়ন** (২য় সং) মূল্য ১০.০০ টাকা
২১। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (২য় সং) মূল্য ৬০.০০ টাকা
২২। **হঠযোগ প্রদীপিকা** (২য় সং) মূল্য ৬০.০০ টাকা
২৩। **আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন** (১ম সং) মূল্য ১০.০০ টাকা
২৪। **গল্পে নীতিকথা** (৪র্থ সং) মূল্য ১০.০০ টাকা
২৫। **পাতঞ্জল যোগদর্শন** (২য় সং) মূল্য ৫০.০০ টাকা
২৬। **যোগবীজ** (১ম সং) মূল্য ২০.০০ টাকা
২৭। **সাংখ্য দর্শন** (১ম সং) মূল্য ১০.০০ টাকা
২৮। **সদ্গুরু স্বামী শিবানন্দ** (১ম সং) মূল্য ২৫.০০ টাকা
—শ্রীমতি আরতি ভৌমিক

গ্রন্থকারের ছবি—(৩" × ৪") ২.০০ টাকা, **রঙিন** (১৫" × ১৮") ১০.০০ টাকা।

(অসমীয়া)

১। **যোগবলে ৰোগ আৰোগ্য** (৯ম সং) মূল্য ১৩৫.০০ টাকা
২। **সহজ যৌগিক ব্যায়াম** (৫ম সং) মূল্য ৭০.০০ টাকা
৩। **খাদ্যনীতি আৰু শিশুপালনবিধি** (৩য় সং) মূল্য ৪৫.০০ টাকা
৪। **ব্ৰহ্মচর্য আৰু ছাত্ৰজীৱন** (৩য় সং) মূল্য ২০.০০ টাকা
৫। **বিবিধ প্ৰাণায়াম আৰু নেতি-ধৌতি** (১ম সং) মূল্য ৩৫.০০ টাকা
৬। **আদর্শ গার্হস্থ্য জীৱন**(১ম সং) মূল্য ১০.০০ টাকা
৭। **মহর্ষি স্বামী শিৱানন্দ** (১ম সং) মূল্য ৩০.০০ টাকা
—অধ্যাপক শ্ৰীহিতেশ্বৰ শৰ্মা

(ওড়িয়া)

১। যোগবলে রোগ আরোগ্য (২য় সং) মূল্য ৯০.০০ টাকা

২। **সহজ যৌগিক ব্যায়াম** (১ম সং) মূল্য ৪০.০০ টাকা
৩। **খাদ্যনীতি ও শিশুপালনবিধি** (১ম সং) মূল্য ৩০.০০ টাকা
৪। **ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন** (১ম সং) মূল্য ২০.০০ টাকা
৫। **সদ্‌গুরু স্বামী শিবানন্দ** (১ম সং) মূল্য ২০.০০ টাকা

উমাচল গ্রন্থাবলী গৃহস্থদের পক্ষে অমূল্য রত্ন স্বরূপ—ইহাই দেশের সুধী ব্যক্তিদের অভিমত। প্রত্যেক গৃহস্থের ও ছাত্র-ছাত্রীদের উহা পাঠ করা উচিত।

ভি.পি.

সংঘের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও যৌগিক ক্রিয়ার উপযোগী বারিসার ধৌতির নল, জলনেতির পাত্র, সূত্রনেতি ও বস্ত্রধৌতির কাপড় ভি.পি.-এর মাধ্যমে ডাকযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। গ্রাহকদের আমরা অনুরোধ জানাইতেছি, ভি.পি. অর্ডারের সহিত কমপক্ষে ৩০ টাকা অগ্রিম হিসাবে মানি অর্ডারে পাঠাইবেন। মানি অর্ডার কুপনের সংবাদ লিখিবার স্থানে প্রয়োজনীয় পুস্তক ইত্যাদির নাম এবং নিজের নাম, ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

পুস্তক প্রশংসা

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে আমাদের প্রকাশিত সমুদয় পুস্তকগুলি বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। কোন কোন সম্পাদক সুদীর্ঘ স্থান জুড়িয়া আমাদের পুস্তকের প্রশংসাবাণী স্বীয় পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাভাবে বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার আমাদের দ্বারা

সম্ভবপর হয় না, কিন্তু সম্পাদকমণ্ডলীর সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা আমাদের এই পুস্তক প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে। এই জন্য বাংলাদেশের মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। স্থানাভাবহেতু এই সমস্ত সমালোচনার বিস্তৃত বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। কয়েকটি সমালোচনার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

* * *

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীকৃত **"যোগবলে রোগ আরোগ্য"** পুস্তকখানি এত উপকারী হইয়াছে যে প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থের ইহার এক খণ্ড সংগ্রহ করা উচিৎ।

(শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০)

বাঙ্গালা ভাষায় যোগবিষয়ে এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর আর কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া আমরা জানি না। এই মহোপকারী **যোগপদ্ধতি** প্রতি গৃহের প্রত্যেক নর-নারী অনুশীলন করিলে জাতি তাহার হৃতস্বাস্থ্য, আয়ু, বল ও প্রাণশক্তি অচিরেই ফিরিয়া পাইবে—একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এইরূপ একখানা একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রতি গৃহে গীতার ন্যায় নিত্য পাঠ্য না হইলে জাতীয় জীবনের পরম দুর্ভাগ্য বলিয়াই আমরা মনে করিব। স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ এই যোগবিজ্ঞান সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার মানবসমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা গ্রন্থকারকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করিয়া পারিতেছি না।

(সুদর্শন পত্রিকা, রাস সংখ্যা,১৩৫৯)

ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন পুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধান এবং উন্নত চরিত্র গঠনে সাহায্য করিবে। অধিকন্তু, তাহাদের অভিভাবকদিগকে এতৎ সম্পর্কিত কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। (দেশ পত্রিকা, ইং ১৩/৫/৫২)

এই সুলিখিত পুস্তকখানিতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্রহ্মচর্য পালনের প্রয়োজন ও উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এই বইখানিতে সর্বাঙ্গীন ব্রহ্মচর্য পালনের প্রণালী নির্দেশ করিয়া উন্নততর সমাজ গঠনের যে সুন্দর পথের সন্ধান দিয়াছেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থের কলেবর অনুপাতে দামও এখনকার বাজারে সস্তাই বলিতে হইবে।

(যুগান্তর, ইং ৩/৮/৫২)

আলোচ্য **ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন** গ্রন্থখানি জাতির জীবনে বেদ স্বরূপ। আমরা দেশের শিক্ষিত পিতামাতা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণকে এই অনুরোধ করিতেছি—এই গ্রন্থখানি তাঁহারা নিজেরা পাঠ করুন এবং তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় পুত্র-কন্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলিয়া দিন, ফলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন মনুষ্যত্ব বিকাশে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। জাতির কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(সুদর্শন, দোল সংখ্যা ১৩৫২)

ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন—ভাবী বাঙ্গালী সমাজ যাহাতে আদর্শ জীবন যাপনের সুযোগ পায়, সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই গ্রন্থখানি রচিত। বাংলার ছাত্র ও ছাত্রীগণ এই পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কেন ছেলে-মেয়েরা স্বাস্থ্যহীন, খর্বাকৃতি, অল্পায়ু এবং ব্যাধি ও অকালমৃত্যু পীড়িত হইয়া থাকে, ইহার কারণ একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়টি অভিভাবক ও পিতা-মাতাগণের বিশেষভাবে পড়া উচিত। **চরিত্রগঠন** অধ্যায়টির উপর ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। এই গ্রন্থখানির বিশেষ প্রচার হওয়া উচিত এবং হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

(আনন্দবাজার, ইং ৭/৯/৫২)

রোগীদের প্রশস্তি

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী

"১৯৫১ সালের মার্চ মাসে আমি হৃদরোগে অসুস্থ হইয়া পড়ি। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকেরা একমত হইয়া রায় দিলেন—আমার রোগ চিকিৎসার বাহিরে গিয়াছে অর্থাৎ শীঘ্রই আমাকে যমরাজের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার জনৈক আত্মীয়ের মারফৎ আপনার **'যোগবলে রোগ আরোগ্য'** বইখানি আমি পাই এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার উপদেশ মত চলিতে আরম্ভ করি। আপনার ব্যবস্থায় ঔষধের উৎপাত তো নাই-ই, এমন কি রোগারোগ্যে আপনার নিয়ম-পথ্য ডাক্তারী নিয়মপথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম প্রথম আমার মনে এই সংশয় জাগিয়াছে—আমাদের দেশের এতবড় পাশকরা সব ডাক্তার সকলেই কি নিয়ম-পথ্যাদি সম্বন্ধে ভুল পথে চলিয়াছেন! আপনার পন্থায় দ্রুত আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইয়াছে আপনার পন্থাই ঠিক, ডাক্তাররাই ভুল পথে চলিতেছেন। আমার নাড়ীর স্পন্দন ৩৭/৩৮-এর পরিবর্তে বর্তমানে ৭২-এ আসিয়াছে। আমার সর্দি, কাশি, বাত প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অসুখগুলিও দূর হইয়াছে। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল এবং যুবকদের মতো যে কোন কাজ করিতে পারি। বর্তমানে আমার ৬৮ বৎসর বয়স চলিতেছে। মনে হইতেছে আপনার কৃপায় নীরোগ দেহে আরও ৫/১০ বৎসর বাঁচিব। আমার পুনর্জীবন লাভের জন্য, বাড়তি আয়ুর জন্য আপনার কাছে আমি চিরঋণী।

ডাক্তাররা যাহাদের 'চিকিৎসার বাহিরে গিয়াছে' বলিয়া রায় দেন, আপনার পন্থায় চলিলে তাহাদের অনেকেই রোগমুক্ত হইয়া আমার মতো পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিবেন। ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস। বাংলাদেশের অধিকাংশ মনীষী রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, হৃদরোগ, করোনারী থ্রম্বসিস্ প্রভৃতি রোগে অকালমৃত্যু বরণ করেন। এই সমস্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা ডাক্তারী চিকিৎসা বর্জন করিয়া অতি সহজসাধ্য আপনার এই

যৌগিক চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলে অচিরে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই। প্রত্যেক চিকিৎসককে আমি আপনার এই পুস্তকখানি পড়িবার অনুরোধ জানাইতেছি। আপনার যোগ সিরিজের বইগুলি বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হউক—ইহাই কামনা করি। .... আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন।"

শ্রীমাধবচন্দ্র রাউত (অবসরপ্রাপ্ত ইনস্‌পেক্টর অফ্ পুলিশ)
৫০, মধুসূদন ব্যানার্জী রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা।

... আমি করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে তিনবার উপর্যুপরি আক্রান্ত হওয়ার পর এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর আর আস্থা রাখিতে না পারিয়া আপনার যৌগিক ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করি। আপনার ব্যবস্থা গ্রহণের পর এই সুদীর্ঘ ১০ বৎসরের মাঝে আমি আর রোগাক্রান্ত হই নাই। আমি নূতন জীবন লাভ করিয়াছি ; আমার মনে হইতেছে—আমি চিরজীবনের মত আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এই ধরণের কঠিন রোগ এত সহজসাধ্য যৌগিক উপায়ে আরোগ্য হইতে পারে—ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল। এই রোগে আক্রান্ত ভারতবাসী মাত্রকেই সুনিশ্চিত আরোগ্যের জন্য পূজনীয় স্বামীজী মহারাজের কাছ হইতে যৌগিক ব্যবস্থাপত্র গ্রহণের জন্য আমি অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রী গৌরগোপাল ধর
ঘুটিয়াবাজার, হুগলী।

গ্রন্থকার বিশ্ববরেণ্য যোগাচার্য পরম পূজনীয় সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ ১৩৮৬ সালের ২০শে আশ্বিন রবিবার (৭ই অক্টোবর, ১৯৭৯) বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

MODERN YOGA-SCIENCE

Modern material Science has invented Atom Bomb, Hydrogen Bomb and poisonous Gas, which can destroy all animals, all human races from the surface of the globe in a few minutes. But modern Yoga Science of India has invented a very easy process to save all human beings from senility, disease and untimely death and to extend human longevity over 125 years to 150 years by showing the Pathway to a higher life, full of Peace and Bliss. This simple process of Yoga-Science which is very beneficial for human society will be found in our Book—YOGIC THERAPY or Yogic way to cure Diseases.

If this Yoga system is introduced throughout the world there will be no necessity of Medicine, Doctoring and Medical Hospitals. This Yoga is a great boon to human society.

যোগবলে রোগ-আরোগ্য

"শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী রচিত যোগবলে রোগ-আরোগ্য গ্রন্থটি আমরা আদ্যোপান্ত পড়লাম এবং আরও অনেককে পড়ালাম। সবারই এক মত—গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গ্রন্থটি যে কেউ পড়বেন তিনিই এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে এই মতই প্রকাশ করবেন।... "যখন বাঙ্গালী-জাতি প্রায় ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যেতে বসেছে, সেই সময় আমাদের নানা সমস্যার একটা সমস্যা প্রতিকারের জন্য আশার আলো নিয়ে যিনি এগিয়ে আসেন, তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই।...আলোচ্য গ্রন্থটি **আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই পড়ে দেখবার জন্য অনুরোধ করব।** একবার পড়তে আরম্ভ করলে সমস্ত বইটাই পড়বার আগ্রহ জন্মায় এবং সমস্ত বইটা পড়া হয়ে গেলে মনে হয়—এত সহজ, এত সাধারণ বিষয়গুলি না জানা থাকায় কত মারাত্মক রকম ভুলই না আমরা করি। শরীর-তত্ত্বের জটিল বিষয়গুলি এত সুন্দর এবং এত প্রাঞ্জলভাবে যে বুঝানো যেতে পারে, তা এই বইটি না পড়লে ধারণা করা যায় না। আমরা সাধারণতঃ যে-সব রোগে প্রায়ই ভুগি, সেই অতি-পরিচিত রোগগুলির স্বরূপ এই বইটিতে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে।... রোগের কারণ যদি সাধারণের বোধগম্য হয়, তাহলে রোগ আরোগ্য হতে বেশী দেরী লাগে না। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থের নির্দেশমত চল্‌লে বহু কঠিন ও দুরারোগ্য রোগের হাত থেকে চিরতরে নিস্কৃতি পাওয়া যায়।... কোন কঠিন অথবা দুঃসাধ্য যোগ-ক্রিয়ার ব্যবস্থা এই বইটিতে নাই—সহজসাধ্য অল্প কয়েকটি যোগক্রিয়ার সাহায্যে সর্বব্যাধি আরোগ্য ও ভাবী রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এতে দেওয়া হয়েছে।"...

(চামেলি রহমান, মহিলা পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৫৮)

UMACHAL SERIES – 3
ISBN–81–85859–02–7